নন্দলাল বসু (১৮৮২–১৯৬৬) ও যামিনী রায়ের (১৮৮৭–১৯৭২)

শিল্প-সাহিত্যচর্চায় ভারত-সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক : তানিয়া মণ্ডল

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক : ড. সুমিতকুমার বড়ুয়া

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা: ৭০০০৩২
২০২৩

Certified that the Thesis entitled

'নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) ও যামিনী রায়ের (১৮৮৭-১৯৭২) শিল্প-সাহিত্যচর্চায় ভারত-সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণ' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Sumit Kumar Barua, Department of Bengali, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor   Candidate

Dated: Dated:

সূচিপত্র

কথামুখ ৬ — ৭

ভূমিকা ৮ — ৪৩

০.১ ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে চিত্রশিল্পের উৎস সন্ধান

০.২ ভারতশিল্পের ধারা

উৎস ও অনুষঙ্গ

চিত্রাবলি

প্রথম অধ্যায় ৪৪ — ১০৬

বিংশ শতাব্দীর নব্যবঙ্গীয় শিল্পচর্চার পূর্বাপর পরিস্থিতি

১.০ ভূমিকা

১.১ ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পচর্চা

১.২ বিংশ শতাব্দীর শিল্পচর্চা

১.৩ উপসংহার

উৎস ও অনুষঙ্গ

চিত্রাবলি

দ্বিতীয় অধ্যায় ১০৭ — ১৬৮১

লোকশিল্পানুষঙ্গ : নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

২.০ ভূমিকা

২.১ পটচিত্র

২.২ আলপনা

২.৩ কাঁথা

২.৪ লোকশিল্পের অন্যান্য ধারায় যামিনী রায়

২.৫ উপসংহার

উৎস ও অনুষঙ্গ

চিত্রাবলি

তৃতীয় অধ্যায় ১৬৯ — ২২

বিদেশি অনুষঙ্গ : নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৩.০ ভূমিকা

৩.১ বিদেশি অনুষঙ্গে নন্দলাল বসু

৩.২ বিদেশি অনুষঙ্গে যামিনী রায়

৩.৩ উপসংহার

উৎস ও অনুষঙ্গ

চিত্রাবলি

চতুর্থ অধ্যায় ২২৬ — ২৩০

চিত্রসাহিত্য : নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৪.০ ভূমিকা

৪.১ গ্রন্থ অলংকরণ ও প্রচ্ছদভাবনা

৪.২ কাব্য ও ধর্মসাহিত্য সংযোগ

৪.৩ নাটক ও মঞ্চভাবনা

৪.৪ চিত্র-শিল্প-সাহিত্যভাবনা

৪.৫ উপসংহার

উৎস ও অনুষঙ্গ

চিত্রাবলি

পঞ্চম অধ্যায় ৩২১ — ৩৫৭

নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের তুলনামূলক আলোচনা

৫.০ ভূমিকা

৫.১ লোকশিল্পের আলোকে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৫.২ বিদেশি অনুষঙ্গে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৫.৩ সাহিত্যের সংস্পর্শে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৫.৪ পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৫.৫ রাজনৈতিক চেতনায় নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৫.৬ শ্লীলতার ভাবনায় নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৫.৭ নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও শিল্পভাবনা

৫.৮ উপসংহার

উৎস ও অনুষঙ্গ

চিত্রাবলি

উপসংহার ৩৫৮ — ৩৬১

গ্রন্থপঞ্জি ৩৬২ — ৩৮৪

কথামুখ

চিত্রশিল্পের প্রতি ভালোলাগা এবং সেই সূত্রে শিল্পী ও শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে জানার আগ্রহ থেকে গবেষণার বিষয় হিসাবে বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা দুই শিল্পী নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের শিল্প-সাহিত্যচর্চা বিষয়ে গবেষণা শুরু করি। ছোটবেলায় ছবি আঁকার সঙ্গে বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি ও তাঁদের জীবন, শিল্পচর্চার ইতিহাস, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যিনি আমাকে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলেছেন সেই প্রণম্য শিক্ষক মহাদেব নস্করের প্রতি আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক দীপান্বিতা ঘোষ এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক স্যমন্তক দাসের শিক্ষা আমার চিরকালের পাথেয়। বাংলা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক বিশেষত অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল, অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক বিশেষত অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল এবং এই দুই বিভাগের অন্যান্য সদস্য যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সুমিতকুমার বড়ুয়া গবেষণা প্রকল্পের অভিমুখ নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোতে স্তরে স্তরে নানাভাবে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। গবেষণা চলাকালীন ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষামূলক এবং গবেষণা বিষয় সংক্রান্ত নানা সমস্যায় পাশে থেকেছেন। কোন শব্দচয়নই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

‘অভিব্যক্তি’-এর প্রতিষ্ঠাতা উৎপল চক্রবর্তীর নানা বিশ্লেষণ থেকে উপকৃত হয়েছি। তাঁর স্নেহধন্যা হতে পেরে আমি গর্বিত।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারির বিভাগীয় প্রধান স্বামী তত্ত্বাতীতানন্দ ও কিউরেটর শঙ্খ বসুর বিশেষ সাহায্য পেয়েছি।

জাতীয় গ্রন্থাগার, যদুনাথ ভবন জাদুঘর ও সম্পদ কেন্দ্রের আর্কাইভ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের গ্রন্থাগার, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গ্রান্থাগার, বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এছাড়া বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ‘ইন্টারনেট আর্কাইভ’, ‘গ্রান্থাগার’ ও ‘বিচিত্রা’ ইত্যাদি থেকে তথ্য ও গ্রন্থ সংগ্রহ করে উপকৃত হয়েছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গ্রন্থাগারিক নিতাই চন্দ্র মণ্ডল, সুদীপ বৈদ্য, বাংলা বিভাগের গ্রান্থাগারিক আইভি আদক ও হরিশ চন্দ্র মণ্ডল বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমার বাবা স্বপন মণ্ডল এবং আমার মা শীলা মণ্ডল যাঁরা আমাকে গবেষণার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার যথেষ্ট নয়। আমার পরম বন্ধু ও স্বামী অমিত ঘোষ গবেষণার কাজে ছবি নির্বাচন, বিব্লিওগ্রাফি দেখে দেওয়া সহ নানা ভাবে সাহায্য করেছে এবং নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছে। আমার সন্তান অত্রির মধুর শাসন ও ত্যাগ স্বীকার ছাড়া গবেষণার কাজ করা সম্ভব হতো না। আমার পরিবার পরিজন, বন্ধুবর্গ প্রতিটি মুহূর্তে যাঁরা আমার পাশে থেকেছেন তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

গভীর মনোনিবেশ সত্ত্বেও গবেষণা পত্রে যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে থাকে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

তানিয়া মণ্ডল

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩

ভূমিকা

০.১ ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে চিত্রশিল্পের উৎস সন্ধান

ভারতবর্ষে চিত্রচর্চা বহু প্রাচীন কাল থেকে শুরু হলেও সেই ইতিহাস লিখে রাখার উদ্যোগ ভারতীয়দের মধ্যে দেখা যায়নি। প্রাচীন শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ প্রকৃত চিত্র চর্চার বহুকাল পরে রচিত হয়। প্রাচীন চিত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – *চিত্রসূত্র, অভিলাষিতার্থচিন্তামণি, শিবরত্নাকর, নারদশিল্প, শিল্পরত্ন, সরস্বতীশিল্প, প্রজাপতিশিল্প।* এছাড়া দামোদর গুপ্তের *কুট্টনীমতম্*, ভোজরাজের *'সমরঙ্গণসূত্রধর*, চালুক্য বংশের সোমেশ্বর রচিত *অভিলাষিতার্থমণি*, বেদনরের বাসপ্পনায়ক রচিত *শিবেশ্বরাতঙ্করা*, শ্রীকুমার রচিত *শিল্পরত্ন*, গুপ্তযুগে *চিত্রলক্ষণ।*

চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে নৃপতি ভয়জিৎকে চিত্রশিল্পের আদিশিল্পী বলা হয়েছে। আবার বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে নারায়ণ মুনিকে আদিশিল্পী বলা হয়েছে।[১] *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদ-সনৎ কুমার সংবাদে দেখতে পাই নারদ চতুর্বেদ ব্রহ্মবিদ্যা বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে 'দেবজনবিদ্যা' (কলাবিদ্যা) অধ্যয়ন করেছিলেন। পালিগ্রন্থ *উম্মাগজাতক*-এ রাজপ্রাসাদের চিত্রের বর্ণনা আছে।[২] চিত্রবিদ্যার প্রথম গ্রন্থ *চিত্রসূত্র*-এর উপসংহারে চিত্রকেই প্রধান কলা বলে বিবেচনা করে বলা হয়েছে –

কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্।

মঙ্গল্যং প্রথমং বৈ তদ্ গৃহে যত্র প্রতিষ্ঠিতম্।।

অর্থাৎ কলাশেষ্ঠ চিত্র ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল প্রদায়ক; যে গৃহে চিত্রও প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে মঙ্গল বিরাজ করে। চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রন্থাকার একটি শ্লোকে যা বলেছেন তা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় – 'পর্বতের মধ্যে যেমন সুমেরু শ্রেষ্ঠ, পক্ষীর মধ্যে গরুর শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে যেমন রাজা প্রধান, তেমনই সমস্ত কলার মধ্যে চিত্র প্রধান।[৩]

বিদগ্ধমাধব (খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী), *উত্তর রামচরিত* (খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী), *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* ও *মালবিকাগ্নিমিত্রম* (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী), *হরিবংশ* (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) ইত্যাদি প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য, *সারত্থপকাসিনী* (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী), *সংযুক্তনিকায় খন্দসযুক্ত*

(খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) ইত্যাদি বৌদ্ধ সাহিত্য ছাড়াও *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র* (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দী), গুজরাটে হাতে লেখা জৈনশাস্ত্র *কল্পসূত্র* (১০৬৮), *বসন্ত বিলাস* (১৪১৫) প্রভৃতি পুঁথির পাতায় চিত্রপটের উল্লেখ আছে।[৪] চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের (৩৩৭-৪২২ খ্রিস্টাব্দ) ভ্রমণ কাহিনিতে কাপড়ের ওপর আঁকা বুদ্ধদেবের পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের মতে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিহারের বৌদ্ধভিক্ষু গোশাল মোঙ্খালিপুত্তের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে-তাঁর প্রাক-ভিক্ষু জীবনপর্বে নাকি নালন্দাবাসী জনৈক পটুয়া সন্তান ছিলেন। গোশাল মোঙ্খালিপুত্তের পূর্বে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেও পটচিত্র-ঐতিহ্য যে এদেশে বর্তমান ছিল এই উল্লেখ থেকে সেই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।[৫] ভাসের (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) *প্রতিমা* নাটকের একটি বর্ণনা পটচিত্রের অস্তিত্বতার কথা অপ্রতক্ষ্যভাবে প্রমাণ করে দেয়। রামচন্দ্রের বনবাস যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই পুত্রশোকে ব্যথিত রাজা দশরথের মৃত্যু হয়, ভরত সেই সময় তার মামার বাড়িতে তাঁর অসুস্থতার খবর শোনামাত্র দ্রুতগতি রথে করে এসে অযোধ্যায় প্রবেশের ঠিক আগেই এক মন্দিরে যান। যেখানে ইক্ষাকুবংশীয় পরলোকগত অন্যান্য রাজাদের পাশে নিজের পিতার মূর্তি দেখতে পান। এত অল্প সময়ের মূর্তি নির্মাণ সম্ভব নয়, এটি কবির অবাস্তব কল্পনা মাত্র। সমালোচকদের মতে ভরত আসলে দশরথের অবয়ব সম্বলিত পটচিত্রই দেখেছিলেন।[৬] প্রাচীন গ্রন্থ *রামায়ণ, মহাভারত*-এ চিত্রাবলির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সেই যুগে শিল্পীরা প্রতিকৃতি ও নিসর্গচিত্র রচনায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। *রামায়ণ*-এ রাবণের চিত্রশালা এবং চিত্রিত যুদ্ধ রথের উল্লেখ আছে।[৭] *রামায়ণ*-এর উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রের জীবনচরিত্র চিত্রপটে বিন্যাসের উল্লেখ আছে। রামের স্বর্ণসীতা, একলব্যে নির্মিত দ্রোণাচার্যের মূর্তি, ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীমচূর্ণের কাহিনি, রাবণের স্বর্ণ পুরীর বিবরণ ইত্যাদি থেকে সেই যুগের স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্মীকির *রামায়ণ* ও ভবভূতির (অষ্টম শতাব্দী) *উত্তরচরিত* অবলম্বনে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) *সীতার বনবাস*-এ (১৮৭৩) চিত্রমালার বর্ণনা রয়েছে। কালিদাসের (সপ্তম শতাব্দী) *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম*-এর ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্মন্তকে চিত্রফলক হাতে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায়। সেই চিত্রে রাজার হৃদয়াভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে বলে বিদূষক মনে করেন। রাজার অঙ্কন দক্ষতা দেখে সানুমতী বলেন – শকুন্তলা যেন সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। চিত্ররচনায় রাজার আবেগ, নিঁখুত করার বাসনা এবং সেই অনুসারে চিত্র রচনার ধাপগুলি নাটকটি সুন্দরভাবে

বর্ণিত হয়েছে।[৮] *মহাভারত*-এর চিত্রলেখা চরিত্রটি একটি দক্ষ চিত্রকরের। তাঁর অঙ্কিত চিত্র দেখেই উষা অনিরুদ্ধকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় বোঝা যায় সেই যুগেও ভারতবর্ষে উন্নত ধরনের চিত্র প্রচলিত ছিল। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকে মালবিকার প্রতিকৃতি দেখে রাজা অগ্নিমিত্রের প্রেমমুগ্ধ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। মেঘদূতের উত্তরমেঘে প্রাচীর চিত্রের উল্লেখ আছে।[৯] কালিদাসের মতে যিনি নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনাযুক্তভাব, মৃতদেহের সংজ্ঞাশূন্যতা ও নিম্নন্নতভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনি 'চিত্রশাস্ত্রক'। যিনি জলের তরঙ্গ, আগুনের শিখা, ধোঁয়া, পতাকাযুক্ত আকাশ প্রভৃতি বায়ুর গতির সঙ্গে অঙ্কন করতে পারেন তিনি 'চিত্রবিৎ'।[১০] হর্ষদেব-রচিত *নাগানন্দ* নাটকে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী প্রতিকৃতির উল্লেখ আছে। হর্ষবর্ধনের *রত্নাবলী* নাটকে রাজমহিষীর সখি সাগরিকা ও অন্যান্য সখিদের চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*-এর নায়িকা বসন্তসেনার কক্ষ প্রাচীর চিত্রে শোভিত ছিল। ভবভূতির *মালতীমাধব* নাটকের মূলচরিত্র মালতী এবং মাধব দুজনেই দক্ষ শিল্পী ছিলেন।[১১] বাৎসায়নের *কামসূত্র*-এ চতুর্থ অধ্যায়ের দশ নম্বর শ্লোকে নাগরকের শয্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে 'চিত্রফলক ও বর্ত্তিকাসমুদগক (তুলি ও রঙ প্রভৃতির পাত্র)'-এর উল্লেখ করেছেন।[১২] *কামসূত্র*-র ভাষ্যকার যশোধর পণ্ডিত চিত্রের ষড়ঙ্গের নির্দেশ করেছেন –

রূপভেদাঃ প্রমান্নি ভাব লাবণ্যযোজনম্।

সাদৃশ্যং বর্ণিকাভং ইতি চত্রং ষড়ঙ্গকম্।।[১৩]

বাণভট্টের *হর্ষচরিত*-এ (সপ্তম শতাব্দী) ভীষণ মহিষয়ারূঢ় প্রেতনাথ মূর্তি ও আরো অনেক মূর্তি সম্বলিত লম্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে ধরে, ডান হাতে শরকাঠি দিয়ে চিত্র বর্ণনার কথা পাওয়া যায়। বাণভট্ট সম্ভবত যমপট ব্যবসায়ীর কথাই বলতে চেয়েছেন। বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* গ্রন্থ থেকে অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগে *পরাশরগতি*, রূপগোস্বামীর *বিদগ্ধ মাধব* ও গোপাল ভট্টের *হরিভক্তি বিলাস* গ্রন্থে চিত্রানুরাগের নমুনা পাওয়া যায়।[১৪]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে জানা যায়, বিশ্বকর্মার ঔরসে শুদ্রানী ঘৃতাচীর গর্ভে যে নটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে চিত্রকর তাদের অন্যতম।[১৫] জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর রাজা ঋষভদেব যুদ্ধ, ব্যবসা, চাষাবাদ, নানারকম কারুশিল্পের সঙ্গে নৃত্য, গীত এবং চিত্রাঙ্কন শেখান।[১৬] বৈয়াকরণিক পাণিণি *অষ্টাধ্যায়ী-তে*

শিল্পীদের দুইভাগে ভাগ করেছেন। ক) গ্রামশিল্পী: যাঁরা কেবলমাত্র গ্রামের লোকেদের প্রয়োজনমত ছবি আঁকেন বা মূর্তি তৈরি করেন। খ) রাজশিল্পী অর্থাৎ কাশিকা: এঁরা রাজনুগ্রহপুষ্ট শিল্পী; রাজার আদেশমতো বা তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী কাজ করেন।[১৭] বিষ্ণুসংহিতায় শিল্পীকে 'কারু' বা 'কারুক' এবং 'শিল্পী' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কারুকের তুলনায় শিল্পী অধিক মর্যাদা লাভ করত। এই দুই শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য থাকায় স্মৃতিশাস্ত্রে উভয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যথা – 'যন্ত্রাকারে কারুক –শিল্পীহস্তে'।[১৮] বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে পটচিত্রকে 'শৌভিক' বা 'শোভনিক' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১৯] ভরত *নাট্যশাস্ত্রে* বিভিন্ন রসের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন – সাপেক্ষে যে বর্ণ নির্দেশ করেছিলেন –

শ্যামো ভবেত্তু শৃঙ্গারঃ সিতো হাস্যঃ প্রকীর্তিতঃ।

কপোতঃ করুণশ্চৈব রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ।।

গৌরো বীরস্তু বিজেয়ঃ কৃষ্ণশ্চাপি ভয়ানকঃ।

নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ।।

অর্থাৎ শৃঙ্গার শ্যামবর্ণ, হাস্য সাদা, করুণ ধূসর, রৌদ্র লাল, বীর গৌর, ভয়ানক কালো, বীভৎস নীল, অদ্ভুত হলুদ।[২০] ভরত নির্দেশিত এই বর্ণ ব্যবহার ধ্রুপদী শিল্পে বহুকাল পর্যন্ত মান্যতা পেয়েছে।

০.২ ভারতশিল্পের ধারা

ভাষা সৃষ্টির বহু পূর্বেই চিত্রভাষার সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা যায়। তার প্রমাণ দেয় বিভিন্ন প্রাচীন গুহাগুলি। জাদুবিশ্বাসে সৃষ্ট চিত্রগুলিতে তাঁদের শৈল্পিক মনের স্পর্শ পাওয়া যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 'রূপ শিল্প' ও 'কথা শিল্প' এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শৈল্পিক সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়েছে।[২১] ভারতবর্ষের সার্বিক ইতিহাসের মতো ভারতশিল্পের কোন ইতিহাস রচিত না হওয়ায় ভারতশিল্পের বিকাশ এবং ধারাবাহিকতা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত প্রত্ন সামগ্রী এবং বাংলার শিল্পপ্রেমী চিত্রসাহিত্যিকগণের রচনা বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভারতশিল্পের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

০.২.১ প্রাগৈতিহাসিকযুগের চিত্র

ভারতবর্ষে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনগুলির উপর ভিত্তি করে বলা যায় প্রস্তরযুগ থেকেই ভারতশিল্প ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে।[২২] ভারতবর্ষের প্রাচীনতম চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার বিন্ধ্যপর্বতমালার একটি গুহায়।[২৩] মধ্যপ্রদেশের রায়গড়, জব্বলপুর জেলা এবং চম্বল বেতোয়া নদীর তীরের খাড়া পর্বতে, উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলায় গুহাচিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন গুহাচিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চিত্র পাওয়া যায় ভীমভেটকার গুহাগুলিতে। ভীমভেটকার গুহাচিত্রগুলি আঁকতে মাটি বা পাথরের আকর গুঁড়োকরা রঙ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং রঙ বাছাই ও প্রয়োগের রীতি প্রকৃতি, রেখার বলিষ্ঠতা, চিত্রগুলিতে প্রাণী ও ঘটনার আকৃতি, গতি ও বেগের দ্যোতনা দর্শকদেরকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়। উড়িষ্যার সুন্দরগড়ের মানিকমুণ্ডার গুহায় বেশকিছু চিত্র পাওয়া গেছে যেগুলি মূলত মেটে সিঁদুর বা লোহাপাথর এবং অন্যান্য স্থানীয় আকর গুঁড়িয়ে তার সঙ্গে চর্বি বা তেল মিশিয়ে আঁকা। এই চিত্রগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের শৈলীর থেকে ভিন্ন ধরনের, তাই এইগুলির সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব হয়নি। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত আরাবল্লী পর্বতের গুহাচিত্রগুলিকে প্যালিও-লিথিকযুগের বলে মনে করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্রগুলিতে মূলত জীবজন্তু, শিকারের দৃশ্য প্রাধান্য পেয়েছে। কোন কোন গুহাচিত্রে আবার মানুষের ছবি এবং জ্যামিতিক আলপনার ছক ও দেখতে পাওয়া যায়।[২৪]

০.২.২ সিন্ধুসভ্যতার শিল্পকীর্তি

বহুকাল পর্যন্ত মনে করা হত আর্যরাই ভারতে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল। মহেন-জো-দারো ও হরপ্পা আবিষ্কৃত হওয়ার পর সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। প্রত্নসামগ্রী বিশ্লেষণ করে জানতে পারা যায় সিন্ধুসভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল তাম্রপ্রস্তর যুগে খ্রিস্টপূর্ব তিরিশ শতাব্দীরও আগে থেকে। অনুমান করা হয় এই সভ্যতা প্রায় দেড় হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল। পাঞ্জাব সিন্ধু বেলুচিস্তান ছাড়াও আম্বালা, লোথাল, কোয়েটা, কালিবঙ্গাল, ধোলাবীর, বিকানীরে স্বরস্বতী নদীর তীরে এবং সৌরাষ্ট্রের একাধিক স্থানে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থাপত্য নিদর্শনগুলির মধ্যে মহেন-জো-দারোর স্নানাগার, হরপ্পার শস্যাগার, লোথালের জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি উল্লেখযোগ্য।[২৫] ধর্মাচরণের জন্য নির্মিত

মাতৃকা মূর্তি, পুরুষ মূর্তি, চুনাপাথরের পুরুষ মূর্তি, নানা রকম পোড়ামাটির পুতুলগুলি ভারতশিল্পে ভাস্কর্যের প্রাচীনত্ব ও উৎকর্ষতার প্রমাণ দেয়। মহেন-জো-দারোয় প্রাপ্ত তামা বা ব্রোঞ্জে তৈরি নারী মূর্তিগুলি শিল্পকর্মের প্রয়োজনে ধাতুগলানোর প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়। সিন্ধুসভ্যতার পোড়ামাটির পুতুলগুলির সঙ্গে লোকজসমাজে প্রাপ্ত টেপাপুতুলের মতো দেখতে। এই সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্রে হলদে বা লাল রঙের প্রলেপের উপর কালো রঙের উপর ষাঁড়, কুকুর, মহিষ, গরু, ময়ূর সহ অন্যান্য নানারকমের পাখি, মাছ, বৃক্ষলতার রকমারি নক্সা শৈল্পিক সুষমায় চিত্রিত হতে দেখা যায়।[২৬] মৃৎপাত্র ছাড়াও এ যুগের চারুকলার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মূর্তি এবং সিলমোহরের গায়ের উৎকীর্ণ ছবিতে।

০.২.৩ বৈদিকযুগের শিল্প

মহেন-জো-দারো ও হরপ্পা সভ্যতা বিলুপ্ত হওয়ার পর আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এঁরা স্তোত্রপাঠ আর প্রকৃতি পূজায় বিশ্বাস করায় দেব রূপ কল্পনায় যে মূর্তি ও চিত্র অনার্যরা রচনা করেছিলেন তা ধ্বংস করে দেন। তবে এ যুগেই ধীরে ধীরে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' রূপায়িত হয়ে ওঠে।[২৭] বৈদিকযুগের শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায় আর্যরা কাঠের কাজ, তাঁত, চামড়া, স্বর্ণালংকারের ব্যবহার জানতেন কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর সেই সমস্ত শিল্পসামগ্রী কালের গর্ভে তলিয়ে গেছে। এই যুগের চিত্রশিল্পের কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও প্রাচীন শাস্ত্রে মনুষ্যচিত্র দর্শন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে জানা যায় সেই যুগে চিত্রশিল্পের বিশেষ স্থান ছিল এবং দেবস্থান বা রাজগৃহ প্রভৃতি দেওয়াল চিত্রের দ্বারা অলংকৃত করা হত।[২৮] সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির পর থেকে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালকে ভারতশিল্পের 'বিস্মৃতির যুগ' বলা হয়ে থাকে।

০.২.৪ মৌর্যযুগের শিল্প

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে বৃহদ্রথ মৌর্যের রাজত্বকাল অর্থাৎ ৩২৪ থেকে ১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শিল্পকলা চর্চার এই যুগকে মৌর্যযুগের শিল্প বলা হয়। মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের সময়কালে শিল্পচর্চার

ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। অশোকস্তম্ভ, খোদাইকৃত বেদি, চৈত্য, বিহার ও স্তূপগুলি এই যুগের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই যুগে প্রাপ্ত প্রায় তিরিশটি স্তম্ভের মধ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণ এবং কয়েকটি অর্ধভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। স্তম্ভশীর্ষ পীঠগুলির নিম্নাংশে ঘন্টার আকারে উল্টানো পদ্ম, তার উপরে নানারকম লতাপাতা, পশুমূর্তি, পদ্ম, চক্র, হংসের নক্সা খোদিত গোলাকার বেদি, উপরে পশুমূর্তি মূলত সিংহমূর্তি বিরাজমান। পূণাত্মা ব্যক্তির স্মৃতিসৌধ হিসাবে নির্মিত স্তূপগুলিকে বেদিকা, অন্ড, হর্মিকা ও ছত্রাবলি এই চার ধাপে নির্মাণ করা হয়।[২৯] এই যুগে প্রাপ্ত ভাস্কর্যের নিদর্শন যক্ষ-যক্ষিণী, পশুমূর্তি এবং মাতৃকামূর্তিগুলি লোকায়ত শিল্প ও দরবারী শিল্পের সহাবস্থানের সাক্ষ্য দেয়। উড়িষ্যা রাজ্যের রামগড় পর্বতের যোগিমারা গুহার চিত্রাবলি, যেগুলিকে ঐতিহাসিক যুগের চিত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি মৌর্যযুগে অঙ্কিত। পাথর ঘষে তৈরি লাল, সাদা এবং হরিতকীর রসে লোহা ডুবিয়ে তৈরি কালো রঙ দিয়ে চুনের আস্তরণের উপর ছবিগুলি আঁকা হয়েছে। অসমতল পাথরের দেওয়ালকে চিত্রাঙ্কনের উপযোগী সমতল পটভূমিতে রূপান্তরিত না করেই মোটা রেখা ও রঙের সাহায্যে কতকটা আলংকারিক রীতিতে ছবিগুলি আঁকা হয়েছে।

০.২.৫ সুঙ্গ, কান্ব, অন্ধ্রযুগের শিল্প

১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুঙ্গ কান্ব ও অন্ধ্র রাজাদের রাজত্বকালের শিল্পচর্চায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের শিল্পচর্চা একত্রে চলতে থাকে। বেদিকায় খোদিত যক্ষ-যক্ষিণী, দেবতা, নাগ মূর্তি, জাতক ও বুদ্ধজীবনী, বিভিন্ন পশু-পাখি, লতা-পাতা-ফুল এবং নানাপ্রকারের অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট মূর্তি যুগের শিল্পচর্চাকে নির্দেশ করে। সুঙ্গ পর্বের শিল্পকে 'উচ্চাঙ্গের লোকায়ত শিল্প' বলা চলে।[৩০] সুঙ্গ স্থাপত্য ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে ভারুত ও সাঁচীস্তূপের উল্লেখ করা যায়। সাঁচীস্তূপেরর তোরণ এবং অমরাবতী স্তূপ সাতবাহন বা অন্ধ্র রাজাদের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। উল্লেখ্য যে স্থাপত্যগুলিতে জাতক ও বুদ্ধজীবনী বর্ণিত হলেও বুদ্ধমূর্তি কল্পনা এই যুগের শিল্পচর্চায় স্থান পয়নি। কুষাণযুগে মহাযানী ধর্মমতের প্রভাবে প্রথম বুদ্ধমূর্তির প্রকাশ ঘটে। গান্ধার[৩১] ও মথুরা শিল্প[৩২] এই যুগেরই কীর্তি।

০.২.৬ গুপ্তযুগের শিল্প

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা পেলেও বৌদ্ধ ধর্ম নিস্তেজ হয়ে যায়নি। তাই স্তূপ, চৈত্য বিহারগুলির সঙ্গে মন্দির স্থাপত্য, বুদ্ধ মূর্তির সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অর্ধ উন্মীলিত ধ্যান মগ্ন নেত্র, কুঞ্চিত কেশ, বস্ত্রাচ্ছাদিত স্কন্ধ, আলোকোবর্তিকা যুক্ত বুদ্ধমূর্তির পূর্ণ রূপ এবং হিন্দু মন্দির স্থাপত্য এই সময়ের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের এই যুগে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হয়। সমতল ছাদওয়ালা মন্দির এবং মন্দির দ্বারে গঙ্গা-যমুনার মূর্তি খোদাই এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এই যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে সারনাথের স্তূপ, বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির, মথুরা ও নালন্দার বুদ্ধমূর্তি, এলাহাবাদের শিব পার্বতী মূর্তি, রাজস্থানের পোড়ামাটির ভাস্কর্য, গোয়ালিয়রের বিষ্ণু মন্দির, দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, আইহোল দুর্গা মন্দিরে বিষ্ণুর অনন্তনাগে উপবিষ্ট মূর্তি, দিল্লীর লৌহ স্তম্ভ, অজন্তা, বাগ ও ইলোরার ভিত্তিচিত্র উল্লেখযোগ্য।[৩৩]

০.২.৭ অজন্তা, বাগ ও ইলোরার চিত্রাবলি

ভারতবর্ষের শিল্পকীর্তিগুলি বহুদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থাকায় মনে করা হত ভারতশিল্পের আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদে অজন্তায় খাড়াই পাহাড়ের গায়ে মানুষের হাতে তৈরি ঊনত্রিশটি গুহার আবিষ্কার সেই ভুল ভাঙায়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অপূর্ব মেলবন্ধন অজন্তায় লক্ষ করা যায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ষোলটি, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে দশটি চিত্রসম্বলিত গুহার কথা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত যে ছয়টি গুহা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় সেগুলির দেওয়ালে, থামে এমনকি ভিতরে ছাদের সমস্ত জায়গা জুড়ে ছবি রয়েছে। বাকি গুহাচিত্রগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দস্যু দলের লোভ ও অনুকৃতি শিল্পীদের পাণ্ডিত্যের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ছয়-সাতশ বছর ধরে অজন্তার গুহাচিত্রগুলি রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। গুহাচিত্রগুলির অধিকাংশই যেহেতু বৌদ্ধধর্মের প্রেরণায় বুদ্ধের জীবন ও জাতক কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত তাই অজন্তা যে বৌদ্ধবিহার বা বাসস্থান ছিল সেই বিষয়ে অনেকেই সহমত পোষণ করেন। গৌতম বুদ্ধের নানা ভঙ্গির মূর্তি ছাড়াও সাধারণ নরনারীর পার্থিব প্রেমলীলা, রাজদরবার, যুদ্ধ, শিকার, নৃত্যগীত, পোশাকপরিচ্ছদ, ভিখারি, দস্যু, চোর, মাতাল, পশুপাখি, গাছ লতা পাতা ফুল, অলংকার ইত্যাদি ‘চোখ

মেলে যা কিছু দেখেছে, শিল্পী তার তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছে'।[৩৪] সময়ভেদে রচিত অজন্তার গুহাচিত্রগুলির অঙ্কনরীতির পার্থক্য লক্ষ করা গেলেও সার্বিকভাবে অজন্তার গুহাচিত্রগুলি নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অজন্তার চিত্রে বহুগুণ পরিপ্রেক্ষণ অর্থাৎ বস্তুকে চর্তুদিক থেকে দেখার পরিপ্রেক্ষিত, ফোরশর্টেনিং[৩৫] আছে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চিত্রগুলি অ্যানাটমি জ্ঞানবর্জিত মনে হলেও ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের 'সাদৃশ্য'-এর রীতিকে অনুসরণ করে অঙ্কিত।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বাংশে অবস্থিত বাগের গুহাগুলিও স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সমন্বয়ে অলংকৃত। বাগগুহা খ্রিস্টিয় পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজা ও ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়। বাগে আবিষ্কৃত নয়টি গুহার মধ্যে কেবলমাত্র দুই, তিন এবং চার সংখ্যক গুহাতে শিল্পকীর্তিগুলি দেখতে পাওয়া যায়। বস্তু সংস্থাপন ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে গুহাচিত্রগুলি অজন্তার সমকক্ষ। তবে বাগের চিত্রাবলির ঐতিহাসিক মূল্য এখানেই যে এখানকার শিল্পীরা ধর্মের গণ্ডী পেরিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জগতে প্রবেশ করেছে।[৩৬] অজন্তা ও বাগের পর ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত গুহাচিত্রগুলির মধ্যে ইলোরাকে স্মরণ করা যায়। ইলোরার প্রাচীরচিত্রের অধিকাংশই কেবলমাত্র একটিতেই দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দীতে গুহানির্মাণকালে রচিত চিত্রগুলি অজন্তার সমতুল্য তবে আরো কয়েক শতাব্দী পরের রচিত চিত্রগুলি নিম্ন মানের। ইলোরার গুহাচিত্রে হিন্দু সংস্কৃতির চিত্রও ধরা পড়ে।

০.২.৮ চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট ও চোল আমলের শিল্প

৬০০ থেকে ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণভারতের বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। চালুক্যদের শাসনকালে দক্ষিণভারতে অসংখ্য মন্দির, গুহামন্দির ও ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। চালুক্যদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি আইহোল, বাদামীর গুহামন্দির প্রাচীরচিত্র এবং কালেশ্বর মন্দির। বৌদ্ধ মঠ ও জৈন মন্দিরের অনুকরণে হিন্দু মন্দিরের প্রতিষ্ঠা চালুক্য শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য।[৩৭] পল্লবদের শাশনকাল ও রাজাদের নামানুসারে এই যুগের স্থাপত্যকে মহেন্দ্রধারা (৬০০-৬২৫), মামল্লধারা (৬২৫-৬৭৪), নন্দীবর্ধন ধারা (৬৭৪-৮০০) এবং অপরাজিত ধারা (নবম খ্রিস্টাব্দ) এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৩৮] মহাবলীপুরমের সপ্তরথ মন্দির, কাঞ্চীপুরমের কৈলাশনাথ মন্দির পল্লবস্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ

নিদর্শন। মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্যমূর্তিগুলি এই যুগের অপূর্ব সৃষ্টি। পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণ পল্লব রাজারাই প্রথম শুরু করেন। রাষ্টকুট রাজাদের শাসনকালে ইলোরায় পাহাড় কেটে তৈরি কৈলাশ মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ। এছাড়া ইলোরার স্থাপত্য, গুহাচিত্র এলিফ্যাণ্টার শৈব মন্দির স্থাপত্য, আলংকারিক নক্সা ও ভাস্কর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণভারতে প্রবল পরাক্রমশালী চোল রাজাদের অসংখ্য গুহামন্দির সহ একাধিক স্থাপত্য কর্মের মধ্যে তাঞ্জোরে নির্মিত রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ। চোল আমলে পাহাড় কেটে মন্দির তৈরির বদলে পাথরের খণ্ড জুড়ে সূক্ষ্মকারুকার্য মণ্ডিত বৃহদাকার মন্দির নির্মাণের নীতি গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে নির্মিত তাঞ্জোর মন্দিরের ব্রোঞ্জের নটরাজমূর্তি ধাতু শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।[৩৯]

০.২.৯ পাল সেনযুগের ভাস্কর্য পুঁথিচিত্র ও তার বিস্তার

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ভার গ্রহণ করেন। প্রথম পাল রাজা গোপাল উদন্তপুর বিহার, ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহার স্থাপন করেন। এই যুগে নির্মিত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তান্ত্রিক দেবদেবী ইত্যাদি মহাযান মূর্তি নালন্দায় আগত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেন রাজারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায় এই যুগে বিষ্ণু ও বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, শিব, দুর্গা, সূর্য, গণেশ ইত্যাদি মূর্তি নির্মিত হয়। শাস্ত্রীয় নিয়মে নির্মিত পাথর, ব্রোঞ্জ, পিতল, অষ্টধাতু ও রূপা দিয়ে তৈরি মূর্তিগুলির পিছনে কারুকার্যখচিত চালি দেওয়ার রীতি এই যুগে দেখা যায়।[৪০]

পাল রাজাদের আমলে বৃহদাকার দেওয়ালচিত্রের বদলে পুঁথি চিত্রণের প্রচলন হয় এবং ধীরে ধীরে বাংলা থেকে গুজরাটে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার পুঁথিচিত্রগুলি সাধারণত তালপাতা বা তুলোট কাগজে আঁকা। পালযুগের চিত্রিত পুঁথিগুলির অধিকাংশই *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা*-এর অনুলিপি। এছাড়া *পঞ্চরক্ষা, কারণ্ডবূহ্য, কালচক্রযান* প্রভৃতি ব্রজযান গ্রন্থের অনুলিপি। লুম্বিনী বনে বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধগয়ায় বোধিলাভ, সারনাথের ধর্মচক্র প্রবর্তন, কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ, শ্রাবস্তী নগরে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন, সঙ্কাশে স্বররগাবতরণ, রাজগৃহে নীলগিরি বশীকরণ এবং বৈশালীর আমন্ত্রণে বানরের মধুদান গ্রহণ বুদ্ধের জীবনের এই প্রধান আটটি ঘটনা; মহাযান ব্রজযান সম্মত বিভিন্ন দেবদেবী যেমন

প্রজ্ঞাপারলিতা, তারা, লোকনাথ, মৈত্রেয়, মহাকাল, ব্রজপাণি, বসুধারা, কুরুকুল্লা, বুন্দা, বজ্রসত্ত্ব, মঞ্জুঘোষ প্রমুখ দবদেবীর প্রতিকৃতি পুঁথি নির্বিশেষে চিত্রিত হয়েছে।[৪১] চিত্রগুলিতে এই যুগের মূর্তি শিল্পের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।[৪২] এই যুগের শিল্পীরা ভরত নির্দেশিত রঙ প্রয়োগের বাধ্যবাধকতাকে অমান্য করে স্বাধীনভাবে রঙ প্রয়োগ করেন। দণ্ডায়মান মূর্তির অর্ধচন্দ্রাকার রূপ, পাশফেরানো মুখের বহিঃসীমা অতিক্রম করা চোখ পাল যুগের চিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পালযুগের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাটে পুঁথিচিত্রণের প্রথা চালু হয়। গুজরাটি পুঁথিচিত্র মূলত *কল্পসূত্র* বা মহাবীর জৈন ও অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনের নানা ঘটনা এবং *কালিকাচার্য কথা* (১০৬৮), *বসন্ত-বিলাস* (১৪১৫) অবলম্বনে অঙ্কিত। সমসাময়িক সমাজচিত্র অনুচিত্রগুলিতে ফুটে ওঠে। মুখের তিন চতুর্থাংশ, সুদীর্ঘ নাক, স্ফীত চোখ, উন্নত বুক গুজরাটি চিত্রের বৈশিষ্ট্য।[৪৩]

০.২.১০ রাজপুত চিত্রকলা

মুসলমান শাসনের প্রাক্কালে শেষ হিন্দু চিত্রকলার ঐতিহ্য বহন করছিল রাজপুত চিত্রকলা। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজপুত চিত্রকলার সময়কাল চিহ্নিত করা হয়। রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজারা পৃষ্ঠপোষকতা করলেও এই চিত্রগুলি বহন করছিল লোকশিল্পের পরম্পরা। সাধারণের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, মানবিক ভাব অনুভূতি ও চিন্তানির্ভর এই চিত্রকলা সমস্ত শ্রেণির দর্শককে আনন্দদানে সক্ষম।[৪৪] বিভিন্ন প্রদেশিক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রচর্চা হওয়ায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য রাজপুত চিত্রকলায় পরিস্ফুট হয়। আজমীর, উদয়পুর, জয়পুর, অম্বর, বিকানীর, বুঁদি, কিষেণগড়, কোটা, মাড়োয়ার, মেবার প্রভৃতি অঞ্চলের চিত্রচর্চাকে রাজপুত শৈলী এবং বাশোলী, কাংড়া, কুলু, গুলের, চাম্বা, জম্মু প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের চিত্রচর্চাকে পাহাড়ী শৈলী বলে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী এই সমস্ত অঞ্চলের চিত্রকলার বিষয় ছিল *রামায়ণ, মহাভারত,* গীতা, পুরাণ, শিব পার্বতী, বারমাস্যা প্রভৃতি কাহিনি। সঙ্গীত ও চিত্রকলার অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ করা যায় রাজপুত চিত্রকলায়। রাগরাগিনীর ভাব, সেই অনুসঙ্গে বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও মানুষের ভিন্ন অভিব্যক্তি চিত্রপটে ফুটে ওঠে। প্রতীকধর্মী উজ্জ্বল বর্ণব্যবহারে চিত্রগুলিতে রাজস্থানের আঞ্চলিক পোশাক-

পরিচ্ছদ, গৃহ, আসবাব, তৈজসপত্রাদি, জীবনযাত্রার ধারা, চারপাশের পরিবেশ, প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি শুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৪৫] এককথায় বলতে গেলে রাজপুত চিত্র হচ্ছে মুখ্যত অভিজাত বা সুসংস্কৃত লোকায়ত চিত্র; স্থির কাব্যধর্মী এবং জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।[৪৬]

০.২.১১ মুঘল শিল্প

মুঘল দরবারের মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুঘল চিত্রকলা বিস্তার লাভ করে। পৃষ্ঠপোষকের রুচি অনুযায়ী রাজদরবারের দৃশ্য, শোভাযাত্রা, শিকারের দৃশ্য, প্রতিকৃতি, পশুপাখি প্রভৃতি রাজকীয় বিষয় ও কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে রচিত চিত্রাবলি রাজদরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। দরবারী শিল্পীদের মধ্যে হিন্দু ও পারসিক উভয়েই ছিলেন, তাই মুঘল শিল্পরীতিতে পারস্যের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির মিশ্র রূপ দেখা যায়। পারস্য চিত্রকলার প্রধান আকর্ষণ সুকুমারভাব ভারতবর্ষের রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে চারিত হয়ে আরো মধুর রূপে প্রতিভাত হয়।[৪৭] প্রতিকৃতি বিশেষ করে পার্শ্বপ্রতিকৃতি, ছবিকে নিপুণ অলংকৃত ফ্রেমে বেঁধে ফেলা, ছবির কিনারায় ক্যালিগ্রাফি ও শিল্পীর নামাঙ্কন মুঘল চিত্ররীতির বৈশিষ্ট্য। আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) আমলে পুঁথি চিত্রণের ধারাটি লক্ষ করলে দেখা যায় একক শিল্পীর দ্বারা চিত্রগুলি রচিত হয়নি, তিন চারজন মিলে একটি চিত্র সম্পাদন করেছন। কেউ রেখাচিত্র, কেউ প্রতিকৃতি আবার কেউ অলংকরণ বা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন।[৪৮] মুঘল চিত্রে ব্যবহৃত রঙ প্রাকৃতিক হলেও তা ছিল উজ্জ্বল চাকচিক্যময়। এই যুগের চিত্রে সোনালী রঙের ব্যবহার পারসিক রীতিকে স্মরণ করায়। গাঢ় ও হালকা রঙ ব্যবহার করে কাছে ও দূরের বস্তুর মধ্যে পার্থক্য গড়ে তোলা হয়। ‘কেতাদূরস্ত, নাটকীয় রস-সমৃদ্ধ, বিষয়-মুখী এবং চিত্রিত বস্তু ও বিষয়ের প্রাচুর্যে’ মুঘল শৈলী অপরূপ হয়ে উঠেছে।[৪৯] মুঘল রাজারা সমগ্র শাসনকাল জুড়ে দিল্লি, আগ্রা, আজমীর, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে অনন্য প্রাসাদ, মহল, স্তম্ভ ও সৌধ নির্মাণ করে স্থাপত্যকলার প্রতি তাঁদের অনুরাগ দেখিয়েছেন। আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুর সিক্রি, বুলন্দ দরওয়াজা, পঞ্চমহল, হাওয়া মহল, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, তাজমহল, লালকেল্লা, জামা মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

০.২.১২ লোকায়ত শিল্পচর্চা

কোন দেশের শিল্পধারা সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে সেই দেশের লোকয়ত শিল্পচর্চার দিকে দৃষ্টিপাত না করলে তা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। কেননা লোকশিল্প সমগ্র জাতির গোষ্ঠীর চেতনার ধারক এবং বাহক। সমাজ গঠনের প্রাক লগ্নেই মানুষ মাটির দেওয়ালে, প্রাঙ্গণে আলপনা এঁকেছে, পুতুল গড়েছে, কাঁথা বুনেছে, পাত্র বানিয়েছে, পট এঁকেছে, নিত্য প্রয়োজনের নানা সামগ্রী নির্মাণ করেছেন তার প্রতিটিই প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে শিল্পের স্তরে উঠে এসেছে। এছাড়াও লোকসমাজে আরো নানারকমের লোকশিল্পকলাচর্চা হয়ে আসছে। বর্তমানে গবেষণাপত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নিম্নলিখিত লোকশিল্পগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক) পট

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন লোকশিল্প ‘পট’ বর্তমান কাল পর্যন্ত কালের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকসমাজের মনন ও শিল্প ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। ভারতবর্ষে পট বা পটচিত্রের সূচনা ঠিক কবে নাগাদ হয়েছিল সেই বিষয়ে কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাই পটশিল্পের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা বেশ কষ্টসাধ্য। পুরাণ আমলের গুহাপটে ও শিলাপটে আলংকারিক চিত্রকলার যে ছন্দ ছিল তা আজও গ্রাম বাংলার পটুয়াগণকে পটচিত্রে বস্তু সংস্থাপনে (Composition) ও রেখাচিত্রের সামঞ্জস্য বিধানে ঐতিহ্যগত ভাবেই সহায়তা করে থাকে। অতএব নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে, পটুয়াগণের আদি উৎস গুহাপট, শিলাপট ও পরবর্তীকালে তাম্রপটও বটে।[৫০] এই তিন ধরনের পটে ব্যবহৃত সংকেত চিত্র, ব্যবহারিক চিত্রগুলির মাধ্যমে সভ্যতার বিবর্তিত ইতিহাসটিকে ধরা যায়। পট অঙ্কনে ব্যবহৃত রঙ প্রকৃতিজাত এবং সেগুলি প্রাথমিক রঙ, রঙিন একরাঙা পটে মূলত প্রাথমিক রঙ ব্যবহৃত হলেও মিশ্ররঙের ব্যবহার দেখা যায়। রঙের উৎস সাধারণ কিন্তু রঙ নির্বাচনে, রঙের উপযুক্ত প্রয়োগ ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টিতে যেগুলি অনন্য সাধারণ পর্যায়ে উন্নীত, শাস্ত্রীয় চিত্রের মতো পটচিত্রে রঙের সাহায্যে দেহ অবয়বের উচ্চ নীচতা বা গভীরতা বোধ, আলোছায়া সৃষ্টির ব্যাপারটি নেই বললেই চলে, যদিওবা কোন কোন চিত্রে শেডিং থেকে থাকে, তবে তা ভারতীয় রীতি মেনেই। অঞ্চলভেদে পটে রঙ ব্যবহারে তারতম্য ঘটে থাকে। ভারতশিল্পের রেখাপ্রাণতা বজায় রেখে পটুয়ারা একটি স্বতন্ত্র গতিপথে

নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে পটচিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন।[৫১] পটচিত্রগুলি রেখাবিন্যাসে, রঙ নির্বাচনে ও বিষয় সংস্থাপনের স্বাতন্ত্রে প্রতীকি তাৎপর্যে উজ্জ্বল।[৫২] আকার অনুযায়ী পট বহুচিত্র অঙ্কিত জড়ানো ও একচিত্র সম্বলিত চৌকো বা চৌকশ এই দুধরনের হয়ে থাকে। জড়ানো পট লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি দুধরনের আর চৌকো পট বর্গাকার ও আয়তাকার হয়ে থাকে। জড়ানো পটকে গোটানো, লাটাই, দোলিয়া বা দীঘল পট ও বলা হয়ে থাকে। জড়ানো পটে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে কাহিনি পরম্পরা থাকে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী পট ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ এই দুধরনের হয়। ধর্মবোধ ও সামাজিক নীতিজ্ঞানে পটুয়াদের সমৃদ্ধির পরিচয় তাদের আঁকা ছবি ও গানে পাওয়া যায়। লোকসমাজের সংযম রক্ষা করা পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজে পটুয়ারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

খ) আলপনা

আদিম যুগে গুহাবাসী মানুষরা, সৃষ্টির আগ্রহ থেকে তাদের জীবন যাত্রার প্রতিচ্ছবিগুলি গুহার গায়ে প্রতীক আকারে খোদাই করে রেখেছিল। এই প্রতীকগুলি সঙ্গে মিশেছিল জাদুবিশ্বাস। এরপর মানুষ যখন কৃষিকাজ ও পশুপালন করতে শিখল তখন চিহ্নগুলির ব্যঞ্জনা বদলে গেল। গুহাচিত্রে ব্যবহৃত রেখাগুলি নতুন ব্যঞ্জনায় অলংকৃত হয়ে শঙ্খলতা, খুন্তিলতা, আবর্ত ইত্যাদি রূপে আলপনায় ব্যবহৃত হতে শুরু করল। উভয় যুগের শিল্পকলার উদ্দেশ্য ছিল একই; জাদুশক্তির সক্রিয়তার সাহায্যে ইহজাগতিক কামনা বাসনার বাস্তবায়ন। বিশেষ বিশেষ প্রতীক বিশেষ বিশেষ কামনা বা প্রত্যাশা পূরণ করার উদ্দেশ্যে রচিত হত। স্থান কালের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে দুই শিল্পকলার মধ্যে বহিরঙ্গ পার্থক্য দেখা দিলেও মূল সূত্রটা একই রয়ে গেছে। বিশেষ প্রতীকের বিশেষ প্রত্যাশা পূরণের বিশ্বাস যুগে যুগে সঞ্চারিত হয়েছে। পরবর্তী যুগের প্রচলিত লোকস্তরের আলপনায় এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।[৫৩] ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে আলপনার প্রচলন আছে। এটি সমগ্র ভারতবর্ষের একটি বহুল প্রচলিত লোকরীতি। বিভিন্ন প্রদেশে এই শিল্পকলা বিভিন্ন নামে পরিচিত।

গ) কাঁথা

গ্রামবাংলার মেয়েরা নিজস্ব চেতনায় সামাজিক বা ব্যবহারিক প্রয়োজনে, আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য কাঁথা তৈরি করেছেন। পরে প্রয়োজনের গণ্ডী পেরিয়ে রুচি বোধের তাগিদে এর সঙ্গে নান্দনিকতা যুক্ত হয়। বাঙালি মেয়েরা তাঁদের দেখা না দেখা জগৎ, সুখ-দুঃখের কাহিনি, সংস্কার ঐতিহ্যকে কাঁথার পিঠে ফুটিয়ে তোলেন। নান্দনিকতা বিমুক্ত কাঁথা ঠিক কবে থেকে নান্দনিকতার সঙ্গে যুক্ত হল তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। লোকসমাজে যে বহু প্রাচীনকাল থেকে কাঁথার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় *ঋক্‌বেদ, উপনিষদ,* বৌদ্ধ পালি সাহিত্য, পাণিনির (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) *অষ্টাধ্যায়ী,* মেগাস্থিনিসের (?-২৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ভারত বৃত্তান্ত, *মহাভারত,* মহর্ষি হারিতের *সংহিতা, কালিকাবৃত্তি,* চন্দ্রাবতীর *রামায়ণ,* রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) *অন্নদামঙ্গল,* সৈয়দ আলাওলের (১৬০৭-১৬৮০) *'পদ্মাবতী'* ও অন্যান্য একাধিক গ্রন্থে।[৫৪]

ঘ) পুতুল

লোকায়ত শিল্পকলার যে সমস্ত নিদর্শন রয়েছে পুতুল তার মধ্যে অন্যতম। দৃশ্য জগতের অনুকরণ স্পৃহা এবং যাদুক্রিয়ায় বিশ্বাস থেকেই সম্ভবত পুতুলের উদ্ভব হয়। অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে বা শ্রদ্ধা জানাতে পুতুল তৈরি হয়ে থাকবে। স্ত্রী অঙ্গ বিশিষ্ট হাতে টেপা পুতুলগুলি প্রজননভিত্তিক ধর্মাচরণ ও মাতৃকা শক্তির আরাধনার প্রমাণ দেয়।[৫৫] অবশ্য নারী মূর্তিগুলিতে কোন দেবীর সন্ধান পাওয়া যা কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।[৫৬] কালক্রমে যাদুক্রিয়া ও ব্রতে ব্যবহৃত পুতুলগুলি পরিমার্জিত রূপ পেল প্রতিমায়। দেবস্থানে উৎসর্গ করার জন্য হাতি, ঘোড়া, সাপ, বাঘ ইত্যাদি পশু আকৃতির পুতুল দেখা গেল। আবার ধীরে ধীরে এই পুতুল শিশুদের খেলার সামগ্রী ও গৃহসজ্জার উপকরণে পরিণত হল।

ঙ) টেরাকোটা

টেরাকোটা শিল্প মানব-সংস্কৃতির অন্যতম সুপ্রাচীন নিদর্শন। সভ্যতার আদি লগ্নে চাকা আবিষ্কারের পর তা ব্যবহার করেই মানুষ তার প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্রগুলি তৈরি করল। ক্ষণভঙ্গুর এই মৃৎপাত্রগুলিকে কাঠিন্যদান করতে সেগুলিকে পোড়ানোর ব্যবস্থা করল। এইভাবেই মানবসমাজে টেরাকোটার প্রচলন

হল। পোড়ামাটির দ্রব্যগুলিকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে একসময় তারা তার ওপর নানা রকম নক্সা এঁকে না অতিরিক্ত মাটি যুক্ত করে দিল। প্রয়োজনের সামগ্রী অচিরেই শিল্পসামগ্রী হয়ে উঠল। পোড়ামাটির তৈরি সকল প্রকার জিনিসই টেরাকোটা পর্যায়ভুক্ত হলেও শৈল্পিক দিক দিয়ে বিচার করলে মন্দিরভাস্কর্য, পূজার্চনা ও শিশুদের মনোরঞ্জনের পুতুল যেগুলি বর্তমানে গৃহসজ্জার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকেই বোঝায়। বাংলার বহু মন্দির প্রাচীর, অন্যতম প্রাচীন এই লোকশিল্পের সাক্ষ্যবহন করে চলেছে।

০.২.১৩ ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিককাল

ঔরঙ্গজেবের (১৬১৮–১৭০৭) শিল্পের প্রতি বিরাগের কারণে দরবারী শিল্পীরা লক্ষ্ণৌ, পাটনা, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি সামন্ত রাজা ও ধনী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ‘কলম’ বা আঞ্চলিক রীতি উদ্ভব করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত শিল্প রচনা করেন।[৫৭] এরপর ইস্টিণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে এদেশে তাদের শাসন কায়েম করলে প্রশাসনিক কাজে ও ব্যক্তিগত আকর্ষণে পাশ্চাত্য শিল্পীরা এদেশে আসেন। এদেশের রাজদরবারে তাঁদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে দরবারী শিল্পীরা তাঁদের গুরুত্ব হারায়। পাশ্চাত্য শিল্পীদের সাহচর্যে থেকে এদেশীয় শিল্পীরা শিখে নিতে থাকেন পাশ্চাত্য শৈলীর কলা কৌশল। অর্ধশিক্ষিত এই সমস্ত দেশীয় শিল্পীদেরকে কোম্পানির শাসকগণ নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগান। নতুন পৃষ্ঠপোষকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা বিষয়কে রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁরা দরবারী রীতি ও পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণে এক মিশ্র রীতি গড়ে তোলেন যা ‘কোম্পানি শৈলী’ নামে খ্যাত। ব্রিটিশ সরকার ইতিমধ্যে রাজনৈতিকভাবে ভারত দখল করার পর প্রসাশনিক কাজে শিল্পীদের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পবিদ্যালয় গড়ে তোলেন। আত্মবিস্মৃত পরাধীন দেশবাসী শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিচালিত হয়ে মনে করে যে শিল্প বলতে পাশ্চাত্য দেশের শিল্পকেই বোঝায়, ভারতবাসীর নিজস্ব কোন শিল্প পরম্পরা নেই। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কিছু মুক্তমনা ভারতবাসী ও ভারতপ্রেমী ইংরেজ শিল্পীদের উদ্যোগে। শিল্পসংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতশিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় হিসাবে এগিয়ে

আসেন। তাঁর শিক্ষাদর্শকে সামনে রেখে একদল শিল্পী ঐতিহ্যানুসারী ভারতশিল্পের চর্চা করে নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারার জন্মে দেন ও সমগ্র ভারত ও বর্হিভারতে প্রসারিত করেন।

ধ্রুপদী শিল্প বা দরবারী শিল্পের সমান্তরালে বহমান লোকশিল্পের ধারাটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে নতুন রূপ পায়। সমাজ পরিবর্তনে নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে শহরমুখী লোকশিল্পীরা কালীঘাট অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। কালীঘাট অঞ্চলে পুণ্যার্থীদের চাহিদা মেটাতে অতি দ্রুততার সঙ্গে যে চিত্রও রচনা করেন তার আঙ্গিকে যেমন পরিবর্তন আসে নাগরিকতার স্পর্শে বিষয়ের দিক থেকেও সেগুলি ভিন্ন হয়ে ওঠে। বটতলার চিত্রের পসার ঘটলে কালীঘাট পট বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। কালীঘাট পটের পরিসমাপ্তির সঙ্গে লোকশিল্পের ধারাটি যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, গ্রামীণ সমাজে তাঁদের শিল্পচর্চা অব্যাহত থাকে।

০.১৪ নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের চিত্রে ভারত-সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণ

বিংশ শতাব্দীর দুই দিকপাল নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) ও যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২) ভারতশিল্পের প্রতিগ্রহণের মাধ্যমে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকেন। নন্দলালের তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসুর থেকে বানান শেখা এবং সেই বানানের উপযুক্ত ছবি আঁকার শিক্ষা পান। পুতুল গড়া, আলপনা দেওয়া, সূঁচের কাজ, পোড়ামাটির ছাঁচ গড়ায় মা ক্ষেত্রমণি দেবীর নান্দনিক চেতনায় নন্দলাল সমৃদ্ধ হন। আঞ্চলিক মেলা ও উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি করা দুর্গা, গণেশ, হাতি, ষাড় প্রভৃতি মূর্তি, মণ্ডপ সাজানো আর তাজিয়া তৈরি তাঁকে অণুপ্রাণীত করে, হাতের কাজের ভাষা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ধার্মিক পরিবারে বেড়ে ওঠায় তাঁর সজাগ শিশুমনে রামায়ণ মহাভারত কাহিনি স্থায়ী আসন লাভ করে।[৫৮] ছোটবেলা থেকেই দেব-দেবী ও বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি গড়ার ও আঁকার যে অভ্যাস তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেই অভ্যাস থেকে সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র অতুল মিত্রের কাছে পেইন্টিং, মডেল ড্রয়িং, স্টিল লাইফ ইত্যাদি শিখে একাডেমিক শিল্পচর্চার প্রাথমিক পাঠ নেন। প্রবল শিল্পানুরাগের কারণে তিনি রাফেল (১৪৮৩-১৫২০), রবিবর্মা (১৮৪৮-১৯০৬) প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রতিচিত্র কিনে নকল করতেন। এমনিভাবেই *প্রবাসী*-তে (১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ) ছাপা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) আঁকা 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' এবং 'বুদ্ধ ও সুজাতা'-এর

প্রতিচিত্র দেখে মোহিত নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভর্তি হওয়ার বাসনা নিয়ে শিল্পবিদ্যালয়ে গেলে তাঁর চিন্তাধারা অভিনবত্ব এবং ছবি আঁকার নিপুণতায় মুগ্ধ ই. বি. হ্যাভেল (১৮৬১-১৯৩৪) তাঁকে সেখানে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এবং হ্যাভেলের নীতি অনুযায়ী ছাত্রদের দেশীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবাদর্শের সাথে পরিচয় করানোর জন্য পুরাণ, প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস তথা দেশীয় শিল্প-আঙ্গিক চর্চা এই দ্বৈত প্রভাব নন্দলালের জীবনে পড়ে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে জাপানের বিখ্যাত শিল্পী ও শিক্ষাবিদ ওকাকুরা কাকুজোর (১৮৬২–১৯১৩), ইওকোয়ামা টাইকান (১৮৬৮–১৯৫৮), হিশিদা সুনসোর (১৮৭৪–১৯৫৮) সঙ্গে পরিচয় এবং অবনীন্দ্রনাথের থেকে জাপানি কলাবিষয়ে শিক্ষা তাঁকে প্রাচ্যশিল্পের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। পরবর্তীকালে অন্য এক জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাইয়ের (১৮৭৮–১৯৪৫) কাছে হাতে কলমে জাপানি তুলির ব্যবহার, জাপানি রীতির ধারাবাহিক বিকাশ ও তার কলাকৌশল শেখবার সুযোগ পান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিন–জাপান ভ্রমণে গেলে সেখানকার শিল্প-সংস্কৃতি তাঁর চিত্রচর্চায় প্রভাব ফেলে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লেডি হ্যারিংহামকে (১৮৫২–১৯২৯) সাহায্য করতে অজন্তায় গেলে তিনি ক্লাসিকাল চিত্রকলা প্রত্যক্ষ করা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তা অনুশীলনের সুযোগ পান। অজন্তার ভিত্তিচিত্রগুলিতে চিত্র ও ভাস্কর্যের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা তাঁকে মুগ্ধ করে। অজন্তায় যাবার অনেক আগে থেকেই ভারতশিল্পের সাক্ষ্যাৎ অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সবান্ধবে তিনি ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ দর্শন করতে অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যান্টা এবং ওড়িশার বিখ্যাত মন্দিরগুলি ভ্রমণ করেন। সুযোগ পেলেই তিনি নিজ তাগিদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকীর্তির চাক্ষুস জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতেন। ভারতীয় চিত্রে ভাস্কর্যের প্রভাব উপলব্ধি করে তিনি এইসব ভাস্কর্যের আকৃতি-প্রকৃতি, মুদ্রা অলংকরণের খুঁটিনাটিগুলিকেও আয়ত্ত করেন। ১৯০৯-১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নন্দলালের ছবিতে ভার্স্কযের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। শুধু ভাস্কর্যের আনুলিপি-অনুসরণ নয়, তিনি সেই সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করেছেন সেখানকার মানুষের জীবন যাত্রা ও স্থানীয় গাছপালা, ঘড়বাড়ির ছাঁদ, পোশাক পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি অনুভব করেন ভারতীয় শিল্পের ভিত্তি হল বাস্তব জীবনাচরণ। চলমান দৈনন্দিন জীবনের নানা মুহূর্ত, মানুষজন, পশুপাখি সবই তাঁর ছবিতে জায়গা করে নেয়। শিল্প জীবনের শুরুতে

তিনি পুরাণ আশ্রিত ছবি আঁকলেও ধ্রুপদী শিল্পরীতিকে মিলিয়ে দেন আধুনিক জীবনের বাস্তব প্রেক্ষিতের সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথে আদর্শে নব্যবঙ্গীয় শিল্পীগোষ্ঠীর একজন হয়ে শিল্পচর্চা শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১–১৯৪১) তৎপরতায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনস্থল শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের পর তাঁর শিল্পচর্চা নবরূপে বিকশিত হয়। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রভাবে সুদূরলোকের কল্পনাবিলাস ছেড়ে তিনি বাস্তব ভূমিতে পদচারণ করেন। শান্তিনিকেতনের একটি কলাভবন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব শুধু নয়, এখানকার সামাজিক জীবনের উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, অভিনয়ের মঞ্চ ও সাজসজ্জা, গড়ে ওঠা আবাসগুলি শ্রীমণ্ডিত করে তোলা, পোশাক-আশাক, আসবাব, মুদ্রণ – যাবতীয় আয়োজনে নন্দলালকে লিপ্ত থেকে রুচির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের ব্যাপক দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এর ফলে তাঁর শিল্পচর্চা আরও পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে। মঞ্চসজ্জা এবং অভিনেতাদের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে তিনি শান্তিনিকেতন তথা সারা বাংলায় নতুন ধারার জন্ম দেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও উদ্যোগে নানা দেশের শিল্পীদের ডেকে বিশ্বজনীন শিল্পকলা চর্চার যে পরিবেশ আশ্রমে গড়ে উঠেছিল তাতে নন্দলালের শিল্পচেতনা উন্মুক্তির পথ প্রসর হয়েছিল তাতে কোন দ্বিমত নেই। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে কলাভবনের পশ্চিমী আঙ্গিক চর্চার যে আবহ তৈরি হচ্ছিল সেই আঙ্গিকে ছাত্ররা আকৃষ্ট হলে সেই আঙ্গিক চর্চায় তিনি বাধা দেননি, বরং অন্তরের স্বাদেশীক ধারার সাথে পশ্চিমী ধারাকে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন। নন্দলাল পট, আলপনা, কাঁথার ইত্যাদি লোকশিল্পগুলির চর্চা করে ধর্মীয় আচার এবং লোকসমাজের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে থেকেনতুন রূপদান করেন। চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি শিল্প, শিল্পপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করে *শিল্পকথা* (১৩৫১), *শিল্পচর্চা* (১৩৬৩) নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া শিল্প শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি খণ্ডের রেখাচিত্র সম্বলিত গ্রন্থ *রূপাবলী* (১৩৫৬) এবং দেশ বিদেশের সূচীশিল্পের নক্সা সম্বলিত গ্রন্থ *ফুলকারী* (–) প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা অজস্র সচিত্র চিঠিপত্রে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর শিল্পভাবনা, সাহিত্য চেতনা, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলালের যোগাযোগ নন্দলাল ও তাঁর সৃষ্টিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি রবীন্দ্রনাথ অননলালের ছবি ও ব্যক্তিত্বে দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের মণিকাঞ্চন যোগে বাংলার শিল্পও সাহিত্যজগত বহু ছবি ও কবিতা উপহার পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের গ্রন্থের প্রচ্ছদরচনা করে তিনি প্রচ্ছদ

শিল্পকে অন্য মাত্রা দান করেছেন। নন্দলাল বসু তাঁর কর্মজীবনের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 'পদ্মবিভূষণ', ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ললিতকলা একাদেমির ফেলো, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দেশিকোত্তম', ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি. লিট', চারুকলা একাদেমি থেকে 'রজত জয়ন্তী পদক', ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে 'ঠাকুর জন্ম শতবর্ষ পদক' সম্মানে ভূষিত করেন।

অবনীন্দ্রনাথের আদর্শে ছাত্রাবস্থায় নন্দলাল ভারতবর্ষের ধ্রুপদী শিল্পের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছিলেন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দেশের প্রভাব তাঁকে সেই আসন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি আজীবন ভারতীয়-সংস্কৃতির প্রতিপালন করে এসেছেন। যামিনী রায় ভারত-সংস্কৃতিকে বুঝেছিলেন বেলিয়াতোড়ের সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের প্রেক্ষিতে বা আরো গভীরে প্রাগৈহাসিক যুগের বিশুদ্ধ রূপকে অনুসরণ করে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের তিনি লৌকিক ও সামন্ত সংস্কৃতির দিক থেকে সমৃদ্ধ গ্রাম বেলিয়াতোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। আর্য অনার্য সংস্কৃতির মিলনস্থল বেলিয়াতোড়ের লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব তাঁর জীবনে খুব গভীরভাবে পড়েছিল। নিজ সংস্কৃতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্তি করেতোলার বাসনা তাঁর ছবিগুলিতে দেখা যায়। তাঁর পিতা রামতারণ রায় বলতেন – 'আমাদের শিক্ষা সার্থকতা পাবে এক হাতে বই আরেক হাতে লাঙলের সমন্বয়ে।'[৫৯] পিতার এই চিন্তাধারার প্রভাব তাঁর সমগ্র শিল্পী জীবনে লক্ষ করা যায়। যামিনী ছিলেন সহজাত শিল্পও প্রতিভার অধিকারী। ছোটবেলাতেই তিনি রঙিন পাথর কুড়িয়ে পশুপাখির অবয়ব অঙ্কন, ছুতোর পাড়ার মূর্তি গড়া দেখে পুকুরের ভিজে মাটি দিয়ে মূর্তি ও পুতুল বানাতে, লাল-হলুদ-খয়েরি রকমারি রঙের গিরিমাটি দিয়ে ছবি আঁকতে পারতেন।[৬০] শৈশবে ছবি আঁকার নেশায় স্কুলের খাতাগুলিকে ভরিয়ে তুলতেন। এক চিত্র প্রদর্শনীতে 'সমাজ' চিত্রটির জন্য বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দেওয়া উপহার তাঁর ছবি আঁকার উৎসাহকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে ভবিষ্যতের পথকে প্রশস্ত করে। পারিবারের সম্মতিতেই ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ) তিনি কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের 'Fine Arts' বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টানা এতগুলো বছর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে সার্টিফিকেটের তোয়াক্কা না করেই শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষায় সমাপ্তি টানেন। শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণকালে বা তারপরেও বেশ কিছু কাল শৌখিন ব্যক্তিদের জন্য ফরমায়েসী প্রতিকৃতি অঙ্কন জিবীকা নির্বাহ করলেও অন্তরের টান উপলব্ধি না

করায় খ্যাতি যশ অর্থাগমের এই পথ পরিত্যাগ করেন। এরপর নব্যবঙ্গীয় শিল্পআদর্শে কিছু চিত্র রচনা করলেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ইউরোপ, চিন, তিব্বত, মুঘল বা পরসিকদের মতো ছবি আঁকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তিনি সেই পরিবেশের নন। ভালো কি মন্দ সেদিক বিচার না করে তিনি এমন এক শিল্পভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যা হবে সবার থেকে আলাদা এবং তাঁর মনের কথা প্রকাশের উপযুক্ত। তিনি অনুভব করেন একটি জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রণালী, আচার ব্যবহার, সৌন্দর্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে শিল্পকলা; লোকশিল্পে বহু যুগ ধরে একই জীবন দর্শন, নিজের বিশ্বাস, নীতি মূল্যবোধ উপস্থাপিত হয়েছে। যে ভূমিতে, সংস্কৃতিকে তিনি বেড়ে উঠেছেন সেই বাংলা বিশেষত বেলিয়াতোড়ের লৌকিক সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের সরলতার কাছে মাথা নত করলেন। পট, আলপনা, কাঁথা, পাটা, টেরাকোটা মন্দির, দেবতাকে উৎসর্গ করা হাতি ঘোঁড়া, সরা, দশাবতার তাস, চালচিত্র, কাঠ মাটির পুতুল, প্রতিমা বাংলার নিজস্ব শিল্প যা বহুকাল ধরে বাংলার ঘরে আচারে-ব্যবহারে, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে ব্যবহারিক ও নান্দনিক চাহিদা পূরণ করে এসেছে সেগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন। লোকশিল্পীদের শিল্পচেতনার সাথে তাঁর আধুনিক মনন সংযুক্ত করে তৈরি করলেন তাঁর একান্ত নিজস্ব শিল্পভাষা। তাঁর শিল্প একদিকে যেমন ভারত পেরিয়ে বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে তেমনি সমালোকদের কটূক্তিতে জর্জরিত হয়েছেন। সমালোচনা বা প্রশংসা কোনটিই তাঁকে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

যামিনী লোকশিল্পের বিষয় এবং আঙ্গিক উভয়কে আপন করে নিলেও পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষা যা তিনি ছাত্রজীবনে লাভ করেছিলেন তাকে কখনই পরিত্যাগ করতে পারেননি। পাশ্চাত্য রীতির চিত্রাঙ্কনে তাঁর দক্ষতা কত উচ্চপর্যায়ের তার পরিচয় প্রতিকৃতি ছাড়াও উজ্জ্বল ইমপ্রেস্‌নিস্টিক নিসর্গচিত্রেও পাওয়া যায়। আধুনিক ইউরোপীয় রীতির শিল্পচর্চা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এই শিল্পীর লোকশিল্পধর্মী চিত্রগুলির মধ্যেও ইউরোপের আধুনিক শিল্প আন্দোলন ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট ইম্প্রেশনিজম, পয়েন্টিলিজম, ফবিজম, কিউবিজম, বাইজেন্টাইন মোজাইক চিত্রকলা প্রভৃতির প্রভাব পড়েছিল তা জোর দিয়ে বলা যায়।

যামিনী রায় যখন খ্যাতির মধ্যগগনে বিরাজ করছেন তখন পরাধীন ভারতবর্ষ একের পর এক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত। তখন অভিযোগ ওঠে তাঁর শিল্পভাবনা অবাস্তব অন্তঃসারশূন্য; সেগুলিতে ভারতবাসীর

পীড়নের আর্তনাদ, বঞ্চনার বেদনা অনুপস্থিত। কিন্তু যামিনী ছিলেন খাঁটি ভারতবর্ষের মানুষ। তিনি বলতেন – 'ভায়া এই মাটির খুরিতে চা যেদিন ওই চিনেমাটির পেয়ালার চায়ের চেয়ে আদর করে খেতে পারব, সেই দিন ঠিক জানতে পারব এই দেশকে'।[৬১] ছেঁড়াখোঁড়া, কিম্ভুতকিমাকার, রূপ ও ডিজাইন বর্জিত সমাজকে তিনি মানেন না।[৬২] তিনি তাঁর ছবিতে গড়ে তুলেছিলেন ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলানো ভবিষ্যতের এক আদল। সমসাময়িক ঘটনাবলি মানসিকভাবে তাঁকে বিচলিত করলেও তিনি তাঁর সেই অশান্তি ছবিতে এঁকে মানুষের মনকে আরো ক্ষতবিক্ষত করতে চাননি। এইভাবেই তিনি সমগ্র শিল্পজীবন ধরে এক ভিন্নধর্মী প্রতিবাদ করে গেছেন।

লোকশিল্পের স্থির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তিনি শিল্পও আঙ্গিকের বারবার পরিবর্তন করেছেন। তাঁর শিল্পচার্চার ক্রম পর্যায়টি হল – ক) বাল্য-কৈশোর যুগ: মূর্তি গড়া ও ছবি আঁকা, খ) Portrait painting-এর যুগ, গ) সাঁওতাল Rural painting–এর ঢঙে ছবি, ঘ) স্বল্প রঙ ও পরিমিত রেখায় Flat technique-এ আঁকা ছবি ঙ) Line drawing-এর পর্যায়: কালো রেখায় আঁকা 'মা ছেলে', 'বধু' ও অসংখ্য জন্তুজানোয়ারের ছবি, চ) Flat technique ও Line drawing-এর সমন্বয়ে আঁকা প্রথম যুগের গ্রাম্য ছবি, ছ) শিশুবোধ সম্মত পর্যায়, জ) বর্ণ বাহুল্য বা ডেকোরেটিভ আলপনার পর্যায়, ঝ) Stylised form–এর পর্যায়, ঞ) Bold and rough form-এ মোটা তুলিতে ছবি আঁকার পর্যায়, তালপাতার চাটাইয়ের উপর ছবি আঁকা (যিশুর ছবি), ট) ডট বা বিন্দু দিয়ে আঁকা পর্যায়, ঠ) লোকগাথার আন্তর রূপ অনুসন্ধানে আঙ্গিক ভাঙার পর্যায়, ড) ব্যঞ্জনাময় ছবি। এই পর্যায়গুলি একটির পর একটি এসেছে এমন নয়, সমস্ত কাজই পাশাপাশি চলেছে।[৬৩]

যামিনী রায় কেবলমাত্র শিল্পী হতে চেয়েছিলেন তাই আত্মপ্রচার বিমুখ এই শিল্পী ঘনিষ্ট মহল ছাড়া নিজের শিল্পদর্শনের কথা কোথাও প্রকাশ করতে চাননি। শিল্প সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ভিন্ন শিল্পভাবনা প্রকাশের ঔচিত্যের কথা ভেবে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুবর্গে তাঁকে গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানালেও তিনি সাড়া দেননি। তাঁর বলা কথা সাজিয়ে তাঁর নামে সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮–১৯৯৩) 'পটুয়া শিল্প' এবং 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া 'ছেলেবেলা' এবং 'স্মৃতিকথা' নামে দুটি স্মৃতিকথা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। বিষ্ণু দে (১৯০৯–১৯৮২), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১–১৯৬০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–১৯৭৪), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–

১৯৭১), নরেশ গুহ (১৯২৩–২০০৯) প্রমুখ সাহিত্যিকরা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পের প্রভাবে সাহিত্য রচনা করেছেন। যামিনী এঁদের গ্রন্থের প্রচ্ছদ রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি নাট্যজগতের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত থাকায় নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং নাট্যমঞ্চে তাঁর প্রভাব পড়েছে। যে শিল্পভাবনা, সাহিত্যচেতনা প্রবন্ধ বা অন্যান্য রচনার স্বল্পতায় অপ্রকাশিত রয়েগেছে তা পূরণ হয়েছে তাঁর লেখা অজস্র চিঠিপত্রে।

যামিনী রায় যেমন সমালোচত হয়েছেন তেমন প্রশংসিত হয়েছেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার Academy of Fine Arts গ্যালারিতে আয়োজিত এক সর্বভারতীয় চিত্রও প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 'উত্তরা অভিমুন্য'-এর জন্য 'Viceroy's Gold Medal' পান। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সমগ্র শিল্পকর্ম এবং ভারতীয় চিত্রশিল্পে নবযুগ উদ্গাতার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 'পদ্মভূষণ' সম্মান পান। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ললিতকলা একাদেমির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে নাগরিক সংবর্ধনা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি. লিট', ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ললিতকলা একাদেমি থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের জীবন, শিল্প ও সাহিত্য চর্চার নানা বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে পুরো বিষয়টিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে –

প্রথম অধ্যায় – বিংশ শতাব্দীর নব্যবঙ্গীয় শিল্পচর্চার পূর্বাপর পরিস্থিতি

দ্বিতীয় অধ্যায় – লোকশিল্পানুষঙ্গ: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

তৃতীয় অধ্যায় – বিদেশি অনুষঙ্গ: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

চতুর্থ অধ্যায় – চিত্র-সাহিত্য: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

পঞ্চম অধ্যায় – নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের তুলনামূলক আলোচনা

বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা শিল্পী নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের শিল্প-সাহিত্যের আলোচনার প্রাথমিক পর্বে ভারতশিল্প কী এবং ভারতশিল্প ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলিকে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন মনে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের কারণ বিগত শতকের শিল্পচর্চার মধ্যেই নিহিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিল্পীদের আগমন ও তাঁদের চিত্রাঙ্কন, কোম্পানি শৈলীর উদ্ভব, লোকায়ত ধারাটির নগরকেন্দ্রিকতায় সৃষ্ট কালীঘাটের পট ও বটতলার ছাপচিত্র এই চারটি

ধারায় শিল্পচর্চা; এরপর ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চা হতে থাকায় অবক্ষয়িত ভারতশিল্পের পুনরুদ্ধারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন শুরু হলে বহু ভারতীয় ও বিদেশি শিল্পপ্রেমী মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। নন্দলাল বসু ছিলেন এঁদের অন্যতম। বিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলনের বিপরীতে পাশ্চাত্য শিল্পচর্চার ধারাটিও অব্যাহত থাকে। এই দুই ধারার শিল্পচর্চা থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যামিনী রায় ভিন্ন ধর্মী শিল্পচর্চা করেন। নন্দলাল ও যামিনীর শিল্প মূলপর্বে প্রবেশ করার পূর্বে এই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

কোন দেশের প্রকৃত শিল্পরুচির পরিচয় পেতে গেলে সেই দেশের লোকশিল্পের দ্বারস্থ হতে হয়। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশ যেখানে বহুবার বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে এবং দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশি সংস্কৃতির সংমিশ্রণে দরবারী শিল্প গড়ে উঠেছে সেখানে শিকড়ের সন্ধানে লোকশিল্পের আলোচনা জরুরি হয়ে পড়ে। নন্দলালের চিত্রচর্চায় পট, আলপনা, কাঁথা এবং যামিনীর চিত্রচর্চায় পট, আলপনা, কাঁথা, মাটি ও কাঠের পুতুল, টেরাকোটা, চালচিত্র ও সরাচিত্র কতখানি প্রভাব ফেলেছিল, লোকশিল্প আঙ্গিকগুলি থেকে তাঁরা কোথায় পৃথক হয়ে গেলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে লোকশিল্পগুলি কীভাবে লোকসমাজের গণ্ডী অতিক্রম করল সেই প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

কোন শিল্পী তাঁর সমকালীন সময়কে অস্বীকার করতে পারেন না। বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনগুলি সম্পর্কে নন্দলালের মনোভাব এবং তাঁর চিত্রে এর প্রভাব কি তাই তা জানার আগ্রহ জাগে। নন্দলাল নব্যবঙ্গীয় শিল্পাদর্শে শিল্পরচনা শুরু করলেও দেশাত্মবোধের অজুরায় যে তিনি কুপমণ্ডুক হয়ে পড়বেন না রবীন্দ্রনাথ সেকথা জেনেই তাঁকে প্রাচ্য সফরের সঙ্গী করেছিলেন। প্রাচ্য স্ফরের প্রভাব নন্দলালের ছবিতে কীভাবে পড়েছিল, কোন পূর্ব সূত্রে প্রাচ্য দেশীয় শিল্পের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছিল তা জানার চেষ্টা করেছি। ছাত্রাবস্থায় যামিনী রায় পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চা করেন। একাডেমিক রীতির শিক্ষাগ্রহণ তাঁর জীবনে কী প্রভাব ফেলেছিল তার অনুসন্ধান করেছি। পাশ্চাত্য রীতির চিত্রাঙ্কন ছেড়ে লোকশিল্পের দিকে যাত্রা কি পশ্চাদ্ধাবন, লোকশিল্পের আঙ্গিকে আঁকা চিত্রগুলি কি কেবল গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচায়ক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব পরবর্তীকালে তাঁর চিত্রে কি পড়েনি, সমকালের শিল্প আন্দোলনগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যামিনী কি সেই আন্দোলনগুলিকে

অস্বীকার করেছেন নাকি সেগুলির চর্চা করেছেন, করলে তা কীভাবে সম্ভব হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে সেই অনুসন্ধান জারি থেকেছে। নন্দলাল বসু যে কেবল ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবক নন এবং যামিনী রায় যে নিছক লোকশিল্পের অনুকারক নন তার প্রমাণে অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নন্দলাল এবং যামিনীকে শুধুমাত্র চিত্রশিল্পী বলা যায় না। চিত্র-সাহিত্য জগতে তাঁরা তাঁদের সাক্ষর রেখে গেছেন। সাহিত্যের কোন কোন বিষয়গুলিকে তাঁরা স্পর্শ করেছেন সাহিত্য বিভাগের ছাত্রী হয়ে তা জানার জন্য আগ্রহী হয়েছি। নন্দলাল ও যামিনী তাঁদের রচিত প্রবন্ধ, গদ্য, স্মৃতিকথা ও চিঠিপত্রের দ্বারা চিত্রসাহিত্য ক্ষেত্রকে কতখানি উর্বর করেছেন তার সন্ধান করেছি। নাট্যজগত তাঁদের সৃষ্টির দ্বারা কতখানি উপকৃত হয়েছে সাহিত্য ও শিল্পের মেলবন্ধনে গ্রন্থপ্রচ্ছদ রচনায় তাঁদের অবদান যথাসম্ভব আলোচনা করেছি। শিল্পীর চিত্র যেমন সাহিত্যিকের মনে দোলা দেয় তেমনি সাহিত্যিকের সঙ্গ, রচনা শিল্পীকে সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। তাঁদের যুগলবন্দীতে উভয়দিকের সৃষ্টিশীল কাজের সন্ধান করেছি।

বিংশ শতাব্দীর এই দুই শিল্পী দুই ধারায় শিল্পরচনা করে ভারতশিল্পকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমালোচকগণ তাঁদেরকে একে অপরের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু যুগ ধর্ম, ভারতশিল্পের আদর্শ তাঁদেরকে একত্রে বেঁধেছে। তাঁদের শিল্পচর্চায় বিষয় গত আঙ্গিকগত পার্থক্য থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের মতাদর্শের ঐক্য লক্ষ করা গেছে। তাঁদের মধ্যে মিল ও অমিলগুলি কী কী নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তা অনুসন্ধান করেছি।

উৎস ও অনুষঙ্গ

১। বেদান্ততীর্থ, গিরিশ্চন্দ্র (১৩২৯)। *প্রাচীন শিল্প পরিচয়*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা। পৃ. ১০৪

২। গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ৬৭-৬৮

৩। বেদান্ততীর্থ, গিরিশ্চন্দ্র (১৩২৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৩-১১৪

৪। বড় পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)। *পটুয়া সংস্কৃতি পরম্পরা ও পরিবর্তন*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ২৭-২৮

৫। ঘোষ, দেবপ্রসাদ (১৯৮৬)। *ভারতীয় শিল্পধারা প্রাচ্যভারত ও বৃহত্তর ভারত*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। পৃ. ১

৬। বড় পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮

৭। গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৭

৮। কালিদাস (১২৬২)। রায়, নন্দকুমার (অনুবাদিত)। *অভিজ্ঞান শকুন্তলা*। কলকাতা: জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। পৃ. ১৩৩- ১৩৬

৯। গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৭ ও ৭০

১০। বেদান্ততীর্থ, গিরিশ্চন্দ্র (১৩২৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৩-১১৪

১১। গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭১

১২। তর্করত্ন, পঞ্চানন (১৩৩৪)। *কাম-সূত্রম্*। কলকাতা। পৃ. ৭৫

১৩। রায়, ত্রিদিবনাথ (সম্পাদিত, ১৯৮০)। *বাৎসায়নের কামসূত্র*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। পৃ. ৬০-৬১

১৪। বড় পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯০-৯২

১৫। চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত, ২০১৩)। *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৩৭৪

১৬। Jain, Champat Rai (1929). *Risabha Deva – The Founder of Jainism*. Allahabad: The Indian Press Limited. P. 96

১৭। বড় পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯০

১৮। বেদান্ততীর্থ, গিরিশ্চন্দ্র (১৩২৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩। ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য

১৯। ঘোষ, দেবপ্রসাদ (১৯৮৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত, ২০১৪)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। পৃ. ১৩৯-১৪০

২১। হাজরা, অক্ষয় কুমার (১৯৫৯)। *শিক্ষায় শিল্পের স্থান*। কলকাতা: অ্যাকাডেমিক এন্টারপ্রাইজ। পৃ. ১

২২। দত্ত, বিমলকুমার (১৩৭৩)। *ভারত-শিল্প*। কলকাতা: বিদ্যাভারতী। পৃ. ১৩

২৩। ঘোষ, নির্ম্মলকুমার (১৯০৮)। *ভারতশিল্প*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১

২৪। মিত্র, অশোক (১৯৯৫)। *ভারতের চিত্রকলা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ২৯-৩১

২৫। দত্ত, বিমলকুমার (১৩৭৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭

২৬। ঘোষ, নির্ম্মলকুমার (১৯০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ.৭

২৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪-১৫

২৮। দত্ত, বিমলকুমার (১৩৭৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩-২৪

২৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬-২৭

৩০। ঘোষ, নির্মলকুমার (১৯০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০

৩১। গান্ধার শিল্প - গান্ধার ভাস্কর্যকে গ্রেকো-রোমান ভাস্কর্য বলা হয়। গ্রীকদের কলা কৌশলে ভারতীয় ভাবাদর্শে ভাস্কর্যগুলি নির্মিত। গান্ধারের শেষযুগের মূর্তিগুলি পাথরের বদলে স্টাকো ও টেরাকোটার দ্বারা নির্মিত। ভাস্কর্যের বিষয় মূলত জাতক এবং বুদ্ধের জীবনী। দ্রষ্টব্য: গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০

৩২। মথুরা শিল্প - মথুরায় জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে এ দেশের নিজস্ব রীতিতে ভাস্কর্যগুলি নির্মিত হয়েছে। এখানকার বুদ্ধমূর্তিগুলি যক্ষের আকারে গড়া। এই যুগের স্থাপত্যগুলিতে নগ্ন নারী মূর্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ধরনের মূর্তি ছাড়াও মথুরার ভাস্কর্যে কুশান রাজাদের প্রতিকৃতি বিশেষ স্থান পেয়েছে। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ৩২-৩৪

৩৩। চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। *শিল্পের ব্যাকরণ*। মুর্শিদাবাদ: বাসভূমি প্রকাশন। পৃ. ৮০

৩৪। ঘোষ, নির্ম্মলকুমার (১৯০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৭

৩৫। ফোরশর্টেনিং - ফোরশর্টেনিং হল পরিপ্রেক্ষিত শিক্ষারই আরেকটি দিক। কোন বস্তু যখন আই লেভেলে লম্বালম্বি অবস্থান করে তখন বস্তুর সম্মুখভাগটিকে অপেক্ষাকৃত বড় এবং পিছনের ভাগটিকে ছোট বলে মনে হয়। আইলেভেলে থাকা বস্তুর এই আপাত হ্রাসপ্রাপ্তিকেই বলে ফোরশর্টেনিং। দ্রষ্টব্য: চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৫

৩৬। ঘোষ, নির্ম্মলকুমার (১৯০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩২

৩৭। চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮২

৩৮। দত্ত, বিমলকুমার (১৩৭৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩

৩৯। চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮২

৪০। গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৯-৫০

৪১। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। *বাংলার চিত্রকলা।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি। পৃ. ৩৩

৪২। রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৮০)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম. মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৮১২

৪৩। ঘোষ, নির্ম্মল (১৯০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪২-৪৩

৪৪। মিত্র, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৫

৪৫। দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। *শিল্প ও শিল্পী*। দ্বতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ২৯৩

৪৬। ঘোষ, নির্ম্মল (১৯০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫০

৪৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫০

৪৮। গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০২

৪৯। ঘোষ, নির্ম্মল (১৯০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫০

৫০। রহমান, মহঃ মতিয়র (২০০৬)। *পটুয়া গীত: সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারা।* পশ্চিমবঙ্গ সরকার: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ. ৭৬

৫১। দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪২২

৫২। বড় পণ্ডা, দীপক কুমার (১৯৯৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৭-৫৯

৫৩। ঘোষ, স্বাতী (২০১৫)। *রবীন্দ্রভাবনায় শান্তিনিকেতনের আলপনা*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৫-৭

৫৪। ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পাদিত, ২০০০)। দাস, তপনকুমার। 'বাংলার কাঁথা: শিল্প ও সংস্কৃতিতে'। *লোকশ্রুতি*। সপ্তদশ সংখ্যা। পৃ. ১৬৩

৫৫। চৌধুরী, দুলাল ও সনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত,২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭৬

৫৬। মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ (১৯৯৯)। *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্ত বঙ্গের প্রেক্ষাপটে*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ. ১৬

৫৭। ঘোষ, নির্ম্মল (১৯০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫১

৫৮। কৌশিক, দিনকর (২০০৮)। সোম, শোভন (অনুদিত)। *নন্দলাল বসু ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*। নতুন দিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া। পৃ. ৩

৫৯। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। *যামিনী রায়: তাঁর শিল্পও চিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক*। কলকাতা: আশা প্রকাশনী। পৃ. ৫১

৬০। দাঁ, প্রশান্ত (২০০৫)। *রূপতাপস যামিনী রায়*। কলকাতা: প্রতিভাস। পৃ. ২৮৭

৬১। বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১১)। *যামিনী রায় শ্রদ্ধার্ঘ্য*। কলকাতা: সুতানুটি বইমেলা। পৃ. ৩০

৬২। মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। *ভারতের চিত্রকলা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ১৩৬

৬৩। দাঁ, প্রশান্ত (২০০৫)। নন্দী, সুধীর। 'শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্র সাধনা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪১–১৪৪

ছবি ১: ভীমভেটকার গুহাচিত্র

ছবি ২: হরপ্পার মৃৎপাত্র

ছবি ৩: হরপ্পার সিলমোহর

ছবি ৪: যক্ষমূর্তি

ছবি ৫: সাঁচীস্তূপ

ছবি ৬: নালন্দার বুদ্ধমূর্তি

ছবি ৭: অপ্সরা, অজন্তা গুহাচিত্র

ছবি ৮: নৃত্য, ইলোরা গুহাচিত্র

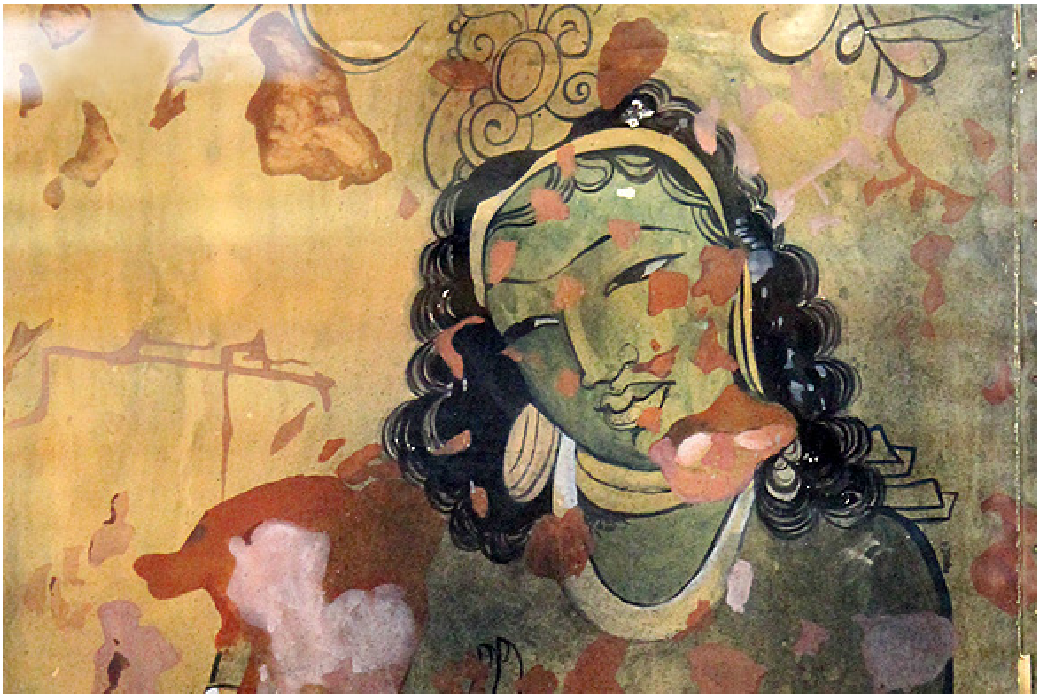

ছবি ৯: বোধিসত্ত্ব, বাগগুহাচিত্র

ছবি ১০: কাঞ্চীপুরমের কৌলাশ মন্দির

ছবি ১১: পালযুগের পুঁথিচিত্র

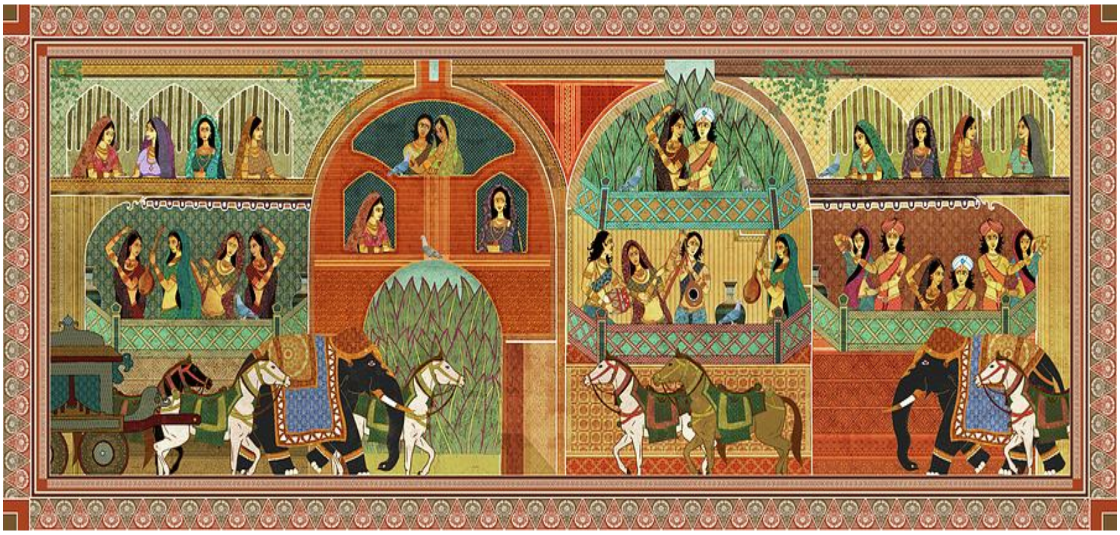

ছবি ১২: রাগমালা, রাজপুত চিত্রকলা

ছবি ১৩: শাহজাহান, মুঘল চিত্রকলা

ছবি ১৪: সীতাহরণ, মেদিনীপুর পট

প্রথম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর নব্যবঙ্গীয় শিল্পচর্চার পূর্বাপর পরিস্থিতি

১.০ ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের সূচনা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এই আন্দোলনে ভারতীয় ঘরানায় চিত্র রচনার যে সার্বিক প্রয়াস লক্ষ করা যায় তার পিছনে তার পূর্ববর্তী সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব বিস্তার অনস্বীকার্য। বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে ভারতের চিত্রকলায় জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গটি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। ভারতবর্ষের শিল্পকলাকে যদি তিনভাগে ভাগ করি তবে দেখা যায় আদিম ও লৌকিক ধারাটির উপর একটা সময় পর্যন্ত তেমন রাজনৈতিক প্রভাব তেমনভাবে পড়েনি। অন্যদিকে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধশালী ধ্রুপদী শিল্পকলা যা কি না সিন্ধু সভ্যতা থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিরবচ্ছিনভাবে চলে আসছিল তাতে ছেদ পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই বিদেশি শক্তির আক্রমণে এই ধারাটি বিপর্যস্ত হয়। তারপর মুঘল যুগে চিত্রকলার নতুন আঙ্গিকের উদ্ভব হয়। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে শিল্প নিদর্শনগুলি বর্তমানে সমাদৃত, বহুকাল পর্যন্ত মানুষ তার সন্ধান পায়নি। নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীকে সুন্দর করে তুলতে লোকসমাজ যে শৈল্পিক নৈপুণতার পরিচয় দিয়েছিল তা সভ্য সমাজে শিল্প বলে সুখ্যাতি লাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে মুঘল রাজপুত শৈলী রাজপ্রাসাদের অন্দরের সুসজ্জিত সামগ্রী হিসেবে থেকে গিয়েছিল। মুঘল আমল পর্যন্ত এমনকি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরও শিল্পীরা এদেশে ছিলেন মূলত রাজানুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই তাঁরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিপন্নতার আভাস পেয়ে ছড়িয়ে পড়েন ভারতবর্ষের নানা রাজদরবারে – রাজপুতানায়, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, বিহার, বাংলায়। স্থানীয় শিল্পের ভাষার সঙ্গে মুঘল শিল্পের পরম্পরা মিলে তৈরি হয় নানা রাজপুত ও পাহাড়ী শৈলী, পাটনা কলম বা মুর্শিদাবাদ কলমের মতো শিল্পধারা। রাজানুগ্রহে পুষ্ট এইসব শিল্পীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ ঘটেনি, ফলে শিল্প শব্দটির সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় তেমনভাবে হয়ে

ওঠেনি।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করতে এলে তারা ভারতশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেনি। ভারতশিল্পের গৌরব গাথা ভারতবর্ষের মননশীল মানুষদের বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেছে।

ক্ষমতাশালী মুঘল শাসকদের পরাজিত করেছে যে জাতি, তারা যে অসাধারণ, তারা যে অতুলনীয় তা বারবার ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরার প্রেচেষ্টা চলেছে। ভারতবাসী বিজিতজাতির চোখ দিয়ে নিজেদের বিচার করেছে। নিজেদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছে জাতির অন্তরে। যা কিছু বিদেশি তাই উন্নত, আর যা কিছু স্বদেশি তা হেলার যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বিদেশি প্রভাব ভারতীয় সমাজে, সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উপরে মারাত্মকভাবে পড়েছে। ভারতীয়রা প্রথমদিকে নিজ দেশের শিল্পের ইতিহাস সন্ধান তেমনভাবে করেননি। ইউরোপীয় শিল্প সমালোচকরা যেমনভাবে ভারতবর্ষে শিল্প ইতিহাসকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন তেমনভাবেই ব্রিটিশদের কাছে সাংস্কৃতিকভাবে পরাভূত ভারতীয়রা ভারতশিল্পকে দেখেছেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের সূচনা হলেও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আঙ্গিকগতভাবে এর সূচনা হতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়।

আঞ্চলিক বিভেদ সত্ত্বেও সমগ্র ভারতশিল্পের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য লক্ষণীয়। ভারতশিল্পীরা সবসময়ই বাস্তব অনুকৃতির পরিবর্তে ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। ব্রিটিশ শাসনে ভারতশিল্পীরা ভারতশিল্পের এই মূল বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন৷ সাহেব শিল্পীদের আগমনে চিত্রশিল্পে বাস্তব অনুকৃতির যে ধারা তৈরি হয়, বিতাড়িত দরবারি শিল্পীরা এবং ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত শিল্পীরা সেই ধারাটিকেই আদর্শ শিল্পের ধারা মেনে শিল্পচর্চা করেন। লোকশিল্পের যে ধারাটি অক্ষত ছিল সেই ধারাতেও বেনোজল এসে মেশে। বিষয়গত এবং আঙ্গিক গত দুইদিক থেকেই জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ঘটে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচর্চায়। এই কাজে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পান ই. বি. হ্যাভেলের থেকে অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্য দিয়ে এই নব্য ভাবনা সারাভারতে ছড়িয়ে পড়ে, যা নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়৷

নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারার শুরুতে যে উদ্দীপনা ও রাজনৈতিক আবহের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিল, যাত্রাপথে তা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ধর্মচেতনা ও পৌনঃপুনিকতায় নব্যবঙ্গীয়

শিল্পচর্চার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদলের খুব কাছাকাছি থেকেও সেই পরিসর থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেন যামিনী রায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে। ব্রিটিশ শাসনের সময়কালে সাহেব শিল্পীদের আগমন, দরবারী শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া শিল্পভাষা, লোকশিল্পের অবক্ষয়, ভারতবর্ষে একাডেমিক পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চার ইতিহাস ফিরে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর মনে নবচেতনা উন্মেষের প্রেক্ষাপটে নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন, তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অবদান এবং নব্যবঙ্গীয় আন্দোলনের সমকালীন সময়ে নিজস্ব শিল্পভাষা নির্মাণে সমুজ্জ্বল শিল্পীবর্গের শিল্পসাধনাকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১.১ ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পচর্চা

১.১.১ পাশ্চাত্য শিল্পী

ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে পাকাপাকিভাবে কায়েম হবার পর মাদ্রাজ ও কলকাতায় বিরাট বিরাট প্রাসাদ স্থাপিত হয় বানিজ্যিক, প্রশাসনিক ও বাসস্থানের প্রয়োজনে। ব্রিটিশদের এই ভবনগুলি প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ছবি ও প্রতিকৃতি দ্বারা অলংকৃত করার প্রথা প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষে বন্ধু পরিবারবর্গ ও দাসদাসী সমেত সুখ-সমৃদ্ধিময় পরিবারের জীবনালেখ্য ইংল্যান্ডস্থিত স্বদেশবাসীর কাছে পরিবেশনের অভিলাসী হয়ে ওঠেন ব্রিটিশরা। সরকারি আমন্ত্রণে আগত শিল্পী ছাড়াও ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ভাগ্যান্বেষণ এবং অর্থ উপার্জনের জন্য অন্যান্য ব্রিটিশ শিল্পীরাও ভারতে আসার জন্য আগ্রহ দেখান। ভাস্কর চিন্তামণি করের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য –

> সাহেব শিল্পীদের ভারতে ভাগ্যদ্দয়কালে আসার বিশেষ আগ্রহের কারণ ছিল এই যে তৎকালীন ব্রিটেনে মাত্র কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী বাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিল্পীদের জীবিকা অর্জনের সামান্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল না। ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজদের অতি অল্প সময়ে ধনাঢ্য হয়ে ফেরার বাস্তব নিদর্শন এবং অনায়াস অর্থাগম ও দেশজ সুন্দরী বিবি ও নফরের সংযোগে স্বর্গসুখ ভোগের নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের নানা কাহিনী বহু সাহেব শিল্পীকে প্রাচ্যে আসবার জন্য প্রলুব্ধ করেছিল।[২]

এই সমস্ত শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন টিলি কেটল (১৭৩৫-১৭৮৬), জন জোফানি (১৭৩৩-১৮১০), ফ্রানচিস্কো রেনাল্ডি (১৭৫৫-?), জর্জ চিনেরি (১৭৭৪-১৮৫২), রবার্ট হোম (১৭৫২-১৮৩৪), টমাস হিকি (১৭৪১-১৮২৪), উইলিয়াম হোজেস (১৭৪৪-১৭৯৭), টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল প্রমুখ। ভারতীয়দের কাছে এরাই ব্রিটিশ প্রদর্শিত পথে যথার্থ শিল্পীর মর্যাদা লাভ করে।

ক) টিলি কেটল

টিলি কেটল কলকাতায় আগত প্রথম সাহেব শিল্পী। ইনি লন্ডনের Shilpey Academy-তে শিল্প শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে স্যার জশুয়া রেনলড্সের (১৭২৩-১৭৯২) কলারীতি দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মাদ্রাজে, ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ও ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ফৈজাবাদে আসেন এবং সেখানে নবাবের দরবারে তিনিই প্রথম সাহেব শিল্পীর সম্মান লাভ করেন। নবাব ও তার পরিবারবর্গ, নবাবের সৈনদলের বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষ ও তাঁদের স্ত্রী সন্তানদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতাতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বীরোচিত সুপুরুষ চেহারার প্রতিকৃতি অঙ্কন করে তিনি প্রচুর অর্থলাভ করেন। এদেশ থেকে চিত্রিত ও সংগৃহীত ভারতীয় দৃশ্যাবলি, জনজীবনের ছবি ও স্কেচ স্বদেশে দেখিয়ে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর সাফল্যের খবর পেয়ে পরবর্তী শিল্পীরা এদেশে আসেন।[৩]

খ) জন জোফানি

জন জোফানি অনায়াস অর্থ উপার্জন ও সম্মান লাভের আশায় ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের (১৭৩২-১৮১৮) প্রস্তাবে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হলে সেখানে নবাব ও তাঁর পরিবারবর্গ ছাড়াও গণ্যমান্য ইউরোপীয় ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের প্রতিকৃতি আঁকেন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার কলকাতায় আসেন। সেন্ট জন গির্জার জন্য আঁকা খ্রিস্টের 'শেষ নৈশভোজ' তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। জোফানির চিত্রগুলিতে রঙের বিশেষ ব্যবহার, বহু ব্যক্তিবর্গ সমন্বিত প্রতিকৃতিতে পৃথক ভাবাভিব্যক্তি ও নাটকীয় ব্যঞ্জনা তাঁকে সকলের থেকে পৃথক করে রেখেছে।[৪] জোফানি কলকাতায় আসার পর যে কয়েকজন শিল্পী কলকাতায় আসেন, তাঁদের

মধ্যে বেশিরভাগই স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস না করে অবিভক্ত ভারতের নানা স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী থেকেছেন। জোফানির পরে যে শিল্পীরা ভারতে আসেন এবং আমৃত্যু ভারতের মাটিতেই শিল্পচর্চা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন টমাস হিকি ও রবার্ট হোম।

গ) টমাস হিকি

টমাস হিকি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন। তৎকালীন সময়ে প্রতিটি ছবির জন্য ২৫০ পাউণ্ড করে পারিশ্রমিক নিতেন। তাঁর আঁকা উইলিয়াম হিকির ভারতীয় স্ত্রী জামদানি বিবির ছবিটি ছিল বিখ্যাত। তিনি মাদ্রাজে গিয়ে টিপু সুলতান (১৭৫১-১৭৯৯) ও ইংরেজদের যুদ্ধের ছবি আঁকেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ সরকার তাঁদের সংগ্রহের বেশ কিছু ছবি মেরামতের ভার তাঁকে দেন। টমাস হিকি প্রায় চব্বিশ বছর এদেশে চিত্রচর্চা করেন।

ঘ) রবার্ট হোম

রবার্ট হোম (১৭৫২-১৮৩৪) ইংল্যান্ডে প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী মারিয়া অ্যানা অ্যাঞ্জেলিকা কাফমানের (১৭৪১-১৮০৭) কাছে প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের শিক্ষা লাভ করেন। পরে ইতালিতে গিয়ে আরো শিল্প অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। লন্ডন ও ডাবলিন শহরে সুনাম অর্জন করতে না পারায় ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের মাদ্রাজে উপস্থিত হন। সেই সময় তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধাভিযান ও ইংরেজ সেনানায়কদের প্রতক্ষ্যচিত্র করবার অনুমতি নিয়ে সৈন্যদলের সঙ্গে যাত্রা করেন। নিহত কর্নেল মূরহাউসের (১৭৪৪-১৭৯১) কৃতিত্বের ছবি আঁকেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তির ছবি আঁকেন। মাদ্রাজে যশোলাভ হলেও আশানুরূপ ধনলাভ না হওয়ায় তিনি মাদ্রাজ ছেড়ে কলকাতায় ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে আসেন। কলকাতায় রাজভবন (১৮০৩) নির্মিত হলে রাজভবনের অন্দরসজ্জার জন্য রবার্ট হোম লর্ড ওয়েলেসলির (১৭৬০-১৮৪২) নির্দেশে প্রতিকৃতি ও ভারতের পশুপাখি, সরীসৃপের ছবি অঙ্কন করেন। পরে আউধের নবাব দরবারে সভাশিল্পীর সম্মানে ভূষিত হয়ে সেখানে প্রতিকৃতি, আসবাবের নক্সা, উষ্ণীষ এমনকি মাহুতের হাতিয়ার, বাতিদান প্রভৃতির গঠনের রূপায়ণ করেন।

লর্ড কর্নওয়ালিশের (১৭৩৮-১৮০৫) সময় থেকে ভারতে আগত ইংরেজদের জীবনযাত্রা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। অন্যদিকে ভারতীয়দের মধ্যেও ইংরেজ বিদ্বাষী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে ইংরেজদেরকে ভারতীয়রা যে নজরে দেখতেন তার পরিবর্তন হতে থাকে। দুই জাতির অন্তরেই জমে উঠতে থাকে পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা।[৫] ভারতীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমতা লোপ পাবার পর ভারতে সাহেব শিল্পীর সৌভাগ্য লাভের সম্ভবনা ক্ষীণ হয়ে আসে। তাই ব্রিটিশ শিল্পীদের ভারত আগমনে ভাঁটা পড়তে শুরু করে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতে আসেন জর্জ চিনেরি।

ঙ) জর্জ চিনেরি

জর্জ চিনেরি ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের মাদ্রাজে আসেন ও প্রায় পাঁচ বছর সেখানে বাস করেন। প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার হেনরি রাসেলের (১৭৫১-১৮৩৬) প্রতিকৃতি আঁকার আমন্ত্রণ নিয়ে কলকাতায় আসেন।[৬] এরপর তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে বহু ইউরোপীয় আমলা ও ক্ষমতাসম্পন্ন বিত্তশালী ভারতীয় যেমন গোপীমোহন ঠাকুর ও তাঁর সন্তানদের, মহারাজ প্রতাপচাঁদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। অর্থের বিনিময়ে প্রতিকৃতি অঙ্কন ছাড়াও বাংলার নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সাধারণ জনজীবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকেন।[৭] কলকাতায় এসে তিনি East Ward of Mrs. Fairlie & Co. নামে একটি স্টুডিও খোলেন। চিনারি ছিলেন এদেশে শেষ বড় শিল্পী। পোর্ট্রেটে[৮], মিনিয়েচরে[৯], ল্যান্ডস্কেপে[১০] তাঁর ছিল সমান দক্ষতা, আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য।[১১]

চিনেরির পর ভারতবর্ষের আগত পাশ্চাত্য শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উইলিয়াম হজেস। তাঁর ছবিগুলির মাধ্যমেই রূপান্তরিত কলকাতার নতুন রূপের পারিচয় পাওয়া যায়।[১২] মিনিয়েচার শিল্পী চার্লস গোল্ড ভারতবর্ষে এসে আঁকা ছবির সংকলন *Oriental Drawing* (১৮০২) প্রকাশ করেন। ড্যানিয়েল নামে এক চিত্রশিল্পী ভারতবর্ষে এসে আঁকা ছবি নিয়ে *Animated Nature* (১৮০৯) নামে ছবির অ্যালবাম প্রকাশ করেন।[১৩] ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে অপর দুই শিল্পী টমাস ড্যানিয়েল ও তাঁর ভাতুষ্পুত্র উইলিয়াম ড্যানিয়েল ভারত ভ্রমণে আসেন। অ্যাকুয়াটিক[১৪] পদ্ধতিতে তাঁরা বারোটি দৃশ্যচিত্র ছেপে প্রকাশ করেন। তাঁরা স্বদেশে পৌছে ভারত ভ্রমণ সংক্রান্ত পুস্তক *Oriental Scenery* (১৮৯৫) প্রকাশ

করেন। বালতাজার সোলভ্যাঁ নামে এক ফরাসি শিল্পী চিত্র সম্বলিত পুস্তক *Manner and Custom and Dresses of the Native of Bengal* (১৮৬৫) প্রকাশ করেন। জেমস মোফাত এর *View of Calcutta* (১৮০৫) ও ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে শিল্পী চার্লস ডেইলী অন্তর্জলি, মুন্সী, বাইজী প্রভৃতি কুড়িখানি চিত্র সম্বলিত প্রকাশিত বই দুটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। পাশ্চাত্য শিল্পী আগমনের শেষ পর্বে কলকাতায় ডানকান বিচি নামক এক প্রতিভাবান শিল্পীর আগমন ঘটে। কলকাতার ক্রেতা ও বাজারের আর্থিক অবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে লক্ষৌ নবাব দরবারে চলে যান। টমাস হিকির মৃত্যুর পর নবাবের শিল্পীচক্রের প্রধানের পদটি খালি থাকায় তিনি ওই পদে নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি সেখানেই থাকেন।[১৫] এরপর সেইভাবে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পী কলকাতায় আসেননি। দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতালাভের আশা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। পাশ্চাত্য শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলির মূল্য অত্যাধিক হওয়ার ধীরে ধীরে ভারত তথা কলকাতায় চিত্রশিল্পের বাজার খারাপ হতে থাকে। এছাড়া ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফটোগ্রাফি যন্ত্র দাগেরোটাইপ (daguerreotype) আবিষ্কৃত হওয়ার ঠিক একবছর পর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে স্যামুয়েল বোর্ণ (১৮৩৪–১৯১২) কলকাতাকে ক্যামেরার সঙ্গে পরিচয় করান। তৎকালীন বাংলার গভর্নর জর্জ এডেনের (১৭৮৪–১৮৪৯) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে কলকাতায় তাঁর ভাগ্যোদয়ের সূচনা হয়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'Whiteway Laidlaw'-এর বাড়ির পাশে দশ নম্বর চৌরঙ্গী রোডে নিজের স্টুডিও 'Bourne and Haward' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্টুডিওটির নাম বদলে হয় 'Bourne and Shepherd'। অন্যান্য ফটোগ্রাফি স্টুডিও এইসময় কলকাতায় গড়ে উঠলে এইগুলির সৌজন্যে কলকাতার চিত্রশিল্পের ইতিহাস বদলে যেতে থাকে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতায় আগত সাহেব শিল্পীরা এইশহরে কর্মরত থেকে নিশ্চয়ই সুখ্যাতি এবং সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই মহানগরীতে উপস্থিতি এদেশীয় বহমান শিল্পধারার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন ঘটিয়ে স্থিতিশীল পরিপূর্ণতায় অভিব্যক্ত করতে পারেনি। ভারতীয় রীতিনীতি টেকনিকের প্রতি অসীম অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাবের কারণে তাঁরা ভারতীয় চিত্রনীতিতে শেষপর্যন্ত আগন্তুকই রয়ে গেলেন – ওরই মধ্যে তাঁরা ভারতীয় চিত্ররীতিকে কিছুটা ভিন্ন পথে টানলেন। ভারতীয় চিত্রশৈলীতে পাশ্চাত্য শিল্পীরা স্থায়ী কোন প্রভাব ফেলতে পারলেননা ঠিকই, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতবাসীর

সাংস্কৃতিক পরাভূত মননে ভাগ্যান্বেষণে আগত বিদেশি শিল্পীদের পাশ্চাত্য শৈলীই কেবলমাত্র 'শিল্প' হিসাবে পরিচিত হবার যোগ্য বলে মনে হতে থাকল। সেই সময় আর্টিস্টের সম্মান পেল বিদেশি শিল্পীরা। ইউরোপীয় শিল্পীদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচ্চবিত্ত ও দরবারি শিল্পীর বংশধরেরা নিজেদেরকে আর্টিস্ট বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতে থাকল। এই দুই শ্রেণির সঙ্গে টিঁকে থাকার লড়াইয়ে স্বশিক্ষিত ভারতীয় শিল্পীরা বিদেশ থেকে আসা শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রিন্টের কপি করতে গিয়ে শিখে নিতে থাকল আলোছায়া ও পরিপ্রেক্ষিতের[১৬] কৌশল।

১.১.২ কোম্পানি শৈলী

ভারতে চিত্রশিল্পী বলতে মুঘল ও অন্যান্য প্রাদেশিক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা ছবি আঁকতেন তাঁদেরকেই বোঝাতো। কোম্পানির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুঘলসহ অন্যান্য রাজদরবাগুলির অবক্ষয় শুরু হলে তাঁদের অনুগ্রহ থেকে দেশীয় শিল্পীরা ক্রমশ বঞ্চিত হতে লাগলেন। অন্যদিকে রাজদরবারগুলিতে সাহেব শিল্পী এবং ইউরোপীয় তৈলচিত্রের সমাদর অধিক হলে ভারতীয় শিল্পীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। এইসময় ভারতবর্ষে আগত পাশ্চাত্য শিল্পীরা কোম্পানি ও দরবার আশ্রিত ছবি অঙ্কনের পাশাপাশি উচ্চবংশীয় ভারতীয়দের তেল রঙের কাজ শিখিয়ে অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। বিদেশি শিল্পীদের থেকে সরাসরি শিক্ষালাভ করা উচ্চবংশজাত ভারতীয় ছাড়াও এঁদের সংসর্গে আসা দরবারি শিল্পীরা এবং সহযোগীর কাজ করতে থাকা অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীরা তেল রঙের ব্যবহার করতে শেখেন। এই সময় ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে বিদেশি শিল্পীদের আঁকা তেলরঙের ছবিগুলি ছোট আকারে জল রঙে নকল করানো হতে থাকলে সেগুলি পুরোপুরি ভারতীয় বা ইউরোপীয় কোনটাই হল না। ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে স্থানীয় শিল্পভাষা ও বিদেশি প্রভাব মিলিয়ে নতুন ধরনের শিল্পভাষা নির্মিত হল।

দরবারি শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষক হারিয়ে নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধান করছেন, সেইসময় ভারতবর্ষে বসবাসকারী ও ভারতভ্রমণে আগত বিদেশিরা তাদের নিজেদের জন্য এবং স্বদেশবাসী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য স্মৃতি হিসাবে ভারতের বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, ভারতীয়দের পোশাক, পেশা, স্মৃতিসৌধ, স্থাপত্য কীর্তির নমুনা সংগ্রহ করার জন্য ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি তাঁদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বংশ পরম্পরায় যে সমস্ত শিল্পীরা ছবি

আঁকতেন তাঁরাই অর্থাৎ দরবারী শিল্পীরা এবং তাঁদের বংশধরেরাও কোম্পানি বা অন্যান্য বিদেশিদের পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা অনুযায়ী ব্রিটিশ কায়দায় সচ্ছ জলরঙে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। নিসর্গচিত্র, নানা স্থাপত্যকীর্তি, ভারতীয় জীবনযাত্রা, চুড়িওয়ালা, ছুতোর, কামার, মিস্ত্রী, মালী, দর্জি, সাহেবদের বাড়ির আশেপাশে ঘোরা মানুষজন, দাসদাসী, চাকর, ভিস্তিওয়ালা, হুঁকো, বরদার বা পাঙ্ক্ষাপুলার, পশুপাখি ও নানা জানা অজানা লতাপাতার ছবি, ভারতীয় যানবাহন, উৎসব, হিন্দু দেবদেবী আঁকা হতে থাকল। একদল শিল্পী শিখতে লাগলেন এনগ্রেভিং[১৭] ও লিথোগ্রাফির[১৮] কৌশল। কারণ তৎকালীন সময়ে বাজার চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এটি জরুরি হয়ে উঠল।[১৯] ভারতে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে দেশীয় রীতির সঙ্গে ইউরোপীয় রীতির সংমিশ্রণে মিশ্ররীতিতে অঙ্কিত এই চিত্রগুলির নতুন নামকরণ হল 'কোম্পানি চিত্র'। শিল্পীরা ভারতীয় হলেও ছবিগুলি ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষকের পছন্দমতো নানা বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি হয়েছিল –

> ... a new colonical category that underlined their displacement and forced exposure and adjustment to Western demands in an open market.[২০]

ক) মুর্শিদাবাদ পর্ব

মুঘল চিত্রশালার পতনে মুঘল কলমের শিল্পীরাই মুর্শিদাবাদের দরবারে এসে মুর্শিদাবাদ কলমের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের সঙ্গে যোগ দেন লক্ষ্ণৌ কলমের শিল্পীরা। কোম্পানি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এঁদের চিত্রে পূর্বতন প্রভু মুঘল বাদশা, বাংলা-অযোধ্যার নবাব এবং অন্যান্য শাসকের প্রতিকৃতি সেইসব ছবির বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাধান্য পায়। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা একটি 'চন্দ্রালোকিত নিসর্গ' চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত এবং আলোছায়ার স্পষ্ট জ্ঞান দেখে কোনো কোনো মুর্শিদাবাদ শিল্পীর পাশ্চাত্য চিত্ররীতির প্রতি আকর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানি চিত্ররীতির প্রভাবে মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের ছবিতে পরম্পরাগত ঘন জলরঙের পরিবর্তে সচ্ছ জলরঙ, রেখাজনিত আলোছায়ার ব্যবহার, আলংকারিক বর্ডারের পরিবর্তে সমস্ত ছবির চারপাশে কালো বর্ডার দেখা গেল। মিনিয়েচরের পরিবর্তে বড়ো আকারের ছবি আঁকা হল। কেবলমাত্র রূপসৃষ্টির জায়গাটিতে নিজস্ব পরম্পরার প্রতি তাঁদের আনুগত্য দেখা গেল।[১০] নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে (১৭০০-১৭২৭)

নিছক ধর্মীয় কারণে দিল্লী থেকে আসা যে সমস্ত শিল্পীরা মহরম ও খাজাখাজির উৎসবে অভ্রফলকের লণ্ঠন চিত্রণের সুবাদে বাংলায় তাদের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কোম্পানি আমলে এই অভিজ্ঞতাকে নতুন করে কাজে লাগিয়ে অভ্রের পাতের উপর মিনিয়েচার আঁকেন। কলকাতা শহরের উত্থানে বাংলার এক সময়কার রাজধানী মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কমে গিয়ে বানিজ্য থেকে শিল্প সমস্তকিছুই কলকাতাকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এরপর ক্ষয়িষ্ণু শহর মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার ইতিহাসে ইতি টানে।

খ) কলকাতা পর্ব

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহর ইরেজশাসিত ভারতের রাজধানীতে পরিণত হলে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চা সমস্ত কিছুই কলকাতাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। রাজধানী কলকাতায় প্রশাসনিক কাজে সেইসময় শিল্পীদের প্রয়োজন নানা কারণে বৃদ্ধি পায়। কলকাতায় আগত পাশ্চাত্য শিল্পীদের খ্যাতি বৃদ্ধি পেলে তাঁদেরকে দিয়ে ফরমায়েশি ছবি করানো আর সম্ভব হয়ে ওঠে না মূলত তাঁদের ব্যস্ততা ও মহার্ঘতার কারণে। ফলে সেই চাহিদা পূরণ করতে ব্রিটিশ সরকার দেশি শিল্পীদের নিয়োগ করলে তাঁরা নক্সা, প্রতিচিত্রণ ও ছবি আঁকার কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেন। কলকাতায় আগত একসময়কার মুর্শিদাবাদ কলম ও পাটনা কলমের শিল্পীরা বোটানিক্যাল গার্ডেনের লতা-পাতা-বৃক্ষ-ফুল-ফল, চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় ছবি আঁকেন। 'Institute of Promoting Natural History of india'-র (১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে, মার্কুইস ওয়েলেসলি ব্যারাকপুরে প্রতিষ্ঠা করেন) প্রয়োজনে, কোম্পানির কর্মচারীরূপে ভারতীয় শিল্পীরা ছবি আঁকেন। এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য শিল্পীদের থেকে তাঁরা ইউরোপীয় রীতিতে অপেক্ষাকৃত বড় আকারে, পাতলা বিলেতি সাদা কাগজে, স্বচ্ছ জলরঙে ছবি আঁকতে শেখেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের ইংরেজদের কৌতুহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানরত দেশীয় শিল্পীদের দিয়ে তাদের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী তারা ছবি করিয়ে নিলেন। ইংরেজ প্রভুদের কাজের প্রয়োজনে এবং ইউরোপীয় চিত্ররীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চার্লস ডয়েলি বা ড্যানিয়েলদের মতো কিছু ইংরেজ শিল্পী ভারতীয় শিল্পীদেরকে এনগ্রেভিং ও এচিং[২১] পদ্ধতি শেখান। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ফটোগ্রাফি প্রচলনের আগে পর্যন্ত কোম্পানিনিযুক্ত দেশি শিল্পীদের

আঁকা ছবিগুলি বিশ্বস্ত দলিল হিসাবে ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে স্থান করে নেয়।[২২] ছবিগুলিতে ইউরোপীয় বাস্তবধর্মীতা, আলোছায়া, পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান প্রত্যক্ষ করা গেলেও বাস্তবতাকে অলৌকিক করে তোলার যে মন্ত্র ভারতীয় শিল্পীদের সত্তার সঙ্গে মিশেছিল তা ব্যবহারের কোন সুযোগ থাকে না।[২৩] সীতা রাম, শেখ মুহাম্মদ আমির করিয়াহ, শেখ জয়েন উদ্দিন (জৈনুদ্দিন), গুলাম আলী খান, ই. সি দাস, ভবানী দাস প্রমুখ শিল্পীদের কাজকর্ম এইসময়ে প্রশংসা পায়। কোম্পানি চিত্রকলা বাংলার পূর্বতন রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও তদানীন্তন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল এবং বার্মা, নেপাল, শ্রীলঙ্কাতেও বিস্তার লাভ করে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ফটোগ্রাফির প্রচলন হওয়ার পর ক্রমে কোম্পানি শৈলীর চিত্রচর্চার অবসান ঘটে।

১.১.৩ লোকায়ত শিল্পচর্চা ও কালীঘাটের পট

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোকসমাজে মানুষের ব্যবহৃত বসনে ভূষণে, আবাসে, আসবাবে, হাতিয়ারে, পত্রাধারে প্রভৃতি জীবনের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত যে লোকশিল্প তাও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য গতিপথ খোঁজার চেষ্টা করল। গ্রামীণ কৃষি ও হস্তশিল্পের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিক দুরবস্থা এবং জাতিভেদ কলুষিত গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার কারণে গ্রামের শিল্পীরা ব্যবসা বাণিজ্যে কেন্দ্রস্থল কলকাতা বিশেষত কালীঘাট অঞ্চলে আসেন রুজি-রোজগারের আশাতে। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে কালীঘাট মন্দিরের সংস্কারের পর মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে বাজার গড়ে উঠেছিল সেখানে স্বর্ণকার, কুম্ভকার, শঙ্খকার প্রভৃতির সঙ্গে চিত্রকর পটুয়ারাও এসেছিল।[২৪] অনুমান করা যায় যে কালীঘাটের পটুয়ারা এসেছিল প্রধানত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর থেকে।[২৫] গ্রাম থেকে শহরে আসা সকলেই যে পটুয়া ছিল তা নয়, তাদের কেউ হয়তো কাঠের কাজ, মন্দির নির্মাণ, পুতুল গড়া বা প্রতিমা গড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই অঞ্চলে আগত শিল্পীদের সকলেই গ্রাম থেকে এসেছিল তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। দেবস্থানে পটের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ঠনঠনিয়ার পটুয়াটোলা থেকে পাট উঠিয়ে পটুয়াদের কালীঘাটে আসার কথাও অনেকে বলে থাকেন।[১৫] কালীঘাট অঞ্চলে সমাগত পটুয়ারা জাতিগতভাবে ছয় শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। যেমন, কাটাকাটী, বসনতরী, সাতকুড়ি, চৌপলকাটা, আটকুড়ি ও বেজো। এদের মধ্যে ‘বসনতরী’ শ্রেণির পটুয়ারা পট আঁকার কাজে চালিয়ে

যান।[২৬] পরম্পরা অনুযায়ী পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বন করে দেবদেবী, দৈত্যদানব, পশুপক্ষী এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য পারিষদবর্গ অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রমুখের মূর্তিচিত্র আঁকতে আরম্ভ করেন। এইসমস্ত বৈষ্ণবগুরু ও আচার্যদের মূর্তিগুলি লক্ষ করলে দেখা যায়, শুধু বলিষ্ঠ লীলায়িত রেখা নয়, টানা টানা ভাবাবিষ্ট আয়ত চোখ ও মুখাবয়ব তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২৭] ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে বদলে যাওয়া সমকালীন সমাজচিত্র, নানা আঞ্চলিক ঘটনা, জনশ্রুতি, বাবু সংস্কৃতি, নারীবাদ, সামাজিক লাম্পট্য, ধর্মীয় ভণ্ডামি প্রভৃতি বিষয় পটে স্থান পায়। কলকাতার সাহেব পাড়া, এলোকেশী-মোহান্ত-নবীনের কাহিনি, বারবিলাসিতার চিত্র বিশেষ করে বারবণিতা গোলাপ সুন্দরি, আয়না সুন্দরি, শুক সুন্দরি, পটের বিবি, বিলাসী ফুলবাবু প্রভৃতি চিত্রপটে দেখা যায়। লৌকিক ও নাগরিক জীবনদৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কালীঘাটের পট। পটগুলির ক্রেতা ছিল মূলত সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহবধুরা। শিক্ষিত স্বামী, ভাই, দেবরদের অপমান, লাঞ্ছনা ও ব্যভিচারের প্রতিবাদ হিসাবে তাঁরা এইসব চিত্রকরদের ছবিতে খুঁজে নিলেন স্বান্ত্বনা ও ব্যঙ্গের খোরাক। যে বিদেশি শিক্ষার প্রভাবে চিত্রকর জাতিটি বিলুপ্ত হতে বসল, তাঁরাও প্রতিহিংসা হিসাবে যাবতীয় ইঙ্গ-বঙ্গ আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিজেদের তুলিতে আনলেন তীব্র শ্লেষ।[২৮] ব্যাবসায়িক লাভ ক্ষতির হিসাবে পট আঁকার সময়, গাঢ় রঙ ব্যবহার কমে আসল, একই পটের পুনরাবৃত্তি হতে থাকল। বিদেশি প্রভাবে প্রভাবান্বিত পটুয়া শিল্পীরা তেল ও জলরঙে দেবদেবীর ছবি আঁকা শুরু করলেও ইউরোপীয় ছবির ঘনত্ব, আলোছায়ার জ্ঞান ও পরিপ্রেক্ষিতের যথার্থ নিয়মগুলি মানলেন না। উইলিয়াম আর্চার পটুয়াদের স্বচ্ছ জলরঙের ব্যবহার ও চরিত্র নির্মাণে বর্তুলতা গুণের জন্য কালীঘাটের পটকে ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত বলে মনে করলেও ভারতীয় চিত্রসমালোচকরা তাঁর এই মতের বিরোধিতা করেন। অশোক ভট্টাচার্য আর্চারের এই সিদ্ধান্ত দুটি কারণে স্বীকার করতে চাননি। প্রথমত, বহিঃরেখার অনুসরণে শেডিং বা বর্তনা অজন্তারকাল থেকেই ভারতীয় চিত্রকলার এক বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চিত্রকলা যেমন কেরলের ভিত্তিচিত্রে, রাজস্থানের নাথদ্বারের ঝোলানো পটচিত্রে, এমনকি পাঞ্জাবের অমৃতসরের ভিত্তিচিত্রে একই ধরনের বর্তনার সাহায্যে গড়নে বর্তুলতা আনতে দেখা যায়।[২৯] পার্থিবতাকে এভাবে অলৌকিকের দিকে নিয়ে যাওয়া ভারতীয় দৃশ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য।[৩০]

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে কালীঘাটে পটুয়াদের পট অঙ্কনের কথা শোনা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কালীঘাট পটের সূচনা হয়। এই শতাব্দীর শেষ অবধি এই ধরনের পটের স্বর্ণযুগ বলে মনে করা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এই চিত্রধারা বহমান ছিল। পাশ্চাত্য শিল্পী, জার্মান ছাপাচিত্র ও লিথোপ্রেসের কারণে এঁদের বিলুপ্তি নিশ্চিত হয়ে যায়। একটা সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নতুন শিক্ষা, নতুন আলোর আস্বাদ পেয়ে দেশীয় চিত্ররীতিকে অবজ্ঞা করে দেশীয় চিত্র, প্রতিমা, মূর্তি থেকে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩১] ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কালীঘাট পটের অবলুপ্তি ঘটে।

১.১.৪ বটতলার ছাপা ও ছবি

গ্রামাঞ্চলে দেবদেবী বিষয়ক পট যাঁরা অঙ্কন করতেন তাঁরা পট অঙ্কনের পাশাপাশি পটের গান শুনিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন। তবে দেবগৃহে তৈলচিত্রের সজ্জা ব্যবহৃত হবার পর তাঁরা অন্যতর পেশার কথা ভাবতে বাধ্য হন। পটগানের পরিপূরক হয়ে ওঠে বটতলার ছবি ও বই।[৩২] কালীঘাট পটের মূল্য বটতলার ছাপচিত্রের থেকে অনেক বেশি থাকায় সাধারণ মানুষ দেবদেবীর ছবি কিনতে সস্তা দামে বটতলার ছাপা ছবিকে বেছে নেন। তাছাড়া কালীঘাটের পট সংগ্রহের জন্য সংগ্রহকারীদের কালীঘাট অঞ্চলেই যেতে হত। যদিও কালীঘাট শুধুমাত্র কালীঘাট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি একটি স্কুল হিসাবে শহরের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। তবুও স্বীকার করতে হয় মূলত কালীঘাট অঞ্চলই ছিল পট বিক্রির মূল কেন্দ্র, অন্যদিকে বটতলার ছাপা বই ফেরিওয়ালার পসরায় পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতেগলিতে পৌঁছে যাওয়ার কারণে বিক্রির ক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ছবিগুলি নন্দনতত্ত্বের বিচারে ততখানি মূল্যবান না হলেও তৎকালীন সময়ে এর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।[৩৩]

বাংলা ছাপা বইয়ে ছবি দেওয়া শুরু হয় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ফেরিস কোম্পানির প্রেসে ছাপা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন – *অন্নদামঙ্গল*-এর এই প্রথম ছাপা সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।[৩৪] গ্রন্থটিতে 'অন্নপূর্ণা', 'সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা', 'সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ', 'সুন্দর ও দারোয়ান', 'বিদ্যা-সুন্দরের দর্শন' ও 'সুন্দরের চোর ধরা' ইত্যাদি মোট ছয়টি ছবি ছিল বলে জানা যায়। বটতলায় এর প্রায় পনেরো বছর পর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে

সচিত্র পুস্তক মুদ্রণের সূত্রপাত হওয়ার পর তিন-চার দশক ধরে এই অঞ্চলটি সচিত্র বাংলা পুস্তক প্রকাশের আখড়া হয়ে ওঠে। বটতলা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছবি পাওয়া যায় জয়নাথ বিশীর *দেবীযুদ্ধ* (১২৮৩) গ্রন্থটিতে। বেদ বেদান্তাদি তন্ত্র, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, সত্যনারায়ণ ব্রত, পদ্মাপুরাণ, বাণব্রত, শিবরাত্রি, গোরক্ষনাথ, ধর্মোদ্ধার, কর্পূরস্তব, অপরাধভঞ্জন, আনন্দলহরী এবং গঙ্গাস্তব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গ্রন্থটি লেখা। গ্রন্থটিতে গ্রন্থকারের ছবি সমেত প্রায় পঁচাত্তরটি ছবির অধিকাংশ নেত্যলাল দত্ত, ও কিছু ছবি নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আঁকেন। কয়েকটি উজ্জ্বল কাঠখোদাই ছবি পঞ্চানন কর্মকারের আঁকা। এই দুটি গ্রন্থ ছাড়াও নন্দকুমার ভট্টাচার্যের *কালী কৈবল্যদায়িনী* (১৮৩৬), *ভাগবতগীতা* (১৮৩৬), *হরপার্বতীমঙ্গল* (১৮৫১), *পঞ্চদশী* (১৮৬২) ইত্যাদি গ্রন্থে ছবি ব্যবহৃত হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ের আরো অনেক সচিত্র বাংলা গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে গেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় কাহিনি বিশেষ করে বৈষ্ণব গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, শাস্ত্রগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ, আইন, তন্ত্রমন্ত্র, ভোজবাজি, নাটক, প্রহসন, গোয়েন্দা কাহিনি, থিয়েটারের গান, কেচ্ছা ও নক্সা জাতীয় বটতলা থেকে প্রকাশ পায়। এইসমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও বটতলার বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে বহুল পরিমাণে পঞ্জিকা প্রকাশিত হতে থাকে। রামনাথ গুপ্তর দিনক্ষণ সংবলিত পঞ্জিকা প্রকাশের বছর দুয়েকের মধ্যে বেণীমাধব শীল, পীতাম্বর সেন, মল্লিকদের প্রেস, চন্দ্রিকা যন্ত্র, বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের প্রেস প্রভৃতি ছাপাখানা থেকে পঞ্জিকা ছাপা শুরু হয়। তিথি-নক্ষত্র গণনার পাশাপাশি, রাশিচক্র, দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশসহ বিভিন্ন দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠান যেমন – ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী ইত্যাদি চিত্রসম্বলিত পঞ্জিকাগুলি নানা উপায়ে নিজেদের বিশেষত্ব প্রকাশের চেষ্টায় একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। সংরক্ষণের অভাবে, নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার হওয়ার দরুণ এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রকাশকদের বটতলার বইপ্রকাশের অনীহার কারণে বটতলার অন্যান্য গ্রন্থের ছবি বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে, কিন্তু বটতলার খোদাই শিল্পীদের খোদাইকৃত সেই সময়কার ছবি বর্তমান কিছু শিশুপাঠ্য পুস্তকে ও পঞ্জিকাগুলিতে আজও 'অক্ষয়কীর্তিস্বরূপ' রয়ে গেছে।[৩৫]

বটতলায় মুদ্রিত ছবিগুলিকে দেবদেবী বা ধর্ম সংক্রান্ত ছবি এবং মানুষ বা অধর্মীয় বিষয় কেন্দ্রিক ছবি মূলত এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।[৩৬] নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক ও মানসিক

অস্থিরতা থেকে আশ্রয় পেতে চিরকাল মানুষ যেমন দেবদেবীর স্মরণাপন্ন হয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়িত সমাজে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই মঙ্গলকাব্য, মহাকাব্য, পুরাণে বর্ণিত লোকায়ত ও পৌরাণিক দেবদেবী সমানভাবে বটতলার ছবিতে স্থান করে নেয়। রাবণ নিধনকারী রাম, শিকারী কালকেতু, সতীর দেহ মাথায় নিয়ে শিব প্রভৃতি সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য চিত্র। মূলকাহিনির ভাববস্তুর সঙ্গে ছবিগুলির অভিব্যক্তির ততটা না মিল পাওয়া যায় না। আসলে ছবির চরিত্রগুলিতে বাঙালির জনমনস্তত্ত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রোধ, হিংসা, রিরংসা প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব ভাব প্রাবল্যে শাক্তদেবী কালীর শান্ত, সৌম্য, অহিংস চেহারা পেয়েছে। দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে জনগণকে ছবিতে স্থান করে দিয়েছে বটতলার শিল্পীরা। *দেবীযুদ্ধ* গ্রন্থে পঞ্চানন কর্মকার খোদিত একটি ছবিতে কৈলাশে হরপার্বতীর সঙ্গে দুইজন সাধু ও একজন সাধারণ মানুষ গাছের উপর বসে রয়েছে। অর্থাৎ স্বর্গসম যে কৈলাশে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই বটতলার শিল্পীর হাতে তা সম্ভব হয়েছে। সদ্যজাত কৃষ্ণকে গোপনে নির্জনে লোকচক্ষুর আড়ালে নন্দালয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে বটতলার শিল্পীর হাতে সেই ছবিতেও বহু জনসমাগম দেখানো হয়েছে। সাধারণ মানুষকে দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ায় বটতলার ছবিকে বিশেষত্ব দান করেছে। সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পুঁথি, পাঁচালি, পঞ্জিকা, পুরাণ, লোককাহিনি, ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা ও পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে নক্সা, প্রহসন ও রঙ্গব্যাঙ্গাত্মক রচনা অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলি বটতলার কাঠখোদাই ও ধাতুখোদাইয়ের নতুন দিক তুলে ধরেছে। সাধারণ মানুষের উপস্থিতি এই ছবিগুলিতে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহুবিবাহ ও বহুবিবাহের ফলে সতীন সমস্যা ইত্যাদি কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারে কীরূপ প্রভাব ফেলেছিল তা বটতলার লেখক ও শিল্পীরা দেখান। পূজা উপলক্ষে বটতলা থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার মলাটে লেখা কবিতার মাঝখানে দুই সতীনের ঝাঁটা হাতে চুলটেনে মারপিটের দৃশ্যাঙ্কন দেখা যায়।[৩৭] সেই সময়ে লেখাপড়া জানা মেয়েদের সমালোচনা করে রাধাবিনোদ হালদারের লেখা *পাশকরা মাগ* (১৩০৯) প্রহসনটির প্রচ্ছদে অঙ্কিত উলঙ্গিনী নারীর ছবির নীচে লেখা হয় – 'স্ত্রী স্বাধীনতার ফল।/পতি হয় পায়ের তল।।'[৩৮] বটতলার এই ছবিটি তৎকালীন সময়ের সামাজিক মনোভাব এবং লিঙ্গবৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিস্ফুট করে। মোহন্ত এলোকেশী তথা কুলবধূ ধর্মগুরু কেচ্ছা কাহিনি কালীঘাটের পটচিত্রে, বটতলার বইতে সচিত্র গল্পাকারে প্রকাশ পায়। কোথাও

নবীন সবে শ্বশুরবাড়ি এসেছে, কোথাও মন্দাকিনীর সাহায্যে এলোকেশী পৌঁছে যাচ্ছে মোহান্তের কাছে, কোথাও মোহান্ত কাছে টানছে এলোকেশীকে, কোথাও নবীন আঁশবটি দিয়ে এলোকেশীর মুণ্ডচ্ছেদ করছে। এই বিষয়ে বটতলায় দুটি লিথোগ্রাফের সন্ধান পাওয়া যায়। *সচিত্র রতিশাস্ত্র* (১৩১৫) গ্রন্থটির নায়িকাচিত্র সিরিজটিতে আঁকা নারী চিত্রগুলির পোশাক, অলংকার, চালচলন তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। ছবিগুলি স্টুডিও চিত্রের মতোই অনেকাংশে রিয়েলিস্টিক হয়ে ওঠে। ফটোগ্রাফির জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বটতলাও নিজেদের ছবি আঁকার ধরনকে বদলে নেয়। কাহিনির প্রয়োজনে শুধুমাত্র বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়, আলাদা করে বড়ো আকারের কাঠখোদাই ছবি ছাপা হয়।[৩৯]

বটতলার ছবিগুলি যথাক্রমে কাঠ, ধাতু ও দস্তার উপর ব্লক বানিয়ে ও লিথোগ্রাফের মাধ্যমে ছাপা হয়। পরবর্তীকালে একমাত্রিক খাঁটি রেখানির্ভর ছবি থেকে হাফটোন[৪০] ব্যবহারের অসামান্য দক্ষতা দেখানো অলংকরণকে ক্রমশ জায়গা করে নেয়। বটতলার গ্রন্থমধ্যস্থ শিল্পী নামাঙ্কিত যে কয়েকটি ছবি পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় রামচাঁদ রায়, রামধন স্বর্ণকার, কাশীনাথ মিস্ত্রি, গোবিন্দচন্দ্র রায়, গোপীচরণ স্বর্ণকার, হীরালাল কর্মকার, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত, পঞ্চানন কর্মকার, তারিণীচরণ দাস, বীরচন্দ্র দাস, কার্তিকচন্দ্র বসাক, কার্তিকচন্দ্র কর্মকার, গঙ্গানারায়ণ ঘোষ, কাশীনাথ মিস্ত্রি, বেণীমাধব ভট্টাচার্য, নিত্যলাল দত্ত, নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা বটতলার চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বটতলার শিল্পীরা পরম্পরানুসারী শিল্পচর্চা করায় তাঁদের কাজে নূতনত্ব বা সার্বিক অর্থে কারিগরি দক্ষতা তেমনভাবে না থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্র ও চিত্র সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কালীঘাট পট ও বটতলার ছাপচিত্র সমানতালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শ্রীপান্থের মতে, বটতলার কাঠখোদাই কালীঘাটেরই রকমফের মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চাহিদা মেটাতে কালীঘাটের শিল্পীরা যখন লিথোগ্রাফের দিকে ঝুঁকছেন সেই জনপ্রিয়তা দেখেই হয়তো বটতলার প্রকাশকরা বড়ো আকারের কাঠ খোদাই ছবি ছেপে বাজার ধরার চেষ্টা করছিলেন। তবে মনে রাখতে হবে বটতলার ছাপাই ছবি ছিল মূলত ইলাস্ট্রেশানধর্মী আর সেই ছবির উৎস বা অনুপ্রেরণা কালীঘাট পট নয়, বরং পাটার ছবি বা চালচিত্র।[৪১] কালীঘাটের পটের প্রভাব পরোক্ষভাবে

কোনও কোনও বিশেষ বইয়ের ছবির উপর পড়েছিল। বইয়ের ছবি খোদাই শিল্প, কালীঘাটের ছবি রঙের চিত্র। তাছাড়া খোদাই চিত্রকরদের সঙ্গে রঙের চিত্রকরদের কোন সম্পর্ক ছিল না।[৪২] কিন্তু সমসায়িক সময়ের এই দুই চিত্রশিল্পের পারস্পরিক আদানপ্রদান ঘটা স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন বাঙালি শিল্পীদের খোদাই শিল্পের জ্ঞান ইউরোপীয় শিল্পীদের কাছেও অর্জিত হতে পারে। পঞ্চানন কর্মকার প্রথম সাহেবদের কাছে অক্ষর কাটা, অক্ষর ঢালাই করা ও ছবি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় ব্লক কাটার কাজ শেখেন।[৪৩] রামচাঁদ, কাশীনাথ, হরিহর সেই যুগের প্রমুখ শিল্পীদের সমসাময়িক অন্যতম কৃতি খোদাই শিল্পী জে. লসনের কাছেও কোনো কোনো ভারতীয় মিস্ত্রি খোদাই শিল্পের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।[৪৪] ইতিহাসের দিকে নজর ফেরালে দেখা যায় বহুকাল পূর্ব থেকেই এদেশে বস্ত্রাঙ্কন, জমিজমার অর্পণপত্র, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও দরবারের সিলমোহর নির্মাণের জন্য কাঠখোদাই, ধাতুখোদাইয়ের প্রচলন ছিল। কে কার শিক্ষক ছিলেন বা কার কাছে শিক্ষানবিশি করেছেন, তা সঠিক না গেলেও এইটুকু বলা যায় যে, একটা লেনদেন উভয়ের মধ্যে হয়েছিল। ধাতুখোদাইয়ের নতুন রীতিনীতি হয়তো ভারতীয় শিল্পীরা কিছুটা আবার বিদেশিদের কাছ থেকে শিখেছিলেন।[৪৫] ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) আধুনিকতম মুদ্রণ যন্ত্রাংশাদি আমদানি করেন এবং ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'U. Ray' নামে একটি ছাপাখানা খোলেন। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানটি 'U. Ray and Sons' নামে পরিচিতি পায়।[৪৬] বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় উপেন্দ্রকিশোরের এই নবোদ্ভূত শিল্পের প্রতি কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্ররা আগ্রহী হলে বটতলার কাঠখোদাই শিল্পে দৈন্য আসে।

১.১.৫ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পশ্চিমী অভিঘাতে আদিমকাল থেকে লোকসমাজে প্রচলিত লোকায়ত ভারতশিল্পের ধারক এই লোকশিল্পের ভাষা বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিদেশি শিল্পদ্রব্যের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ায় দেশি কার্পেটের বদলে বিদেশি কার্পেট, 'মসলন্দ'-এর পরিবর্তে বিলাতি চেয়ার-সোফা, ধুতি চাদর শালের পরিবর্তে হ্যাটকোর্ট, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল প্রভৃতি ধাতু নির্মিত কারুকার্যখচিত পাত্র যা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার বদলে বহু দ্রব্য বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে প্রেরিত হতে

থাকে।[৪৭] এই বদলে যাওয়া সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তন্তুবায়, কাংসবণিক, স্বর্ণকার, চর্মকার, পটুয়া সকলেই নিজেদেরকে বদলে নিয়েছে। ফলে শিল্পের দুনিয়ায় ঘটে গেছে 'নিঃশব্দ বিপ্লব', অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে সাহেবী 'সূক্ষ্মশিল্প' ও ভারতের কারিগরি পরম্পরা মিশে গেছে।[৪৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লোকশিল্পীরা নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। বিদেশি শিল্পীদের প্রভাবে পাশ্চাত্য শিল্পানুকরণ প্রবণতা দরবারী শিল্পী ও ধনী-মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিদেশি শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকল না। শিল্পশিক্ষার আগ্রহ জনমানসে তৈরি হলেও স্বদেশের শিল্প বা প্রাচ্য শিল্পচর্চা করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সেভাবে না থাকায়, তরুণ শিল্প শিক্ষার্থীরা বিদেশি শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষা নিতে আগ্রহী হয়ে উঠলে পশ্চিমী শিল্পকলাকে আয়ত্ত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হল।

ক) Brush Club

ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে (১৮৩০/১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে) কলকাতায় প্রথম চারুকলা সংস্থা Brush Club প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্লাবের প্রথম সম্পাদক হন তৎকালীন সময়ের কলকাতার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর উইলিয়ামাকার। Brush Club-এর উদ্যোগে ১৮৩১ ও ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে দুটি প্রদর্শনী হয়। এই দুটিই কলকাতার সর্বপ্রথম প্রদর্শনী। প্রদর্শনী দুটিতে উইলিয়াম হজেস, টিলিকেটল, জর্জ চিনেরি, জন জোফানি, রেমব্রান্ট, ক্যানালেগে, টার্নার প্রমুখ বিদেশি শিল্পীদের ছবি প্রদর্শিত হয়। এঁদের আঁকা প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির কপিগুলি প্রদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় 'সূক্ষ্ম শিল্প'র কৃতিত্ব প্রদর্শন।[৪৯] এই দুটি প্রদর্শনী ছাড়া এই ক্লাবের অন্য কোন কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া যায় না। প্রদর্শনী দুটিতে অংশগ্রণকারী শিল্পীদের তালিকায় কোন ভারতীয় শিল্পীর নাম না পাওয়া গেলেও দাতাদের তালিকায় কিছু বাঙালির নাম পাওয়া যায়।

এর বহুপূর্বে ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী চিত্রশিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পী মিঃ হোন চিত্রশিক্ষা প্রসঙ্গে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের *Calcutta Gazette*

পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন।[৫০] এছাড়া জঁ জাঁক বেলনস নামে এক ফরাসি চিত্রশিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় যিনি ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কোন এক অজ্ঞাতনামা শিক্ষাকেন্দ্রে শিল্প-শিক্ষকতা করেন।[৫১]

খ) Mechanics' Institute

কলকাতার লিখিত ইতিহাস অনুযায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের শেষের দিকে (১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি) London Mechanics' Institute–এর আদলে প্রতিষ্ঠিত Mechanics' Institute কলকাতার প্রথম সংগঠিত শিল্পবিদ্যালয়। *India Review* পত্রিকার শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক ডঃ ফেড্রিক করবিন স্কুলটি স্থাপন করেন। সভাপতি স্যার জন পিটার গ্রান্ট, সহ-সভাপতি রেভারেন্ড বোয়াজ, যুগ্মসম্পাদক হন জর্জ গ্রান্ট এবং কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট (১৮১৩–১৮৮০)। প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম সদস্য হিসেবে রামমোহন রায়ের (১৭৭২–১৮৩৩) শিষ্য, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক এবং চক্রবর্তী ফ্যাকশনের (ইয়ং বেঙ্গল) নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীর (১৮০৬–১৮৫৭) নাম পাওয়া যায়। এছাড়া ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪–১৮৮৩), মহারাজ রামানাথ ঠাকুর (১৮০১–১৮৭৭) ও হরিমোহন ঘোষের নাম পাওয়া যায়। 'এদেশীয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প' শিক্ষা প্রদান ছিল এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[৫২] প্রথমে কলকাতার টাউন হলে, পরে সাঁ সুসি নাট্যঘরে এবং শেষেরদিকে রাজভবনের পূর্বদিকের বাড়িতে ক্লাস করানো হয়। ইংরেজ চিত্রশিল্পী কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট প্রতিষ্ঠানটির শিল্পশিক্ষার শিক্ষক নিযুক্ত হলে বুধবার সাধারণ ড্রয়িং ও শনিবার করে পরিপ্রেক্ষিতের ক্লাস করান।[৫৩] কলকাতার এই শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শেষ অবধি এর কাজকর্ম বিস্তার লাভ করে। এর বহু পূর্বে পুনেতে স্কটিশ চিত্রশিল্পী জেমস ওয়েলস (১৭৪৭–১৭৯৫) স্থাপিত শিল্পবিদ্যালয়টি ভারতের এবং সম্ভবত এশিয়ার প্রথম শিল্পবিদ্যালয়।

গ) Bethune Society

ভারতদরদী জন এলিয়ট ডিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের (১৮০১-১৮৫১) মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থিয়েটার হলে ডঃ এফ. জে. মৌএটের (১৮১৬-১৮৯৭) উদ্যোগে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর কলকাতার বহু গুণীজনকে নিয়ে আয়োজিত সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে Bethune Society গড়ে ওঠে। এই সোসাইটি প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাংলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভারতীয়দের মধ্যে জ্ঞানুশীলনের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটাতে, ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সমঝোতা সহিষ্ণুতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অরাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত এই সোসাইটিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা ছাড়াও স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা সম্পর্কে নিয়মিত বক্তৃতা দেওয়া হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন গুণীজন নানা বিষয়ে মোট দশটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপরে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ হজসন প্রাটের (১৮২৪-১৯০৭) বাড়িতে মিঃ অ্যালেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার লেঃ কর্নেল এইচ গুডউইন (১৮৩৪-১৯২৩) ‘Union of science, in industry and art’ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে বিশেষভাবে কলকাতায় বিজ্ঞানসম্মত শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। শিল্পবিদ্যালয় গঠনের জন্য একটি সমতি গঠন করার কথাও বলেন। তাঁরই প্রস্তাবে গড়ে ওঠে ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’।[৫৪]

ঘ) শিল্প-বিদ্যোৎসাহিনী সভা

বেথুন সোসাইটির কিছু সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠে ‘Society for the Promotion of Indrustrial Art’ বা ‘শিল্প-বিদ্যোৎসাহিনী সভা’। এই সভার সভাপতি লেঃ কর্নেল এইচ গুডউইন, যুগ্ম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) ও হজসন প্রাট্ নির্বাচিত হন। সোসাইটির ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রামচন্দ্র মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), প্রতাপচন্দ্র সিংহ (১৮২৭-১৯৬৬) প্রমুখ। হজসন প্রাটের বাড়িতে আয়োজিত বিদ্যোৎসাহিনীর প্রথম সভায় গঠিত সাব কমিটির সভাপতি হন সিসিল বিডন (১৮১৬-১৮০) এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন জেমস্ লঙ (১৮১৪-১৮৮৭), উইলিয়াম মনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩), রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ। এই কমিটিকে গুডউনের প্রস্তাব

অনুযায়ী শিল্পবিদ্যালয় গঠনের প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্থির হয়, শিক্ষালয়ে শেখানো হবে ক) আদর্শ (মডেল, অবজেকট) ও প্রকৃতি (নেচার) অনুসরণে আঁকা, খ) ধাতুপাত, কাঠের ফলক ইত্যাদিতে খোদাই করে বই প্রভৃতিতে ছবি ছাপা ও লথোগ্রাফি বা ছাপার জন্য পাথরফলকে আঁকা, গ) মৃৎপাত্র ও মাটি, মোম ইত্যাদির সাহায্যে বিবিধ জিনিস বানানো।[৫৫] ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রচারপত্রে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কথা জানিয়ে জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনাসহ শিল্পবিদ্যালয়টিতে কী কী বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে এবং শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে জ্ঞাত করা হয়।[৫৬]

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের সমসাময়িককালে এক বিশেষ ধরনের শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যারা ছাপাখানার জন্য প্রয়োজনীয় হরফ ডিজাইন করতে পারে, বইপত্র ও অন্যান্য ছাপা জিনিসগুলিতে সুন্দর করে হরফ সাজানোর কায়দাকানুন পরিকল্পনা করতে পারে, ছাপাখানার উপযোগী নক্সা, ম্যাপ, চার্ট, গ্রন্থচিত্র, ছবি আঁকতে পারে, অলংকরণের জন্য ডেকরেটিভ বর্ডার, কর্ণার, হেডপিস, টেলপিস ইত্যাদি আঁকতে পারে।[৫৭] মুদ্রণযন্ত্র আমদানি করার পর ইউরোপীয় শাসকরা এদেশেও এই ধরনের শিল্পী ও কারিগর তৈরির প্রয়োজন অনুভব করেন। এই সময় সারা ভারতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, কর্মশালা, নিত্যনতুন শিল্প কারখানা তৈরির জন্য নক্সা তৈরির প্রয়োজন হল। প্রতিটি ভবনের জন্য ব্রিটেন থেকে নক্সা তৈরি করে আনা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং একদিকে ছাপাখানার প্রয়োজনে বা ছাপাখানার মধ্য দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এমন ধরনের শিল্পী ও কারিগর তৈরির কথা তারা ভাবতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে নির্মাণকার্য সুচারুরূপে রূপায়ণের জন্য ভারতীয় কর্মচারীদের স্থাপত্য অঙ্কনরীতি শিখিয়ে নেবার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক শাসকের গুণগ্রাহীদের কাছে সরকার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল আকর্ষণীয় ও সাধুবাদযোগ্য। সরকারি উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়, পরম্পরাগতভাবে যারা নানা কারুকলার সৃষ্টি করে চলেছেন, তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিল্পশিক্ষা দান করে জীবিকা নির্বাহের সম্মানজনক ব্যবস্থা করে দেওয়া।[৫৮] যদিও তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সার্ভে অফিসে সরকারি কাজের চাহিদা পূরণের জন্য 'দক্ষ অনুকরণকারী' তকমা দেওয়া আর্টিস্ট তৈরি করা।[৫৯]

৬) The School of Industrial Art

শিল্প-বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রচারপত্র প্রকাশের বহুদিন পর ১৮৫৪ খিস্টাব্দের ৯ আগস্ট মাসে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে শিল্পবিদ্যালয় উদ্বোধনের দিনক্ষণ, স্থান, কবে কি বিষয়ের কোন ক্লাস হবে এবং ছাত্রেদের কত টাকা মাইনে দিতে হবে তা জানানো হয়। বিজ্ঞাপন অনুসারে বেসরকারি উদ্যোগে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট 'The School of Industrial Art' প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে বহু ভারতীয়ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করেন। বিদ্যালয়ের জন্য প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁদের গরাণহাটার বাড়িটি বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দেন। সরকারের তরফ থেকে কোনো আর্থিক অনুদান না পেয়ে ছাত্রদের বেতন ও সভ্যদের চাঁদাতেই বিদ্যালয় পরিচালিত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠাদিবসে ওই বাড়িতেই মূর্তি আর মৃৎশিল্পের (Custing and Modeling) শিক্ষক রিগো (M. B. Rigaud) আর অঙ্কনের (ড্রয়িং) শিক্ষক আগার (M. Agyar) বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু করেন। গুডউইনের প্রস্তাব মতো ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার টাউন হলে বিদ্যালয়ের প্রথম প্রদর্শনী হয়, এবং ওই বছরই তিনশো টাকা মাইনের বিনিময়ে ইংল্যান্ড থেকে এচিং ও কাঠখোদাইয়ের শিক্ষক টি. এফ. ফাউলারকে আনা হয়। ফাউলারের মৃত্যুর পর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেজার ও বোনেটকে লিথোগ্রাফির অধ্যাপনায় নিযুক্ত করা হয়। আঠাশজন ছাত্র নিয়ে শিল্পবিদ্যালয়ের সূচনা হলেও এর গরিমা ছড়িয়ে পড়ায় কয়েক বছরে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে হয় দুশো তেষট্টিজন। গরাণহাটার বাড়িতে স্থান সঙ্কুলানের অভাব হওয়ায় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি হীরালাল শীল ও মতিলাল শীলের কলুটোলার বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি এখানেই থাকে। পূর্বের মতো বিদ্যালয় কতৃপক্ষকে এই বাড়িটির জন্যও কোন ভাড়া দিতে হয় না। এই বাড়িটিতে ক্লাস শুরু হওয়ার পর বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টির পাঁচশো চারজন ছাত্রের মধ্যে তিনশো ছাপান্নজন বাঙালি, দুজন হিন্দী ভাষী, সাতজন বাঙালি, দুজন ইউরোপীয় এবং একশো সাঁইত্রিশজন ফিরিঙ্গি ছাত্র ছিলেন।[৬০] বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্য ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের এককালীন দান ও ছাত্রদের দেওয়া বেতনে বিদ্যালয়ের খরচ কুলিয়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়লে সরকারের কাছে দরবার করে মাসিক ছয়শো টাকা আদায় করা সম্ভব হলেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে তা অর্ধেক হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রভাব বিদ্যালয়ের

শিক্ষাব্যবস্থার উপর পড়েনি। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নতুন বিষয় ফটোগ্রাফি যুক্ত হয়। বেথুন সোসাইটির ত্রয়োদশ বর্ষের সভাপতি আলেকজান্ডার ডাফ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারত ত্যাগ করলে শিল্পবিদ্যালয়টি বন্ধ হবার উপক্রম হলে লেফটেনান্ট গভর্নর সিসিল বিডন সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়টিকে আর্থিক অনুদান দেন এবং বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ইংল্যান্ড থেকে একজন যোগ্য অধ্যক্ষ আনার পরিকল্পনা করে লন্ডনের সাউথ কেসিংটন মিউজিয়ামে আবেদন জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ হেনরি হোভার লককে (১৮৩৭-১৮৮৫) ভারতবর্ষে পাঠান। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন লকের যোগদনের পরই শিল্পবিদ্যালয়টি সরকার অধিগৃহীত হয়ে 'Government School of Art'-এ পরিবর্তিত হয়।[৬১]

চ) Government School of Art

হেনরি হোভার লক ১৮৬৪ থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যক্ষ থাকাকালীন লন্ডনের সাউথ কেসিংটন মিউজিয়াম ও পরে রয়্যাল আকাদেমির পাঠ্যসূচিকে কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির সঙ্গে যুক্ত করে ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিক শিল্পরীতিতে আধুনিক শিল্পশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেন। শিক্ষাশ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী পাঠ্যসূচিকে কতগুলি স্তরে-উপস্তরে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা ও শিল্প শিক্ষার পর জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি নজর দেন। তিনি ছাত্রদের জন্য কতগুলি পুরস্কার ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বড়লাট নর্থব্রুক (১৮২৬–১৯০৪) ও ছোটলাট রিচার্ড টেম্পলের (১৮২৬–১৯০২) সহযোগিতায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয় সংলগ্ন ১৬৪ ও ১৬৫ নং বউবাজার স্ট্রিটে কলকাতার প্রথম স্থায়ী আর্ট গ্যালারি স্থাপন করেন।[৬২]

ছ) অন্যান্য প্রদেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিল্পশিক্ষার ধারণাটি ইউরোপ থেকে আমদানি হওয়ার পর কলকাতার মতই মাদ্রাজ, বোম্বাই ও অবিভক্ত ভারতের লাহোরে শিল্পবিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ মে সার্জন আলেকজান্ডার হান্টারের (১৮১৬ - ?) উদ্যোগে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিল্পবিদ্যালয়টি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে সরকার অধিগ্রহণের পর 'Madras school of Art And Design' বা

'Madras school of Art And Craft' নামে পরিচিত হয়। বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতে এর নাম পুনরায় পরিবর্তিত হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ বোম্বাইতে স্যার জামসেটজী জিজেভয় (১৭৮৩–১৮৫৯) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত Sir J. J. School of Art and Industry-তে চিত্রশিল্পী জর্জ উইলকিনস টেরি শিল্প শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য স্কুলটি 'টেরির স্কুল' নামেও পরিচিত হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সরকার অধিগ্রহণের পর এই স্কুলের নাম বহুবার পরিবর্তিত হয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্থানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে 'Punjab School of Art' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মেয়োর সম্মানে 'Mayo School of Art' নামে পরিবির্তিত হয়।[৬৩] ইংরেজ সরকারের সুপরিকল্পিত পরিকাঠামোতে ব্রিটিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমির পাঠ্যক্রমের আদলে, সরকারি নীতি অনুযায়ী চলতে লাগল এই চারটি স্কুল – কালো মানুষদের শিল্পশিক্ষার নিরিখে সাদা মানুষদের বোঝা বহনের তাগিদে।[৬৪] এই শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের উপনিবেশ বিস্তারের প্রয়োজনে নথি জরিপ সংরক্ষণ প্রভৃতি দপ্তরে চাকরির সংকল্পে রচিত পাঠ্যক্রম ছিল মূলত রেখাঙ্কন, জ্যামিতিক ড্রইং, প্রতিকৃতি অঙ্কন, মডেলিং,[৬৫] লিথোগ্রাফি, এনগ্রেভিং ইত্যাদি। উল্লেখিত পাঠক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা শিল্পের ইতিহাস, শিল্পতত্ত্ব সংক্রান্ত উচ্চমানের শিল্পশিক্ষা বা সৃজনশীলতা বিকাশের উপর জোর না দিয়ে কেবলমাত্র কারিগরি বিদ্যার মেধাহীন নকলনবিশি শিক্ষায় শিক্ষিত করাই প্রধান হয়ে উঠল। এর পিছনে কারণগুলি হল প্রথমত, চাকরিতে ও অজুরার কাজে নকলনবিশিই আদৃত হতো। দ্বিতীয়ত, এ দেশের পরম্পরার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবহেতু যেমন এদেশের মানুষ নিজেরদের উত্তরাধিকার ভুলে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে ক্রমাগত ইউরোপ থেকে হুবহু সাদৃশ্যমূলক মূর্তি ও ছবির প্রতিলিপি এ দেশে নিয়ে এসে যে সাংকৃতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলেছিল, তার ফলে এই কেতাই এ দেশের শিল্পীদের সামনে আদর্শস্বরূপ হয়ে উঠেছিল।[৬৬] পরানুকরণে মোহগ্রস্থ ভারতবাসী তখন পর্যন্ত ভারতশিল্পকে জানবার চেনবার প্রয়াস করল না।

১.৬ Government School of Art-এর প্রারম্ভিক পর্যায়

শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা শিক্ষালাভ করছিলেন তাঁরা বিদেশি শিল্পীদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারলেন না আবার শিক্ষার তকমা থাকায় দেশি স্বশিক্ষিত শিল্পীদের থেকেও আলাদা হয়ে রইলেন। ফলে

সরকারি অনুগ্রহ ছাড়া তাঁদের জীবিকা নির্বাহ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশদের লেখা বই যেমন, Dr. Joseph Fayer-এর লেখা *The Thantophidia of India* (১৮৭২) বা ভারতীয়দের গবেষণালব্ধ কোন বই যেমন – রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Antiquities of Orissa* (দুই খণ্ড: প্রকাশকাল ১৮৭৫ ও ১৮৮৮) ও *Buddhgaya* (১৮৭৮) সচিত্রকরণের দায়িত্ব শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রেদেরই দেওয়া হয়। মেডিকেল কলেজের অস্থিবিদ্যার চারশো তেত্রিশটি ছবি শিল্পবিদ্যালয়ের দুই ছাত্র আঁকেন। ফোর্ট উইলিয়ামের সেন্ট পিটার্স চার্চের ও রাজভবনের দুরবার হলের অভ্যন্তরে অলংকরণের দায়িত্ব পান শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এছাড়া সরকারি যাবতীয় মডেলিং, চিত্ররচনা ও অলংকরণের দায়িত্বও এঁদের উপরেই দেওয়া হয়। আর এভাবেই শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রেদের গায়ে 'দক্ষ অনুকরণকারীদের' তকমা লাগানো হয়।[৬৭]

লকের দুই ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (১৮৪৯–১৯০৫) ও শ্যামাচরণ শ্রীমানী (?–১৮৭৫) শিল্পবিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসাবে সেখানেই শিক্ষকতার সুযোগ পান। অন্নদাপ্রসাদ কাঠখোদাই, লিথোগ্রাফি, এনগ্রেভিং শেখার পর লকের তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয় রীতিতে তেলরঙ[৬৮] চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে একটানা পঁচিশ বছর শিক্ষকতা করেন। তিনি Calcutta Art Studio-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পাশ্চাত্য একাদেমিক রীতির শিল্পচর্চা এবং সাধারণ বাঙালি পরিবারগুলির মধ্যে চিত্রকলার মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে এই আর্ট স্টুডিয়োর ভূমিকা অনেকখানি। 'Indian Association for the Promotion of Fine Arts and National Gallery' নামক বাঙালি শিল্পীদের প্রথম চারুকলা সংস্থা গঠিত হলে তিনি তাঁর সহসভাপতি নির্বাচত হন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত চারুকলা বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকা *শিল্প পুষ্পাঞ্জলি*-র (প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৯২) প্রধান উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় কলা সংসদ'-এর (১৯০৫) সভাপতি হন।[৬৯] শ্যামাচরণ ছাত্রাবস্থাতেই ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে Government School of Art-এর জ্যামিতিক চিত্রকলার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে প্রাশ্চাত্য শিল্পানুকরণ পরিত্যাগ করে স্বদেশের শিল্পভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টিপাতের আহ্বান জানান। প্রথম ভারতীয় শিল্প সমালোচক হিসাবে নিয়মিত বক্তৃতা ও নিবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখা *সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরি* (১৮৭৪) গ্রন্থটি শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ লককে

উৎসর্গ করেন।[৭০] ভারতীয় পরম্পরাগত শিল্পকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করে ভারতীয় শিল্পীদের স্বদেশের শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও আত্মনির্ভরতার আহ্বান জানান। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্রের (১৮৪০-১৮৯৪) প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কুল চালু হলে তিনি সেখানে চারু ও মূর্তিকলার শিক্ষকতা শুরু করেন। নবগোপাল ও অন্যান্য স্বদেশি নেতাদের উদ্যোগে আয়োজিত হিন্দু মেলার জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি শিল্পশিক্ষা প্রবর্তন, দৈনন্দিন জীবনে ও জাতিগঠনে শিল্পের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রচার করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে একই মঞ্চ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্যামাচরণ পরম্পরাগত দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন ও তরুণদের শিল্পচর্চায় এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।[৭১] ইতিপূর্বে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষে ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, কাব্য ও নাটক নতুন পথ কেটে দ্রুত তালে এগিয়ে চললেও শিল্পকলার মহান ঐতিহ্য ও সুন্দরের সাধনা বহুদিন সেভাবে গতি পায়নি।[৭২] শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা সমগ্র জাতির পূর্ণ বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীন সভ্যতা ও কলা বিষয়ে পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্ববিদদের গবেষণায় ভারতবর্ষের ভাস্কর্য-চিত্রকে পরানুকরণ দোষে দুষ্ট ও তুচ্ছ করে দেখানো হয়। এমন পরিস্থিতিতে শ্যামাচরণ শ্রীমানীর চিন্তা চেতনা, শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ এবং তাঁর বক্তৃতা নিবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে অন্য পথের দিশা দেখায়। গ্রন্থ রচনার তিরিশ বছর পর আর্ট স্কুলের এক সভায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিল্পভাবনার অন্যতম অনুপ্রেরণাদাতা হিসাবে শ্যামাচরণকে স্মরণ করেছেন।[৭৩]

লক অধ্যক্ষ হয়ে এলে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৭-১৮৮১) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ভারতীয় শিল্পের শিকড় সন্ধানের আকুতি সুশিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজে তৈরি হওয়ায় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানরা শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে মহীশূর, শোলাপুর, বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশের সন্তান থেকে শুরু করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানরা চিত্রশিল্পচর্চা করতে থাকলে *মনুসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম সংহিতা* প্রভৃতি শাস্ত্রে শিল্পকারদের সমাজের নিম্নশ্রেণি রূপে গণ্য হওয়ার দিন ফুরিয়ে আসতে থাকে। বংশপরম্পরাগত শিল্পচর্চার বদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের যুগ চলে আসায় শিল্পকলাচর্চা অনেক উচ্চস্তরে পৌছে যায়। সচেতন প্রয়াসে আবিষ্কৃত হতে থাকে ভারতশিল্পের নানা উজ্জ্বল নিদর্শন। লৌকিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ভারতবর্ষীয় প্রত্ন-

সামগ্রী পুঁথিপত্রের সন্ধান, সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল সব সৃষ্টি সম্পাদনা করে প্রকাশে আগ্রহী বহু মনীষীর তখন অভ্যুদয় হয়েছিল।[৭৪] ইউরোপীয় শিল্প সমালোচকরা তখন অনুভব করতে পারলেন প্রাচ্য দেশের সম্পদ তুচ্ছ করার ব্যাপার নয়, শিল্পক্ষেত্রে ইউরোপীয় আদর্শই একমাত্র আদর্শ হতে পারে না। ভারতের কলাশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বিদেশ থেকে আসা অধিকাংশই শিক্ষক যাঁদের ভারতীয় শিল্প ও সমাজ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল।

১.২ বিংশ শতাব্দীর শিল্পচর্চা

১.২.১ আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল

শিল্পী, শিল্পরসিক ও ভারতপ্রেমিক হ্যাভেল ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। অধ্যক্ষ হয়ে আসার পর তিনি দেখেন শিল্পবিদ্যালয়ের ইংরেজদের বহু পুরনো প্রাদেশিক শিল্পরীতি অনুসৃত হচ্ছে। পরাধীন দেশের মানুষকে তাদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে এবং শিল্প যে জাতীয় সৌন্দর্যবোধের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি – এই স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু অস্বীকৃত সত্যকে শেখাতে হ্যাভেল ভ্রান্ত রীতি ও ভ্রান্ত নমুনার আবর্জনাকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেন।[৭৫] শিল্পসংগ্রহশালার বহু বিদেশি চিত্র ও মূর্তি সরিয়ে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলিম যুগের চিত্র সংগ্রহ করেন। ছাত্রদের ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় করাতে তিনি পাঠক্রমে ইউরোপের স্টেইন গ্লাস, ডিজাইন[৭৬] ফ্রেস্কো[৭৭] ইত্যাদির সঙ্গে প্রাচ্যশিল্প ও ভারতীয় কারুশিল্পের কতগুলি বিষয় পাঠক্রমে যুক্ত করেন। তিনি সমস্ত শিল্প শিক্ষাকে কারুকলা ও চারুকলা এই দুটি ভাগে ভাগ করে কারুকলা বিভাগে ডিজাইনের উপর গুরুত্ব দেন।[৭৮] কারুশিল্প বিভাগের বেতনহার কমিয়ে দেওয়া ও অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে একদল ছাত্র, বিভিন্ন সংবাদপত্র, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যান। তাঁরা হ্যাভেলের কর্মকাণ্ডের মর্মপোলব্ধি করতে না পেরে মনে করেন হ্যাভেল শিল্পবিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ভাঙতে ও তাঁদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছেন। শত বিরোধিতা সত্ত্বেও হ্যাভেল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করে ভারতবর্ষের শিল্প ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা যদি চিত্রাঙ্কনের দিকে ঝোঁকে তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে আগ্রহ জন্মাবে।

ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় শিল্পের প্রতি যে মোহান্ধতা সৃষ্টি হয়েছে তা প্রভাবশালী কোন ভারতীয় শিল্পীর কর্মকাণ্ডের দ্বারাই মোচন করা সম্ভব জেনে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আহ্বান জানান।[৭৯] ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর (১৮৫০-১৯৪১) মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হ্যাভেলের পরিচয় হওয়ার পর তিনি ভারতীয় আদর্শে চিত্ররচনায় অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেন এবং কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হন।[৮০] হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের যখন পরিচয় হয় তখন অবনীন্দ্রনাথ সবেমাত্র ভারতীয় রীতিতে চিত্ররচনার কাজে হাত দিলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ্যাভেল নিজ আদর্শ রূপায়ণের সমস্ত গুণই অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে পেলে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন।[৮১]

১.২.২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পবিদ্যালয়ে যোগদানের প্রথম দিনেই অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেল নির্মিত ছোট আর্ট গ্যালারিতে তিনি প্রাচ্য কলারীতির নিদর্শন দেখে আপ্লুত হন। তিনি উপলব্ধি করেন পুরাতন ছবিতে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে থাকলেও ভাবের অভাব রয়েছে। তাঁর পূর্বসূরীরা যা দিতে পারেননি তা তাঁকে দিতে হবে মনস্থির করে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সঙ্গে চৈনিক শিল্পশাস্ত্র, জাপানি শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। রঙ-রেখা নিয়ে গবেষণায় তিনি উপলব্ধি করলেন রঙ ও রেখার তাৎপর্য অনেক গভীরে নিহিত। তাই আজীবন তাঁর রেখাপ্রধান চিত্রগুলি বুদ্ধিরদীপ্তি এবং ভাবপ্রধান চিত্রগুলিতে রঙের মায়াজাল বিস্তার হতে দেখা গেল।[৮২] তবে চিত্র রচনার প্রথমদিকে অবনীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ইউরোপীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথ ও কাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলকাতার একাডেমিক নিয়মের দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী ছিলেন।[৮৩] বালক বয়সে পিতার হাতে আঁকা ছবি দেখার বা তাঁর কাছ থেকে চিত্রবিদ্যা শেখার কোন সুযোগ অবনীন্দ্রনাথ না পেলেও নিজের আগ্রহে পিতার রঙ-তুলি, পেন্সিল চুরি করে তিনি ছবি আঁকতেন। পিতার শখের বাগানের ফুল, ফল, পশু, পাখি, আভিজাত্যপূর্ণ ঠাকুরবাড়ির কারুকার্যমণ্ডিত আসবাব পত্রের মধ্যে পেলেন ছবি আঁকার রসদ।[৮৪] বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তাঁর চিত্রাঙ্কন শুরু। ছবি আঁকার প্রতি নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) *স্বপ্ন-প্রয়াণ*-এর (১৮৭৫)

জন্য আঁকা দুটি চিত্র তাঁর নিজস্ব কলারীতির প্রথম সৃষ্টি। বিষয়ের রূপায়ণ, চিত্রায়ণ ও কম্পোজিশনের দিক থেকে ছবি দুটি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের সূচনা স্বরূপ ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে আছে। এরপর তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বধূ' ও 'বিম্ববতী' কবিতা দুটির চিত্ররূপ দেন।[৮৫] ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে নিজ গৃহে ওলিন্টো গিলার্ডির (১৮৪৮–১৯৩০) কাছে প্রকৃত অর্থে চিত্রশিক্ষা করার সুযোগ পান। তাঁর কাছে নিসর্গ চিত্র, প্রতিকৃতি চিত্র, প্যাস্টেল[৮৬] ও তেলরঙে ছবি আঁকা শেখেন। তেলরঙের কলা কৌশলে আরো দক্ষতা অর্জন করতে মিঃ সি. এল. পামারের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। জীবন্ত মডেল বসিয়ে চিত্রাঙ্কনে তিনি দক্ষতা অর্জন করলে পামার প্রাণির অন্তর্গঠনের শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে মড়ার মাথার খুলি এনে তাঁকে আঁকতে দিলে ভয়মিশ্রিত বীতশ্রদ্ধায় তাঁর চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ইতি ঘটল।[৮৭] পরে জলরঙে ছবি আঁকা শিখতে তিনি আবার পামারের কাছে গেলে অনতিবিলম্বে নিসর্গ চিত্র রচনার করণ-কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেন। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিত্রগুলি পাশ্চাত্য কলারীতি শিক্ষণের সাক্ষ্য দেয়। পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি আঁকা চললেও তিনি অন্তরের তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। এসময় তাঁর প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪–১৮৪৬) লাইব্রেরিতে একটি সচিত্র পাণ্ডুলিপির মধ্যে মুঘল চিত্ররীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটায় তাদের কারুকলা ও বর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হন।[৮৮] তারপর তাঁর ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮১৯–১৮৫৮) মিসেস ফ্রানসিস মার্টিনড্যালের দেওয়া একটি সচিত্র কবিতার বইয়ের পাতার চারিদিকে আইরিশ মিনিয়েচরের আদর্শে আঁকা লতাপাতার নক্সা, ছবি, কাব্যচরণের অক্ষরবিন্যাস দেখে অবনীন্দ্রনাথ মোহিত হন।[৮৯] প্রায় সমসাময়িক সময়ে ভগ্নীপতি শেষেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের থেকে দিল্লির নানা রূপচিত্র সম্বলিত একটি পার্শিয়ান ছবির বই উপহার পান। দেশীয় ও ইউরোপীয় চিত্রের নিদর্শনের মধ্যে তিনি কোন তফাৎ খুঁজে না পেয়ে উপলব্ধি করেন দুই দেশের প্রাচীন চিত্রকলার গোড়ার কথা এক। এই সমস্ত ঘটনাবলির তরঙ্গ বিক্ষেপে তিনি পাশ্চাত্য রীতির অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে নতুন পথে, নতুনভাবে চিত্র রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথম দিকে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় চিত্ররীতির অনুবর্তী হয়ে কাজ শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে বৈষ্ণব পদাবলির চিত্র রূপায়ণের সময় অনুভব করেন চিত্রপটের পরিবেশ ও বস্তুবিন্যাসে বিদেশি প্রভাব এসে পড়েছে। তাই তিনি তৃপ্ত হতে না পেরে ছবিতে সোনা লাগানো বা অন্য নানা উপায়ে দেশি পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শিখে আবার মন দেন বৈষ্ণব পদাবলি রূপায়ণের কাজে।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বুদ্ধচরিত্র' আঁকার পর তাঁর কাছে ছবিগুলি প্রাণহীন মনে হওয়ায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে অন্তরের উপলব্ধিকে স্থান দেন।[৯০] তখন স্বদেশিযুগের বাতাবরণে অবনীন্দ্রনাথ ভাবতে শুরু করেন – 'দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্য কিছু করতে হবে।'[৯১] স্বদেশি ভাবনায় ওয়াশ পদ্ধতিতে[৯২] আঁকা অন্ন বস্ত্র বরাভয় হাতে ভারতমাতার চিত্রটি ভারতশিল্পের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে। 'ছবি দেশী মতে ভাবতে হবে, দেশী মতে দেখতে হবে'[৯৩] একথা মনে করে বিলিতি পোর্ট্রেট আঁকা একেবারেই ছেড়ে দিয়ে দেশে যা কিছু নিজের শিল্প আছে, সমস্ত কিছু সন্ধান শুরু করেন। শিল্পবিদ্যালয়ে যোগদানের পরে হ্যাভেলের উৎসাহে তিনি জয়পুররীতিতে টালির উপরে চিত্র রচনা করেন। জাপানি কলাবিদ ওকাকুরা কাকুজোর উদ্যোগে ইওকোয়ামা টাইকান, হিশিদা সুনসো ও পরবর্তীতে যোশিও কাৎসুতার মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি ও জাপানি চিত্ররীতি, আঙ্গিক পদ্ধতির আদান প্রদান ঘটে। জাপানি ওয়াশ পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর সৃজনশীল মনন ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব 'ওয়াশ টেকনিক' বা 'ধৌত পদ্ধতি'। পরতে পরতে রঙের বিচিত্র প্রয়োগে, স্পষ্ট রূপের অন্তরালে অস্পষ্ট রূপাভাসে ছবিগুলি রহস্যময় হয়ে ওঠে। ওমর খৈয়াম (১৯০৮–১৯১০) সিরিজের ছবিগুলি অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।[৯৪] 'আঁখি পাখি ধায়' 'পুরীর পুরন্ধ্রী', 'প্রসাধনরতা', 'কাজরী নৃত্য', চৈতন্যলীলা বিষয়ক কয়েকখানি চিত্র এবং একগুচ্ছ নিসর্গ চিত্রে উড়িষ্যা ভ্রমণের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। অবনীন্দ্রনাথ বরাবরই নানা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন, তাই ওড়িশি টাপই ছবিগুলি একটা পর্যায়ে রচিত হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং, মুসৈরী, রাঁচি, সাহাজাদপুর ভ্রমণের নিসর্গ চিত্রগুলিতে ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর নিজস্বতা মিশে রইল। 'গজদন্ত বোধিসত্ত্ব', 'শেষ বোঝা', 'লীলাকমল', 'সমুদ্রকন্যা', 'The Dream of Freedom', 'Stagnation and Flow', 'Soul of Stone', 'Old Toys' প্রভৃতি প্রতীকধর্মী চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। তাঁর আঁকা সাঁওতাল মেয়ে ও শিকারী ছবি দুটি সমকালীন সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ করায়। এছাড়া তিনি বহু রূপকধর্মী হাস্যারসাত্মক, পশুপাখি ও মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে *আরব্য রজনীর* (১৩৪১) কাহিনি অবলম্বনে আঁকা চিত্রগুলিকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যাতে পারে। বর্ণব্যবহার বিশিষ্টতায়, বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে ছবিগুলি অভিনব হয়ে উঠেছে। ১৯৩৮ খিস্টাব্দ নাগাদ পটধর্মী

চিত্ররচনায় মনোনিবেশ করলে চণ্ডীমঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের কাহিনি চিত্রায়ণে তার প্রভাব লক্ষিত হয়।[৯৫] অবনীন্দ্রনাথ জীবনের অন্তিম পর্যায়ে কাঠকুটো ও পরিত্যক্ত নানারকমের বস্তুসমূহ দিয়ে তৈরি করেন নানা চরিত্র। সেই অভিনব সৃষ্টিরাজির নাম দেন 'কুটুম-কাটাম'।

১৯০৫ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের যোগদানের পর শিল্পবিদ্যালয়ে ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষাদানের জন্য সৃষ্ট বিভাগে নতুন শিক্ষাদর্শ ও অভিনব শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাদান হতে থাকে। হ্যাভেলের উদ্যোগে অবনীন্দ্রনাথ দেশি ভাবনা ও রীতিতে নতুন চিত্রশৈলী উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় কলা-সংসদ'-এর (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ জুন) সম্পাদক হন। হ্যাভেলের পদত্যাগের পর শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের (১৮৭২-১৯৫৫) সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পবিদ্যালয় থেকে ইস্তফা দিয়ে 'Indian Society of Oriental Art'-এ (১৯০৭) সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯৬৪-১৯২৪) অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদে তিনি যোগদান করলে তাঁর শিল্প জীবনে আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা হয়। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য –

> তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।'[৯৬]

১.২.৩ Indian Society of Oriental Art

হ্যাভেলের প্রস্তাব অনুযায়ী অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার সি. এফ. লারমারের বাড়িতে গঠিত একটি সোসাইটিতে অবনীন্দ্রনাথ ও নর্মান ব্লান্ট (১৮৭৭-১৯৪১) যুগ্মভাবে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথ পরে সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথমে সোসাইটির কয়েকজন সভ্যের পক্ষ থেকে সোসাইটির 'Oriental Art Society' প্রস্তাব করা হলেও অবনীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে সোসাইটির নাম হয় 'Indian Society of Oriental Art'।[৯৭] ওপর একটি সূত্রে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮) সোসাইটির নামকরণ করেছেন বলে দাবি করা হয়।[৯৮] সোসাইটির প্রারম্ভিক লগ্নে গগনেন্দ্রনাথ,

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৫৩), সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৫১) , সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০), জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৬), আশুতোষ চৌধুরি (১৮৬০-১৯২৪), অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৭৪) প্রমুখ স্বনামধন্য ভারতীয় ব্যক্তি, বিদেশি কলারসিক, শিল্পী ও শিল্পপ্রেমী মানুষজন ছাড়াও সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, জজ, ব্যারিস্টার, রাজা-মহারাজা, অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় এই আর্ট সোসাইটি ইঙ্গ-বঙ্গ শিল্প কলারসিক ও শিল্পীদের মিলন স্থল হয়ে ওঠে। সোসাইটি তার সদস্যদের সংগৃহীত দুর্মূল্য প্রাচ্য কলাশিল্পের নিদর্শনগুলি সদস্য ও সর্বসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরা, শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা, বক্তৃতা দান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যশিল্প বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চার ও আগ্রহ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কলকাতার জাদুঘরে সোসাইটি আয়োজিত প্রদর্শনীতে জন উডরফ (১৮৬৫-১৯৩৬) সংগৃহীত একগুচ্ছ জাপানি চিত্রের প্রতিলিপি ছাড়াও ওকাকুরা, টাইকান, হিসিদা সুনসো, কাটসুটা, কিমুরা বুজান, ওটাকে চিকুহা প্রমুখ ভারতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত জাপানি শিল্পী; অবনীন্দ্রনাথ, যামিনীপ্রকাশ, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (?-১৯০৯), নন্দলাল বসু, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি প্রমুখ বাঙালি শিল্পীর ছবি এবং ভারতের নানা প্রদেশের ধ্রুপদী শৈলীর ছবি এবং বহু কারুসামগ্রী প্রদর্শিত হয়।[৯৯] সোসাইটির মুখ্য কার্যাবলি হিসাবে প্রতিবছর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আয়োজিত প্রদর্শনীতে মূলত অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্র প্রদর্শন ছাড়াও ভারতশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি স্থান পায়। কলকাতায় আয়োজিত প্রদর্শনীর সফলতায় এবং দেশি বিদেশি শুভাকাঙ্খীদের প্রচেষ্টায় এলাহাবাদ, মাদ্রাজে এমনকি বিদেশেও সোসাইটির প্রদর্শনী হয়। প্রতিভাধর শিল্পীদের ছবির প্রতিলিপি মুদ্রণ করে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ ও দেশ বিদেশে সেই ছবিগুলির প্রচার একসময় সোসাইটির কার্যাবলির অংশ হয়ে ওঠে। বিদেশে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রচারে জাপানের বিখ্যাত কলা পত্রিকা *কোক্কা*য় সর্বপ্রথম ভারতীয়দের, বিশেষ করে নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদের ছবি মুদ্রিত হয়। পরে লন্ডনের কার্ল হেনশচেল ও এমেরি ওয়াকারের মুদ্রণযন্ত্রে উৎকৃষ্টমানের ছবি ছাপা হয়। হ্যাভেল, আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী (১৮৭৭-১৯৪৭), লর্ড রোনাল্ডসে (১৮৭৬-১৯৬১) দেশে বিদেশে বক্তৃতাদান ও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ও. সি. গাঙ্গুলির সম্পাদনায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সোসাইটির মুখপত্র *রূপম* প্রকাশিত হলে সেখানে সোসাইটির কার্যপ্রণালী ও

শিল্পীদের সৃষ্টকর্ম বিষয়ক লেখা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্প বিশারদ ও পণ্ডিতদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়।[১০০] সোসাইটির তরফ থেকে দেশ বিদেশের কলাবিষয়ক পত্র-পত্রিকা কিনে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করার প্রথা ছিল। সেসব পত্রিকা ও অন্যান্য নানা মূল্যবান গ্রন্থ, চিত্র ও কারুকলা সামগ্রী সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রয়াস সদস্যদের মধ্যে প্রথম থেকেই দেখা যায়। এছাড়া সোসাইটির তরফ থেকে ভারতের বিভিন্ন শিল্পকীর্তি ও প্রদর্শশালা অনুশীলনের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। সোসাইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করে লেডি হ্যারিংহামের কাজে সাহায্য করার জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে অবনীন্দ্র-শিষ্য অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪), নন্দলাল বসু, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৭-১৯৬৪) প্রমুখ শিল্পীদের অজন্তা ভ্রমণে প্রেরণ।[১০১] সোসাইটির শিল্পশিক্ষা বিভাগটির শিক্ষাপদ্ধতি অবনীন্দ্র রীতিতে চলতে থাকে। কোন বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ বা শিক্ষান্তে ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় না। বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিক্ষার্থীদের সারা বছরের রচনাবলি দেখে শিল্পরসিকদের প্রশংসা সমালোচনা ও ছবি কেনবার আগ্রহই হল শিল্পীর সাফল্যের স্বীকৃতি। সেখান থেকে এভাবেই শিক্ষালাভ করে পরবর্তীকালে প্রতিভাবান শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা পেতে শিক্ষার্থীদের কারোর কোন অসুবিধা হয়নি।[১০২] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগতভাবে যে নব্যকলারীতির জন্মদান করেছিলেন সোসাইটির মাধ্যমে তার বিস্তার ঘটে। বিংশ শতাব্দীর তিনটি দশক জুড়ে সোসাইটির বহুমুখী কর্মকাণ্ড নব্যবঙ্গীয় কলারীতির প্রসার প্রচার ও চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.২.৪ অবনীন্দ্র শিষ্য-প্রশিষ্য ও নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতি

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতি সমগ্র ভারতবর্ষে এমনকি বিদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পবিদ্যালয়ে যোগদানের কিছুদিন পর সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এরপর, অসিতকুমার, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৭৫), কে ভেঙ্কটাপ্পা (১৮৮৬-১৯৬৫), সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে (১৮৯০-১৯৭১), হাকিম মহম্মদ খান, শমী উজ্জামা, দেবীপ্রসাদ, রূপ কৃষ্ণ (১৯০১-১৯৬৮) ও আরো অনেকে অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্প বিভাগে এসে ভর্তি হন। 'Indian society of Oriental Art'-এ ও ব্যক্তিগতভাবে অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে যাঁরা

শিক্ষাগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সারদা উকিল (১৮৮৮–১৯৪০), রণদা উকিল (১৯০০–১৯৭০), মুকুল দে (১৮৯৫–১৯৮৯), বীরেশ্বর সেন (১৮৯৭–১৯৭৪), চারু রায় (১৮৯০–১৯৭১), সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯২–১৯৭০), চিন্তামণি কর (১৯১৫–২০০৫), প্রাণকৃষ্ণ পাল (১৯১৫–১৯৮৮) প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পী।[১০৩] অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন হিন্দু শাস্ত্রের দেবদেবীর উৎকৃষ্ট ছবি তেমনভাবে নেই। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে (বিশেষত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি ও নন্দলাল বসু) যমরাজ, অগ্নিদেবতা ইত্যাদি বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কনের জন্য আদেশ দিলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর ছাত্ররা দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কনে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যান। অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি ও কল্পনার বিকাশ না হলে শিল্প প্রতিভা বিকশিত হয় না। তাই শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্রদের রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ কাহিনি ইত্যাদি নিয়িমিত শোনা ও পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখা ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যবস্থা করে দেন।[১০৪] গুরুদের কাছে শোনা গল্প ও মঞ্চস্থ নানা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর ছাত্ররা একের পর এক অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি করেন। অবনীন্দ্রনাথ গতানুগতিক চিত্ররীতির অন্ধ অনুকরণের বদলে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ছবিকে সমৃদ্ধ করার আদর্শকে তিনি তুলে ধরেন। ফলে তাঁর ছাত্ররা প্রত্যেকেই অবনীন্দ্র ছায়ায় থেকেও নিজ ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল হয়ে নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনকে প্রসারিত করেন। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন প্রদেশের কলাশিক্ষালয়ে অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পধারাকে সর্বভারতীয় করে তোলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য নন্দলাল Indian Society of Oriental Art, ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রায় শিক্ষকতা ও পরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যক্ষের পদ অলকৃত করেন। অসিতকুমার জয়পুর মহারাজের আর্ট স্কুল ও লক্ষ্ণৌ এর সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষরূপে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। দেবীপ্রসাদ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের সরকারি আর্ট স্কুলে প্রথমে উপাধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। শৈলেন্দ্রনাথ Indian Society of Oriental Art, বারাণসী ও জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সমরেন্দ্রনাথ লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্ট-এ কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা বিভাগের অধীনে শিক্ষকতা করেন। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮–১৯৬৮) শ্রীলঙ্কায় শিক্ষকতা করতে যান।

এছাড়া যেসব ছাত্ররা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে এসেছিলেন তাঁরাও নিজ প্রদেশে ফিরে এই নব্যকলারীতি প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এইভাবে পশ্চিমভারত বাদে সমগ্র ভারতবর্ষে অবনীন্দ্রনাথ উদ্ভূত নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতি গৌরবোজ্জ্বল শিখরে পৌঁছে যায়।[১০৫]

১.২.৫ নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতি ও বিদেশি সংসর্গ

জাতীয়তাবোধ উন্মেষকালে ভারতীয় ভাবধারার আবেগে মথিত ভারতবাসীর কাছে নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতি দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এই ভাবধারার অগ্রগতিতে কয়েকজন বিদেশি শিল্পী ও শিল্পরসিকদের অবদান অবিস্মরণীয়।

ক) জাপানি শিল্পী

নব্যকলারীতির জন্মলগ্নে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দকে (১৮৬৩–১৯০২) জাপানের বিশ্বধর্ম সম্মেলনে নিয়ে যাবার অনুরোধ নিয়ে প্রথমে কলকাতায় আসেন সেখানকার বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাবিশেষজ্ঞ ওকাকুরা। চিন, জাপান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিল্পবিশেষজ্ঞ ওকাকুরা ওইসমস্ত শিল্পের উৎসভূমি ভারতবর্ষের শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ করতে চেয়েছিলেন এবং সৌভাগ্যের বিষয়, একেবারে সূচনায় তিনি বিবেকানন্দের বিশাল উজ্জ্বল দৃষ্টির আলোকলাভ করেছিলেন।[১০৬] তিনি টোকিয়োর শিল্পবিদ্যালয়ে পশ্চিমি প্রথাগত শিল্পশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে সম মতাবলম্বীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'নিপ্‌পোন বিজুৎসু ইন্‌' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাচ্য আদর্শে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন করতে তিনি প্রাচ্যদেশগুলি ভ্রমণ করতে শুরু করেন। কলকাতার ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে আসেন এবং বাংলার শিল্প আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন।[১০৭] প্রাচ্য আদর্শে রচিত জাপানি শিল্পকলার জাপানি চিত্রের মূল ভিত্তি ভারতেই রয়েছে তা তিনি স্পষ্ট করেন। তাঁর মতে –

> চিন ও জাপান যদি দক্ষিণ উপদ্বীপের (ভারতবর্ষ) উদ্দীপনাময় প্রভাব থেকে বঞ্চিত হতো, তাহলে এই দুটি দেশের শিল্পবৃত্তি অবশ্যই বলবীর্যহীন হয়ে পড়ত।[১০৮]

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবাসীদের মধ্যে স্বদেশকে চেনার প্রচেষ্টা শুরু হয়। অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রাঙ্কন ও চিত্রভাবনা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ওকাকুরা টাইকান ও হিশিদাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এঁরা এদেশের শিল্পীদের জাপানি কলাকৌশল শেখাতেন আর অবনীন্দ্রনাথ এঁদেরকে নানা পৌরাণিক কাহিনি, শাস্ত্রমতে দেবদেবীর মূর্তিরহস্য ও রূপ বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে তাঁরা জাপানি পদ্ধতিতে সিল্কের উপর ছবি আঁকতেন।[১০৯] অবনীন্দ্রনাথ দেখতেন তাঁরা কোথা থেকে একটু কয়লার টুকরো কুড়িয়ে এনে সেটা দিয়ে প্রথমে সিল্কের উপর এঁকে, তারপর পালক দিয়ে ঝেড়ে তার উপরে একটু হালকা কালি বুলিয়ে দিয়ে চমৎকার চিত্ররচনা করেন।[১১০] এঁদের পর ইয়োকোইয়ামা ও কাৎসুতা ভারতবর্ষে এসে নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতিকে সমৃদ্ধ করেন। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা জাপান থেকে আগত এইসব শিল্পীদের থেকে সিল্কের উপর হালকা কালি দিয়ে ছবি আঁকা শিখে নেন। অবনীন্দ্রনাথ এই রীতিতে খুব বেশি কাজ না করলেও লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ, ও. সি. গাঙ্গুলি, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা এই নতুন কাজে উচ্চাঙ্গের সব ছবি আঁকেন।[১১১] অবনীন্দ্রনাথ টাইকানের থেকে ভারতীয় রীতিতে তাড়াতাড়ি লাইন টানার বদলে ধীরে লাইন টেনে লাইন ড্রইং এবং ওয়াশ টেকনিক শেখেন। তিনি এই সম্পর্কে বলেন –

> ...টাইকানের ছবি আঁকা দেখে দেখেই একদিন আমার মাথায় এল, জলে কাগজ ভিজিয়ে ছবি আঁকলে হয়। টাইক্কানকে দেখতুম ছবিতে খুব করে জলের ওয়াশ দিয়ে ভিজিয়ে নিত। আমি আমার ছবিসুদ্ধ কাগজ দিলুম জলে ডুবিয়ে। তুলে দেখি বেশ সুন্দর এফেক্ট হয়েছে। সেই থেকে ওয়াশ প্রচলিত।[১১২]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত এই ওয়াশ টেকনিকে ছবি আঁকা নব্যবঙ্গীয় রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাই ভারতবর্ষে আসেন। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ‘বিচিত্রা’য় বেশ কিছুকাল শিক্ষকতা করে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ, মুকুল দে, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮–১৯৬১), প্রতিমা দেবীকে (১৮৯৩–১৯৬৯) জাপানি চিত্রাঙ্কন বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।[১১৩] এইভাবে জাপানি শিল্পীদের সাহায্যে জাপানি চিত্ররীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির মেলবন্ধন ঘটে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

খ) স্টেলা ক্রামরিশ

অস্টিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন শিল্পতাত্ত্বিক স্টেলা ক্রামরিশ (১৮১৬-১৯৯৩) ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে Oriental Seminar Library-র পুঁথিপত্রে প্রাচ্য সংস্কৃতির সন্ধান পেলে তা নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের Oxford University-তে তাঁর ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতায় মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভারতবর্ষে আসার জন্য আহ্বান জানালে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনে পশ্চিমী গথিক[১১৪] থেকে দাদাইজম[১১৫] বিষয়ে মোট তেতাল্লিশটি বক্তৃতা দেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের মেলবন্ধন বিষয়ে Indian Society of Oriental Art-এ বক্তৃতা দেন। তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ১৯২৩ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন।[১১৬] স্টেলার সুচিন্তিত বক্তব্য ও গ্রন্থাবলি ভারতশিল্পের এই নব যাত্রায় যথেষ্ট সাহায্য করে।

গ) ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) আন্তরিকভাবে ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের কলাশিল্পকে ভালোবেসেছিলেন। তিনি নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের 'বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক' ছিলেন।[১১৭] তাঁর ভারতশিল্পবোধ স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত।[১১৮] ভারতীয় দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনির চিত্রায়ণ নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদের শিল্পরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। নিবেদিতা চিত্রাঙ্কনের সেই সমস্ত বিষয়বস্তুর মর্মব্যাখ্যা ও দেবদেবীর ভাবভঙ্গি শিল্পীদের বুঝিয়ে দেন।[১১৯] শিল্পীদের রচিত চিত্র সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও বিশ্লেষণ, নব্যবঙ্গীয় শিল্পশৈলীকে শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে পরিচিত করেছে। অপরপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যরা নিবেদিতার বইয়ের জন্য ছবি এঁকেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যদের অজন্তা ভ্রমণে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সর্বজ্ঞাত। নিবেদিতা চাইতেন অবহেলিত ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুত্থান ঘটুক। তাই তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্রদের কাছে ডেকে অনুপ্রাণিত করেন এবং ভারতশিল্পের স্বরূপ তাঁদেরকে বোঝান। ভারতশিল্পের নবজাগরণকালে যে

সমস্ত বিদেশি শিল্পী ও শিল্পপ্রেমিক শিল্প আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতার সঙ্গে তাঁদের সকলের সুমধুর সম্পর্ক ছিল। নিবেদিতা ওকাকুরার *Ideal of the East* (১৯০৪) গ্রন্থটি লিখতে সাহায্য করেন। হ্যাভেল স্বদেশে ফিরে যাবার পর ভারতশিল্প সম্পর্কে যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই সম্পর্কে নিবেদিতার প্রশংসা বাক্য শোনা যায়। তিনি আনন্দ কুমারস্বামীর প্রথম গ্রন্থের সামালোচনা লেখেন। প্রাচ্যশিল্পের প্রতি কুমারস্বামীর দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি মুগ্ধ হলেও রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৩) *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় একজন নিয়মিত শিল্পসমালোচক ছিলেন। এই পত্রিকায় প্রথমদিকে রবিবর্মার ছবির প্রতিলিপি বা ওই জাতীয় অন্যান্য ছবি ছাপা হলে তিনি তার বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে ওই ধরনের চিত্রগুলি ভারতীয়রীতির নয়, পাশ্চাত্যরীতিকেও সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করতে অক্ষম। তিনি এই পত্রিকার জন্য উৎকৃষ্ট মানের বিদেশি ছবির প্রতিলিপি আনিয়ে, ভারতশিল্প সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেন।

ঘ) আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী

কুমারস্বামী বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কুমারস্বামী বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও শিল্পের প্রতি সহজাত আকর্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে শ্রেষ্ঠ কলাশিল্প সমালোচকের সম্মান এনে দেয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নিদর্শনগুলি তিনি তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন এবং ভারতশিল্পের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন।[১২০] ভারতশিল্পকে গ্রিকশিল্পের অনুকরণরূপে প্রতিভাত করার যে চেষ্টা বিদেশি শিল্প সমালোচকদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছিল কুমারস্বামী সেই দাবিকে যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেন। Copenhagen Congress of Orientalists-এ ভারতশিল্পের মৌলিক গুণ ও আদর্শের পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। তাঁর মতে বুদ্ধের ধ্যানী অথবা দণ্ডায়মান মূর্তি কল্পনা, মুদ্রা প্রয়োগ সমস্ত কিছুই ভারতবাসীর অন্তরের সৃষ্টি; তার মধ্যে গ্রিস দেশীয় দেবদেবীর প্রতিরূপ খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা।[১২১] তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপীয় সমালোচকরাও ভারতশিল্পকে হীনদৃষ্টিতে না দেখে তার মহান আদর্শ ও ব্যাপকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। Dawn Society ও National council of Education-এর উদ্যোগে তিনি স্বাদেশিকতা, জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পকলা

সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন।[৬৯] জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংগ্রহশালায় রাজপুত, মুঘল ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পুঁথিচিত্র ও কারুশিল্পের অ্যালবামগুলি নন্দলাল বসুর সহযোগিতায় ক্যাটালগ আকারে প্রকাশ করেন। ভারতশিল্প সম্পর্কে সংগৃহীত নানা তথ্য, অজস্র ফটোগ্রাফ ক্রমান্বয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।[১২২]

১.২.৬ নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন ও স্বদেশি সংসর্গ

ক) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে শিল্পী না হলেও *প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ* পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনকে ও এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের শিল্পপ্রচারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই দুটি পত্রিকা ছাড়াও তিনি *ধর্মবন্ধু, দাসী, প্রদীপ* এবং *মুকুল* পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সঠিকভাবে বলতে গেলে, *প্রবাসী*-র মধ্য দিয়ে নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদের চিত্রবিদর্শনকে তিনি নাতিশিক্ষিত ও শিক্ষিত বাঙালির ঘরে-ঘরে বহন করে নিয়ে যান, এবং *মডার্ন রিভিউ*-এর মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালি, ভারতবাসী, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহী বিদেশিদের কাছেও পৌঁছে দেন।[১২৩] তাঁর পত্রিকায় নবীন শিল্পীদের ছবি, নিবেদিতা, কুমারস্বামী, সি. এফ. এন্ড্রুজ (১৮৭১–১৯৪০), অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পবিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ ছাপা হয়। তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায়, তাঁর প্রকাশিত *রামায়ণ-মহাভারত গ্রন্থে*, অ্যালবাম রূপে ছবি ছেপে নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদেরকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন।[১২৪] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ইন্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচারকরূপে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।[১২৫]

খ) অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতির অন্যতম শিল্পী, বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক ও অধ্যাপক। আশৈশব তিনি শিল্পের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন।[১২৬] ভগিনীপতি অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাশ্চাত্যরীতির শিল্পশিক্ষালাভ কালে ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণালাভের কোন সুযোগ পাননি। *স্টুডিও* পত্রিকায় প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার নিজস্ব বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ভাষা, পদ্ধতির আভাস পান এবং ভারতীয় চিত্রশিল্পের

ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বন্ধে তীব্র কৌতুহলের উদয় হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন চিত্রপদ্ধতি ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার রূপরহস্য আলোচনা, ইতিহাস আবিষ্কারে ব্রতী হন।[১২৭] পরবর্তীকালে প্রাচীন মধ্যযুগীয় মূর্তি, চিত্র, কারুকলার সামগ্রী, নব্যচিত্রকলার সামগ্রী, দুষ্প্রাপ্য এবং সমসাময়িক দেশি বিদেশি গ্রন্থের সমাহারে গড়ে তোলেন নিজস্ব সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার। ভারতশিল্প সম্পর্কে তাঁর লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালা চিত্রসাহিত্য ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।

১.২.৭ নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনে রবীন্দ্র-ছায়ায় লালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

ক) বিচিত্রা

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের উদ্যোগে আনুমানিক ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান 'বিচিত্রা' গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানটি বেশিরভাগ জায়গাতে 'বিচিত্রা ক্লাব', কোথাও 'বিচিত্রা সভা', Bichtra School of Art and Crafts ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিতি পায়। প্রতিষ্ঠানটিকে মাত্র দু-তিন বছরের জন্য প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী হলেও 'বিচিত্রা'র অবদান অবিস্মরণীয়। সাহিত্যপাঠ, সঙ্গীতচর্চা, নাট্যচর্চা, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা এবং নব্যবঙ্গীয় শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিভাশীল শিল্পীদের দ্বারা শিল্পশিক্ষা দান 'বিচিত্রা'র বহুমুখী কাজকর্মগুলির মধ্যে অন্যতম। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে, সুরেন কর ও জাপানের খ্যাতনামা শিল্পী কাম্পো আরাই, কাসহারা, দক্ষিণভারতীয় শিল্পী ধনুষ্কোটি আচার্য প্রমুখ শিল্পীরা 'বিচিত্রা'য় শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হন। মূলত চিত্র-ভাস্কর্য চর্চার সঙ্গে পিতল, কাঠ, বাঁশ, সূচের কাজ ও লিথোগ্রাফি শেখানো হয়। এখানেই প্রথম স্টুডিয়ো ভিত্তিক শিল্পশিক্ষা এবং সহ-শিক্ষার প্রচলন হয়। এখান থেকে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি অ্যালবাম *অদ্ভুত লোক* (১৯১৭) ও *নব হুল্লোড়* (১৯২১) প্রকাশিত হয়।[১২৮] 'বিচিত্রা'র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও নানা কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়।

খ) কলাভবন

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকে বাস্তবায়িত করতে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হলে পড়াশোনার সঙ্গে ছবি আঁকা, গান, অভিনয় আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথমদিকের

শিল্পশিক্ষক ছিলেন ওঁকারানন্দ, সন্তোষচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ আইচ, অসিতকুমার হালদার।[১২৯] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ‘বিচিত্রা’ বন্ধের পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষা বিভাগ ‘কলাভবন’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। অতীতের পুনর্জাগরণ ও শিল্প আন্দোলন ভারতীয় সমাজের উপরিতল ও জীবনের এক ছোট অংশকে স্পর্শ করেছিল বলে তাঁর মনে হয়। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধের ঊর্দ্ধে বিশ্বজ্ঞানের সঙ্গে একাত্মবোধ ও জীবনবিকাশের উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় শিল্পশিক্ষার আদর্শকে সমকালের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে, স্বদেশের বিস্মৃত শিল্প-সংস্কৃতিকে পুনঃজাগরিত করতে গড়ে ওঠে ‘কলাভবন’।[১৩০] দেশ-বিদেশের অসংখ্য আর্টের বই, পত্র-পত্রিকা, ছবির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে কলাভবনের ছাত্রদের প্রথম থেকেই মুক্ত মানসিকতা গড়ে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে দেশ বিদেশ থেকে শিল্পী ও শিল্পসমালোচকরা শান্তিনিকেতনে আসেন আলাপ আলোচনা ও ভাবনা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে।[১৩১]

গ) বিচিত্রা স্টুডিও

বোলপুর শান্তিনিকেতনে কলাভবনে প্রতিমা দেবী ও ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলের তত্ত্বাবধানে ‘বিচিত্রা স্টুডিও’ নামে ব্যবহারিক ও কারুশিল্পের একটি বিভাগের প্রচলন হয়। শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রাম থেকে লোকশিল্পীদের এনে তাঁদের কাছ থেকে কাজ শেখা এবং কাজ শেখানো কাজ শেখানো উভয়ই চলত। এইসব লোকশিল্পীদের কাজের জন্য অর্ডার সংগ্রহ করে তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলা হত এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।[১৩২] ‘বিচিত্রা স্টুডিও’ই বৃহত্তর রূপ পায় ‘শিল্পসদন’ নামক প্রতিষ্ঠানে।

ঘ) কারুসঙ্ঘ

ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা ও অর্থ উপার্জনের চিন্তা থেকেই নন্দলাল বসু কারুসঙ্ঘের পরিকল্পনা করেন। তিনি বুঝেছিলেন একসঙ্গে জোটবেঁধে সমবায় ভিত্তিতে বিকল্প পরিবেশে চারুশিল্পকে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর করে তোলাই শিল্পচর্চাকে জীবন্ত রাখার একমাত্র উপায়। তাঁর ছাত্র প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়ের (১৯০৪–১৯৮৭) দান করা অর্থে কারুসঙ্ঘের জন্য পাঁচবিঘা জমির উপর সঙ্ঘের কাজ শুরু হয়।[১৩৩] কারুসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্যের একটি ছিল একটি শিল্পী-উপনিবেশ গড়ে

তোলা, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে সম্মিলিত শিল্পচর্চার পরিবেশ গড়ে তোলা যাবে। অপর উদ্দেশ্যটি ছিল অর্ডার অনুযায়ী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা এবং সদস্যদের জন্য একটি সাধারণ অর্থভানণ্ডার গড়ে তোলা।[১৩৪] ছবি আঁকা, পুস্তক অলংকরণ, প্রাচীরচিত্র, মূর্তিনির্মাণ, সূচীশিল্প, বাটিকের কাজ, বাসন গয়না আসবাব ও গৃহসজ্জার বিভিন্ন দ্রব্যের ডিজাইন তৈরির অর্ডার নেওয়া হতে থাকে এই প্রতিষ্ঠানে।[১৩৫] প্রভাতমোহন ও অন্যান্য সদস্যরা নানা জায়গায় চলে যাওয়ার পর কারুসঙ্ঘের কাজকর্মে শিথিলতা চলে আসায় পরে তা বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কারুসঙ্ঘ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারুসঙ্ঘের সঙ্গে প্রথম প্রতিষ্ঠিত কারুসঙ্ঘের আদর্শ ও পরিকল্পনার কোন মিল পাওয়া যায় না। শিল্পীদের উপনিবেশ 'Women Artist's Association, Santiniketan'-এ রূপান্তরিত হয়।[১৩৬]

ঙ) শ্রীনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লীজীবনের উন্নয়ন ভাবনার বাস্তবায়নে সুরুলে একশত বিঘে জমির উপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীনিকেতন'।[১৩৭] সংস্থাটির প্রধান লক্ষ ছিল গ্রাম পুনর্গঠন, তাই সেখানে কৃষিকাজ ছাড়াও গ্রামীণ জীবনের সৃষ্টিশীল সত্তার উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে কারুশিল্প শেখানোর ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।[১৩৮] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনিকেতনের সচিব হলে চারু ও কারুশিল্পে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদারের মতো শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যে কাপড়ে বুটিকের কাজ, নতুন নতুন নক্সা ও চামড়ার উপর অসাধারণ সব কারুকাজ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমেরিকা থেকে বই বাঁধাই ও সৌখিন মাটির কাজ শিখে আসা প্রতিমা দেবীর উদ্যোগেই 'শ্রীনিকেতন'-এ মৃৎশিল্প, বাটিক ও গালা শিল্প বিভাগ গড়ে ওঠে। সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরি কারুশিল্প শাখার চর্মশিল্প, বাটিক, গালার কাজ, বই বাঁধাই, সোনা-রূপা-মিনার কাজ, সূচীশিল্প ও এমব্রয়ডারি ইত্যাদি শিক্ষা দেবার দায়িত্ব পান।[১৩৯]

১.২.৮ নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের বিপক্ষাচরণ

বিংশ শতাব্দীতে নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন শক্তিশালী ও ব্যাপক রূপে ছড়িয়ে পড়লেও কখনই তা সর্বজনস্বীকৃত হয়নি।[১৪০] নব্যবঙ্গীয় চিত্ররীতিতে আসক্তশিল্পী গোষ্ঠীর সমান্তরালে পাশ্চাত্য একাডেমিক

রীতির চর্চা চলতে থাকে। রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত (১৮৭০-১৯২৭), যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বসু (১৮৯৭-১৯৭৭), হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৩০১-১৩৫০) ও সমসায়িক পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি অনুসারী শিল্পীদের প্রভাবে গড়ে ওঠে ভিন্ন ধারা। শিল্পবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হ্যাভেল পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির পরিবর্তে ভারতীয় শিল্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করায় রণদাপ্রসাদ ও তাঁর সঙ্গীসাথী যাঁরা পাশ্চাত্য রীতির চিত্রাঙ্কনে ইচ্ছুক তাঁরা একটি শিল্পচর্চা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। রানি ভিক্টোরিয়ার (১৮১৯-১৯০১) রাজ্য শাসনের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে নবনির্মিত এই শিল্পবিদ্যালয়ের নামকরণ হয় 'The Jubilee Art Academy'।[১৪১] নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের বিপক্ষে রণদাপ্রসাদ ও তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একাদেমি বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, বসন্ত গাঙ্গুলি (১৮৯৩-১৯৬৮), প্রহ্লাদ কর্মকার, প্রমথনাথ মল্লিক প্রমুখ।[১৪২]

বিংশ শতাব্দীতে নব্যবঙ্গীয় শিল্পচর্চার জোয়ার আসলেও পাশ্চাত্য রীতির তৈলচিত্রাঙ্কনের বলিষ্ঠ শিল্পী যামিনীপ্রকাশ নিজ পন্থায় অটল ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করার পর তিনি সেই পদ অলংকৃত করেন। তেলরঙে প্রতিকৃতি ও দৃশ্যচিত্র অঙ্কনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। নির্বাচিত কিছু রঙ ছাড়া অন্য রঙ ব্যাবহার তিনি পছন্দ করতেন না। 'Academy of Fine Arts' স্থাপনায় তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা একটি স্মরণীয় ঘটনা। চিত্রাঙ্কন করে জীবিকানির্বাহের দিশা দেখাতে শিল্পবিদ্যালয়ে তিনি বাণিজ্য বিভাগ (commercial Art) নামে নতুন বিভাগ খুলে সতীশ সিংহকে শিক্ষাদানের ভার দেন।[১৪৩]

বাংলার বাইরে পাশ্চাত্য রীতির চিত্রাঙ্কনে খ্যাতি আর্জনকারী শিল্পীদের মধ্যে অতুল বসু অন্যতম। তিনি প্রথমে রণদাপ্রসাদের শিল্পবিদ্যালয়ে, পরে কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে ও লন্ডনের Royal Academy-তে শিক্ষাগ্রহণ করেন। নিজ প্রতিভা ও পাশ্চাত্য রীতির নানা কলাকৌশল আয়ত্ত করে প্রতিকৃতি অঙ্কনে সাফল্য অর্জন করে কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং ১৯২৭-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন।[১৪৪] পাশ্চাত্য রীতির বাস্তবধর্মী চিত্রকলার চর্চাকে সুসংহত করতে 'Society of Fine Arts' (১৯২০) প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১৪৫] তিনি ২৪ বিডন স্টিটের 'Indian Academy of Art'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও তৃতীয় সম্পাদক ছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার অতুল বসুর অন্যতম বন্ধু ও সহপথযাত্রী ছিলেন। তিনি জল ও তেলরঙ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমপারদর্শি ছিলেন। কম্পোজিশন চিত্রাঙ্কন ছিল তাঁর বিশেষ পছন্দের, তবে সাধারণত পৌরাণিক বিষয় ও নারীজীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন ভঙ্গির নারীমূর্তি ছিল তাঁর চিত্রের বিষয় বস্তু। তিনি 'Indian Academy of Art'-এর (১৯১৯) প্রতিষ্ঠাতা এই শিল্পী প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র *Indian Academy of Arts* নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। সেই সময়কার নানা বাংলা মাসিক পত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়।[১৪৬]

ঐতিহ্য ও সমকালের সমন্বয়ে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সূত্রপাত ঘটলেও উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে এই শিল্প আন্দোলনের মহৎ উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। গতানুগতিকতা ও অজন্তা, মুঘল, রাজপুত শৈলীর ক্রমাগত অনুকরণের প্রভাবে শিল্প আন্দোলন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও শিল্প আন্দোলনে স্বদেশি উন্মাদনা তৎকালীন সমাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে অমুলক ছিল না। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে এই আন্দোলনের তেজ স্তিমিত হয়ে আসলেও এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের বিস্তার ঘটল আধুনিক চিত্রকলা চর্চার মধ্যেও।

১.২.৯ নব্যবঙ্গীয় বিকল্প ধারায় শিল্পচর্চা

বিংশ শতাব্দীতে এই দুই গোষ্ঠীর বাইরে থেকে যাঁরা যাঁরা স্বকীয় রীতি উদ্ভাবনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যামিনী রায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বশিক্ষিত শিল্পী' ছিলেন।[১৪৭] ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিত্ররচনায় এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি দুই হাজারেরও অধিক চিত্র রচনা করেন। কবিতা, গানে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে মনের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তা তিনি ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাঁর ছবি আঁকা শুরু হয় পাণ্ডুলিপির সংশোধনে। প্রথমে সেই সংশোধন ছিল নিতান্তই আঁকাবাঁকা কাটাকুটি রেখা। পরে সেই কাটাকুটির মধ্যে ফুটে ওঠে জন্তু বা জন্তুর দেহাংশ, লতাপাতা, ফুল, কোথাও চোখ, মুখের খানিকটা অংশের আভাস। *পূরবী*-র (১৯২৫) পাণ্ডুলিপিতে দেখা গেল লেখার সম্পূর্ণ অংশ কেটেকুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে কাল্পনিক আকার আকৃতির জীবজন্তু বা অন্য প্রাণী। এরপর সরাসরি সাদা কাগজে বর্ণের বিচিত্রতায় ছবি আঁকা শুরু করলেও কাল্পনিক বিমূর্ত জগত থেকে বেরোতে পারেননি। তাঁর শেষ

পর্যায়ের ছবিগুলিতে প্রকৃতির নানা দৃশ্য, মানুষ, ঘরবাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিশ্বপ্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করেন।[১৪৮] তিনি ছবি থেকে সুন্দরকে পরিত্যাগ করে অসুন্দরের মধ্য থেকে তার চিত্রগত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি থেকে। নাম গোত্রহীন কাল্পনিক পাখি-জন্তু-সরীসৃপ তাঁর ছবির বিষয় হয়ে ওঠে। অনেকে একে তাঁর অবচেতন মনের রূপকল্প বলে মনে করেন।[১৪৯] তাঁর ছবির রূপনির্মাণে আদিমতা ও অভিব্যক্তিবাদের[১৫০] প্রভাব খুব গভীরভাবে এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ ছবিই 'পেলিক্যান' কালিতে আঁকা। তাঁর ছবিতে রঙ, রেখা ও ছবি এক অদৃশ্য ঐক্যে আবদ্ধ।[১৫১] রবিবর্মা থেকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল হয়ে শিল্পচর্চায় জাতীয়তাবোধের যে রূপান্তর ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথের ছবি সেই ধারাবাহিকতায় এক নতুন চেতনা নিয়ে আসে। জাতীয়তা কেমন করে আন্তর্জাতিকতায় সম্পৃক্ত হয়ে মহত্তর রূপের সন্ধান দিতে পারে রবীন্দ্রনাথের ছবি তারই দৃষ্টান্ত।[১৫২]

নব্যবঙ্গীয় শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকেও ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পচর্চা করে স্বতন্ত্র চিত্রশৈলীর পরিচয় দেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমালোচকদের মতে পাশ্চাত্য তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় পরিবেশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাঁর কিউবিক[১৫৩] ছবিগুলি ইউরোপীয় কিউবিক ছবির থেকে পৃথক। ফটোগ্রাফির অভিজ্ঞতা সঞ্জাত আলো ছায়ার দ্বন্দ্ব, কুহেলিকাময়, অস্পষ্ট, রোমান্টিক কাব্যিক ভাব তাঁর কিউবিক সাদা-কালো ছবিতে ফুটে ওঠে। তাঁর ছবির বস্তু বা ফিগার ছবিতেই নিজের ছায়া ফেলে, যা তাঁর আগে ভারতীয় ছবিতে বিরল।[১৫৪] চিত্রশিল্পজগতে গগনেন্দ্রনাথের অপর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন। সমকালের রাজনীতি সমাজ শিক্ষা ধর্ম জাতিভেদপ্রথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সমাজের অসঙ্গতির প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।[১৫৫] পুঁথিসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যাবস্থা, বর্ণবৈষম্য, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর দুরবস্থা, ইউরোপীয় সংস্কৃতির বৃথা অনুকরণ প্রচেষ্টা, ইংরেজ সরকারের শাসন, স্বদেশি সুবিধাবাদী রাজনীতি এমনকি গান্ধিজির কিছু কিছু নীতির বিরোধিতাসহ তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি সমস্ত দিকগুলির প্রতি তিনি আলোকপাত করেন। কলমের দ্বারা যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তাই তিনি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাঁর ব্যঙ্গচিত্র পেলব নয় বরং তা ক্ষুরধারে শ্রেষ্ঠ। বিকল্প শিল্পচর্চায় অনন্য স্মরণীয় যামিনী রায় পুরাতনের পুনরাবিষ্কার ও স্বীয় শিল্পচেতনা ও স্বতন্ত্র শৈলী ভারতশিল্পকে নতুন পথপ্রদর্শন করে।[১৫৬]

১.৩ উপসংহার

হরপ্পা মহেন-জো-দারো এবং গুহাচিত্রের পরবর্তী পর্যায়ে গুপ্তযুগ থেকে ঔরঙ্গজেবের সময়কাল পর্যন্ত ভারতশিল্পের এক সমৃদ্ধশালী ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পচর্চার দিক পরিবর্তন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পুরো ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলার চিত্রকলা কতগুলি ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। প্রথমত, পাশ্চাত্য শিল্পীদের আগমনে ইউরোপীয় রীতির শিল্পচর্চা শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, কোম্পানি শৈলী বা কোম্পানি কলমের সৃষ্টি। তৃতীয়ত, লোকসমাজে ঐতিহ্যগত লৌকিক চেতনার সঙ্গে নগরজীবনের ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীবনচেতনা মিলেমিশে তৈরি হয় কালীঘাটের পট। চতুর্থত, কালীঘাট পটের অবক্ষয়ের কালে এর পরিপূরক হয়ে ওঠে বাংলার খোদাই শিল্পীদের অনন্য সৃষ্টি বটতলার ছাপাছবি।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবাসীদের উপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য সৃষ্টির প্রবল চেষ্টা চলতে থাকে। ইংরেজ আমলে তাদের দ্বারা সৃষ্ট শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের প্রয়োজনে ভারতবাসীদের শিক্ষা দান করা হতে থাকে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে মেনে নেন একদল ভারতবাসী। নিজেদের ঐতিহ্য সংস্কৃতির গৌরবময় অধ্যায় তাঁদের বিস্মৃতি অতলে তলিয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পরিস্থিতি কিছুটা বদল হতে শুরু করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এসে পড়ে। স্বাজাত্যবোধ জাগরিত হয় ভারতবাসীর অন্তরে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৎপরতায় এবং তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐতিহ্যনুসারী শিল্পচর্চার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের জন্ম হয়। ভারতবাসী ও বিদেশিদের যৌথ উদ্যোগে এই শিল্পরীতির প্রসার ঘটে। নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতির সমান্তরালে চলতে থাকে পাশ্চাত্য একাডেমিক শিল্পরীতির চর্চা। এরই মধ্যে কিছু শিল্পী এই দুই ধারার গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলেন। নন্দলাল বসু শুরুর দিকে অবনীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথে বেঙ্গল স্কুলের ধারায় চিত্রচর্চা করলেও পরে সেই ধারা থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র শৈলী নির্মাণ করেন। যামিনী রায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন পথে নিজেদের পরিচয় গড়ে তোলেন।

উৎস ও অনুষঙ্গ

১। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ভট্টাচার্য, স্বাতী। 'ভারতশিল্পের কায়ানির্মাণ – উনিশ শতক'। *দশদিশি*। শিল্পকলা সিরিজ। প্রথম ভাগ। পৃ. ১০

২। কর, চিন্তামণি (১৯৯৮)। *শিল্পী ও রূপকলা*। কলকাতা: পাশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৭০-৭১

৩। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। *বাংলার চিত্রকলা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৬৬

৪। কর, চিন্তামণি (১৯৯৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৩–৭৫

৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৮-৭৯

৬। ঘোষ, বিনয় (২০১০)। *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড। পৃ. ১৭৪

৭। কর, চিন্তামণি (১৯৯৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮০

৮। পোর্ট্রেট – কোন ব্যক্তির মুখ বা পূর্ণাবয়ব তুলে ধরে যে ছবি বা ভাস্কর্য তাকে পোর্ট্রেট বলে। শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানুষটির মেজাজ, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার অর্ন্তদৃষ্টি প্রয়োজন পোর্ট্রেট অঙ্কনের ক্ষেত্রে। দ্রষ্টব্য: চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। *শিল্পের ব্যাকরণ*। মুর্শিদাবাদ: বাসভূমি প্রকাশন। পৃ. ৩৯

৯। মিনিয়েচার – খুব ছোট আকারের ছবিকে মিনিয়েচার বলে। এই ধরনের ছবি সাধারণত কাগজ, চামড়া, কাঠ, তামার পাত ও হাতির দাঁতের উপর আঁকা হত। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। *শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৪৬১

১০। ল্যাণ্ডস্কেপ – সাধারণভাবে আউটডোর বা বর্হিজগতের দৃশ্যকেই ল্যাণ্ডস্কেপ বলে। এটি চাক্ষুস বা বিমূর্ত রীতিতে আঁকা হতে পারে। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩৫

১১। মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। *ভারতের চিত্রকলা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ৬৫

১২। সুর, অতুল (২০১৬)। *কলকাতা*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। পৃ. ১৩৫

১৩। দাস, গৌতম (২০০০)। *বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার*। কলকাতা: পুনশ্চ। পৃ. ৪৪

১৪। অ্যাকুয়ান্টিক পদ্ধতি – এচিং-এর উপর ওয়াশ দিয়ে ছবি ছাপার পদ্ধতিকে অ্যাকুয়ান্টিক পদ্ধতি বলা হয়। দ্রষ্টব্য: দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। *শিল্প ও শিল্পী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ. ৩৬৩

১৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৬৩–৩৬৪

১৬। পরিপ্রেক্ষিত – ছবি আঁকার জন্য যে দৃশ্যটি নির্বাচন করা হয়, সেই দৃশ্যনিবন্ধ বস্তুগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের আনুপাতিক দূরত্ব, নৈকট্য, উচ্চতা ও গভীরতা গাণিতিক নিয়মে ছবিতে নির্দিষ্ট করা বা ফুটিয়ে তোলাই হল পরিপ্রেক্ষিত। দ্রষ্টব্য: চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৩

১৭। এনগ্রেভিং – এনগ্রেভিং বলতে কাঠ বা ধাতুর ফলক বা ব্লকে কোনো নক্সা খোদাই বা উৎকীর্ণ করা এবং সেই নক্সা থেকে ছাপ নেওয়া উভয়কেই বোঝায়। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৪

১৮। লিথোগ্রাফি – লিথোগ্রাফি এনগ্রেভিং-এর একটি শাখা। লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে একটি পাথরের উপর নির্দিষ্ট একটি ছবি খোদায় করে উঁচু অংশগুলিতে তৈলাক্ত কালি অথবা ক্রেয়ন দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়, এই পাথরটির সাহায্যে একাধিক ছবি পুনরুৎপাদিত করা হয়। See: Adekine's, M. Jules (1905). *Adeline's Art Dictionary*. New York: D. Applenton and Company. P. 241

১৯। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২-১৩

২০। Guha Thakurata, Tapati (1992). *The Making of a New 'Indian' Art.* Great Britain: Cambridge University Press. P. 13

২১। এচিং – তামা, দস্তা বা অন্য ধাতব পাতে ছবি এঁকে যে অংশগুলি ছাপা হবে সেগুলি বাদ দিয়ে বাকি অংশগুলিতে অ্যাসিড দিয়ে খোদাই করে নিয়ে তারপর কাঠের ব্লকে লাগিয়ে প্রেস মেশিনের সাহায্যে অসংখ্য ছবি করার পদ্ধতিকে এচিং বলে। দ্রষ্টব্য: চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪২

২২। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৫-৭৬

২৩। ঘোষ, মৃণাল (১৯৪৪)। *শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব*। কলকাতা: প্রতিক্ষণ। পৃ. ১৩৮

২৪। ঘোষ, বিনয় (২০১০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৬৮

২৫। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৮

২৬। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮

২৭। ঘোষ, বিনয় (২০১০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭০

২৮। মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৪

২৯। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৮-৯৯

৩০। ঘোষ, মৃণাল (১৯৪৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৯-১৪০

৩১। মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৪

৩২। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৪

৩৩। বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত, ২০০০)। *বটতলার বই*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: গাঙচিল। পৃ. ২৬-২৮

৩৪। সেন, সুকুমার (২০০৮)। *বটতলার ছাপা ও ছবি*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৩১

৩৫। ঘোষ, বিনয় (২০১০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮৪

৩৬। বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত, ২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮

৩৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯-৩১

৩৮। শ্রীপান্থ (১৯৯৭)। *বটতলা*। কলকাতা: আনন্দ। চিত্র সংখ্যা ৬৮

৩৯। বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত, ২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩১-৩২

৪০। হাফটোন - ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সম্পূর্ণ বানিজ্যিক পদ্ধতির মুদ্রণ কৌশলটি আবিষ্কৃত হয়। এই পদ্ধতিতে আলোছায়ার তারতম্য অর্থাৎ একটা টোন থেকে আর একটা টোনে যাওয়ার ক্রমান্বয়ে দৃশ্যত কোন ছেদ থাকে না। এইকাজে নক্সা বা ছবিকে বিশেষ ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন আকার আয়তনের অসংখ্য বিন্দু সমষ্টির ঘনত্বের ভিন্নতায় বিন্যাসের মাধ্যমে পরিস্ফুট করা হয়। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬১৮

৪১। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫

৪২। সেন, সুকুমার (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (১৯৮১)। গোস্বামী, রঘুনাথ। 'দুই শতকের গ্রন্থচিত্রণ'। *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩৩৩

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (১৯৮১)। সরকার, কমল। 'বাংলা বইয়ের ছবি ১৮১৬-১৯১৬'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩১৪

৪৫। ঘোষ, বিনয় (২০১০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮৫

৪৬। ঘোষ, সিদ্ধার্থ (২০১৮)। *কলের শহর কলকাতা*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১২৯

৪৭। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার (১৩৮৯)। *ভারতশিল্পের কথা*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। পৃ. ৬৫

৪৮। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬

৪৯। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮২)। সরকার, কমল। 'ভারতের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী'। *দেশ*। জুলাই। পৃ. ৩৪

৫০। গুহ, প্রদ্যোত (১৯৭৮)। *কোম্পানি আমলে বিদেশি চিত্রকর*। কলকাতা: আয়ান। পৃ. ১২-১৩

৫১। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৩

৫২। শাস্ত্রী, শিবনাথ (১৯৮৩)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স লি.। পৃ. ১৪৭

৫৩। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৮

৫৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩–৫৪

৫৫। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৭

৫৬। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৫

৫৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত, ১৯৮১)। গোস্বামী, রঘুনাথ। 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৫৫

৫৮। Chatterjee, Ratnabali (1990). *From the Karkhana to the Studio*. New Delhi: Books N Books. P. 75– 76

৫৯। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮

৬০। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৬–৫৮

৬১। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৭– ১০৮

৬২। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১২

৬৩। Iguchi, Toshino and Suga, Yasuko (Edited, 2017). Fujita, Haruhiko. 'Art and Design Education in Nineteenth Century India: British Background and Devolopment in South Asia'. *The Second Asian Conference of Design History and Theory: Design Education beyond Boundaries*. Japan: Tsuda University. P. 111–118. https://acdth.com/download/2017/all_corol.pdf. Last accessed: 20.10.2023.

৬৪। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮

৬৫। মডেলিং – মডেলিং হল ভাস্কর্যের একটি প্রাচীন কৌশল। মডেলিং করতে সাধারণত মাটি, মোম, কাঠ ও ধাতুর ব্যবহার করা হয়। https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/modeling. Last accessed: 23.10.2023.

৬৬। সোম, শোভন ও আচার্য, অনিল (সম্পাদিত, ১৯৮৬)। *বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ১০

৬৭। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮

৬৮। তেলরঙ – চিত্রশিল্পী হুবার্ট ভ্যান-আইক (১৩৬৫–১৪২৬) ও জন ভ্যান-আইক (১৩৯০–১৪৪১) ভাতৃদ্বয়ের গবেষণায় তেল রঙের আবিষ্কার হয়। মসৃণ থেকে খসখসে ইত্যাদি নানা ধরনের এফেক্ট সৃষ্টি করা যায় বলে ইউরোপ সহ সারাবিশ্বে এর কদর রয়েছে। এই রঙের মিশ্রণ ও আলো প্রতিরোধী ক্ষমতা অনেক বেশি হলেও সমস্ত আবহাওয়ায় উপযুক্ত নয়। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬–১৭

৬৯। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৪

৭০। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭২

৭১। সোম, শোভন ও আচার্য, অনিল (সম্পাদিত, ১৯৮৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১

৭২। বসু, সুধা (২০১৩)। *শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: বোনা। পৃ. ১৫

৭৩। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৩

৭৪। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১

৭৫। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৩)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ* । পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস। পৃ. ১০৭

৭৬। ডিজাইন – কোনো শিল্পকর্মের আয়োজন, পরিকল্পনা, খসড়া এবং নক্সা সবই ডিজাইনের অঙ্গ। ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য বা যেকোনো শিল্পকর্ম গড়ে তুলতে গেলে রেখা, অভিমুখ, আকৃতি, আকার, বুনট, রঙ এবং টোনের সূত্রবদ্ধ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষত ডিজাইন গড়ে ওঠে। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১২–২১৩

৭৭। ফ্রেস্কো – বালি ও চুনের প্লাস্টার ভিজে থাকতে থাকতে তার উপর যে ছবি আঁকা হয় তাকেই ফ্রেস্কো বা ইটালীয় ফ্রেস্কো বলে। দ্রষ্টব্য: বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ৫৫

৭৮। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৭

৭৯। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ও চন্দ, রানী (১৯০৬)। *জোড়াসাঁকোর ধারে*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১০৩

৮০। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮১

৮১। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২০

৮২। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬০

৮৩। খালেদ, মইনুদ্দীন (২০০৩)। *দশ বাঙালি শিল্পী*। ঢাকা: প্যাপিরাস। পৃ. ১১

৮৪। ঠাকুর, প্রতিমা (১৩৫৯)। *স্মৃতিচিত্র*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস। পৃ. ৩৮

৮৫। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯

৮৬। প্যাস্টেল – ছবি আঁকার এক ধরনের মাধ্যম এটি। প্যাস্টেল সাধারণত সফট, হার্ড এবং পেনসিল আকারের হয়ে থাকে। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০৭

৮৭। খালেদ, মইনুদ্দীন (২০০৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪

৮৮। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৪–৩৬

৮৯। খালেদ, মইনুদ্দীন (২০০৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪

৯০। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৬-৪৩

৯১। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯৭৩)। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন। পৃ. ৬৩

৯২। ওয়াশ পদ্ধতি – ওয়াশ পদ্ধতি জলরঙের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কাগজকে ভিজিয়ে নিয়ে এর উপর জলরঙকে ছবিতে আলো-ছায়ার বিচার অনুযায়ী রঙ হালকা ও গাঢ় করে স্তরে স্তরে প্রয়োগ করা হয়। কাগজ ও রঙ শুকিয়ে গেলে চওড়া তুলিতে কোন স্বচ্ছরঙের প্রলেপ দিতে হয় ধোঁয়াশা বা কুয়াশাচ্ছন্নভাব তৈরির জন্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে ওয়াশ পদ্ধতির সূচনা করলেও তিনি সাবেক ওয়াশ পদ্ধতিতে ছবি আঁকেননি। তুলি দিয়ে ওয়াশ করার পরিবর্তে তিনি পুরো কাগজটাকেই জলে বার বার ধুয়ে তার থেকে স্তরে স্তরে স্বচ্ছরঙের আভাস তুলে এনে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি এই ধরনের ওয়াশ করার জন্য লন্ডনের হাতে তৈরি হোয়াটম্যান কাগজ এবং লন্ডনের উইন্‌সর নিউটন কোম্পানির জলরঙকে বেছে নেন। তবে দেশি কাগজ বা সিল্কের উপরও এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়। দেশি রঙ ব্যবহার করা যায়। ওয়াশ পদ্ধতিতে ফিনিসিং করতে যদি কোন অনচ্ছ রঙ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় অথবা চিত্রে সোনা রূপা লাগানোর প্রয়োজন হয় তবে তা ওয়াশের পরেই করা হয়ে থাকে। দ্রষ্টব্য: বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৫-১১২

৯৩। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯৭৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৩

৯৪। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৭-৭৮

৯৫। খালেদ, মইনুদ্দীন (২০০৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮

৯৬। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৯৮)। *ঘরোয়া*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১

৯৭। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১১

৯৮। গাঙ্গুলী, অর্ধেন্দ্র কুমার (১৯৬৯)। *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ। পৃ. ১৫২

৯৯। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৫

১০০। গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী অর্ধেন্দ্রকুমার (১৯৬৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৯-১৬১

১০১। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০৮-৩০৯

১০২। গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী অর্ধেন্দ্রকুমার (১৯৬৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৪

১০৩। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৭ ও ১৪০

১০৪। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৯

১০৫। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪০

১০৬। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৯

১০৭। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৯

১০৮। গাজী, তানজিয়া। 'প্রাচ্যের আদর্শ: উৎসের খোঁজে'। https://www. deshrupantor.com/editorial-news/2019/08/121775. Last accessed – 3.11.23

১০৯। বসু, সুধা (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৩

১১০। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ও চন্দ, রাণী (১৯০৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩২

১১১। গাঙ্গুলী, অর্ধেন্দ্র কুমার (১৯৬৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪১

১১২। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ও চন্দ, রাণী (১৯০৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩২

১১৩। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৯–১৫০

১১৪। গথিক – মধ্যযুগীয় চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি শব্দ। গথিক স্থাপত্যে ছাদ ও দেওয়ালের ভারবহনের জন্য কিছুটা পর পর এক দেওয়াল থেকে আরেক দেওয়ালে ঝুলে থাকা পাথরের তৈরি একরকমের স্তম্ভের ব্যবহার করা হল। এই নতুন স্থাপত্য রীতিতে জানালা, সিলিংকে সুসজ্জিত করা হল। এই যুগের ভাস্কর্য জড়তা, আনুষ্ঠানিকতা, সাধাসিধা ফিগারেটিভ রূপ ছেড়ে ক্রমশ আরো বাস্তবানুগ, ভঙ্গিবিশিষ্ট নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিভিত্তিক চেহারা পেতে শুরু করল। এযুগের চিত্রকলায় প্রতিকৃতিগুলিতে বাস্তবধর্মীতা লক্ষ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে এই রীতির জনপ্রিয়তা বাড়ে। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫২–১৫৩

১১৫। দাদাইজম – সুইজারল্যান্ডের তিস্তান-জারা তাঁদের শিশুদের খেলনা ঘোড়ার নামানুসারে দাদাইজম নামে এক অদ্ভুত শিল্পমত প্রচলন করেন। খেলনা ঘোড়া যেমন তার শিশুচালকের খেয়ালখুশিতে চালিত হয় – শিল্পীর মন সেরকম দুর্বার, বন্ধনহীন, নিয়ম-শৃঙ্খলার ধার ধারে না। দ্রষ্টব্য: দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮৩)। *শিল্প ও শিল্পী*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। পৃ. ৩০৮

১১৬। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৭–১৩৮

১১৭। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪২৪)। *নিবেদিতা লোকমাতা*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ১৭

১১৮। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৬

১১৯। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩১

১২০। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৩

১২১। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪২৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬২

১২২। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৪

১২৩। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৪২২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩১

১২৪। গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দ্রকুমার (১৯৬৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৪

১২৫। চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত, ১৩৫০)। *ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ*। 'ভারতীয় চিত্রকলা প্রচারে রামানন্দ'। *প্রবাসী*। পৌষ। পৃ. ২৬১

১২৬। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৬

১২৭। গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দ্রকুমার (১৯৬৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৪ ও ৯৮

১২৮। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৭–১৪৯

১২৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪০

১৩০। ঘোষ, স্বাতী (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫

১৩১। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০৫

১৩২। দত্ত, পুলক (১৪০৮)। *কারুসঙ্ঘ শান্তিনিকেতন শিল্পীসমবায়*। শান্তিনিকেতন: রবীন্দ্রভবন বিশ্বভারতী। পৃ. ৩৬

১৩৩। ঘোষ, স্বাতী (২০১৫)। *রবীন্দ্রভাবনায় শান্তিনিকেতনের আলপনা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা -৯৪

১৩৪। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। 'নন্দলাল: কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন'। *দেশ*। পৃ. ৩৫–৩৬

১৩৫। দত্ত, পুলক (১৪০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬–২৫

১৩৬। ঘোষ, স্বাতী (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৬

১৩৭। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫২

১৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (২০১৪)। *শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগ*। কলকাতা: অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্‌স্। পৃ. ২৯

১৩৯। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫২

১৪০। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৩

১৪১। বসু, অতুল (১৯৯৩)। *বাংলায় চিত্রকলা ও রাজনীতির একশ বছর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ২০

১৪২। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৩

১৪৩। দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭৯

১৪৪। দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৪

১৪৫। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৭

১৪৬। দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৫-৩৯৬

১৪৭। দাস, গৌতম (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬১

১৪৮। মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৭-১২০

১৪৯। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৭

১৫০। অভিব্যক্তিবাদ – ফরাসি চিত্রকর Herve ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে জীবনের আভ্যন্তরীণ রহস্য প্রকাশে 'Expressionism' এই শব্দটি সম্ভবত প্রকাশ করে থাকেন। এটি আধুনিক শিল্পজগতের একটি জীবনবাদী দর্শন। এই রীতির চিত্রগুলি বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়ে শিল্পীর অনুভব, উপলব্ধির দিকটি রেখা এবং গাঢ় রঙে পরিস্ফুট করে। দ্রষ্টব্য: আহসান, সৈয়দ আলী (২০০২)। *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ*। ঢাকা: বইপত্র। পৃ. ১৩৮

১৫১। রায়চৌধুরি, দেবীপ্রসাদ (১৯৯৬)। মিত্র, মৈত্রেয়ী (অনুবাদিত)। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিক্ষা ও চিত্রশিল্প*। দিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া। পৃ. ৬৫

১৫২। ঘোষ, মৃণাল (২০১২)। *ছবির রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: অভিযান। পৃ. ৭৩

১৫৩। কিউবিক ছবি – এই ধরনের চিত্রে বিভিন্ন জ্যমিতিক আকার আয়তনের সমাবেশ ঘটিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর ঘনত্ব সন্নিবেশিত করা হয়। কিউবিস্টদের মতে মহাবিশ্বের যা কিছু রয়েছে সবকিছুরই গড়ন গোল, শঙ্কু বা ত্রিকোণ, চর্তুভূজ, বহুভূজ বা সিলিন্ডারের মতো। যেমন চাঁদ গোল, পাহাড় ত্রিকোণ ইত্যাদি। এই সমস্ত বস্তুরই রয়েছে ঘনত্ব। নানা দিক থেকে দেখলে তা বিচিত্র রূপ পায়। বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপের উদ্‌ঘাটনই হল কিউবিস্টদের মূল লক্ষ। তাই কিউবিজম ক্রমশ সাভাবিকত্বকে পরিহার করে বিমূর্ত হয়ে ওঠে। দ্রষ্টব্য: মিত্র, অশোক (১৯৮৮)। *পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ১৭৮

১৫৪। মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১১-১১৫

১৫৫। খালেদ, মইনুদ্দীন (২০০৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৭

১৫৬। সেন, যামিনীকান্ত (১৩৬৭)। *বাংলার রূপরস সাধনা*। কলকাতা: মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৭০

চিত্র ১: রবার্ট হোমের আঁকা চিত্র

চিত্র ২: গাছের ডালে পাখি, কোম্পানি শৈলী

চিত্র ৩: নবীন ও এলোকেশী, কালীঘাট পট

পাসকরা মাগ।

(সামাজিক প্রহসন)

স্ত্রী স্বাধীনের এই ফল।
পতি হয় পায়ের তল ॥

শ্রীরাধাবিনোদ হালদার প্রণীত।

চিত্র ৪: বটতলার ছবি

চিত্র ৫: ভারতমাতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র ৬: শেষ বোঝা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র ৭: অজন্তা গুহাচিত্র, অসিতকুমার হালদার

চিত্র ৮: লক্ষ্মী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

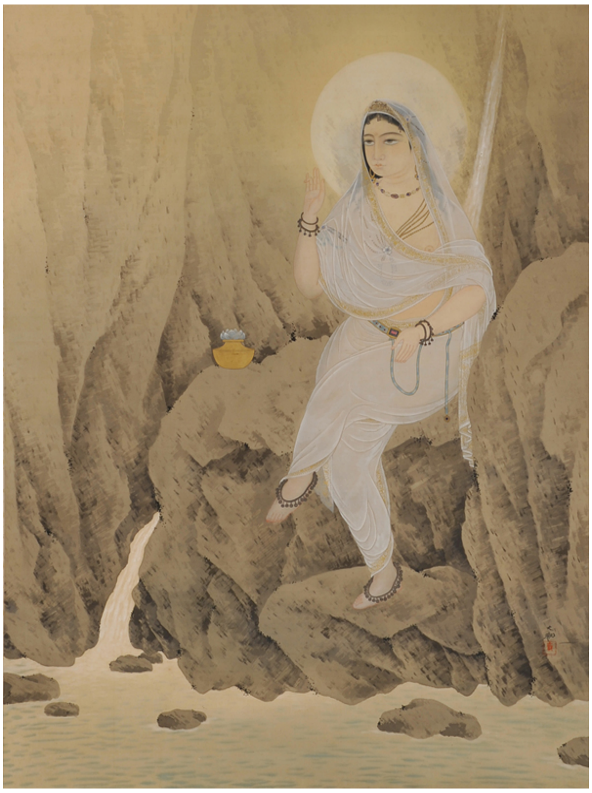

চিত্র ৯: Kannon in White, ইয়োকাহামা টাইকান

চিত্র ১০: মা ও শিশু, রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

চিত্র১১: কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যাস্ত, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্র ১২: জগদীশচন্দ্র বসু, অতুল বসু

চিত্র ১৩: পূরবীর পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র ১৪: কলিযুগের ব্রাহ্মণ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকশিল্পানুষঙ্গ: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

২.০ ভূমিকা

লোকসংস্কৃতি, লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণ, জীবনযাপন প্রণালী, চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি। লোকসমাজের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির একটি শাখা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ একদিকে প্রয়োজনের তাগিদে অন্যদিকে তার নান্দনিক পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে যা কিছু সৃষ্টি করত বা যা কিছু ক্রিয়া কর্ম করত তা সম্পূর্ণরূপে আপনশক্তি, কল্পনা, রুচি ও দক্ষতার উপরেই নির্ভরশীল ব্যক্তির নান্দনিক ও ব্যবহারিক বোধের মিলিত চর্চার প্রভাবে এইভাবেই ছিল। আদিতম লোকশিল্প ও লোককারুকলার উৎপত্তি হয়েছিল। অতএব সেই শিল্প ও কলা ছিল মূলত আত্মকেন্দ্রিক। কালক্রমে সমাজব্যবস্থার বিবর্তনে এই আত্মকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা হয়ে উঠেছিল সামগ্রিক জীবনচর্যার এক আত্মিক অঙ্গবিশেষ। শিল্প হয়ে উঠেছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও লোকায়ত ভাব সমন্বিত। এইভাবেই আদিম শিল্প ধীরে ধীরে লোকশিল্পে রূপান্তরিত হয়েছিল। লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা লোকশিল্পের নানা বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। উপকরণ ও জমিভেদে লোকশিল্পের বিভাজন হচ্ছে এরূপ –

ক) অঙ্কন ও নক্সা: আলপনা, পটচিত্র, ঘটচিত্র, মুখোশ, দেয়ালচিত্র, উল্কি ও অন্যান্য অঙ্গচিত্র, চালচিত্র, শখের হাঁড়ি, নকশি পুতুল ইত্যাদি;

খ) সূচীকর্ম: বিবিধ নকশি কাঁথা, রুমাল, শাড়ি ও অন্যান্য পোশাক;

গ) বয়ন শিল্প: নকশি পাটি, নকশি শিকা, নকশি পাখা, ঝুড়ি, ফুলচাঙ্গা;

ঘ) মডেলিং বা প্রতিরূপ দেওয়া: পুতুল ও খেলনা, হাঁড়ি-পাতিল, মুখোশ, ছাঁচ, নকশি পিঠা, নকশি দরমা, মিষ্টি দ্রব্য, অলংকার, নৌকা, রথ, তাজিয়া, খাট, পালঙ্ক, বাক্স, সিন্দুক, পালকি ইত্যাদি;

ঙ) খোদাই কাজ: খোদাইকরা কাঠের দ্রব্য, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, নানা রকম ধাতু শিল্প;

চ) খচিত করা: মণি, মুক্তা, হীরা ও পান্না খচিত বিবিধ অলংকার, রঙিন কাঁচ-পাথর দ্বারা প্রাসাদ অলঙ্কৃতকরণ ইত্যাদি।

উপাদানের ভিন্নতার ভিত্তিতে লোকশিল্পের বিভাগগুলি হল – ক) ধাতুশিল্প, খ) মৃৎশিল্প, গ) দারুশিল্প, ঘ) প্রস্তরশিল্প, ঙ) শোলাশিল্প, চ) বস্ত্রশিল্প, ছ) বাঁশ-বেত্ শিল্প, জ) মাদুর শিল্প, ঝ) কাগজ মণ্ড শিল্প।[১] লোকশিল্পের বিশেষ কতগুলি বিভাগ নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের চিত্রে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে, তাঁরা কতটা তাঁদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছেন সেই বিষয়ে অধ্যায়টিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

২.১ পটচিত্র

পট সম্পর্কে আলোচনার প্রাথমিক পর্বেই 'পট' শব্দটির অর্থ জানা প্রয়োজন। পট শব্দটির বুৎপত্তি গত রূপ পট্ট>পট্‌ট<পট। সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দটি ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের মাধ্যমে কালক্রমে বাংলা 'পট' পরিণতি লাভ করেছে; যার প্রতিশব্দ বস্ত্রখন্ড বা কাপড়।[২] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় শব্দকোষে পট শব্দটির বুৎপত্তিতে অর্থ বলতে বুঝিয়েছেন – "পট্ট + অ (অচ্)–ণ" ক) 'বেষ্টনসাধন', বস্ত্র খ) লিখনার্থ বা চিত্রীকরণার্থ কাপাসীয় বস্ত্র গ) চিত্রার্থ কাষ্ঠাদি পট্ট ঘ) চিত্রপট।[৩] পালি ভাষায় 'পট্ট' কথাটা খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেও এর অর্থ বস্ত্র বা বস্ত্রখন্ড।[৪] বর্তমানে পট্ট বা যন্ত্রের ওপর আঁকা চিত্রই পট বলে পরিচিত। কোন কোন সাহিত্যিক 'পট' শব্দের আদি উৎস হিসাবে তামিল 'পডম' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। 'পডম' শব্দের অর্থ হল পট বা ছবি।[৫] 'পট' কথার অর্থ যে ছবি বা চিত্র, তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় *মহাভারত*-এ। পট শব্দের উৎস হিসাবে সংস্কৃত 'পট্ট' বা দ্রাবিড় 'পডম্' যে শব্দটিকেই স্বীকার করি না কেন পট শব্দের সঙ্গে চিত্র বা ছবির যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানে পট বলতে সাধারণত কাপড় এবং কাগজের ওপর আঁকা বিশেষ ধরনের লৌকিক চিত্রকলাকে বোঝানো হয়ে থাকে। যারা পট তৈরি করেন তাঁরা পটুয়া নামে পরিচিত। এঁরা দেবদেবীর মাহাত্ম্য, পুরাণ-মঙ্গলকাব্য, সমসাময়িক নানা কাহিনি নিয়ে নির্দিষ্ট শৈলী অনুসরণ করে পট আঁকেন ও সেটি গীতসহ প্রর্দশন করেন। ভারত-শিল্পের রেখাপ্রাণতা বজায় রেখে পটুয়ারা একটি স্বতন্ত্র গতিপথে নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে পটচিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন।[৬]

রেখাবিন্যাসে, রঙ নির্বাচনে ও বিষয় সংস্থাপনের স্বাতন্ত্রে প্রতীকি তাৎপর্যে উজ্জ্বল।[৭] নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় এই লোকশিল্পটিকে প্রয়োজনমতো আত্তীকরণ ঘটিয়েছেন এবং নিজ স্বাতন্ত্রে সমুজ্জ্বল থেকেছেন।

২.১.১ নন্দলাল বসুর চিত্র ও ভাবনায় পটচিত্র অনুষঙ্গ

নন্দলাল বসুর সমগ্র শিল্পকর্মের দিকে তাকালে বোঝা যায় সমস্ত রকম আর্টেরই তত্ত্বসন্ধান, প্রয়োজনমতো অনুশীলন, সম্ভবমত আত্মীকরণ চলেছে আশ্চর্য দ্রুত গতিতে। একসময় ভদ্র কুলীন সমাজের শিল্পচর্চায় অনাদৃত ‘পট’ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে অন্দরমহলের বস্তু হয়ে এসেছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু হওয়ার এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। অবনীন্দ্র গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে নন্দলাল বসু লোকশিল্প ও পটচিত্র নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে শুরু করেন। প্রথমদিকে তিনি ও তাঁর সতীর্থরা বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে পট ও পাটা সংগ্রহ করা শুরু করেন। এই সময় কালীঘাটের বেশ কিছু পট, মেদিনীপুরে কিছু পট-পাটা আর দক্ষিণী কিছু কাটিং সংগ্রহ করেন।[৮] ভবিষ্যতেও পট-পাটা সংগ্রহের নেশা তিনি একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যখনই তাঁর নজরে ভালো কোন পট-পাটা এসেছে তিনি তা নিজের ও কলাভবনের জন্য সংগ্রহ করে এনেছেন। ছাত্রাবস্থায় এবং তাঁর পরবর্তীকালেও পট নামক ঐতিহ্য বিরোধী অনভিজাত, লৌকিক শিল্প আঙ্গিকটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে পটের প্রভাব তাঁর ছবিতে বার বার ফিরে এসেছে।

ক) বাণীপুরে কালীঘাট পটের পুনরুজ্জীবন

আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করার পর **১৯১৬** খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিক ভাবে ‘বিচিত্রা সভা’ প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু কালীঘাটের পটের কথা মাথায় রেখে পুরাতন রীতিতে নতুন ধারা প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা করেন। অর্থাৎ যার টেকনিক হবে পুরাতন বা ঐতিহ্য অনুসারী, কিন্তু আঁকার বিষয় হবে নতুন।[৯] অবনীন্দ্রনাথ একবার নন্দলালকে বলেন বিশেষ গোষ্ঠী ও গণ্ডীর শিল্পভাবনা থেকে বেরিয়ে ‘শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের’ আনন্দদানের জন্য নতুন ধরনের পট আঁকতে।[১০] গুরুর

নির্দেশমতো নন্দলাল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর বাণীপুরের বাড়িতে 'বেল পাকলে কাকের কি', 'সাপে নেউলে', 'নেড়া বেলতলায় ক'বার যায়' ইত্যাদি নীতিকথা, বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি বিষয় ও পুরনো বই থেকে নানা জন্তুজানোয়ারের ছবি পটের ফর্মটিকে মাথায় রেখে বালির কাগজে আঁকেন।[১০] ছবিগুলি বিক্রির উদ্দেশ্যে মুদির দোকানে ঝুলিয়ে রাখতেন। জুটমিলের কুলিরা নিয়মিত তা কিনলে প্রত্যহ 'গড়ে ।।০ ।।৵০ (আট আনা – দশ আনা) রোজগার হত'। এতে তিনি খুবই 'গৌরব বোধ' করতেন।[১২] এসময় একটি ঘটনা থেকে শিক্ষা পেয়ে তিনি পট আঁকা থেকে নিবৃত্ত হন। নতুন কোন চিন্তা-ভাবনা বা নতুন কোন কাজ নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে করতেন, তাই পট নিয়ে তাঁর এই নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর দিতে তাঁর নিজের আঁকা কুড়ি–তিরিশটি কালীঘাটের পট নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে কালীঘাটের পট সম্পর্কে কথা উঠতেই নিজের আঁকা ছবি তাঁর সামনে মেলে ধরেন। ছবিগুলি দেখে খানিকটা থমকে গিয়ে ছবিগুলির দাম জানতে চান অবনীন্দ্রনাথ। নন্দলাল জানান তাঁর ছবিগুলি চার পয়সা করে বিক্রি করছেন। একথা শুনে অবনীন্দ্রনাথ এক টাকা করে সমস্ত ছবি কিনে নেন।[১৩] এই ঘটনায় তাঁর আর্টে ঘা পড়ে 'মন কুঁচকে' গেল, 'অ্যাটিটুড' বদলালো। 'কেন যে অ্যাটিটুড বদলালো, সে রহস্য বরাবর নন্দলালের অজানা।'[১৪] পরবর্তীকালে কানাই সামন্তের প্রশ্নের উত্তরে ৩০ জুন ১৯৪৪ তারিখে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেন –

> জানিনা কেন পট-ছবি আঁকার ইচ্ছা চলে গেল। হয়ত গ্রীষ্মের পর [ছুটি] ফুরিয়েছিল – কলকাতায় এসেছিলাম বা ওঁর কাছে এসে দেখলাম, যে পথে চলেছি উহা গ্রাম্য এবং সাময়িক ইচ্ছামাত্র, কেবল একটু recreation মাত্র – তাই আবার উঁচু দরের শিল্পসাধনার কথা মনে জেগে উঠল। অবশ্য উনি ঐরূপ [গ্রাম্য] হয়ত ভাবেন নাই। আমার অর্বাচীন মন ঐ ধারণা করেছিল।[১৫]

ছাত্রাবস্থায় গ্রীষ্মের ছুটিতে পট আঁকা ছিল নন্দলালের একটি খেয়াল, কম সময়ে পটের মতো ছবি এঁকে কম দামে বিক্রি করে জনসাধারণকে আনন্দদানের তৃপ্তি। শুধু দেব-দেবতার ছবি না এঁকে চারপাশের দৃশ্যমান জগতের বিষয় নিয়ে পট আঁকবার হালকা চালের খেলা। অবনীন্দ্রনাথের আচরণে নন্দলাল উপলব্ধি করেছিলেন লোকচিত্রের যে পথে চলেছেন তা গ্রামীণ সংস্কৃতির অঙ্গ, এটিকে সাময়িক বিনোদনের পর্যায়ে রাখা উচিত। শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত মার্জিত রুচির ব্যক্তির পক্ষে এ পথ অবলম্বন করা সঠিক নয়। তাই তিনি আবার ধ্রুপদী শিল্পসাধনার দিকে মনোনিবেশ করেন। মহার্ঘ

হওয়ার কারণে স্বনামধন্য চিত্রশিল্পীদের ছবি কেনা ছিল সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। মধ্যবিত্ত শিল্পপ্রেমীদের ক্ষোভ প্রশমণ করতে তাই স্বল্পমূল্যে এই ধরনের ছবি বিক্রির উদ্যোগ আরো একবার নিয়ে ঠিক করেন যেমন আঁকেন তেমনি আঁকবেন, অথচ ছবির দাম থাকবে সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে। এই ভাবনা নিয়ে ওই সময়ে তিনি পাঁচখানা ছবি এঁকে প্রত্যকটির দাম তিরিশ টাকা ধার্য করেন। 'কেন্দুলীর মেলা', 'উড়ন্ত শালিকের ঝাঁক', 'ইনোসেন্ট্ গার্ল', 'রাধার তমাল আলিঙ্গন' হল এই পর্যায়ের ছবি। ছবিগুলি ও. সি.গাঙ্গুলী ও দক্ষিণের চেট্টি মুদালিয়র কিনে নেওয়ায় স্বল্পমূল্যে মধ্যবিত্তের হাতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এই পর্যায়ে আঁকা 'কালী' ছবিটির দাম শুনে অবনীন্দ্রনাথ রুষ্ট হয়ে দুশো টাকা দিয়ে ছবিটি কিনে নেন। তিনি উপলব্ধি করেন অর্থনৈতিক কাঠামোর বদল না ঘটলে এই ধরনের 'এক্সপেরিমেন্ট' অর্থহীন।[১৬] আমরা জানি নন্দলাল বাণীপুরে পট আঁকা শুরু করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশ মাফিক। তাহলে সেই অবনীন্দ্রনাথ কেন তাঁর আচরণের মাধ্যমে শিষ্যকে এই পথ পরিত্যাগের ইঙ্গিত দিলেন সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশটি ভালোভাবে বিচার করলে খানিকটা বোঝা যায় তাঁর এরূপ আচরণের অন্তরালে লুকিয়ে আছে অন্য বক্তব্য। পট অঙ্কনের নির্দেশ দেওয়ার আগে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে বলেছিলেন এমনভাবে ছবি আঁকবে যাতে লোকে ছবি নেয়। এই লোক বলতে শিক্ষিত অশিক্ষিত দুই শ্রেণির লোককেই তিনি নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু নন্দলাল ওই সময় পট বিক্রির নেশায় অতিদ্রুত হাতে ছবি আঁকা শুরু করেন। একটি ছবি শিল্প হয়ে উঠতে যে শ্রম, সাধনা, মননের দাবি করে নন্দলালের এই ছবিগুলি স্বাভাবিকভাবে সেই দাবি পূরণ করতে পারছিল না। স্বল্প মূল্যের হওয়া সত্ত্বেও jute mill-এর শ্রমিক বা ওই শ্রেণির মানুষদেরকে তাই দরদাম করে বা প্রায় বিনামূল্যে সেই সব ছবি নিতে দেখা যায়। দেখা যায় সস্তা দামে ছবি বিক্রি করতে গিয়ে নন্দলাল নিজের মূল্য দিতে ভুলে গেছেন। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের গোচরে নন্দলালের আঁকা সেই সময়ের পটগুলি আসার মুহূর্তেই তিনি উপলব্ধি করেন, এই ধরনের ছবি শিক্ষিত মানুষের রুচি গ্রাহ্য হতে পারে না। নন্দলালের মধ্যে তিনি যে প্রতিভা দেখেছিলেন ছবিগুলি সেইরূপ ছিল না। তাই তিনি বেশি দামে সমস্ত ছবি কিনে নেন। এমন আচরণের পিছনে অবনীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল নন্দলালকে মেধাহীন পট আঁকার খেলা থেকে বিরত করা। সস্তায় ছবি বিক্রির নেশা থেকে দূরে রাখা। তিনি চেয়েছিলেন জনসাধারণকে সস্তার

বিনোদন দিতে গিয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পীটি যেন হারিয়ে না যায়। দ্বিতীয়বার নন্দলাল যখন কম দামে ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে। সেই অবস্থায় কমদামে ছবি বিক্রির প্রয়াস নিজের প্রতিভার অবমূল্যায়ন। পরিণত বয়স্ক ছাত্রের এহেন ভুলে অবনীন্দ্রনাথ রুষ্ট হন। সেই সময়ে আঁকা নন্দলালের ছবিগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন শিল্পীর উচ্চভাবনা, নিপুণ শিল্পকৌশলের সেরা প্রকাশ। ভুল সিদ্ধান্তের জন্য উচ্চমানের ছবিগুলি সস্তায় বিক্রি হওয়াকে অবনীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। তাই নির্ধারিত দামের থেকে বেশি মূল্যে ছবি কিনে তিনি তাঁর ছাত্রকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ছবিগুলির প্রকৃত মূল্য কী হওয়া উচিত। বাণীপুরের বাড়িতে প্রায় একমাস ধরে নিরন্তর পট আঁকার ফলে নন্দলাল শিল্পঅভিজ্ঞতা ও কালীঘাটের শিল্পীদের পট অঙ্কনের দক্ষতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এই সময় থেকেই কালীঘাটের পটের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।[১৭]

খ) হরিপুরা কংগ্রেসের সূত্রে পট-চর্চা

বাণীপুরের পর সাময়িকভাবে নন্দলাল পট আঁকা থেকে বিরত হলেও পটের প্রতি তাঁর যে ‘প্রীতি’ ছিল সেটা রূপ নিল হরিপুরায় যাবার পর।[১৮] গান্ধিজির (১৮৬৯-১৯৪৮) আগ্রহে লক্ষ্ণৌ (১৯৩৬) এবং ফৈজপুরের (১৯৩৭) কংগ্রেস অধিবেশনে নন্দলাল মণ্ডপ-সজ্জা, শিল্প-প্রদর্শনী, ‘তিলক নগর’ পরিকল্পনার ভার পান। দুটি ক্ষেত্রেই নন্দলাল ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসরণ ও স্থানীয় খাঁটি ভারতীয় উপকরণ ব্যবহার করেন। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির আলোকচিত্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, অসিত কুমার হালদার এবং তাঁদের শিষ্য-সতীর্থদের ছবি; অর্থাৎ প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত ভারতশিল্পের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন।[১৯] ফৈজপুরে গান্ধিজির ইচ্ছায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করে নগরসজ্জা করেন।[২০] নন্দলালের ভাবনায় মুগ্ধ গান্ধিজি স্থানীয় শিল্পীদের আপত্তি সত্ত্বেও ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের বারদৌলির কাছে হরিপুরা গ্রামের কংগ্রেস অধিবেশনে মণ্ডপ সাজানোর দায়িত্ব তাঁকে দেন।[২১] গান্ধিজি নন্দলালকে বলেন সমস্ত নগরটা শিল্প দিয়ে মুড়ে দিয়ে এমন ‘Exhibition’ করতে যাতে গ্রামের লোক রাস্তা চলতে চলতে কলাশিল্প দেখতে পায়।[২২] গান্ধিজির

নির্দেশ মতো খুব অল্প সময়ে পুরো কংগ্রেস নগরটাকেই শিল্প-প্রদর্শনীতে পরিণত করার মূল দায়িত্ব তিনি পালন করেন। এসময় তিনি বহু পটজাতীয় ছবি এঁকে চতুর্দিকে, তোরণের দ্বারে, সেবকদের থাকবার ঘরে, গান্ধিজি ও সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-?) ঘরে লাগিয়ে দেন। হরিপুরায় পটের ধরনে আঁকা যে রঙিন ছবিগুলি দিয়ে মোট চুয়ান্নটি তোরণ সাজানো হয়। দেশি রঙে মোটা তুলিতে আঁকা ছবিগুলির আবেদন পণ্ডিত-অপণ্ডিত নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ দর্শকের মর্মে গিয়ে পৌঁছায়।[২৩] গ্রামের মানুষদের সঙ্গে সংযোগ রেখে স্বদেশী চিন্তাচেতনা ও স্বদেশী উপকরণ দিয়ে আঁকা ছবিগুলি লোকশিল্পের সাবলীল স্ফূর্তিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মেজাজের দিক থেকে লোকশিল্প হলেও ধ্রুপদীশিল্প সুলভ কারিগরি কুশলতা, শিল্পীর মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ ছবিগুলিতে ফুটে ওঠে।[২৪] এইসময়ে নন্দলালের আঁকা সঙ্গীত পর্যায়ের ষোলটি, খেলাধুলা পর্যায়ের আটটি, গৃহস্থ জীবনের ষোলটি, গ্রামীণ কারিগরি বা কুটীর শিল্প পর্যায়ের বাইশটি, চিরাচরিত কাল্পনিক বিষয় যেমন পরী-উড়ন্ত মানুষ ইত্যাদি বিষয়ের ছয়টি এবং জীবজন্তু ও অলংকরণ মিলিয়ে পনেরোটি। সব মিলিয়ে মোট তিরাশিটি এবং সেগুলির প্রতিলিপি মিলিয়ে দুশোর বেশি ছবির হিসাব পাওয়া যায়।[২৫] যদিও নন্দলাল বসু নিজে প্রায় চারশোটি পটের কথা বলেন।[২৬] অনুমান করা হয় তিনি হয়তো মূল ছবি ও তার একাধিক কপি মিলিয়ে এই সংখ্যাটির কথা বলেন। এই বিপুল সংখ্যক ছবি তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য নিয়ে মাত্র উনিশ দিনে সম্পন্ন করেন। কাগজ মাউন্ট করা, পট ভূমিতে রঙ করার কাজগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা করলে ও মূলড্রয়িং-এর বনেদ তৈরি ও শেষ রেখা টেনে ছবি সমাপ্তির কাজ তিনিই করেন।[২৭] গান্ধিজির নির্দেশে নন্দলাল ছবিগুলি 'রাস্তায়, দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে' দিলেন।[২৮] গ্রামবাসীদের জন্য আকর্ষণীয় ভাবে গ্রাম্য জীবন চিত্রিত করতে তিনি 'সূক্ষ্ম কারিগরি' ও 'ঘোরপ্যাঁচ'-হীন[২৯] সারল্যপূর্ণ গ্রাম জীবনের নিজস্ব সম্পদ পটচিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও গ্রামবাংলার লৌকিক পট বা শহুরে কালীঘাটের পটচিত্রের সারল্য আর হরিপুরা পটের সারল্যের প্রেক্ষিত ভিন্ন। হরিপুরার চিত্রগুলির আঙ্গিকগত সারল্য এবং নৈপুণ্য নন্দলালের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। ছবি আঁকার জটিল কৌশল পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে ছবিকে গ্রামীণ সংস্কৃতির উপযুক্ত ও মনোগ্রাহী করে তুলতে পটের ফর্মটিকে গ্রহণ করা তাঁর সচেতন সিদ্ধান্ত।[৩০] সময়াভাবে কালীঘাটের পটুয়াদের মতো তড়িৎ গতিতে অতি দ্রুততার সঙ্গে আঁকার জন্য হরিপুরা পটগুলিতে একটা স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাব দেখতে

পাওয়া যায়। তাতে শিল্পীর দক্ষতা রয়ে যায় অথচ সূক্ষ্ম কারিগরি বাদ পড়ে যায়।[৩১] বর্তুলাকার দ্বিমাত্রিক রেখার টান কালীঘাটের পটের বৈশিষ্ট্য। আলো-ছায়ার খেলা বোঝাতে রেখাগুলি কোথাও মোটা আবার কোথাও সরু হওয়ার ফলে দ্বিমাত্রিকতার মধ্যেই ত্রিমাত্রিকতার আভাস ফুটে ওঠে। হরিপুরা পটের ছবিগুলির রেখা সাবলীল, কিছুটা আলংকারিক ধরনের; কালীঘাটের পটের এই রেখাঙ্কন রীতির থেকে অনেকটাই আলাদা। ছবির জমিকে দ্বিমাত্রিক থেকে ত্রিমাত্রিক করা কিংবা একটানা বর্তুলাকার রেখার পরিবর্তে জাপানি লিপিকলার ক্যালিগ্রাফিক রেখাঙ্কন[৩২] কৌশল সেখানে দেখা যায়। হরিপুরার পটগুলিতে চাষী, তাঁতি, কুমোর, ছুতোর, নর্তকী, খেলোয়াড় প্রভৃতি প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব কাজের ছন্দ, মাংস-পেশিময় গড়ন, পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে হাওয়ার দোলা ক্যালিগ্রাফির গতিশীল রেখার দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। ফলে সেগুলি কালীঘাটের পটের পুতুল প্রতিমার থেকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।[৩৩] কালীঘাটের পটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গোল বা পানপাতা গড়নের ভারি মুখ ও টানাটানা বড় চোখ। চোখ বড় করে আঁকা হলেও তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুখমণ্ডলের রেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হরিপুরা পটগুলিতে আঁকা লোক-জনের চোখ মুখের পাশ দিয়ে সামান্য বার করা। মুখগুলি পানপাতার গড়নে নয়, খানিকটা জৈন পুঁথিতে চিত্রিত নরনারীর মুখের ধাঁচে আঁকা।[৩৪] কালীঘাটের শিল্পীদের আঁকা নারী-পুরুষ, জীবজন্তু সবার চোখ টানা, স্ফীত ভাবালুতাময়, ব্যক্তিভেদে এবং অভিব্যক্তিভেদে এমনকি সামাজিক কদর্যতার ছবির ক্ষেত্রেও অপরিবর্তনীয়।[৩৫] কিন্তু হরিপুরা পট চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত শিল্পীর সৃষ্টি, তাই শিল্পীর রুচি ও শিক্ষা প্রভাব পড়তে দেখা যায়। চিত্রিত প্রতিটি চরিত্র তার ব্যক্তিত্বের ধরন অনুযায়ী চোখ ও মুখের বিচিত্র ভঙ্গিমায় পৃথক আবেদন সৃষ্টি করে। ব্যবসায়িক কারণে কালীঘাটের পটে খুব সামান্য সংখ্যক রঙ অপেক্ষাকৃত পাতলা ভাবে ব্যবহার তাকে অন্যান্য গ্রামীণ পটগুলি থেকে পৃথক করেছে। এই ধরনের পটে ডৌল বা 'রিলিফ' দেখানোর জন্য বিভিন্ন রঙ বা একই রঙ গাঢ় থেকে হালকাভাবে লেপন করা হয়েছে। হরিপুরার পটে খুব সীমিত সংখ্যক প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাইমারি রংগুলি ভারতীয় কায়দায় ছবিগুলিতে চাপানো হয়েছে। একটি অবয়ব বা আকৃতি মোটা তুলিতে উজ্জ্বল রঙের চওড়া ছোপে আভাসিত করে কালো বা অন্য কোন গাঢ় রঙে টানা রেখার সাহায্যে সেগুলি স্পষ্ট করা হয়েছে। গাঢ় থেকে হালকা রঙ ব্যবহার করে ডৌল সৃষ্টির প্রচেষ্টা এখানে করা হয়নি।[৩৬] ভারতীয় মানুষের

গাত্রবর্ণের বৈচিত্র্য বোঝাতে বাদামি রঙের বিচিত্ররূপে প্রয়োগ হরিপুরা পটের আরো একটি আকর্ষণ।[৩৭] নন্দলাল হরিপুরার ছবিগুলি কালীঘাটের পটুয়াদের মতো পেনসিল ব্যবহার না করে তুলি দিয়ে সমাপ্ত করেননি। ছোট ছোট 'স্কেচ্' করে নিয়ে কীভাবে এগোবেন তার 'খসড়া' এঁকে ছবির মূল রূপটিকে ধরেছেন।[৩৮] যেহেতু ছবিগুলি ছিল পরিকল্পিত ও প্রদর্শনীর জন্য সৃষ্টি তাই নন্দলাল মূল ছবির সাথে একাধিক প্রতিলিপির সামঞ্জস্য রাখতে পুরো বিষয়টি ছকে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ছবির মূল বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে কালীঘাট পট অঙ্কনের ক্ষেত্রে পশ্চাদপটে হালকা রঙের ব্যবহারের বাধ্যবাধকতাকে তিনি মানেননি। ছবির নিজস্ব প্রয়োজনে পশ্চাদপটে কোথাও হালকা কোথাও গাঢ় রং ব্যবহার করেছেন। কালীঘাট পটের মতো পশ্চাদপটকে একেবারে ফাঁকা না রেখে মূল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছোট বড় মোটিফ এঁকে পশ্চাদপটের শূণ্যতাকে পূরণ করেছেন। কালীঘাটের পটে নারী-চরিত্র ও পুরুষ-চরিত্রগুলির পোশাক-পরিচ্ছদ ও অঙ্গ-সজ্জা একটি নির্দিষ্ট গতে বাঁধা। হরিপুরা পটে চরিত্র অনুযায়ী ও পেশা অনুযায়ী পোশাক এবং সাজসজ্জা পরিবর্তিত হয়েছে। চরিত্ররা যেন নাটকের নট-নটী হয়ে নাট্যদৃশ্যের দাবি অনুযায়ী সাজঘর থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ বদল করে এসেছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনই যেন ছবির চরিত্রগুলিকে বাস্তব করে তুলেছে। কালীঘাটের পট তৎকালীন সময়ের সামাজিক ঘটনাবলি ও ব্যভিচারকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে উপস্থাপন করেছিল বলেই পটগুলিকে সামাজিক দলিল হিসাবে গণ্য করা যেতেই পারে।[৩৯] অন্যদিকে হরিপুরা পটগুলি আঁকার সময়ে সেগুলিকে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে নন্দলাল সামাজিক মেজাজ অনুযায়ী গ্রামের নরনারী, দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, খেলাধুলা, উৎসব-অনুষ্ঠানের ছবি এঁকেছেন। হরিপুরার পটগুলি আঁকার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে শিক্ষাদান করা ও স্বদেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।[৪০] ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা 'পরম্পরা পুনঃপ্রবর্তনের' প্রচেষ্টা অধিক পরিলক্ষিত হয়।[৪১] কালীঘাট পট ও হরিপুরা চিত্ররাজি এ ভাবেই নিজ নিজ ধারায় সমকালকে বর্ণনা করেছে। হরিপুরার ছবিগুলি মিউরালধর্মী। লক্ষ করার বিষয়, প্রতিটি ছবিতেই আছে একটি নির্দিষ্ট আকারের বাঁধুনি। একটি বাঁকা খিলানের মতো ঘেরের মধ্যে মূল বিষয়বস্তুটি উপস্থাপন করা হয়েছে। দেওয়ালে ভিত্তিচিত্রের মতো পরপর রাখা হবে জেনেই পরিসীমার মিল রাখতে, শিল্পীর এই পরিকল্পনা বলে মনে হয়।[৪২] যদিও ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের উপাদান,

উপকরণ ও পদ্ধতি কোনটাই এখানে ব্যবহার করা হয়নি। সস্তা বোর্ডে সাঁটা কাগজে আঁকা ছবিগুলির ধরন ভিত্তিচিত্রের মতো। হরিপুরার ছবিগুলিকে ভিত্তিচিত্রের সগোত্রীয় বলার অপর একটি কারণ উল্লেখ করে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেছেন –

> পরম্পরা ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার অনবদ্য সংযোগে এই চিত্ররাজির সর্বত্রই বিদ্যমান। শিল্পী কোনো একটি বিশেষ প্রাচীন বা নবীন শিল্পআদর্শকে স্বীকার না করে সাময়িক মতিমেজাজ অনুযায়ী এই চিত্রগুলি রচনা করেন। রূপে বর্ণে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন হয়েও হরিপুরা চিত্রাবলীর অন্তরে যে প্রবাহের ভাব সেটি রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণের পরিমাণ ও অবস্থানের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। বিষয় নিরপেক্ষ রূপরঙের প্রবাহ থাকার কারণেই এই ছবিগুলিকে নন্দলাল-রচিত ভিত্তিচিত্রের সগোত্রীয় বলা চলে।[৪৩]

রঙ ও ছবি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা ও সরল বোধগম্যতা পোস্টার শিল্পের একটি গুণ। এই গুণের ভিত্তিতেই হরিপুরা পটের ছবিগুলিকে অনেকেই পোস্টার বলে থাকেন। নন্দলাল গ্রামজীবনের দৈনন্দিন বিষয়, গ্রামের নরনারী, উৎসব-অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, বিভিন্ন পেশার মানুষকে সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গভীরতা দিয়ে এমনভাবে মূর্ত করেন যা দেখে গ্রামবাসী ও আপামর ভারতবাসী নিজেদের জীবন, পরিবেশ ও স্বদেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ছবিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিল্পরসিকদের কাছেও বুদ্ধিগ্রাহ্য। তবে পোস্টার বলতে যদি বক্তব্য প্রধান ছবি বোঝায় বা বিজ্ঞাপন বোঝায় তাহলে হরিপুরার ছবিগুলি তা ঠিক নয়।[৪৪] নন্দলাল বসু হরিপুরা পট আঁকার ক্ষেত্রে কালীঘাটের প্রভাবের কথা স্বীকার করলেও হরিপুরা পট কালীঘাট পটের অন্ধ অনুকরণ নয় একথা বলা বাহুল্য।[৪৫] হরিপুরা পটে ভারতীয় প্রাচীন বা নবীন শিল্প আঙ্গিক অথবা কোন বিদেশি শিল্পাদর্শের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সাময়িক মেজাজ। রাজনৈতিক সভার নীরস শুষ্কতা তাঁর তুলির স্পর্শে রসমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।[৪৬]

বাণীপুরের বাড়িতে বসে আঁকা পট এবং হরিপুরার পটধর্মী চিত্রগুলি ছাড়াও নন্দলালের আঁকা বেশ কিছু ছবিকে পট হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। **১৯১১** খ্রিস্টাব্দে আঁকা রাম-সীতা-উপাখ্যানের রূপরাজিকে পট হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ, 'বিশেষের বাস্তবতা বা রিয়েলিজ্‌ম্'হীন ছবিগুলি আঁকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'সীমাবদ্ধ পটভূমির মণ্ডন বা অলংকরণ'।[৪৭]

গ) পট ও নন্দলালের দৃষ্টিভঙ্গি

ধ্রুপদী শিল্পের পাশাপাশি অনভিজাত লোকশিল্প তথা 'পট' সম্পর্কে নন্দলাল বসুর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি অজন্তা, বাগ, কাংড়া, রাজস্থানী ছবির সঙ্গে দেশী পটের মিল খুঁজে পান। উইলিয়াম জর্জ আর্চারের (১৯০৭–১৯৭৯) *Bazar Painting of Calcutta* (১৯৫৩) বই সম্পর্কে তিনি বলেন –

> ...একসঙ্গে কালীঘাটের পটগুলি ছাপায় দেখে মনে হয় যেন খোটান বা অজন্তার বা নারার ছবির বংশধরদের দেখছি। কালীঘাটের পট পদ্ধতি অতি পুরাতন হঠাৎ হয় নাই, মোগল বা পারস্যর ছাপ অতি কম আছে। সময় ও উপকরণের (পরিমিতির) জন্য এই চেহারা হয়েছিল। বিলাতি আধুনিক শিল্পীদেরও influence করেছে। ইহা চিনা কাচের ছবির অনুকরণ নয় বরং খোটানের অনুকরণে চিনা কাচের ছবি হয়েছে।[৪৮]

অজন্তার গুহাচিত্রের কপি করতে নন্দলাল মিসেস হ্যরিংহামের সঙ্গে সেখানে যান। ফিরে এসে সেই ছবিগুলির কপি এবং তারও কপি করতে হয় তাঁকে। সেই কপিগুলির একসেট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেন ও মিসেস হ্যারিংহাম অন্য সেট নেন। সেই সময় কপি করতে গিয়ে নন্দলাল অনুভব করেন অজন্তার ছবির সঙ্গে পটচিত্র-পাটাচিত্রের 'শিল্পছন্দের' মিল রয়েছে। তাছাড়া উড়িষ্যার পট ও পাটা শিল্পের সঙ্গে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদের পট ও পাটার ছবির 'বিষয় আর অঙ্কনপদ্ধতি' প্রায় অনুরূপ।[৪৯] তাঁর মনে হয়, বাংলার এই দেশি চিত্রবিদ্যার শিকড় বহু প্রাচীন কালের। আর এই প্রাচীন চিত্রকলার অবস্থান কেবল বাংলায় নয় দ্বীপময় ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদেরকেও পট বিষয়ে স্টাডি করতে বলতেন। একবার কানাই সামন্ত (১৯০৪–১৯৯৫) বাংলার পট ও উড়িষ্যার পটে তফাৎ বুঝতে না পারায় তিনি তাঁকে বলেন, ভারতশিল্পের নিদর্শনগুলি ঠিক মতো না দেখলে না বুঝলে কোনদিন বড় কোন সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং প্রতিটি অঞ্চলের নিদর্শন ও শিল্পকর্মগুলি দেখে ভারতশিল্পকে বুঝতে হবে তাঁর অন্তরাত্মাকে চিনতে হবে।[৫০] নন্দলাল কেবল বাংলার পট নয়, জগন্নাথের পট সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন *শিল্পচর্চা* গ্রন্থটির 'জগন্নাথের পট' অধ্যায়ে। প্রথমেই এই ধরনের পট তৈরির মোট ষোলটি উপকরণ ক্রমানুসারে বর্ণনা করেছেন – ক) ছবি রেখে আঁকবার জন্য একটি কাঠের পাটা, খ) সমান সুতো ও ঠাস-বুননি ওয়ালা মোটা খদ্দর বা তাঁতের কোরা কাপড়, গ) পাথুরে খড়ি বা কাঠখড়ির সাদা রঙ, ঘ) তুলি রাখবার জন্য বাঁশের চোঙ, ঙ) নারকেলের মালা, চ) পাত তাতাবার জন্য আগুনের পাত্র,

ছ) জৌসা[৫১] করার জন্য আগুনের পাত্র, জ) কাঠ কয়লা, ঝ) ভালো মানের গালা বা রজন, ঞ) কৎবেল[৫২] আঠা , নিম বা বাবলা গাছের আঠা, ট) তেঁতুল বীজ, ঠ) বালির পুটলি, ড) মাটির সরা, ঢ) মসৃণ ঝামা ইঁট, ণ) শঙ্খ বা সমুদ্রের কড়ি, ত) কেয়াডাঁটির তুলি বা উটের লোমের তুলি ইত্যাদি।[৫৩] উপকরণগুলি কতটা পরিমাণে নিতে হবে, কেমন মানের নিতে হবে, কেমনভাবে সেগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু উপকরণের ছবি এঁকে দেখিয়েছেন। এরপর যথাক্রমে পটের জমি, খসড়া প্রস্তুত, তুলি তৈরি, রঙ তৈরি ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার পর জগন্নাথের পট অঙ্কনের ক্রমটিকে বর্ণনা করেছেন এবং ওড়িয়া ভাষায় ক্রমটির নামোল্লেখ করেছেন দেখিয়েছেন। ওড়িয়া ভাষায় পট ধাপগুলি হল – ক) 'ছকা', যেখানে ঈষৎ গেরুয়া রঙের জমিতে পাতলা সাদা রঙের খসড়া অঙ্কন ও অন্য নানা রঙের ব্লক অঙ্কন, খ) 'লাল কাঠি', অর্থাৎ লাল রঙ দিয়ে ছবির মধ্যে বস্তুর ঘেরগুলি বার করে নেওয়া, গ) 'টোপাটুপি', অর্থাৎ সাদা ও অন্যান্য রঙের ফোঁটা দেওয়া, ঘ) 'কালোকাঠি', অর্থাৎ কালো রঙের রেখা দিয়ে ছবি সমাধা করা।[৫৪] সবশেষে রয়েছে দেশি পদ্ধতিতে জৌসা করার বর্ণনা। জগন্নাথের পট আঁকতে ব্যবহৃত 'শঙ্খ-সাদা' তৈরির পদ্ধতি পুরীর পটুয়াদের কাছ থেকে শিখে লিপিবদ্ধ করেছেন।

নন্দলাল পটশিল্পের সহজ সরলতায় আকৃষ্ট হয়ে বহু ছবি এঁকেছেন, কিন্তু সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থে কোন ভাবেই পটের ছবি বলা যাবে না, তা একান্ত ভাবে নন্দলালের নিজস্ব সৃষ্টি।[৫৫] বিষয়গত ও শৈলীগত দুদিক থেকেই লোকশিল্পের এই ধারাটিকে তিনি অনুকরণ করেননি, এটি তাঁর অনুপ্রেরণার স্তরেই রয়েগেছে। পটশৈলী সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে বোঝা যায় পটকে তিনি দেখেছেন গবেষকের মতো, আর ব্যাখ্যা করেছেন শিক্ষকের মতো।

২.১.২ যামিনী রায়ের চিত্র ও ভাবনায় পটচিত্র অনুষঙ্গ

বিষ্ণু দের 'চড়ক ঈষ্টার ঈদ ও রোজা' কবিতাটিতে যামিনী রায়ের শিল্পচর্চা যাত্রার একটা চিত্র পাওয়া যায় –

কর্ম শুধু ক্লান্তি, অসংলগ্ন অর্থহীন,

শত অর্থ খোঁজার পরেও অনর্থক।

তারপর ক্লান্ত ফেরা।

গ্রামে কিংবা গ্রাম্য জীর্ণ অতিকায় শহরেই হোক।[৫৬]

পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির শিল্পচর্চা এবং ভারতীর শিল্পেকে আদর্শ করে বেঙ্গল স্কুলের[৫৭] চিত্রচর্চায় যথাযথ আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয় বলে মনে করে তিনি যখন ভিন্ন পথের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তখন অন্তরের দ্বন্দ্ব আর বহু সাধনার পর সাবেক শিল্প তথা বাংলার পটের সহজ সরল সটান ভঙ্গিমায় তিনি তাঁর মানস প্রতিমার সন্ধান পান। সাবেক শিল্পের সঙ্গে যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত আত্মিক যোগ, অনুপ্রেরণার বাস্তব উৎস, তাঁর প্রতিভা, সময় ও সমাজ তাঁকে কতটা প্রভাবিত করেছে সেই প্রশ্ন আসতে বাধ্য।

ক) পটচিত্র: যামিনী রায়ের অনুপ্রেরণা

যামিনী রায় যেকোন গুণী শিল্পীর মতো সর্বদাই পাঠ নিতে প্রস্তুত। ভারতীয় জীবনের শিকড় সন্ধানে তিনি নিজের গ্রামের ফেলা আসা শৈশবের স্মৃতির আঙ্গিনায় আশ্রয় খুঁজে পান। বেলেতোড় গ্রামের সন্নিকটস্থ পটুয়া পাড়ার পটুয়াদের আঁকা ছবি তাঁকে মুগ্ধ করত, বার বার ছুটে যেতেন সেখানে। ওই অল্প বয়সেই পটুয়াদের জীবনের সঙ্গে ছবির ওতপ্রোত সম্পর্ক, তাদের জীবনযাপন, রঙ তৈরি তুলি তৈরির পদ্ধতি তাঁর ছোট্ট মনে দাগ কেটে যায়। শৈশবের সেই টান থেকে অর্থ যশ ও প্রতিষ্ঠার মায়া ত্যাগ করে তিনি নিজ জন্মস্থান বেলেতোড়ে গিয়ে সেখানকার নানা লোকশিল্পের সঙ্গে পটচিত্রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। গ্রামীণ পরিবেশকে তিনি তাঁর শিল্পও সাধনার পক্ষে অন্তরায় মনে করে সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে কলকাতা শহরকে বেছে নেন। কেননা তাঁর মতে –

> শ্মশান না হলে শবসাধনা হয় না। প্রত্যেক সাধনার সাধনপীঠের প্রয়োজন হয়। এ যুগের কলকাতাই হ'ল সাহিত্যের শিল্পের সাধনপীঠ।[৫৮]

যামিনী যে সময় লোকশিল্পের ধারাতে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করে শিল্পচর্চা করার কথা ভাবছেন সেই সময় কলকাতায় কালীঘাটের পট ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহী শিল্পী কালীঘাটের পটুয়াদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ধৈর্য ও অধ্যাবশায়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের রেখাঙ্কনের সাবলীল ভঙ্গি ও সীমিত রঙ ব্যবহারের কৌশল পর্যবেক্ষণ করেন। বেলিয়াতোড়, কলকাতা,

মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া সহ বাংলার নানা অঞ্চল থেকে তিনি পট সংগ্রহ করেন।[৫৯] উপলব্ধি করেন বাঙালি পটুয়ারা রেখার সাহায্যেই তাদের মনের কথা বলে গেছে। পটের বিষয়বস্তু, উপকরণ ও পদ্ধতির দ্বারা তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। দীর্ঘ অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার পরিপক্ক মন এবং পরিণত শিল্পচেতনা নিয়ে তিনি গ্রামীণ শিল্পকলার মধ্যে নিহিত সরল সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সংকেতকে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যামিনী যখন আত্মপরিচয়ের দিশা খোঁজার সংকটময় অবস্থায় উপস্থিত তখন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ্রাসনে মানুষ বিদ্ধস্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সভ্যতার সংকট* (১৩৪৮) এবং জাপানিও ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদকে ধিক্কার দিয়ে অনেকগুলি কবিতা ('বুদ্ধভক্তি', 'আফ্রিকা', 'শ্রাদ্ধ', 'অপঘাত', 'আহ্বান', 'প্রায়চিত্ত', *প্রান্তিক* (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থের সতেরো ও আঠারো সংখ্যক কবিতা, *জন্মদিনে* (১৩৪৮) কাব্যগ্রন্থের ষোল ও একুশ সংখ্যক কবিতা, *পত্রপুট* (১৩৪৩) কাব্যগ্রন্থের সতেরো সংখ্যক কবিতা ইত্যাদি) লিখেছেন। তখন দেশে অর্থনৈতিক মন্দা, হতাশা, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা ও ঝড়, মহামারী, একদিকে যুদ্ধের বিভীষিকা, অন্যদিকে শাসক ইংরেজের নির্মম অত্যাচার চলছিল। সাহিত্য-শিল্প সর্বত্র স্বাদেশিকতার প্রভাবে বিলাতি দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি আর্ট বর্জনের সংকল্প শিল্পীদের মনে দৃঢ় হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্বে একদিকে যেমন অজন্তার গুহাচিত্র, মোগল ও রাজপুত ঘরানায় চিত্রচর্চা আন্দোলনের মাধ্যম হয়েছে তেমনি অন্যদিকে শিল্পীদের চিত্রে সমকালীন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমাজ ও মানসিক অস্থিরতা ফুটে উঠেছে। যামিনী রায় সেখানে স্পষ্টতই ঘোষণা করেন যে তিনি এমন হানা হানির রক্তাক্ত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন না।[৬০] দেশের এই অস্থিরতার সময়ে তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে শান্তি দিতে। তিনি উপলব্ধি করেন যে কোন জটিল রেখা, রঙের কারসাজি, চিন্তার বিশ্লেষণে, তত্ত্বায়িত জীবনে নয়, মানুষ শান্তি পাবে সরলতায়। তাই জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে তিনি বেছে নেন পটচিত্রের জটিলতামুক্ত সহজ রীতি নীতিকে।[৬১]

যামিনী রায়ের জীবনের পথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার পিতা রামতারণ রায়ের একটি বড় প্রভাব রয়েছে। শিল্পীর কথা থেকেই জানা যায় রামতারণ বাবু একসময় ছিলেন সরকারি চাকুরে। পরে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে বেলিয়াতোড়ে ফিরে এসে চাষীর জীবন আরম্ভ করেন। পারিবারিক দিক থেকে স্বচ্ছলতার অভাব না থাকলেও বিলাসীতামুক্ত সরল জীবন যাপনকে বেছে নেন। তিনি যামিনীকে

পেন্সিলের বদলে নখ দিয়েই কাগজে ড্রয়িং শেখান। তিনি বলতেন 'আমাদের সকলের এক হাতে যেন বই, অন্য হাতে লাঙল'।[৬২] এই নীতি দ্বারা চালিত হয়েই শহরে শিক্ষাগ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রামীণ শিল্পকলার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেন। অনুভব করেন শিক্ষা ও মাটির সরলতা মেলাতে হবে। যামিনী রায় আরো দুজন মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হন। বাংলার লোকশিল্পের আঙ্গিককে গ্রহণ করলেও সরলরেখা, বক্ররেখা, বিসপির্ত রেখার মাধ্যমে ছবিতে জীবনের সহজ ছন্দটিকে সংযোজিত করার প্রয়াস ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিল্পী যখন বিভোর, তখন একদিন তাঁর পুত্র পটলের (অমিয় রায়) স্লেটে আঁকা ছবি অন্যমনস্কভাবে চোখের সামনে মেলে ধরতেই অবাক হয়ে যান।[৬৩] তিনি দেখেন পটলের আঁকা ছবিতে চোখ দুটি মুখে সীমানার বাইরে চলে গিয়েছে। ছবি আঁকার ধরন তাঁকে নতুন দিশা দেখায়। সহজসরল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে পথের সন্ধান তিনি করছিলেন তা তিনি পান শিশুর সারল্যপূর্ণ ছবিতে।[৬৪] শিশুর দেখার মধ্যে যে সারল্য রয়েছে প্রাগৈহাসিক যুগের শিল্প তথা পটচিত্রে রয়েছে জটিলতা মুক্ত, সমাজ সংস্কার মুক্ত সেই সারল্য, বিস্ময় ও শুদ্ধতা; ছবি আঁকার মধ্যে আছে অকৃত্রিম আনন্দের প্রকাশ। তিনি লক্ষ করেন পটুয়ারা যে চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করতে চায় শিশুদের মতোই তা তাদের সচেতন প্রয়াস নয়। প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি না করে প্রকৃতির মূল কথাটুকু প্রকাশের অসচেতন সরলতার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গী ও সরলতাকে রপ্ত করে ছবিকে বয়স্ক মনের জটিলতা-দ্বন্দ্ব মুক্ত সহজ-সরল সুন্দর করে তুলতে হবে।[৬৫] তিনি বলেন সমস্ত শিল্পেই 'শিশুমনটি' অপরিহার্য, যদিও তাকে হতে হবে 'সচেতন শিশু'।[৬৬] তাঁর পরিণতবয়স্ক শিল্পেও শিশুর লীলাই আমরা দেখতে পাই।[৬৭] তাঁর পটশিল্পের প্রতি অনুরাগের পিছনে স্ত্রী আনান্দময়ী দেবীর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে দেখে অশোক মিত্রের অনুভূতি উদ্ধারযোগ্য –

> মুখের দিকে চাইলে থমকাতে হয় কারণ সে-মুখের পটসুলভ প্রতিচ্ছবি যামিনীবাবুর ছবিতে ইতিমধ্যেই অমরত্বলাভ করেছে। শান্ত, স্থির প্রকৃতির অথচ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য...।[৬৮]

লেখক যামিনী রায়ের স্ত্রীয়ের চলনে যে সুলক্ষণ ভাব প্রত্যক্ষ করেন ছবিতে এবং চিত্রিত নারীদের মুখে সেই শান্ত-সুলক্ষণ রয়েছে। শিল্পীর স্ত্রী-চরিত্রদের অনেকেরই পোশাকের ধরন অশোক মিত্র বর্ণিত শিল্পীর স্ত্রীয়ের পোশাক পড়ার ধরনের মতো। সুনয়নী দেবীকে (১৮৭৫–১৯৬২) লোকশিল্পধারার প্রথম শিল্পী বলে মনে করা হয়। দেশজ উপকরণ ও বিষয়বস্তুতে আঁকা তাঁর ছবিতে পটচিত্রের আঙ্গিকে টানা

অর্ধনিমীলিত দীঘল চোখ দেখতে পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি আঁকার সূত্রে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে দীর্ঘ অতিবাহিত করার সময় অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের মাধ্যমে যামিনী সুনয়নী দেবীর ছবি আঁকার সঙ্গে পরিচিত হন। সুনয়নী দেবীর ছবির লোকজরূপ এবং দেশি উপাদান ব্যবহারের দ্বারা যামিনী গভীরভাবে প্রভাবিত হন।[৬৯] যদিও যামিনীর ছবির নিজস্ব শৈলী সুনয়নী দেবীর ছবির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের।

খ) পট ও পটুয়াদের সঙ্গে যামিনী রায়ের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

পৈতৃক জমিদারির সম্পদে যামিনী রায় ছিলেন প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু পটুয়াদের মতোই সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধারণ জীবনযাপনই পছন্দ করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন – তিনি একজন ‘সাধারণ পটুয়া’ এবং তার ঐতিহ্যই তাঁর অনুসৃত।[৭০] তিনি একই ছবি বহুবার এঁকেছেন। এই ধারণা তিনি জড়ানো পট ও কালীঘাটের পটুয়াদের থেকে পান। পুনরাবৃত্তির প্রশ্নে তিনি বলেন – ‘আমি যে পোটো’।[৭১] তবে তিনি আদৌ ‘পটো’ কি না সেই বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কিংবদন্তি, সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক সমস্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করে বলা যায় পটুয়ারা মিশ্র জাতি। তাঁরা কোনদিনই পুরোপুরি মুসলমান সমাজের অন্তর্গত হতে পারেননি আবার হিন্দু ধর্মের লোকেরাও তাঁদেরকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তারা হিন্দু মুসলমানের মাঝে রয়ে যায়।[৭২] কিন্তু যামিনী রায়ের বংশগত দিক থেকে এক গৌরবময় উত্তরাধিকার আছে। জন্মসূত্রেই তিনি হিন্দু এবং কোনরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই এই ধর্মকে তিনি আজন্ম পালন করেছেন। বৌদ্ধ মুসলিম ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি দ্বারা কালের নিয়ম অনুসারে যতটা সমগ্র বাঙালি হিন্দু জাতি প্রভাবিত হয়েছে ততটুকুই, তার থেকে বেশি কিছু তিনি গ্রহণ করেননি। হিন্দু লোকাচারই তাঁকে বেষ্টন করে থেকেছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সমস্তই হিন্দু রীতি মেনেই হয়েছে। তিনি চিরকাল ছবি আঁকার সাথে যুক্ত থেকেছেন। পটুয়াদের মতো মিশ্র বৃত্তি গ্রহণ করেননি। যদিও বা তর্কের খাতিরে ধরে নিতে হয় তিনি পটুয়া, তাহলে তাঁকে ‘চিত্রকর পটুয়া’[৭৩] শ্রেণির অর্ন্তগত বলে ধরতে হবে। যামিনী রায় পট আঁকলেও পটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাহিনিমূলক গীতের অবতারণা করেন না। পটুয়ারা লোকশিক্ষক ও লোকরক্ষকের ভূমিকা পালন করে আসছেন সেই সুদূর অতীত থেকে।[৭৪] তিনি মানুষকে আনন্দ দিতে ছবি আঁকেন, কোন নীতিবাক্য তাঁর

ছবির বিষয়বস্তু নয়। তিনি দেখেন বাঙালি পটুয়ারা প্রধানত রেখার সাহায্যেই তাঁদের মনের কথা আশ্চর্য নিপুণভঙ্গিতে বলছেন। বৃষ্টির জলধারা যেমন মাটির উপর দিয়ে ডালপালার ভঙ্গিতে স্বাভাবিক গতিতে গড়িয়ে চলে, পটুয়াদের রেখাগুলিও তুলির মুখ থেকে সহজে বেরিয়ে ছবির রূপ ধারণ করছে।[৭৫] পটচিত্র অনুসরণে তাঁর প্রধান দাবী ছিল ছবি আঁকার জটিল রীতি ও নীতিকে সহজ করা। শিশু যেমন করে খেলা করে ঠিক তেমনি করে তিনি এদের মোটিফ এবং ছবি আঁকার পদ্ধতির নকল করেন।[৭৬] পটশিল্পীদের সামান্য বস্তুর মধ্যে চিরন্তন সত্য, ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতাতে তিনি মুগ্ধ হন। গ্রামীণ লোকশিল্পের এই ফর্মটিকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে রামায়ণ মহাভারত-এর নানা কাহিনি, মহাদেব, কৃষ্ণলীলা, মঙ্গলকাব্যের নানা দেবদেবী ইত্যাদির সঙ্গে বেলিয়াতোড়ের জনসমাজে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই পটের আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাঁওতালদের নাচ-গান, মাদল-বাদন, সাঁওতাল রমণীর প্রসাধন, সাঁওতাল মা ও শিশু, লাঙল হাতে চাষী, কীর্তন গায়ক, বারব্রত ও পূজারত গ্রাম্য মেয়ে, কর্মরত ছুতোর প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পটধর্মী ছবিতে মাতৃরূপের যে প্রকাশ ঘটে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে মায়ের আদলে গড়া নয়, পৌরাণিক মহিমায় সমুজ্জ্বল।[৭৭] বিষ্ণু দে যামিনী রায়ের ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করেন –

> তাঁর ছবি দেখে অনুভবে আসে ভারতীয় জনসাধারণের জীবনের গভীর নাড়িস্পন্দন, যে জনসাধারণের প্রতিবেশিত্বে এই শিল্পের জীবন। তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছেন তাঁর দেশের লোকের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম, ধর্ম দৃশ্যাবলী, বিচিত্র আনুষ্ঠানিক নৃত্য, কর্মরত সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। রঙ দিয়ে, রূপ দিয়ে সর্বত্রই তাঁর চিত্রলোকে পুনরাবিষ্কৃত হয় চৈতরূপ বিরাট ভারতবর্ষ, আধ্যাত্মজীব্য, দুর্জ্ঞেয়, ইন্দ্রিয়জীব্য, লালিত্যে প্রায় নারীস্বভাব।[৭৮]

পটুয়াদের থেকে গোলাকার রেখাঙ্কনের গোপনীয়তাটুকু শিখে নিয়ে অবয়বের সঙ্গে সংগতি রেখে দ্রুত রেখাঙ্কনের মাধ্যমে তিনি একের পর এক সৃষ্টি করে চলেন। বঙ্গবধু পর্যায়ের ছবিগুলিতে বুদ্ধদেব বসু রেখাঙ্কনের এই কৌশলকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে এই ছবিগুলিতে একটি মাত্র বক্র রেখার মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নারীর যৌবনের সকল শ্রী ও সৌষম্য ও উষ্ণতা।[৭৯] বাঁকুড়ার পট, বিশেষত কালীঘাটের পটের সাথে যামিনীর ছবির আত্মিক মিল খুঁজে পেয়েছেন সমালোচকগণ। পটচিত্রের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বাহ্যিক দিক থেকেও তাঁর ছবি পটচিত্র বলে গণ্য হওয়ার

কতগুলি মূল শর্ত পালন করছে। নতুন ফর্মের সন্ধানে প্রথাগত ফর্মকে ত্যাগ করলে তাঁকে চরম দারিদ্রতার সম্মুখীন হতে হয়, সেই 'স্ট্রাগলিং পিরিয়ডে'[৮০] মূলত দারিদ্রতার কারণেই ক্যানভাসের অভাব মেটাতে পারিবারিক আলমারি থেকে ধুতি শাড়ি নিতে হত।[৮১] একটু যদি পিছনে ফিরে তাকাই তাহলে আমাদের মনে পরবে যে পটচিত্র অঙ্কনের প্রথম পর্বে চিত্র অঙ্কনের জন্য কাপড় ব্যবহৃত হত। যাইহোক শুধু মাত্র দারিদ্রতার কারণেই নয় কিছুটা সচেতন ভাবেই তিনি ছবির চিত্রপট তৈরিতে ঘরে বোনা কাপড়ের উপর মাটি ও গোবরের প্রলেপ ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন হাতে তৈরি কাডবোর্ড, দানাদার মোটা কাগজ, তালপাতা অথবা চাটাই।[৮২] এইগুলি সম্ভব হয়েছে দেশের প্রাচীন পুরুষদের মতোই শুধু কার্যকারণের পূর্বজ্ঞান থেকে।[৮৩] পটচিত্রণের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহৃত মূলত সাতটি রঙ, যথা – ভারতীয় লাল, সিঁদুরে লাল, কালচে হলুদ, কাঠকয়লার ধূসর, ক্যাডমিয়াম সবুজ, নীল, সাদা পটুয়া রীতির অনুসরণে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত করেন। উদ্ভিজ রঙ ফুল, পাতা, বীজ ও গাছের ছাল, বা স্থানীয় রঙিন পাথর ও মাটি গুঁড়ো করে তাঁর সঙ্গে তেঁতুল বীজের কাঁই ও গোবর জল ছেঁকে মিশিয়ে অথবা ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে রঙ তৈরি করেন। সিঁদুররঙের জন্য হিঙ্গুল, ধূসররঙের জন্য নদীর পলিমাটি, নীলরঙের জন্য চাষের নীল ও পাথর, সাদার জন্য সাধারণ খড়ির রঙ এবং হাড়ির পিছনের কালি, সন্ধ্যাপ্রদীপের ভুসো থেকে কালো রঙ তৈরি করেন।[৮৪] তবে ছবিতে রঙের স্থায়িত্বের ব্যপারে কখনো কখনো তাঁর উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। তাঁর আঁকা অনেক ছবির রঙেই পরে ফাটল ধরেছে। তিনি এক সময় এর সপক্ষে বলেন, তাঁর ছবির রঙ বা জমির স্থায়িত্ব কম হতে পারে, তাতে অসুবিধা নেই। কারণ মানুষ মুহুর্তের বিনোদনের জন্য যে পরিমাণ খরচ করেন তার থেকে তাঁর ছবির মূল্য অনেক কম।[৮৫] আসলে তিনি তাঁর ছবিগুলির দীর্ঘায়ু ও সত্যতাতে তেমনভাবে গুরুত্ব দেননি। রঙ রাখার পাত্র নির্বাচনেও প্রশিক্ষিত শিল্পীর মতো বাজার চলতি প্যালেট ব্যবহার না করে তিনি পটুয়া রীতির অনুসরণ করে সস্তা ভাঁড়, নারকেলের মালা ব্যবহার করেছেন। তবে তুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যগত পটুয়াদের থেকে ভিন্ন ছিলেন। তিনি ছাগল, ভেড়া বা কাঠবেড়ালির লোম থেকে তুলি তৈরিতে সময়পাত না করে বাজার চলতি সহজলভ্য তুলিকেই বেছে নেন।[৮৬]

যামিনী রায় নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পে নিরুৎসাহী মানুষের চোখেও বিশেষ চিত্র শৈলীর আভাস ফুটে ওঠে। তাঁর এই শৈলী সম্পর্কে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন, বোধহীন পুনরাবৃত্তির ফলে সৃষ্ট গড়নের মুদ্রাদোষকেই পটের বিশেষত্ব বলে ধরে নিয়ে যামিনী নিজেকে সেই গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন। তাঁর মতে পটের 'ম্যানারিজম' এবং পটচিত্র অনুকরণ লব্ধ নিজস্ব 'ম্যানারিজম' মিলে যামিনী রায়ের 'কায়দা বা স্টাইল' তৈরি হয়।[৮৭] একাধিক বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য, যামিনী রায় সদর্থে একজন আধুনিক শিল্পী বলে গণ্য হতে পারেন না, তিনি আসলে একজন 'পোটো' অর্থাৎ পটুয়া শিল্পী মাত্র, তাঁরা এও বলেছেন তাঁর ছবিতে পটের অক্ষম অনুকৃতি রয়েছে মাত্র। অসিতকুমার হালদার বলেন – যামিনীর চিত্রপট 'চোখে আঙুল দিয়ে' দেখিয়ে দেয় তা কালীঘাটের পটুয়াদের 'নকল'। তিনি কালীঘাটের পটুয়াদের দ্রুত অঙ্কন দক্ষতা, 'potential technique' কিছুমাত্র আয়ত্ত করতে পারেননি, 'নতুন পন্থা' আবিষ্কার না করে ম্যানারিজমকে আঁকড়ে ধরেছেন।[৮৮] সমালোচকদের বিরূপ সমালোচনা যতই তাঁকে 'পটুয়া' বা 'পটুয়াদের থাকেও হীন দক্ষতার শিল্পীর পর্যায়ে নামিয়ে আনুক না কেন বলা বাহুল্য পটধর্মী ছবি আঁকলেও তাঁকে পটুয়া বলে স্বীকার করার কোনো উপায় থাকে না।[৮৯] পটচিত্র থেকে তিনি প্রেরণা পেলেও নিজেকে এর 'অসংস্কৃত তারল্য' থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখেন।[৯০] দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি (১৮৯৯–১৯৭৫) তাঁর রচিত চিত্র সম্পর্কে বলেন –

> ছবির পরিবেশকে যে ভাবে হিসাব করে গোছানো হয়েছে অর্থাৎ 'Compactness in the Composition' পটুয়ার চালকে বিধ্বস্ত করে যামিনীদাকে আঁকড়ে ধরেছে জোর করে বলবার জন্য যে-যে নতুন প্রথায় তিনি ছবিতে রূপ দেখাতে চাচ্ছেন সেটি তার নিজস্ব দান এবং এই দান যে আমাদের কৃষ্টির একটি বৃহৎ সম্পদ তা অস্বীকার করার উপায় আমার মত পরশ্রীকাতরের পক্ষে সম্ভব নয়।[৯১]

তিনি বাঁকুড়ার লৌকিক পটচিত্রের উপাদান নেন কিন্তু তার পৌনঃপুনিকতাকে সুকৌশলে বাদ দেন। অন্যদিকে কালীঘাটের নিম্নরুচির রসিকতাপূর্ণ জনমনোরঞ্জন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন।[৯২] কালীঘাটের শিল্পচর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন সুপ্ত উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। সমালোচকরা যামিনীর চিত্রের সঙ্গে কালীঘাট পটশৈলীর মিল খুঁজে পেলেও তাঁদের সিদ্ধান্তের সূত্র ধরেই আক্ষরিক অর্থে সেইগুলি কালীঘাট পটের প্রতিচ্ছবি নাকি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মৌলিক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। পট বিষয়ক একটি প্রবন্ধে কালীঘাট পট সম্পর্কে তিনি নিজস্ব মতামত

প্রকাশ করে বলেন কালীঘাটের ছবি আসল পটুয়া ছবি নয়, এর ভাষা গ্রাম্য, কিন্তু বক্তব্য শহরকেন্দ্রিক।[৯৩] সুতরাং কালীঘাট পটকে সমন্বয়ীরীতির ফসল বলা যেতে পারে। কালীঘাটের পট তাঁর কাছে কখনই জাতীয় শিল্পের বিশুদ্ধ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং সেই কারণে কালীঘাটের পটকে কখনই অনুকরণযোগ্য মনে করেননি।[৯৪] 'বাবু-পট'কে প্রাধান্য দিয়ে কালীঘাটের পটুয়াদের পৌরাণিক ধর্ম-চ্যুতিকে তিনি বরং নিন্দাই করেছেন।[৯৫] কালীঘাটের শিল্পীদের আঁকা ক্যালিগ্রাফি রেখার গতিশীলতার প্রতি আকৃষ্ট হলেও পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। রেখার তীক্ষ্ণভাবকে কমিয়ে মেলায়েম করে দেখানোর জন্য তিনি কালো রেখার পাশ বরাবর ভিতর দিকে লাল বা ধূসর রেখার ব্যবহার করেন।[৯৬] এর মাধ্যমে তিনি শেড লাইটের কারসাজিকে ভেঙ্গে দেন। কালীঘাটের পটে আলো বোঝাতে সরু লাইন আর অন্ধকার বোঝাতে মোটা লাইন ব্যবহারের জটিলতাকে রঙ ব্যবহারের সরলতায় নামিয়ে আনেন। দ্বি-মাত্রিকতার মধ্যে ত্রি-মাত্রিকতার আভাস দেন। তিনি তাঁর প্রথম দিককার ছবিগুলিতে রঙের গুরুত্ব হ্রাস করে হাল্কা ছাই রঙের জমির উপর মোটা তুলির বলিষ্ঠ রেখার টানে ফর্মটিকে বের নেন। কালীঘাটের পটের মতো ভল্যুম তৈরি করার জন্য বাইরে থেকে ভেতর দিকটা ক্রমে হাল্কা রঙে মোলায়েম করে দেন।[৯৭] কালীঘাটের পটের সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবির মূল পার্থক্য হল ভাস্কর্যসুলভ গড়ন।[৯৮] কালীঘাটের শিল্পীরা কালো রঙকে প্রাধান্য দিয়ে জল রঙের কায়দায় সীমিত পরিমাণে লাল, নীল, হলুদ রঙের ব্যবহার করেন। যামিনী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি প্রাকৃতিক রঙ এবং পরবর্তীতে টেম্পেরার প্রতিটি রঙে সাদা মিশিয়ে তাকে অনচ্ছ ও মোলায়েম করে ব্যবহার করেন। রঙ ব্যবহারের চাতুর্যে ছবিগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।[৯৯] জন্মভূমির লাল মাটির প্রভাব চিরকাল তাঁর মনে কাজ করার জন্য ছবিতে লাল রঙের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[১০০] উষ্ণ লাল রঙকে এমন দক্ষতার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেন যে তা কোথাও চোখকে বিব্রত করে না, কোন কোন ক্ষেত্রে রঙ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক হয়ে সাংকেতিক অর্থ প্রকাশ করে। কালীঘাট পটে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিমিতি বোধ। পটের সীমা ধরে ছবি আঁকার প্রবণতা কালীঘাটের পটে দেখা যায়। এই সীমা ধরে আঁকার বিষয়টিকে যামিনী আরও পরিশীলিত রূপ দিয়ে ছবি থেকে ছবির ফ্রেমকে বাদ দিয়ে দেন। তিনি পটচিত্রের বড় চোখ আঁকার রীতিতে গ্রহণ করলেও তাকে মুখের পার্শ্বরেখার সীমায়িত করেন না। আধ্যাত্মিক গভীরতা, মননের বিশালত্বের প্রকাশ ঘটে চোখে। বিস্তৃত চোখ এঁকে তিনি যেন

সমস্ত দেহকে বাদ দিয়ে কেবল চোখের উপর মনোনিবেশ করেন বলে মনে হয়।[১০১] যে কোন ধরনের ছবিতেই স্পেস বিভাজন খুব জরুরি। সঠিক স্পেস বিভাজনের অভাবে ছবির তাল কেটে যায়। স্পেসের ধারণা শিল্পীর মনের মধ্যে থাকে। নাট্যমঞ্চকে যেমন তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় ঠিক তেমনি পট আঁকার ক্ষেত্রে চিত্রপটটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সম্মুখভাগে থাকে মূল বিষয়, দ্বিতীয় ভাগে থাকে মূল বিষয়ের সাথে জড়িত আনুষঙ্গিক বস্তু আর তৃতীয় ভাগে থাকে পশ্চাদপট। যামিনী খুব সচেতন ভাবে মধ্যবর্তী ধাপটিকে বাদ দিয়ে ছবির মূল বিষয়ের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পশ্চাদপট নির্মাণ করেন। চিত্রবিদ্‌রা আবার স্পেসকে পসিটিভ অর্থাৎ যেখানে ছবি আঁকা হয় এবং নেগেটিভ ছবি আঁকা হয় না কিন্তু ছবির চারপাশ জুড়ে থাকে; এই দু-ভাগে ভাগ করেছেন। যামিনী বিভিন্ন মোটিফ এর দ্বারা নেগেটিভ স্পেসকে পসিটিভ স্পেসে রূপান্তরিত করেন। তাঁর ছবিতে জড়ানো পটের মতো গুচ্ছাকারে গল্প, কোন আখ্যান বা নাটকীয় পরিস্থিতি নেই। তাঁর আঁকা পটগুলি চৌকোপটের মতো বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে আঁকা একক চিত্র বা কাহিনির চিত্রাবলিও নয়।[১০২] অলংকরণের ক্ষেত্রে ছবিকে ভারি করে তোলার প্রবণতা পটশিল্পীদের মধ্যে দেখা যায়। সেই প্রবণতা থেকে তিনি খুব সচেতনভাবে নিজেকে মুক্ত করেছেন। সামান্য কয়েকটি রেখা ও কয়েকটি রঙের ব্যবহারেই তাঁর পট অলংকৃত হয়ে দিপ্তীমান হয়ে ওঠে। মূল বিষয়টির সাথে পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলির সামঞ্জস্যরক্ষা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। আঙ্গিকের দিক থেকে যামিনীর ছবিকে যেমন পটচিত্র থেকে আলাদা করে চেনা যায় তেমন বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এইগুলি সতন্ত্র। বলা হয়ে থাকে যামিনী রায় চিরাচরিত পটের মতই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্যকে বিষয় করে ছবি এঁকেছেন। একথার সত্যতা রয়েছে। আবার এটাও ঠিক যে চিংড়ি মুখে বিড়াল বা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছবিতে কালীঘাটের পট বা সরার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা ঠিক যে বিষয়গত দিক থেকে তাঁর ছবি কালীঘাটের পট বা সরা থেকে অনেকাংশেই আলাদা। তাঁর আঁকা 'কীর্তনীয়া', 'বাউল', 'রমনীকুল', 'মাঝি-মাল্লা', 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি ছবি কালীঘাট পট থেকে আলাদা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যিশুখ্রিস্ট বিষয়ক ছবিগুলি। এই ছবিগুলির মধ্যে দিয়ে বিষয়গত দিক থেকে যামিনী রায়ের মৌলিকতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০৩] কালীঘাট শৈলীর ছবিতে সমকালীন বাবু সংস্কৃতির নানা দিক দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলি নবোদ্ভুত বাবু সমাজের এক জীবন্ত ও কৌতুকাবহ দৃশ্যের দলিল। অন্যদিকে যামিনী

রায়ের ছবি সম্পর্কে অভিযোগ তাঁর ছবিতে সমসাময়িকতা সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। ধর্মীয় সংস্কার ও রোমান্টিক কল্পনার জগত থেকে তিনি কখন বেরিয়ে আসতে পারেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশ ভাগ কোন কিছুই তাঁর ছবিতে স্থান করে নিতে পারেনি। সমালোচকের কথায় পীড়িতের আর্তনাদ, বঞ্চিতের বেদনা, বিদ্রোহ তাঁর ছবিতে অনুপস্থিত।[১০৪] যামিনী রায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই নিজেকে এসব থেকে দূরে রাখেন। তিনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমাজকে অতীত স্মরণের শীতলতা দিতে, ঘরোয়া মানুষকে শান্তি দিতে চান। যার অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত থাকে প্রতিবাদে ভেঙ্গে গড়ার প্রেরণা।[১০৫] গ্রাম্য পটুয়াশিল্পী লৌকিক কল্পনা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে অবচেতনে নিজসম্প্রদায়ে নিজের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন মাত্র। যামিনীর ছবি, আঙ্গিক, রেখা, রঙ সমস্ত কিছু তাঁর পেশাদারি মনোভাব ও গভীর চিন্তার ফসল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবির সেই অসচেতন সরলতার সঙ্গে তিনি মেলাতে চান সচেতন আধুনিক অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যৎ সৌন্দর্যময় সমাজের স্বপ্ন ও বয়স্ক মনন।[১০৬] তিনি ইউরোপ ঘুরে ভাবী নব পৌরাণিক যুগে পৌছানোর সুদীর্ঘ পথের পথিক।[১০৭] পরিশীলিত চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভারতীয় শিল্পীদের সামনে এক নতুন দরজা খুলে দিয়ে যান। পটের দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরিমিত মার্জিত রঙ ও রেখার সাহায্যে তিনি যে শিল্পসৃষ্টি করেন তাকে কোনমতেই লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।[১০৮] প্রকাশভঙ্গির মধ্যে ‘বিদেশী প্রথা’ অনুসৃত শৃঙ্খলা পটচিত্রের থেকে তাঁর ছবিকে স্বাতন্ত্র করে তোলে।[১০৯]

২.২ আলপনা

মানুষ সুন্দরের পূজারী। আর এর সৌন্দর্যের বোধ থেকেই আলপনার সৃষ্টি হয়েছে। বুৎপত্তিগতভাবে ‘আলপনা’ শব্দটি অনার্য ভাষা ‘আইলপণ’ থেকে এসেছে। ‘আইল’ অর্থাৎ মেঠো পথ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্র, গৃহ, জনবসতি প্রভৃতিকে কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করার আদিম জাদু বিশ্বাস থেকেই আলপনা শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ বলে অনুমান করা হয়।[১১০] ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে এই আলপনা শব্দটি সম্ভবত আইলপনা অর্থাৎ আইল বা বাঁধ বাঁধবার কলা থেকেই এসেছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে –

As a matter of fact 'Ali pana or Al-Pana is an indigenous word meaning the art of drawing Ails (embankments)'. [১১১]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আলিম্পন'কে প্রলেপ দেওয়া এবং 'আলিপনা'কে সখীপনা অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে 'আলিপনা'কে শিল্পশিক্ষকের 'রুল-কম্পাসের বাঁধন দিয়ে টানা চিত্রকর্মের ছাঁদে ফেলে বলা চলে না – এটি হলো আলিপনা'।[১১২] পুরাপ্রস্তরযুগ (প্রায় ২.৫ মিলিয়ন বছর আগে থেকে ১০০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ও নব্যপ্রস্তরযুগ (৮০০০-৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), উভয় যুগের শিল্পকলার উদ্দেশ্য ছিল একই; জাদুশক্তির সক্রিয়তার সাহায্যে ইহজাগতিক কামনা বাসনার বাস্তবায়ন। স্থান কালের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে দুই শিল্পকলার মধ্যে বহিরঙ্গ পার্থক্য দেখা দিলেও মূল সূত্রটা একই রয়ে গেছে। বিশেষ প্রতীকের বিশেষ প্রত্যাশা পূরণের বিশ্বাস যুগে যুগে সঞ্চারিত হয়েছে। পরবর্তী যুগের প্রচলিত লোকস্তরের আলপনায় এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।[১১৩] উল্লেখ্য ব্রতের আলপনায় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বস্তুর প্রতিরূপ অঙ্কন করেই মানুষ তৃপ্ত থাকতে পারেনি যতক্ষণ না 'শিল্পসৌন্দর্যে' সেগুলি ভূষিত হচ্ছে।[১১৪] আধুনিক চিত্রশিল্পীদের অনেকেই আলপনার এই নান্দনিক মূল্যকে স্বীকার করে এর রূপচেতনা ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে জাতীয় চেতনা ঐতিহ্যের বাহক হিসেবে রূপায়িত করেন তাঁদের শিল্পে। তাঁদের আলপনার সঙ্গে গ্রামীণ ঐতিহ্যানুসারী ব্রতানুষ্ঠানের আলপনার নান্দনিক পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

২.২.১ আলপনা শিল্প ও নন্দলাল বসুর ভাবনা

জাতীয় ঐতিহ্য শিক্ষা সংস্কৃতি অনুশীলন ও চর্চার প্রাণকেন্দ্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে নন্দলাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রকৃতিকে দোসর করে জ্ঞানের চর্চা বিকশিত হওয়ার লক্ষে শান্তিনিকেতনে প্রতিটি ঋতুর প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় ঋতু-উৎসব উদযাপিত হয়। এছাড়া বিশ্বভারতীর যাবতীয় উৎসব ও সভাসমিতিকে আলপনা দ্বারা সাজানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল প্রবল। নন্দলাল তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের এই মনোবাসনা বাস্তবায়িত করেন।[১১৫] শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আলংকারিক শিল্পসৃষ্টিতে তিনি যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁর পূর্ণ প্রকাশ

ঘটে আলপনায়। নন্দলাল আসার অনেক আগে থেকেই ক্ষিতিমোহন সেনের (১৮৮০-১৯৬০) তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনে আলপনা দেওয়ার রীতি ছিল। সেই সময়কার ঋতু-উৎসবগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক মিলে আলপনা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় শোভন সোমের সাক্ষ্য থেকে। তিনি জানান ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ষা উৎসব উপলক্ষে ক্ষিতিমোহন সেন ছাত্র মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তর সহায়তায় পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে বৈদিক স্থণ্ডিল আলপনা দেন। সম্ভবত এটিই ছিল শান্তিনিকেতনে কোন উৎসবে দেওয়া প্রথম আলপনা।[১১৬] ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে এসে নন্দলালও দেখেন ক্ষিতিমোহনের তত্ত্বাবধানে মণীভূষণকে বৈদিক 'স্থণ্ডিল' পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে আলপনা দিতে। নন্দলাল তাঁকেই 'অনুসরণ করে' আশ্রমে আলপনা দিতে শুরু করেন।[১১৭] ক্ষিতিমোহনের সময়ে শান্তিনিকেতনের আলপনার আর গ্রাম বাংলার মেয়েলি আলপনার মধ্যে খুব বেশি তফাৎ ছিল না। সাবেকী ধারা অনুযায়ী আলপনায় আদিম প্রতীক ও সাদা রঙের প্রাচুর্য লক্ষ করা যেত। কলাভবনের শিক্ষার বিষয় হিসাবে 'সূচের কাজ', 'আলপনা' ইত্যাদি 'decoration'-এর কাজের সূচনা হয় সুকুমারী দেবীর (?-১৯৩৬) সাহচর্যে।[১১৮] বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত শান্তিনিকেতনী আলপনার বিকাশ ঘটে চল্লিশের দশকে বা তারপরে। ছাত্রী সুকুমারী দেবীর স্বভাবসিদ্ধ মণ্ডন দক্ষতা ও গুরু নন্দলালের মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভায় সচেতনভাবে ধর্মীয়চিহ্ন পরিহার করে ডিজাইনের বিশেষ ধরন ও বিন্যাসের আলংকারিক জটিলতা বা বিভিন্ন রঙের মানানসই ব্যবহার আলপনাগুলিতে দেখা যায়। আশ্রমের প্রকৃতি গাছপালা, ফুল, পাখি ইত্যাদির সঙ্গে দেশ-বিদেশের আলংকারিক শিল্প সম্পর্কে নন্দলালের জ্ঞান শান্তিনিকেতনের আলপনাকে সমৃদ্ধ করেছে।[১১৯] নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হলেও আলপনা নামক মণ্ডনশিল্প রচনার ব্যাপারে তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ছাত্রীরাও ছিলেন সম্পূর্ণভাবে নন্দলালের অধীনে। শিক্ষার বিধি-ব্যবস্থা একই রকম থাকলেও অলংকরণ-কর্ম সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রেখে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের হাতে মৌলিক রচনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং নব-নিযুক্ত শিক্ষকদের হাতে অনুলেখনের ভার দেন। তিনি বারবার হাতের কাজ, আলপনাকে আবশ্যিক করার চেষ্টা করেন।[১২০] প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পথে প্রকৃতিজাত বস্তুরাজির আলংকারিক রূপ প্রকাশের শিক্ষাদান করেন। প্রকৃতিকে ঠিক মত না দেখতে পারলে, তার রূপ রসের বোধ জাগ্রত না হলে শিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না বলে তিনি মনে করেন। তাই বদ্ধ ঘরের শিল্পশিক্ষার আবদ্ধ না থেকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি জিনিস

মেঘ, জল, আগুন, ফুল, পাতা, গাছ, পাখি ইত্যাদি সমস্ত কিছু থেকেই শিক্ষাগ্রহণের কথা বলেন। তাঁর মতে, 'আঙুল ছাড়া হাত ও Nature ছাড়া ডিজাইন দুটোই অকেজো'।[১২১]

নন্দলাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাকিছু ভালো দেখতেন তাকে খোলামনে প্রশংসা করতেন এবং তার থেকে যদি কিছু শেখার থাকে তা নিজে শিখতেন ও অন্যদের শিখতে বলতেন। ইন্দুসুধা ঘোষ (১৯০৩-১৯৯৫) ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই কলাভবনে ভর্তি হওয়ার দিনই উপাসনাগৃহে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা করার স্থানে আলপনা দিলে নন্দলাল সেই আলপনায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের নৈপুণ্যতা দেখে অন্যান্য ছাত্রীদের তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেন। ইন্দুসুধাও সেদিন প্রথম জানতে পারেন 'প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের' মেলবন্ধন ঘটিয়ে প্রকৃতিকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করতে পারলেই আলপনা অভিনব ও সুন্দর হয়ে ওঠে।[১২২] শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির এই যোগসূত্রের প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু তাঁর *শিল্পকথা* গ্রন্থটির 'শিক্ষায় শিল্পের স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন –

> প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধন একবার হলে, প্রকৃতিকে সত্যকার ভালোবাসতে শিখলে, ছেলেদের অন্তরে রসের উৎস আর কখন শুকোবে না; কারণ, প্রকৃতিই যুগে যুগে শিল্পীকে শিল্প সৃষ্টির উপাদান যুগিয়ে এসেছে।[১২৩]

নন্দলালের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরম্পরাক্রমে গৌরী ভঞ্জ (১৯০৭-১৯৯৮), যমুনা সেন (১৯১২-২০০১) এবং কলাভবনের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের শিল্পরচনা ও শিক্ষকতা মারফৎ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। নন্দলাল ব্রতাচারের আলপনার প্রথাগত রূপ ভেঙে নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বস্তুর সার্বিক নিরপেক্ষ ছন্দোময় রূপ সৃষ্টি করেন যা সকল প্রকার উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে মানানসই। আলপনার গড়ন বা মোটিফের সঙ্গে উপকরণেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে পিটুলিগোলা দিয়ে আলপনা দেওয়ার পরিবর্তে খড়ি, এলামাটি, গেরিমাটি, নানা প্রকার গুঁড়ো রঙ, গোলা রঙ, চুন সুরকি বালি কয়লাগুঁড়া, শস্য, ফুল, আবির ইত্যাদি নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করে আলপনা দেওয়ার প্রচলন করেন।[১২৪] গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া, কাঠচাঁপা, বর্ষায় কদম, টগর, বকুল, শিমুল, শরতে শিউলি, শেফালি, হেমন্তে কাঞ্চন, শীতে সূর্যমুখী, বসন্তে পলাশ ইত্যাদি ঋতুর বিভিন্ন ফুল ছাড়াও অগ্নিশিখা, অপরাজিতা, দোলনচাঁপা, জবা, নয়নতারা প্রভৃতি ফুল বিশেষত পদ্মের বিচিত্র আলংকারিক রূপের ডিজাইন ব্যবহার করেন। উৎসব

অনুষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী আলপনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। স্থান কাল ও অনুষ্ঠান ভেদে আলপনার বিচিত্র মোটিফ বা ডিজাইন ব্যবহার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গৌরী ভঞ্জ বলেন –

> হলকর্ষণের সময় বর্ষাকাল বলে বৃষ্টি জলে ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় গতানুগতিক গুঁড়া বা জলে গোলা রঙ দিয়ে আলপনা দেওয়া চলত না। এজন্য শস্য চুন বালি প্রভৃতি দিয়ে আলপনা দিতে হল। তেমনি পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের আলপনা ফুল পাতা দিয়ে করা হল। মৃত্যু তিথিতে যে অনুষ্ঠান হত তাতে আগ্নিশিখা এঁকে আমরা নকশা করতাম। বসন্তোৎসবের আলপনায় তেমনি পলাশ শিমুল প্রভৃতি বসন্তের দ্যোতক প্রকৃতির কোনো কিছু থেকে অলংকরণের মোটিফ ব্যবহার করেছি।[১২৫]

নন্দলাল বর্ষা ঋতুতে বড়ো শক্ত পিচবোর্ডে আগে থেকেই পরিকল্পনামাফিক আলপনা এঁকে রাখার বিকল্প ব্যবস্থা করেন। কারণ এতে উৎসবে আলপনার প্রয়োজনীয়তাও মেটে আবার সুবিধা-অসুবিধা ভেদে এগুলোকে গুটিয়ে রাখা চলে। পৌষ উৎসবের আলপনাগুলি ছিল আকারে বড়ো, সাদা ও নানা রঙের ব্যবহারে অনবদ্য। খ্রিস্টোৎসবের আলপনায় ক্রুশ এবং স্বস্তিকার মেলবন্ধনের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য দেশের ধর্মাচরণকে খাঁটি ভারতীয় প্রথা-সংস্কৃতি লালিত শিল্পকলার দ্বারা উপস্থাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সরার উপর বিচিত্র অলংকরণের কাজ, লোকসমাজে প্রচলিত বাংলার খেলনা পুতুলের মোটিফের চিত্ররূপ ইত্যাদি নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার রেওয়াজ শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের আলপনাতে দেখা যায়। বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আম্রকুঞ্জের সুবিশাল প্রাঙ্গণে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘন কারুকার্যবিশিষ্ট আলপনার প্রচলন ছিল। বর্ষশেষের সন্ধ্যার মন্দিরে আলপনা হতো সাদা। উপাসনা শেষে ছাত্রছাত্রীরা তাতে রঙ ভরতো। মন্দিরে উপাসনার দিনে এক এক বুধবার এক-একজন মেয়ের উপর ভার থাকত মন্দিরের ভিতর শ্বেতপাথরের মেঝের উপর ছোট একটি আলপনা দেবার। অন্য আর কেউ আলপনা দিতে চাইলে মন্দিরের বাইরের সিঁড়িতে আলপনা দিতে পারত। নন্দলাল এসে দেখতেন মন্দিরের ভিতরকার এই আলপনা। প্রশংসা করতেন বা ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিতেন। অনুকণা খাস্তগীরের (১৯০৮–১৯৮৪) আলপনায় ফোঁটার অভাব দেখে তিনি বলেন 'ফোঁটা হল আলপনার প্রাণ' তাই প্রতিটি ফোঁটা 'যত্ন' করে আঁকতে হয়।[১২৬] ছাত্রী ইন্দ্রসুধা ঘোষের আঁকা কলসীর উপর সাদা বিন্দু বসিয়ে নন্দলাল তাঁকেও আলপনায় ফোঁটার গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন। উপাসনার আগে প্রত্যেকবার নতুন নতুন আলপনা দেওয়ার রীতি যেমন ছিলো তেমন বৈতালিকে নতুন নতুন আলপনা দেওয়ার নিয়মও ছিল। পুরনো লাইব্রেরির বারান্দায়, যার উপর তলায় কলাভবনের ক্লাস হতো সেখানে

প্রতিদিন সকালে বৈতালিকের আগে আলপনা দিতে হতো। একবার গ্রীষ্মকালে কুয়ো থেকে বেরোনো ‘এলামাটির মত হলদে’ মাটি ব্যবহার করে তাঁর ঘরের আমকাঠের দরজা জানলার পাল্লায় গেরি ও সাদা মিশিয়ে ফুল পাতার নক্সা করেন।[১২৭] সামান্য উপকরণের সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলার এরূপ শিক্ষা তাঁর থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও পান। উড়িষ্যার গোপালপুর ভ্রমণের সময় তিনি লক্ষ করেন সেখানকার মানুষরা রোজ সকালে নিজের বাড়ির সামনে গুড়ো রঙ দিয়ে খুব দ্রুত আলপনা দেয়। তাদের সেই জ্যামিতিক নক্সার প্রতি আকৃষ্ট হন। কলাভবনের এই ধরনের আলপনা শেখানোর মনবাসনা জানিয়ে কন্যা যমুনাকে নন্দলাল সেখান থেকেই ১১ নভেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রের কিয়দংশ উদ্ধারযোগ্য –

> এখানে গুঁড়া গিয়ে রাস্তার দু-ধারে রোজ সকালে নিজ নিজ বাড়ির সামনে আলপনা দেয়। এইটা আশ্রমে introduce করলে কেমন হয়? খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়।[১২৮]

পত্রটির এক পাশে লেখা ও অপরপ্রান্তে দ্রুত কলমের টানে সেই অঞ্চলের আলপনার নমুনা এঁকে পাঠান। মাদ্রাজের আলপনা দেওয়ার পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জ্যেষ্ঠ কন্যা গৌরীর জন্য আলপনা দেওয়ার টিনের ছোট ছোট রোলার ও বাক্সের মত দেখতে কতগুলি জিনিস আনেন। রোলারের গায়ে এবং বাক্সের মতো জিনিসটির নীচে ডিজাইন অনুযায়ী কিছু দূর পরপর ছিদ্র করা। রোলার বা বাক্সের ভিতর গুঁড়ো রঙ বা খড়ি ভরে অতি দ্রুত যতদূর ইচ্ছা ততদূর পর্যন্ত একই মাপের একই ধরনের আলপনা দেওয়া যায়।[১২৯]

নন্দলাল শান্তিনিকেতনের আলপনায় প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পোড়ামাটির কাজ, মূর্তি, প্রাচীন মন্দিরের আলংকারিক প্যাটার্ন, অজন্তার বিভিন্ন নক্সা, মোটিফ ও ভূমি-বিভাজনকে গুরুত্ব দেন।[১৩০] ছাত্রাবস্থায় অজন্তার গুহাচিত্রের অনুকৃতি করার সময় তিনি লক্ষ করেন বিভিন্ন ফুল, ফল, লতাপাতা ইত্যাদি প্রতিদিনের দেখা জিনিসকে কীভাবে আলংকারিক গুণে প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি শান্তিনিকেতনের আলপনায় এসবের পুনঃপ্রকাশ ঘটান নিজের অনুভূতি মিশিয়ে। পদ্মফুলের আলংকারিক বন্ধন-এর অনুসরণে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ফল, ফুল, পাখি, মাছ দিয়ে নব নব আলপনা রচনা করেন।[১৩১] বস্তুর মূলগত ছন্দকে অনুভব করে অজন্তার শিল্পীরা যেমন বাস্তবের অনুকৃতি না ঘটিয়ে কল্পনার আশ্রয়ে অলংকরণ করেছিলেন নন্দলাল আলপনা রচনার ক্ষেত্রে সেই

নীতিকে পালন করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের এ ব্যাপারে সচেতন করেন। নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের আলপনায় দেশীয় ঐতিহ্য, প্রাচ্যের নানা দেশের আলংকারিক মোটিফ এবং নিজস্ব রুচি অনুযায়ী বাস্তব প্রকৃতির আলংকারিক রূপ প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

আলপনা সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে নন্দলালের *শিল্পকথা* ও *শিল্পচর্চা* গ্রন্থে। *শিল্পচর্চা* গ্রন্থের 'মণ্ডনশিল্প' নিবন্ধে তিনি বলেছেন – 'মণ্ডন শিল্পের রচনা হল আসলে রূপ ও ছন্দ নিয়ে'।[১৩২] তাঁর মতে রূপ ও ছন্দের গতানুগতিক প্রয়োগে বৈচিত্র্যহীন মণ্ডনশিল্পে নতুনত্ব আনতে অবিচ্ছিন্ন স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেকোন ডিজাইনে বা অলংকারে বাইরের আকৃতি এবং ভিতরের শৃঙ্খলা দুটি দিক আছে। নন্দলাল *শিল্পকথা* গ্রন্থের 'শিল্পে শারীরস্থানবিদ্যার প্রয়োগ' অধ্যায়ে তিনি বলেছেন – মণ্ডনশিল্পীরা কোনো নক্সা করতে গেলে প্রথমে তার সীমা, বিভাগ ও গতিভঙ্গি আগে ঠিক করে নেন, তারপর ইউনিট বা মোটিফ যোগ করেন। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট একটি আকৃতির ভিতরে নির্দিষ্ট একটি গতিভঙ্গি অনুযায়ী নানা অলংকারমুদ্রা যোগ করে নক্সা তৈরি করেন। শিল্প রচনাকালে 'উপমিত বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি মাপজোপে ছোটো বড় হয়, কিছু বা বাদ যায়, কিছু বা উপমান থেকে উপমিত বস্তুতে নূতন করে যুক্ত হয়'।[১৩৩] শিল্পী প্রত্যেকটি বস্তুর সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভেদ বিষয়ে জ্ঞানঅর্জন করার পর তাঁর ইচ্ছেমতো একটি রূপের বাইরে আকৃতির সঙ্গে অন্য একটি রূপের শৃঙ্খলা যোগ করে মৌলিক সৃষ্টি করতে পারেন। তবে অপ্রধান খুঁটিনাটি লক্ষণ ফোটাবার ঝোঁকে মূল উদ্দেশ্য ছেড়ে বিপথে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়, তাই শিল্প-উপাদানের বিশেষ প্রকৃতিকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হয়। নন্দলাল মণ্ডনশিল্প রচনায় রূপ ও ছন্দের আনুষঙ্গিকভাবে তাল বা যতি (pause) এবং ওজন (balance)-এর কথা বলেছেন। তাল নির্দিষ্ট হয় যথোচিত বিন্যাস, আলোছায়ার ঘনত্বের বিভিন্নতা ও ছন্দোবেগের হ্রাসবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওজন রক্ষা করা যায় রূপ ও রেখার পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে। সম এবং বিষয় উভয় প্রকার অলংকার রচনাতেই এই নীতিকে মেনে চলতে হয়। প্রাচ্য শিল্পীদের মন ছন্দপ্রিয় ও অলংকারপ্রবণ হওয়ায় তাঁরা শিল্প রচনায় বস্তুর মনগড়া রূপ দিয়ে থাকেন।[১৩৪] পারসিক, চৈনিক, জাপানি, মিশরীয়, গ্রীক, রোমক প্রতিটি দেশের আলংকারিক কাজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় প্রধানত জাতি রুচির উপর নির্ভর করে। সেই রুচি গঠন হয় সেই দেশে প্রাপ্ত ফুল, ফল, পশু, পাখি, গাছপালা থেকে অথবা পঞ্চভূতের প্রভাবে। ভারতের আলংকারিক

শিল্পে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে পদ্ম, সৌন্দর্য ও পবিত্রতার উপমান হিসাবে। তারপর আমের পল্লব ও ফল, অসত্থপাতা, ডাব এইগুলির অল্পবিস্তর ব্যবহার আছে। পঞ্চভূতের প্রতীক মণ্ডনশিল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত, তার সমতলভত্তিক এবং ত্রিমাত্রিক রূপটি কী ও কেমন হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে নন্দলাল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'পঞ্চপ্রতীক ও আলংকারিক রূপ' শীর্ষক রচনাটিতে। তাঁর মনে হয়েছে, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে কল্পিত পঞ্চভূতের পঞ্চ প্রতীকগুলিই আমাদের সমস্ত আলংকারিক কল্পনার মূলে রয়েছে। পৃথিবী হল স্থিতি, সেই মতই তার রূপকল্পনায় ঘনক বা চারকোণা; মাটিতে জলের ফোঁটা পড়লে বৃত্তাকার বিন্দু রচনা করে তাই জল বোঝাতে গোলাকার বিন্দু; আগুন সর্বদা উর্দ্ধগামী তাই ত্রিকোণ; বায়ু হালকা এবং আপনার আকার আপনিই রচনা করে, একে প্রতিকায়িত করতে অর্ধচন্দ্র; আকাশের প্রতীক ডিম্বাকৃতি। আকাশ অর্থে স্পেস বা ফাঁকা বোঝায়, এই ফাঁকা জিনিসটি রূপরচনার সার্থকতা বিচারে রেখার মত অপরিহার্য। রেখাঙ্কনের বাইরে ও ভিতরে এই যে ফাঁক, একেই খণ্ড খণ্ড আকাশ বলা যেতে পারে।[১৩৫] ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অনন্য সাধারণ দক্ষতা ও আপন সৃজনী শক্তির দ্বারা নন্দলাল ভারতীয় মণ্ডন শিল্পকে সুচারু রূপে পরিবেশন করেন। তাঁর শিক্ষানীতির দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত আলপনা নামক মণ্ডন শিল্পের যে ধারাটি ছাত্র পরম্পরায় পরিবেশিত হয়ে এসেছে সেটিকে উন্নত, পরিশীলিত, পরিমার্জিত শিল্প হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

২.২.২ আলপনা শিল্প ও যামিনী রায়ের কৃতিত্ব

যামিনী রায়ের চিত্রে বিচিত্র সূত্রগুলির মধ্যে আলপনা ছিল অন্যতম। তাঁর আঁকা বহু ছবিতে বাংলার আলপনা বা দেওয়ালচিত্রের[১৩৬] প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি লক্ষ করেন পল্লিশিল্পীরা খুব সহজভাবে ছবির বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা না করে প্রথা ও কল্পনার সংমিশ্রণে কেবলমাত্র কয়েকটা সহজ রেখার সাহায্যে দ্রষ্ট বা কাল্পনিক বস্তুর আভাস দিয়ে থাকেন।[১৩৭] বঙ্গললনাদের এই ভুল-ত্রুটিহীন অবলীলাময় স্বভাবসিদ্ধ রেখাঙ্কন কৌশলের পারদর্শিতা তাঁকে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের রেখাঙ্কনের কৌশলকে আয়ত্ত করে আলপনার ছন্দময় বক্ররেখা ও বৃত্তাকার রেখা দিয়ে একের পর এক ছবি আঁকেন। পুরু রেখা ও চিত্রগুলির মানানসই বিন্যাসে যেমন আলপনা সুন্দর হয়ে ওঠে ঠিক

তেমন ভাবেই শিল্পী পুরু রেখার ব্যবহার করেন। আলপনা অঙ্কনে বস্তুর বাস্তবোচিত প্রতিরূপের বদলে তার মূল ভাবটি অলংকরণের আকারে প্রকাশ করার সাংকেতিক প্রবণতার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধই লক্ষ করা যায়। যামিনী রায় বিশ্বপ্রকৃতির নানা উপাদান সহজ সরল অনাড়ম্বর রেখার মাধ্যমে অঙ্কনের সময় নক্সার বিশেষ বুনোটকে অনুসরণ করেন।[১৩৮] 'দেশীয় পূজা উৎসব পার্বণ আচারের আলপনাকে ছবির ভাষা দান করেন।'[১৩৯] ছবির মধ্যে আলপনার প্রাধান্যের ফলে আলপনা হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ছবি।[১৪০] কেবলমাত্র আলপনার বিন্যাসে আঁকা বহু ছবি যেহেতু কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে আঁকা হয়নি তাই আলপনার রেখার টানে ছবিগুলি রহস্যময় হয়ে ওঠে।[১৪১] গ্রাম বাংলার সাধারণ শিল্পকীর্তির সঙ্গে পেশাদারিত্বের ছোঁয়ায় তাঁর আলপনা ভিন্ন ধরণের মেজাজ তৈরি করে। ব্রত পার্বণের ঊর্দ্ধে উঠে সমগ্র প্রকৃতি ভাবনার কথা ফুটিয়ে তুলতেই তিনি বেশি আগ্রহ দেখান। তাঁর একটি আলপনাধর্মী চিত্র লক্ষ করলে বোঝা যায় প্রকৃতিতে দেখা গাছের হুবহু প্রতিকৃতি না অঙ্কন করে তিনি কয়েকটি পুরু উলম্ব রেখার সাহায্যে গাছের কান্ড এবং তার পাশে ডিম্বাকৃতি কয়েকটি বিন্দুর মাধ্যমে গাছের পাতা-ফুল-ফলের সমৃদ্ধি বোঝাতে কয়েকটি গোলাকার রেখা এবং তার চারপাশে কয়েকটি বিন্দুর মাধ্যমে ফুলের আভাস দিয়েছেন। বিষয়বস্তুর বিস্তীর্ণতা বোঝাতে ফ্রেমের দুপাশে অর্ধেক ফুল এঁকেছেন। ছবিটির ফ্রেমটিও জ্যামিতিক আলপনার সহজ সরল অলংকরণে সজ্জিত। এই চিত্রটির মাধ্যমে তিনি শুধু তিনটি গাছই নয়, বরং মনে করা যেতে পারে এর মাধ্যমে সুসজ্জিত উদ্যান অথবা বনভূমির আভাস দিয়েছেন। এই ধরনের মোটিফ তিনি অন্য অনেক ছবিতে ব্যবহার করেছেন। যেহেতু ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ না করে শিল্প সৃষ্টির তাগিদে তিনি আলপনাগুলি আঁকেন তাই খুব সচেতনভাবে ব্রতাচারের আনুষ্ঠানিক দিকগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। তাঁর আলপনাধর্মী চিত্রগুলিতে পিটুলি গোলার সাদা বর্ণের আধিক্য লক্ষ করা যায়। তবে কোন কোন আলপনাধর্মী চিত্রে লাল, হলুদ, সবুজ রঙ ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই রঙগুলি একদিকে যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধির করে তেমনি বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক ও বটে। ডেকরেটিভ আলপনার ধরন এবং এতে উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার খুশির আবেশ তৈরি করে।[১৪২] আলপনায় রঙ ব্যবহারের পিছনে উড়িষ্যা ও রাজস্থানী আলপনার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। যামিনী 'রেখার থেকে রঙকে গাঢ় রেখে চিত্রের ভাবকে প্রতিলোম বিন্যাসে' গড়েছেন –

> গাঢ় জমিতে সাদা রেখায় তারা আরও বেশি করে আলংকারিক উৎস-চিত্রের সমীপে উপস্থিত। ...উপাদানের আলংকারিক স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে শিল্পীর আবেগময় চিন্তাপ্রসূত প্রচেষ্টাকে সরিয়ে রেখে ছান্দিক সম্ভাবনার অঙ্ক কষা হিসাবের নির্লিপ্ততার ইঙ্গিত রইল চর্চার পদ্ধতিতে।[১৪৩]

আলংকারিক রূপব্যঞ্জনার দিক থেকে 'কৃষ্ণ গোয়িং টু দ্বারকা' ও 'কৃষ্ণ উইথ গোপিনিজ' অবিস্মরণীয়।[১৪৪] আলপনাধর্মী চিত্রগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় সেগুলির পশ্চাদ্‌পটে ব্যবহৃত রঙ কখনো বেলিয়াতোড়ের লাল মাটির মতো আবার কখনো গাঙ্গেয় অঞ্চলের মাটির মতো আবার কখনো গোবর লেপা উঠোনের মতো রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। যামিনীর আলপনায় ব্যবহৃত মোটিফগুলি ব্রতের সরল আলপনা থেকে সংগৃহীত হলেও নির্দিষ্ট কোন ব্রতের সঙ্গে সংযোগ বিহীন। গাছ-ফুল-পাতা, উড়ন্ত পাখি, গৃহ এবং গৃহের তৈজসপত্রাদি, মাছ এবং মাছের অনুসঙ্গে পুকুর বা নদী ইত্যাদি মোটিফের ব্যবহারে অঙ্কিত একটি আলপনায় পল্লীজীবনের সুচারু দৃশ্য ফুটে ওঠে। আবার হাতি, ফুল, মাছের মোটিফ অঙ্কিত অপর একটি আলপনায় বনাঞ্চল আভাসিত হয়। এভাবে ছোট ছোট মোটিফগুলিকে সাজিয়ে নতুন রূপে উপস্থাপন করাতেই তাঁর কৃতিত্ব। তাঁর আলপনাধর্মী ও অন্যান্যচিত্রে মঙ্গলঘট, গোলাকার ফুল, চক্র বারংবার অঙ্কিত হয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর একটি ছবিতে আলপনার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির মেলবন্ধন ঘটান।[১৪৫] আলপনার মাধ্যমে ছবি আঁকা ছাড়াও তাঁর আঁকা প্রায় সমস্ত ছবির অলংকরণের ক্ষেত্রে আলপনার ব্যবহার হতে দেখা যায়। পশ্চাদপটের শূন্যস্থানকে একঘেয়ে থেকে মুক্ত করে সেখানে আলপনার ছোট ছোট মোটিফের ব্যবহার সাংকেতিক অর্থ বহন করে। এইগুলি ফুল, পাতা, গাছ, সমগ্র বনভূমি বা নক্ষত্ররাজির দ্যোতক। তাঁর চিত্রপটে অঙ্কিত মনুষ্য বা মনুষ্যেরতর প্রাণীদের মূর্তিগুলির পরিহিত বস্ত্র, গাত্রালংকার আলপনার দ্বারা অলংকৃত। তিনি বিষয় অনুযায়ী কোথাও নক্সাকারী কাজের নমুনার অবতারণা করেছেন আর সেই নক্সাগুলির চেহারার সঙ্গে বাংলার ব্রতকথার আলপনার সাযুজ্য লক্ষণীয়।[১৪৬] চিত্রপটকে সুচারুভাবে বিভাজন করে আলপনার প্রয়োজনে সাজানোর কঠিন কাজটি যামিনী কঠোর অনুশীলন ও অননুকরণীয় দক্ষতার দ্বারা অবলীলায় সম্পন্ন করেছেন। ভারতবর্ষের চিত্রকল্পের একটি বড় লক্ষণতার আলংকারিক ভঙ্গিমা বা Decorative manner যা অত্যাশর্য্য সংযমের সঙ্গে যামিনীর চিত্রে এসেছে। বাহুল্য নামক কোন কিছুই তাঁর চিত্রকল্পনায় স্থান পায়নি যেটা সেই সময়ের নিরিখে যথার্থই স্মরণীয় ঘটনা।[১৪৭] তিনি বাংলার আলপনার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে কালি কলমে নানা স্কেচের মধ্যেও

নানা রকম পরীক্ষা করেছেন। প্রথম জীবনের মঞ্চসজ্জার কাজে এবং প্রদর্শনী গৃহ অলংকরণের ক্ষেত্রে আলপনার ব্যবহার করেছেন। বড় বড় মাটির জালা, মাটির ভাঁড় নক্সার বিচিত্র রঙ-এর ব্যবহারে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। মাটির জালা, থালা, বাটিতে আঁকা আলপনার প্রকৃতি পাত্রটির প্রকৃতির মতোই করেন, ছবির ডিজাইন সেখানে প্রাধান্য পায়না।[১৪৮] শুধু ছবি নয়, সবধরনের কমণীয় কাজে আলংকারিক ভঙ্গিমাকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। এমনকি সরস্বতীপূজার-কার্ড, বিয়ের-কার্ড, সভাসমতির নিমন্ত্রণপত্রেও যথাযথ আলংকারিক ভঙ্গিমা থাকা একান্ত দরকার বলে তিনি মনে করতেন।[১৪৯] তাঁর মতে এই আলংকারিক ভঙ্গিমার দ্বারাই কার্ডটির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়। স্বাধীন শিল্পীর ন্যায় সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য আলপনার ব্যবহারে গ্রামীণ শিল্পীর সঙ্গে তাঁর আলপনার পার্থক্য ঘটে যায়।

২.৩ কাঁথা

কাঁথা শব্দটি সংস্কৃত কন্থা শব্দ থেকে এসেছে। অঞ্চলভেদে উচ্চারণগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন – কংথা, ক্যাতা, কাঁতা, কেঁথা, ক্যাঁথা, কাঁথা ইত্যাদি।[১৫০] *বঙ্গীয় শব্দকোষ* অনুযায়ী কাঁথার অর্থ 'সেলাই করা জীর্ণবস্ত্রাদির আস্তরণ বিশেষ'।[১৫১] নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬–১৯৩৮) কাঁথা বলতে কতগুলি 'জীর্ণ বস্ত্র' একত্রে সেলাই করা দ্রব্যকে বোঝান।[১৫২] কামিনিকুমার রায় কাঁথা বলতে 'সাধারণতঃ পুরাতন' কাপড় একত্রে সেলাই করে প্রস্তুত 'গাত্রাবরণ ও শয্যাস্তরণ'কে বুঝিয়েছেন।[১৫৩] অর্থনৈতিক কারণে বা বৈরাগ্যের প্রতীক হিসাবে সাধু-সন্তদের কাছে কাঁথাই ছিল একমাত্র শীতের সম্বল।[১৫৪] বাংলার গ্রামীন মেয়েরা নিজস্ব চেতনায় সামাজিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে কাঁথা সৃষ্টি করে এসেছে। পরে প্রয়োজনের গণ্ডী পেরিয়ে নান্দনিকতাঁর তাগিদে তারা দেখা না দেখা জগৎ, সুখ-দুঃখের কাহিনি, সংস্কার ঐতিহ্যকে কাঁথার পিঠে ফুটিয়ে তোলে।

২.৩.১ সূচীশিল্প ও নন্দলালের কৃতিত্ব

নন্দলাল বসু চারুকলা ও কারুকলাকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সমগুরুত্ব সম্পন্ন মনে করে কলাভবনের পাঠক্রমে সূচীশিল্প ও অন্যান্য কারুশিল্পকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। আনন্দ কেন্টিস

কুমারস্বামীর আদর্শ দ্বারা নন্দলাল বসু প্রভাবিত হয়ে বিশ্বাস করতেন প্রকৃত স্বদেশ চেতনা গ্রামের কারুশিল্পীদের শিল্পের প্রতি সম্মান জানিয়ে গড়ে উঠতে পারে এবং শিল্পরুচির বিকাশের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। তিনি 'বিচিত্রা'য় শিল্পশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলে নানাপ্রকার কারুশিল্পের সঙ্গে সূচীশিল্পের শিক্ষাদান করেন। পরবর্তীকালে কলাভবনে যোগদান করলে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বিশ্বভারতীর কর্মীদের গৃহিণীরা তাঁর কাছে শিল্পশিক্ষা নিতে আসার সময় বা এর কিছুকাল পর সুকুমারী দেবী কলাভবনের decoration বিভাগে তাঁর তত্ত্বাবধানে সূচীশিল্পের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। নন্দলালের সাহচর্যে সেই শিক্ষা গ্রাম্য সরল ভাবের পরিবর্তে নান্দনিক সূক্ষ্মতায় উন্নীত হয়। নন্দলাল কারুশিল্পশিক্ষাকে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন মেয়েদের মধ্যে চিত্রশিল্পী হওয়ার দক্ষতা থাকলেও সংসারে জড়িয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত কারুশিল্পকে আঁকড়ে ধরে শিল্পচর্চা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মেয়েরা ভবিষ্যত জীবনে যদি শিল্পের অখণ্ড সাধনা নাও করে উঠতে পারেন, শিল্পের অনুভব তাঁরা জাগিয়ে তুলতে পারবেন ঘরে ঘরে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাই তিনি কলাভবনে কিছু হাতের কাজের শিক্ষা আবশ্যিক করেন।[১৫৫] বাংলার কাঁথা-সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌ এর চিকনকারী এবং কাঠিয়াবাড়ের সূচীশিল্প[১৫৬] শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। সূঁচের কাজ সাধারণত কলাভবনের ছাত্রীদের শেখানো হলেও নন্দলালের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়েই সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা সূঁচের কাজ করা একটি খদ্দরের চাদর উপহার দেন।[১৫৭] ফলে কলাভবনে সূচীশিল্পের শিক্ষায় যে কেবল ছাত্রীদের একছত্র অধিকার ছিল সেকথা স্পষ্টভাবে বলা যায় না।

সূচীশিল্পের উপর আগ্রহ থেকে নন্দলাল বসু নিজেও সূচীশিল্পের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সংগৃহীত সুন্দর সুন্দর কাঁথা ও দেশবিদেশের সূচীশিল্পের নমুনা নিয়ে প্রকাশিত হয় *ফুলকারী*৷ গ্রন্থটির ভূমিকাতে চারুশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য –

> যে তুলির কাজের মর্ম্ম জানে সূচের কাজের সৌন্দর্য্যটিও সে ধরে নেয় সহজে। ...তুলি দিয়েই টানি বা সূচ দিয়েই বুনি দুয়েই তুল্য মূল্য আর্টের হিসেবে! ...ভালমন্দ ছোট বড় একথা ওঠার অবকাশই হোলনা আর্টের নানা বিভাগের চর্চ্চার ও সাধনার বেলায়।[১৫৮]

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নন্দলাল বসুর পরিকল্পনায় কারুসংঘ প্রতিষ্ঠা হলে সেখানেও সূচীশিল্পের কাজ চলতে থাকে। তাঁর উৎসাহে সেখান থেকেই সূচীশিল্পের ওপর ইন্দুসুধা ঘোষের গ্রন্থ *সীবনী* (১৯৩০) প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকা লিখে দেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৫৯] গ্রন্থটির 'রংয়ের ব্যবহার' অংশে লেখিকা নিজের আঁকা নক্সাগুলিতে কী ধরনের রঙ ব্যবহার উপযুক্ত হবে ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী তার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। যদিও তিনি জানেন বর্ণ বিন্যাস ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে, তবে বর্ণ প্রয়োগে সামঞ্জস্য বোধের শিক্ষা প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন –

> রং সাজাতে হলে প্রকৃতির কোনো জিনিষের মধ্যে থেকে নেওয়াই ভাল। যেমন ডালিমফুলের লালের সঙ্গে তার ভিতরের রেণুর সোনালিটি মানায়। এখানে লাল কতগুলি এবং কি রকম ঘন তার সঙ্গে কি রকম ঘন কতখানি সোনালি মানিয়েছে সেটি লক্ষ করতে হবে।[১৬০]

ইন্দুসুধার এই বক্তব্য যেন আচার্য নন্দলালের শিক্ষার প্রতিফলন। যমুনা সেনের *সেলাইয়ের নকশা* (১৯৫১) গ্রন্থটিতেও একই বক্তব্য ফুটে ওঠে। গ্রন্থটিতে জামা, ওড়না, শাল, টেবিল ক্লথ, পর্দা ইত্যাদি কাপড়ের উপর করবার উপযোগী কতগুলি মৌলিক নক্সাগুলি বিভিন্ন ধরনের সেলাইয়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। সেলাইয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নক্সা পাওয়ার পর তার সঙ্গে মানানসই রঙ নির্বাচনের শিক্ষা গ্রন্থকার প্রকৃতির বর্ণসমাবেশের মধ্য থেকে নিতে বলেন। তাঁর মতে প্রকৃতি সজ্জিত 'সুন্দর ও নিঁখুত রঙের মানান আর হতে পারেনা'।[১৬১] তবে প্রকৃতির পাঠশালা থেকে রঙ নির্বাচনের শিক্ষাগ্রহণ করার কালে মূল বস্তুর রঙের ভাগ ও ওজনের দিকটিতে খেয়াল রাখার কথা তিনি বলেন। যমুনা সূচীশিল্পের নক্সা অঙ্কন রঙের ভাগ ও ওজন বিষয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের শিক্ষা যে শিক্ষক ও পিতা নন্দলালের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সূচীশিল্পের নক্সা কেমন হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে নন্দলাল লেখেন –

> কাপড়ের উপর করিবার উপযোগী নকশার ধরন হওয়া চাই অলঙ্করণধর্মী (decorative)। নকশাগুলির সার্থকতা প্রকৃতির ফুল লতা পাতা ইত্যাদির হুবহু নকল করায় নহে, বরং তাহার অনুসরণে শিল্পীর তৈয়ারী নিজস্ব ছন্দে গড়া বস্তুর রূপ ও রঙের সৃষ্টিতে।[১৬২]

নান্দনিক রুচি সম্পন্ন উৎকৃষ্ট সূচীশিল্প রচনার এই মূল কথাগুলি নন্দলাল বসু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

নন্দলালের অপর এক ছাত্রী ইলা ঘোষ আধুনিক শিল্পশিক্ষার বদলে তাঁদের নিজস্ব, সহজাত শিল্পশিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের মেয়েদের অর্থকরী হস্তশিল্প শেখাবার পরিকল্পনা করেন। তিনি দেখেন হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে গ্রামীণ সমাজের লোকশিল্পের অনেকখানি জায়গা জুড়ে 'কাঁথা' শিল্প থাকলেও তা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি এই গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গ্রামীণ শিল্পীদের নিয়ে কাঁথা সেলাইয়ের সাহায্যে তৈরি করলেন শাড়ির পাড়, চাদরের নক্সা, বটুয়া, বিছানার চাদর প্রভৃতি। কলাভবনের গণ্ডী পেরিয়ে এই কাঁথা শিল্পচর্চা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে বোলপুরের গ্রামে গ্রামে।[১৬৩] এইভাবেই নন্দলাল বসু এবং তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকশিল্পের এই ধারাটিকে নবরূপদান করেন।

২.৩.২ কাঁথা ও যামিনী রায়ের কৃতিত্ব

যামিনী রায় বাংলার নকশি কাঁথার মধ্যে আলপনার নক্সা লক্ষ করেন এবং অজস্র সমান্তরাল, বক্র ও কৌণিক রেখার সাহায্যে কাপড়ের ওপর মেয়েদের এই সাবলীল শিল্পকর্মে তিনি অনুপ্রাণিত হন। আলপনায় যে আকাঙ্খা তিনি লক্ষ করেছিলেন নকশি কাঁথায় তাঁর পূর্ণতা দেখেন। কাঁথায় ব্যবহৃত মোটিফগুলিকে নিজের শিক্ষা, কল্পনা ও অনুভূতি মিশিয়ে নতুন রূপে উপস্থিত করেন। কাঁথায় ব্যবহৃত নানারকম ছবি যেমন – বিবিধ লতা-পাতা, বিভিন্ন ধরনের ফুল, মাছ, পাখি, চিংড়ি, বেড়াল, হাতি, ঘোড়া, গাছ, মাটির বাড়ি, কলসী, প্রদীপ, ধানের শিষ ছাড়াও বহু প্রচলিত কাঁথার প্রতীকধর্মী মোটিফ যেমন – কলকা, সূর্য, চাঁদ, তারা বরফি, চাকতি, চৌকোনা, বুটি ইত্যাদি ছবিতে প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করেন। তাঁর কোন কোন আলপনা চিত্রকে নকশি কাঁথার মতো মনে হয়।[১৬৪]

কাঁথার দ্বিমাত্রিক ছবিতে শেডের কাজের প্রচলন না থাকলেও কখনো কখনো নক্সা ভরাট করার সময়ে হাতের দক্ষতায় শেডের কাজের আভাস ফুটে ওঠে। যামিনী রায়ের ছবিও বর্ণান্তরহীন গঠনগতভাবে দ্বিমাত্রিক।[১৬৫] বাংলার কাঁথা সেলাইয়ের ফোঁড়গুলির ওঠানামা এবং রেখা ছন্দের পৌনঃপুনিকতা কাঁথার নক্সার মতো মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রে। তাঁর ছবির চারপাশে প্রায়ই যে বর্ডার দেখা যায় তাতে কাঁথার পাড়ের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। 'সীতাহরণ' ছবিটি গৃহস্থের কাঁথার কথা মনে

করিয়ে দেয়। কারণ ছবিটিতে সুস্পষ্টভাবে কাঁথার অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায় ছবির চারপাশের বন্ধনীর মধ্যে। বর্ণ নির্বাচন আর মুখাবয়বের রৈখিক বিন্যাসের মধ্যেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৬৬]

বাংলার নকশি কাঁথা শিল্পে বর্ণ প্রয়োগ কৌশলের খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিভিন্ন বর্ণের সুতোর ব্যবহারে কাঁথাগুলি বর্ণবহুল হয়ে ওঠে। কাঁথার নক্সায় ব্যবহৃত হলুদ, লাল ও নীল রঙ – 'সত্ত্ব', 'রজ' ও 'তম' তিনটি গুণের প্রতীক। তবে বহু ক্ষেত্রেই রঙ নির্বাচন কিন্তু বাস্তবানুযায়ী হয় না। ফলে, হলুদ রঙের হাতি, সবুজ রঙের ঘোড়া, লাল রঙের ময়ূর ও নীল রঙের পদ্মের হামেশাই দেখা মেলে ।[১৬৭] যামিনীর ছবিতেও বর্ণ ব্যবহারের স্বাধীনতা দেখা যায়। তবে তাঁর বর্ণ প্রয়োগের সঙ্গে মিশে থাকে শিক্ষিত শিল্পী মনন, নান্দনিকতা বোধ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। তাই তাঁর ছবিতে নীল হাতি আঁকা হলেও তা বেমানান অর্থহীন হয়ে পড়ে না।

কাঁথাতে যে নক্সাগুলি অঙ্কিত হয় সেগুলি বহুলাংশে আলপনার নক্সার সাথে মিলে গেলেও তার মধ্যে ব্রত পার্বণের আচার অনুষ্ঠান বা জাদুকেন্দ্রিক বিশ্বাসের অভিক্ষেপ নেই। আলপনা হিন্দু রমণীদের নিজস্ব সম্পদ হয়ে থেকেছে কিন্তু কাঁথার বিষয়বস্তুর ওপর ধর্ম ও লোকবিশ্বাসের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে থাকলেও এর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র প্রতিভাসিত হয়। ধর্মীয় বাধা পেরিয়ে নান্দনিকতার দিক থেকে কাঁথা শিল্পীরা যেমন কাঁথা সৃষ্টি করেছে তেমনি যামিনী রায়ও শিল্পের নান্দনিক দিকটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় যামিনী রায় কাঁথার তৈরির পদ্ধতিকে গ্রহণ না করে এর মোটিফ, রেখা, বর্ণব্যবহার, স্বাধীন উদার চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

২.৪ লোকশিল্পের অন্যান্য ধারায় যামিনী রায়

২.৪.১ পুতুল

ক. মাটির পুতুল

লোকায়ত শিল্পকলার যে সমস্ত নিদর্শন রয়েছে পুতুল তার মধ্যে অন্যতম। ছোট আকৃতির মূর্তিকেই সাধারণত পুতুল বলা হয়। দৃশ্য জগতের অনুকরণ স্পৃহা, যাদুক্রিয়ায় বিশ্বাস এবং অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে বা শ্রদ্ধা জানাতে সম্ভবত পুতুলের উদ্ভব হয়। স্ত্রী অঙ্গ বিশিষ্ট হাতে টেপা

পুতুলগুলি প্রজননভিত্তিক ধর্মাচরণ ও মাতৃকা শক্তির আরাধনার প্রমাণ দেয়।[১৬৮] অবশ্য নারী মূর্তিগুলিতে কোন দেবীর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।[১৬৯] কালক্রমে যাদুক্রিয়া ও ব্রতে ব্যবহৃত পুতুলগুলি পরিমার্জিত রূপ পায় প্রতিমায়। আবার এই পুতুলগুলি ধীরে ধীরে শিশুদের খেলার সামগ্রী ও গৃহসজ্জার উপকরণে পরিণত হয়। শিশুর হাতে তুলে দেওয়া মায়ের গড়া পুতুলের মধ্যে ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত অনুভূতির বিশ্বজনীন প্রসারিত আবেদনেরই সুর ধ্বনিত হয় যামিনী রায়ের ছবিতে সহজ সরল অনায়াস উপলব্ধি আঙ্গিকের আড়ালে।[১৭০] তাঁর ছেলেবেলায় পুকুরঘাটে বসে পুকুরের মাটি দিয়ে দেবদেবীর মুখ আর জন্তুজানোয়ার গড়তে গড়তে তার নাওয়া খাওয়ার সময় পেরিয়ে যেত।[১৭১] ছেলেবেলার পুতুল গড়া, তার মধ্যে থাকা ছদ্ম বিশ্বাসের আকার পদ্ধতি, কল্পনাপ্রবণ নক্সা ও রঙ সারাজীবন তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।[১৭২] তিনি পুতুল ও প্রতিমার ত্রিমাত্রিক গড়নকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিত্রে তার প্রয়োগ করেন। বিষ্ণু দে তাঁর ছবিতে পুতুলের গড়নকে গ্রহণের প্রসঙ্গে লেখেন –

> তিনি খুঁজেছিলেন মৌলিক আকারের ও সমবর্তী রঙের উচ্ছল রূপায়ণ এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন বাংলার পুতুলের চৈত্যরূপের নিশ্চিন্ত ঋজুতায় তাঁর ঘরের ও সর্বদেশের শিশুদের শুদ্ধ ভাবগঠনের দৃষ্টিতে, আদিম বর্ণপংক্তির রঙিন শক্তিতে। তাই তাঁর পরীক্ষা চলল আমাদের চোখের প্রাথমিক অন্তরস্থ জালিধূসরের সারল্যে, যে-ধূসর, চোখ খুললেই রূপের কাঠামোতে হয়ে পড়ে আকাশের অনন্ত নীলিমা।[১৭৩]

যামিনী রায় লোকায়ত সমাজের ঘরের সম্পদ, ভাবধর্মী পুতুলগুলির মধ্যে নিজ শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা খুঁজে পান। হাতের রেখায় বা আঙুলের অল্প চাপে কাঙ্ক্ষিত ভাব ফুটিয়ে তোলার সহজ সাবলীল ধরনকে গ্রহণ করেন। পুতুলের নিষ্পাপ মুখ কাঠি দিয়ে আঁকা চুল, জুড়ে দেওয়া হাত পা ইত্যাদি খুব জীবন্তভাবে তার ছবিতে আসে। অসংখ্য পুতুলের সমাবেশে তাঁর চিত্রপট ভরে ওঠে। ধূসর পটভূমির সাদা-কালো অসংখ্য ছবিতে বাংলার এই লোকশিল্পের সাধনা করে গেছেন। পুতুলের গড়নকে কত বিচিত্র শৈলীতে উপস্থাপিত করা যায় তা যামিনী রায়ের চিত্র না দেখলে বোঝা যাবে না। তাঁর বেশকিছু একরাঙা খয়েরি রঙের ছবির ফর্মে বাংলার মাটির পুতুলের প্রভাব সুস্পষ্ট। স্বতঃস্ফুর্ত, অসচেতন অথচ বলিষ্ঠ রেখার পৌনঃপুনিক আঁচড়ে আঁকা কৌণিক মুখ, বলিষ্ঠ গর্দান, বেঁটেখাটো শরীর – এসবই মাটির পুতুলের আদল ঘেঁষা।[১৭৪]

বাংলার পুতুলে লোকশিল্পীদের যে শিল্প-নৈপুণ্য আত্মপ্রকাশ করে তা প্রতিমা রচনায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সাধারণ মূর্তিকে দৈবী মহিমায় মহমান্বিত করার কৌশল যামিনী নিষ্ঠার সঙ্গে ধৈর্য্য সহকারে বহুদিন প্রত্যক্ষ ও আত্মস্থ করেন। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারা যায় সময়ে অসময়ে সুযোগ পেলেই তিনি কুমোর পাড়ায় বসে থাকতেন। তিনিও 'বিরাট ঠাকুর' গড়বেন সংকল্প করে দুর্গাপূজার মাসখানেক আগে থেকে কুমোরদের প্রতিমা গড়ার সময় নাক মুখ চোখ হাত পা তৈরি ও রঙ প্রয়োগের ধরন লক্ষ করতেন।[১৭৫] মূর্তি তৈরি করার এই কৌশল যেমন তিনি শৈশবে বেলেতোড়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তেমনি কলকাতার কুমোরটুলিতে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন। শিল্পীর এই দর্শনের ফলশ্রুতি আমরা তাঁর চিত্রে প্রত্যক্ষ করি। বাংলার দৈবী মূর্তিগুলির ভাবের অভিব্যক্তি ধ্যানের বিকাশ তাঁর ছবিতেও দেখা যায়। তাঁর চিত্রে ঐশী ভাবের সঙ্গে বাংলার খাঁটি পল্লিনারীর সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও নির্ভীক জীবনের আদর্শ ফুটে ওঠে। ছবিতে আঁকা চোখগুলি যেন বাংলার পুতুল ও দেবী প্রতিমার বিশেষত্বকে প্রকাশ করে।[১৭৬] তিনি ছবিতে যখনই দেব-দেবীর প্রতিরূপ এনেছেন প্রতিমার গড়ন থেকে বিচ্যুত হতে পারেননি। পুতুল ও প্রতিমা শিল্পের আতিশয্য-আড়ম্বরহীন, সংযত অথচ চিত্তাকর্ষক শৈলী তাঁর চিত্রে পরিলক্ষিত হয়। দেবদেবী ছাড়াও অন্যান্য মূর্তিঅঙ্কনের ক্ষেত্রে ও তিনি লোকশিল্পের এই ফর্মটিকে ব্যবহার করেন।[১৭৭] পুতুলধর্মী চিত্রগুলিতে রঙ করতে গিয়ে কখনো কাঁচা মাটি, কখনো বা পোড়া মাটির রঙ ব্যবহার করেন তবে দেব-দেবীর চিত্রে রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি অনেকখানি প্রতীকী হয়ে ওঠেন। প্রতিমার অলংকার সজ্জা না এনেও তাঁর ছবিতে দেবী নিরাভরণে মলিন হন না।

খ. কাঠের পুতুল

মাটির পুতুল ছাড়া বাংলায় অন্যতম প্রাচীন ও সর্বাধিক প্রচলিত পুতুল হল কাঠের পুতুল। মিশরের মমির সঙ্গে এই পুতুলগুলির মিল থাকায় এইগুলি 'মমি-ডল' নামে পরিচিত। এই ধরনের পুতুল তৈরি করতে প্রথমে চৌকো কাঠের ছোট ছোট টুকরোর দুপাশ চেঁছে ফেলে একটা দীর্ঘ ত্রিকোণাভাস ফুটিয়ে তুলে এর উপরের দিকের দুপাশ কিছুটা চেঁছে ঘোমটা দেওয়ার আদল, ও পরে বুকের উপর থেকে থুতনির নিচ অবধি খানিকটা অংশ গভীরভাবে কেটে মুখ তৈরি করা হয়।[১৭৮] এছাড়া নানা মাপের

কাঠের খণ্ড খোদাই করে নানা ধরনের অবয়ব ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা।[১৭৯] খোদায়ের পর কাঠগুলিতে ক্রমে এঁটেল মাটি ও খড়ির প্রলেপ দেওয়ার পর তাতে হলুদ, সবুজ, লাল, নীল ইত্যাদি রঙ প্রয়োজন মতো দেওয়া হয়।[১৮০] সবশেষে কালো বলিষ্ট রঙে চোখ, মুখ, কাপড়ের ভাঁজ ও অন্যান্য অলংকরণ করা হয়। নারী পুতুলগুলি রানি পুতুল নামে পরিচিত হলেও বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় ও বিষ্ণুপুরে এইগুলি নন্দরানি পুতুল নামে পরিচিত।[১৮১] যামিনী রায় এই ধরনের পুতুলের গড়নকে গ্রহণ করলেও এর হুবহু প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কন করেননি। কেবলমাত্র ঘোমটার কাছটাতে আড়াআড়ি রেখাগুলি ছাড়া বাকি সব অংশেই কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছেই। তাঁর ছবি অনেক বেশি অলংকৃত; আলাদা করে কান, দুল, চুলের খোঁপা, টিপ, পা ও কোমরের ভাঁজ বোঝানো। তাঁর আঁকা পুতুলের হাত দুটোকে পাশ থেকে সরিয়ে এনে সামনে রাখা, আর বুকের কাছের উত্তরীয় হাতের দুপাশে ঝোলানো। কাঠের পুতুলের আদলে আঁকা মূর্তিগুলির গড়নে অনমনীয় কাঠের দৃঢ়ভাব লক্ষ করার মতো। ছবিগুলি দেখলে মনে হয় বিভিন্ন আকৃতির কতগুলো কাঠের টুকরো জুড়ে জুড়ে যেন মূর্তিগুলি তৈরি হয়েছে। আবার কখনো মনে হবে চৌকো কাঠের টুকরোকে বিভিন্ন দিক থেকে কেটে কেটে মূর্তির আকার দান করা হয়েছে। ছবির জীবজন্তু, গাছপালাতেও এই স্বভাব লক্ষ করা যায়। সরল রেখাঙ্কনের কৌশলই ছবিগুলিকে এমন মাত্রা দান করেছে। ওয়াশ রঙের ব্যবহারে ছবিগুলি যেন কোন সুদূর অতীতের গল্প বলে যায়।

২.৪.২ টেরাকোটা

টেরাকোটা শিল্প মানব-সংস্কৃতির অন্যতম সুপ্রাচীন নিদর্শন। টেরাকোটা শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ (মূলত ইতালীয় ভাষা)। ‘টেরা’ অর্থ মাটি, আর ‘কোটা’ অর্থ পোড়ানো। ‘টেরাকোটা’ শব্দটির অর্থ হল পোড়ামাটি।[১৮২] পোড়ামাটির তৈরি সকল প্রকার জিনিসই টেরাকোটা পর্যায়ভুক্ত হলেও শৈল্পিক দিক দিয়ে বিচার করলে মন্দিরভাস্কর্য, পূজার্চনা ও শিশুদের মনোরঞ্জনের পুতুল যেগুলি বর্তমানে গৃহসজ্জার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকেই বোঝায়। পোড়ামাটির টেরাকোটার উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায় বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যগুলিতে। এছাড়া এ অঞ্চলের ঘোড়া, হাতি এই বিশেষ শিল্পরীতির পরিচায়ক রূপে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে। যামিনী রায় এই দুই

ধরনের টেরাকোটা শিল্পের দ্বারাই ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্যামরায়, মদনমোহন, বিশেষ করে জোড়বাংলা মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালের টেরাকোটা তাঁর মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে।[১৮৩] তাঁর 'রামায়ণ মহাভারত ভাগবত বিষয়ক চিত্রগুলির রীতি প্রকৃতি, ব্যঞ্জনা ও বিভঙ্গ' দেখে বিষ্ণুপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মন্দির অলংকরণের প্রভাব বুঝতে পারা যায় ।[১৮৪] রাম-সীতার বনবাস, মারীচের স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ, রাবণ-জটায়ু যুদ্ধ, কৃষ্ণলীলার অসংখ্য বিষয় – মা যশোদার ননী তৈরি ও বালক কৃষ্ণ, ননী চুরি, গোপীনীদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের নৌকা যাত্রা, গাভী ও কৃষ্ণ, গোপীনীদের সঙ্গে দোল খেলা ইত্যাদি বিষয়গুলি অঙ্কনের সময় কখনো তিনি বিষয়ের ভাববস্তুটিকে গ্রহণ করে তাকে নিজের মতো রূপ দিয়েছেন আবার কখনো মন্দিরগাত্রের টেরাকোটাকে হুবহু নকল করেছেন। তাঁর রাবণ-জটায়ু যুদ্ধ ছবিটিতে রাবণের দাঁড়ানোর ভঙ্গি, জটায়ুর আকৃতি, তার আক্রমণের ধরন, রথের মধ্যে সীতার বসে থাকা সমস্ত কিছুই মন্দিরগাত্রের টেরাকোটার সঙ্গে পুরোটাই মিলে যায়। নৌকা যাত্রার চিত্রটি হুবহু নকল না হলেও নৌকার আকৃতি, দাঁড় বাইবার কায়দা টেরাকোটা শিল্প থেকে প্রাপ্ত। যশোদার কাঁখে বালকৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বলরাম, বেশকিছু নারী মূর্তি টেরাকোটা প্যানেলেরই রূপান্তর। শরীরের লীলায়তভঙ্গি, ছন্দোময়তা, হাত ও পায়ের মুদ্রা, চুল বাঁধার স্টাইল, কোমরের ভাঁজ, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নৃত্যরতা নারী, তিন সখী এই ছবিগুলিতে তিনি মণিহীন চোখ আঁকার বৈশিষ্ট্য টেরাকোটা থেকে প্রাপ্ত বলে বলে মনে হয়। শাক্ত দেব-দেবীদের মধ্যে মহিষমর্দিনী দুর্গাই টেরাকোটা ভাস্কর্যে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছেন। মন্দির টেরাকোটায় মহিষমর্দিনী দুর্গাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সপরিবারে একটি মাত্র প্যানেলে দেখানোর ধরনকে যামিনী রায় গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে বিশেষকরে মদনমোহন মন্দিরে একক, দ্বৈত কিংবা দলগত কীর্তনের ফলক আছে।[১৮৫] তাঁর নামসংকীর্তনের ছবিগুলিতে এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া তিনি মন্দির অলংকরণের এই মোটিফ নানা ধরণের লতা-পাতা, নক্সা; বিশেষ করে ফুলগুলিকে আলপনার ধাঁচে সম্পুর্ণ ভিন্ন রূপে রূপায়িত করেন। তাঁর চিত্রের বর্ডারে জ্যামিতিক রেখার ফুলকারি কাজের যে রীতি দেখা যায় সেই ধরন টেরাকোটা মন্দিরগুলোতেও দেখা যায়।[১৮৬] তিনি টেরাকোটার বিষয়কেই যে শুধু গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তিনি মন্দির অলংকরণের টেরাকোটার স্থাপত্য শৈলীকে চিত্রপটে স্থান দিয়েছেন। তাঁর ছবিতে বাঁকুড়ার মন্দির-প্রতিমার প্রভাব থাকলেও ছবিগুলি তুলনামূলকভাবে

দীর্ঘায়তনের হওয়ায় অনুপাতের দিক থেকে পোড়ামাটির কাজের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মেলে না।[১৮৭] তাঁর একসময় স্থুল ডট দিয়ে আঁকা ছবিগুলি দেখলে মনে হয় মাকড়া পাথরের প্যানেলগুলির মত দার্ঢ্য, ঘনত্ব ও সৌন্দর্য আনার জন্য এর ব্যবহার করেন। আবার তাঁর ছবিতে গেরুয়া বা লাল রঙের বাহুল্য তা টেরাকোটার পোড়ামাটির কথাই মনে করায়।[১৮৮] মন্দির টেরাকোটায় *রামায়ণ, মহাভারত,* পুরাণ, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি কাহিনিগুলি একটার পর একটা টালি সজ্জিত করে ধারাবাহিকভাবে চিত্রিত হওয়ায় সেখানে নাট্যধর্মীতা লক্ষ করা গেলেও যামিনীর ছবি স্থির খন্ডিত একটিমাত্র ঘটনা উপস্থাপিত হওয়ায় তাতে ধারাবাহিকতা ও নাট্যধর্মীতা নেই।

ভবেশ সান্যাল (১৯০১-২০০৩) ও যামিনী ১৯২৭ বা ২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যামিনীর বাগবাজারের বাড়িতে পুতুল গড়তে শুরু করলে ভবেশ অনুভব করেন যামিনী কিছু ‘জিজ্ঞাসা’, ‘অব্যক্তব্যঞ্জনা’ ত্রিমাত্রিক গড়নে রূপায়িত করতে চান। তাঁর ‘মনগড়া’ ঘোড়া যেন ‘বাঁকুড়ার ঘোড়া’-য় রূপায়িত হয়ে ‘তেজি মেজাজটাকে’ই প্রাধান্য দেয়। যে সরলীকৃত আঁকার ধরন তাঁর ছবিতে দেখা যায় তারই সন্ধান তিনি মাটির মাধ্যমে শুরু করেন।[১৮৯] বাঁকুড়ার পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার শৈল্পিক সৌন্দর্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর ছবিতে সরাসরি এই ধরনের ঘোড়ার আদলকে যেমন ব্যবহার করেন তেমনি অন্যান্য পশুর মধ্যেও লোকায়ত এই ঘোড়ার আদলকে আনেন। কিছু ছবিতে শুধু ঘোড়া, আবার কোথাও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার দেবদেবী, বীরাঙ্গনা নারী, মুসলিম শাসককে ছবির বিষয়বস্তু করেছেন। তিনি এক ধরনের ঘোড়া এঁকেছেন যার মুখটা অনেকাংশেই আসল ঘোড়ার মতো, কিন্তু তার নাতিদীর্ঘ নিম্ন স্ফীত গলা, দীর্ঘাকৃতি পা, টানাচোখ কান, পিঠে বসবার আসন এবং মুখের লাগাম মাটির ঘোড়ার পরম্পরায় তৈরি। আরেকটি ছবিতে ঘোড়ার মুখটি ছোট করে আঁকা কিন্তু তার মধ্যে ও দীর্ঘ চোখ ও দীর্ঘ কান, স্তম্ভের মতো পা, বলিষ্ঠ দেহের গঠন এবং সারা শরীর জুড়ে নানা রঙের অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। অলংকরণবর্জিত আর এক ধরণের রক্তাভ ঘোড়া দেখা যায় যার মুখ ও দেহ দীর্ঘ অথচ পাগুলো ছোট। তাঁর আঁকা কালো রঙের লম্বা গলার আর একটি ঘোড়ার পাগুলো ছোট, দীর্ঘ ও আয়তাকার দেহ উত্তরীয় পরিহিত লাল, কমলা, চাপা সবুজ রঙ দ্বারা অলঙ্কৃত। উল্লেখ্য যে তাঁর আঁকা ঘোড়াগুলি অধিকাংশেরই কালো ও লাল রঙ বাঁকুড়ার লাল-কালো মাটির ঘোড়াগুলিকে স্মরণ করায়।

তবে অলংকরণে বর্ণের সমারোহে এইগুলি টেরাকোটা থেকে পৃথক হয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবি জানায়।

বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি মৃৎশিল্পকেন্দ্রে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতিও তৈরি হতে দেখা যায়। এলাকা ভেদে হাতির গড়ন ও বর্ণের পার্থক্য দেখা যায়৷ যামিনী রায়ের আঁকা বিভিন্ন ধরনের হাতির ছবিগুলিতে পোড়ামাটির পুতুলের আদল চোখে পড়ে। লোকশিল্পীদের তৈরি হাতি সাধারণত লাল ও কালো রঙের হলেও যামিনীর আঁকা হাতি বর্ণ কালো, ধূসর, খয়েরি এবং গাঢ় নীল হয়ে থাকে। হরিণ, গরু, ষাঁড়, বাঘ, অসংখ্য বিড়ালও টেরাকোটার আকারভুক্ত হয়ে পড়ে। তবে জন্তু-জানোয়ারের ফর্মের মধ্যে পোড়ামাটির খেলনার ফর্মের সঙ্গে কিছুটা মিল আমাদের চোখে পড়লেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইগুলিকে তাঁর মৌলিক সৃষ্টি বলা যায়।[১৯০]

২.৪.৩ চালচিত্র ও সরাচিত্র

প্রতিমার পশ্চাদপটে চালচিত্র স্থাপন করা একটি প্রাচীন রীতি।[১৯১] এই চালগুলি বহু চরিত্র ও বর্ণ সহযোগে পটুয়ারা চিত্রায়িত করে থাকেন। বাঁকুড়ার ফৌজদারি শিল্পীগণ দশাবতার তাস আঁকার পাশাপাশি প্রতিমা তৈরি ও চালচিত্র আঁকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১৯২] দুর্গাপূজার ঠিক আগে চালচিত্র অঙ্কনে ব্যস্ত শিল্পীদের নিরীক্ষণের প্রভাব যামিনী রায়ের ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়।[১৯৩] তাঁর আঁকা রামায়ণ কাহিনির একটি চিত্রে প্রতিটি মূর্তির পিছনে চালচিত্রের আভাস লক্ষিত হয়।

গোল মাটির থালায় আঁকা পঞ্চকল্যানী পটেরই স্বজাতি হল বহুল পরিচিত চিত্র সরা বা লক্ষ্মীসরা। পটের অঙ্কনরীতি এরও উপজীব্য। পটধর্মী এই লোকশিল্পটিও যামিনী রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সরার বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করলেও একাধিক বিষয়কে একই চিত্রপটে স্থান দেন না৷ সরার মতো চিত্রপটকে খণ্ডিত না করে সমগ্র চিত্রপট জুড়ে ছবি আঁকেন। সরা আঁকার রীতি অনুসারে একচোখা দুর্গা ও একচোখা লক্ষ্মী অর্থাৎ প্রোফাইল ফেসের মূর্তি, আবার দুটি চোখওয়ালা অর্থাৎ পূর্ণ মুখাবয়ব অঙ্কনের ধরন তাঁর ছবিতে লক্ষ করা যায়। সরার লতামণ্ডলী, চারপাশের বর্ণবেষ্টনী, মূর্তির গঠন, বেশবিন্যাসের ‘আতিশয্যহীন কঠিন সংযমের’[১৯৪] বন্ধন তাঁর ছবির মধ্যেও লক্ষ করা যায়। আলপনাধর্মী চিত্র ছাড়া বাকি সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশেষ করে দেবদেবী, পশুপক্ষীর মূর্তির সীমা অঙ্কনে

ফরিদপুরের সরাশিল্পীদের মতো গাঢ় কালো রঙ ব্যবহার করেন। সরাশিল্পীরা খসড়া না এঁকে জমিতে সরাসরি দ্রুত ও সাবলীল ভঙ্গিতে রঙের সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পোশাক প্রভৃতির আভাস দেন। এরপরে সীমা সূচক রেখার সাহায্যে সেই রূপকে স্পষ্ট করে তোলেন। রূপের আদ্যোপান্ত বাঁধুনি হিসাবে এই রেখা ব্যবহৃত হয় না। প্রয়োজনমতো জায়গা বিশেষে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যামিনী রায় আগে থকে খসড়া অঙ্কন করে নিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে সীমা বরাবর রঙ ভরে মেপে মেপে রেখা টানার ফলে তাঁর ছবির স্ফূর্তি নষ্ট হয়। সরা শিল্পীরা যেখানে অপেক্ষাকৃত সরু রেখার সাহায্যে জায়গা বিশেষে রূপকে উজিয়ে দেন; তিনি সেখানে স্থূল রেখার সাহায্যে রূপকে বাঁধন হিসাবে সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখতে চান।[১৯৫] আচার্য ব্রাহ্মণ বা গনক ব্রাহ্মণরা যে সরা প্রস্তুত করেন তার জমি লাল রঙের এবং তার উপরে সমস্ত দেবদেবীরই কাপড় কালো রঙের হয়ে থাকে। নানা লতামণ্ডনে ও মূর্তির অলংকরণে কালো রঙের উপরে সাদা খড়ি মাটির ব্যবহারই এই সরার বৈশিষ্ট্য। তাঁর বেশিরভাগ ছবির পশ্চাদপটে লাল রঙের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দেবদেবীর কাপড় কালো রঙে ঢেকে না দিলেও মূর্তি অলংকরণে তিনি মূলত সাদা রঙই ব্যবহার করেছেন।

২.১৬ উপসংহার

নন্দলাল বসু ভারতবর্ষের ধ্রুপদী শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে লোকশিল্পকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে লোকশিল্পের প্রতি নিজে আগ্রহী হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করেছেন। কলাভবনে বাংলা ও বাংলার বাইরের লোকশিল্পগুলির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহে লোকশিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে আলাদা ধারার জন্ম হয়েছে যা শান্তিনিকেতনী ধারা নামে পরিচিত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে লোকশিল্পগুলি সম্পর্কে তাঁর ভাবনার পরিচয় মেলে। তিরিশের দশকের আগের সময়টুকু বাদ দিলে যামিনী রায়ের শিল্পচর্চাকে লোকশিল্প অনুসারী বলে বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্য শিল্পচর্চা ও নব্যবঙ্গীয় ধারার চিত্রচর্চায় আত্মার যোগ খুঁজে না পাওয়ায় তিনি বাংলার লোকশিল্পকে আশ্রয় করে বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন। বেশিরভাগ সমালোচক তাঁর ছবিগুলিতে পটচিত্রের প্রভাবকেই চিহ্নিত করেছেন। নিজেকে পটুয়া বললেও তিনি যে নিছক পটুয়া নন তা তাঁর ছবির বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে। পট ছাড়াও তাঁর ছবিতে আলপনা, কাঁথা, পুতুল, প্রতিমা, মন্দির টেরাকোটা, চালচিত্র ও সরাচিত্রের প্রভাব লক্ষ করা

যায়। বোলিয়াতোড়ের লৌকিক সংস্কৃতিতে লালিত শৈশবের স্মৃতি থেকে উঠে আসা বিষয়গুলি কোন না কোনভাবে তাঁর ছবিতে ছাপ রেখে গেছে। লোকশিল্পের ইঙ্গিতময়তা, রেখাঙ্কনের সরলতা, বর্ণ প্রয়োগের কৌশলকে তিনি গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তির নিজস্ব সৃজনশীলতা অপেক্ষা পারিবারিক তথা সামাজিক লক্ষসাধনই লোকশিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান হয়ে ওঠে। সমাজনির্ভরতার কারণে লোকশিল্পগুলি অনেকক্ষেত্রে মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে থাকে। লোকশিল্পের এই মঙ্গলকর দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। লোকশিল্পীরা লোকরঞ্জনের সূত্রে লোকসাধারণকে ধর্মীয়, সামাজিক শিক্ষাদান করে থাকে। লোকশিল্প শিল্পসৃষ্টির সচেতন বোধ নিয়ে সবক্ষেত্রে রচিত হয় না, গার্হস্থ্য জীবন ও ব্রত-পার্বণের অঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবচেতন মনে সৃষ্ট মোটিফগুলি পরম্পরাক্রমে লোকশিল্পে ব্যবহার হয়। এইক্ষেত্রে অনলস দীর্ঘ-সাধনা, সহজাত শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞান বিশেষ সহায়ক হয়। যামিনী রায় ও নন্দলাল বসু নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অখ্যাত অবজ্ঞাত আদিম শিল্পচর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এই দুই শিল্পীর হাত ধরে লোকশিল্প লোক সমাজের গণ্ডী পেরিয়ে, আচার অনুষ্ঠানের সংস্কারকে জয় করে সার্বজনীন চর্চার বিষয় হয়ে উঠছে। তাঁদের এই ব্যতিক্রমী ও সাহসী পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গেছে।

উৎস ও অনুষঙ্গ

১। বড় পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)। *পটুয়া সংস্কৃতি পরম্পরা ও পরিবর্তন*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ২৩

২। দত্ত, গুরুসদয় (২০০৮)। *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য*। কলকাতা: ছাতিম। পৃ. ১

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (১৯৬৭)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। দ্বিতীয় খণ্ড। নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ১২৫৫

৪। বড় পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫

৫। চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত, ২০১৩)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৩৭০

৬। দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। *শিল্প ও শিল্পী*। দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক। পৃ. ৪২২

৭। বড় পণ্ডা, দীপক কুমার (১৯৯৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৭-৫৯

৮। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। প্রথম খন্ড। বীরভূম: রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ। পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

৯। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। মণ্ডল, পঞ্চানন। ‘গুরুশিষ্য সংবাদ’। *মাস্টারমশাই নন্দলাল।* কলকাতা: লালমাটি। পৃ. ১৫১

১০। সামন্ত, কানাই (১৯৬২)। *নন্দলাল বসু*। কলকাতা: কথাশিল্প প্রকাশন। পৃ. ৩৪

১১। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৪

১২। বসু, নন্দলাল (১৩৯২)। দত্ত, অম্লান ও সুব্রহ্মণ্যন্, গণপতি শ্রীকল্লাতি (সম্পাদিত)। *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ২৮২

১৩। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৬

১৪। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। মণ্ডল, পঞ্চানন। ‘গুরুশিষ্য সংবাদ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫১

১৫। বসু, নন্দলাল (১৩৯২)। দত্ত, অম্লান ও সুব্রহ্মণ্যন্, গণপতি শ্রীকল্লাতি (সম্পাদিত)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮৩

১৬। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৬-৩৯৭

১৭। বসু, নন্দলাল (১৩৯২)। দত্ত, অম্লান ও সুব্রহ্মণ্যন্, গণপতি শ্রীকল্লাতি (সম্পাদিত)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮২

১৮। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৬

১৯। ঘোষ, সাগরময় (১৩৮৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। ‘নন্দলাল: কারুসংঘ ও জাতীয় আন্দোলন’। *দেশ*। পৃ. ৪৩

২০। ঘোষ, সাগরময় (১৩৮৯)। গুহ, মনোরঞ্জন। ‘গান্ধিজী ও নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ.১২৫-১২৬

২১। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৩)। *নন্দলালের বাপুজি*। কলকাতা: সূত্রধর। পৃ. ১৭-২৫

২২। বসু, নন্দলাল (১৩৯২)। দত্ত, অম্লান ও সুব্রহ্মণ্যন্, গণপতি শ্রীকল্লাতি (সম্পাদিত)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪৮

২৩। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। ‘গুরু স্মরণ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৫

২৪। কৌশিক, দিনকর (১৯৯৫)। সোম, শোভন (অনুবাদিত)। *নন্দলাল বসু ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*। নিউ দিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট। পৃ. ৭৯

২৫। ঘোষ, সাগরময় (১৩৮৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। ‘নন্দলাল: কারুসংঘ ও জাতীয় আন্দোলন’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৭

২৬। ঘোষ, সাগরময় (১৩৮৯)। গুহ, মনোরঞ্জন। ‘গান্ধিজী ও নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ.১২৫

২৭। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ভঞ্জ, গৌরী। ‘আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৭

২৮। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। দুগার, ইন্দ্র। ‘রূপপতি নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৯

২৯। চক্রবর্তী, বরুণকুমার ও মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পাদিত,১৯৯৬)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: অপর্ণা। পৃ. ১৫৭

৩০। Prasad, Sujata (Edited, May 2022). Siva Kumar, R. ‘Nandalal Bose: The man, his art and his pedagogic practice’. *The NGMA Art Journal*. P. 40

৩১। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ। ‘পোস্টার শিল্প ও নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭২

৩২। ক্যালিগ্রাফিক রেখাঙ্কন – নন্দলাল বসুর ভাষায় শরপাতি (শরপাতার মতো) রেখা। দ্রষ্টব্য: বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ৯৪

৩৩। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। *নন্দলাল*। কলকাতা: দেজ। পৃ. ৬৬-৬৭

৩৪। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ। ‘পোস্টার শিল্প ও নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭২

৩৫। মাইতি, চিত্তরঞ্জন (২০০১)। *প্রসঙ্গ: পট, পটুয়া ও পটুয়া সঙ্গীত*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। পৃ. ৩১

৩৬। কৌশিক, দিনকর (১৯৯৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৬

৩৭। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭০

৩৮। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। দুগার, ইন্দ্র। ‘রূপপতি নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৯

৩৯। Sinha, Suhashini and Panda, C (2011). *Kalighat Paintings*. London: V & A Publishing. P. 28–29

৪০। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ। ‘পোস্টার শিল্প ও নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭১

৪১। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী। ‘নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯১

৪২। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৬

৪৩। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। চক্রবর্তী, কাঞ্চন (সম্পাদিত)। *চিত্রকথা*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী। পৃ. ২৬৫

৪৪। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। গুহ, মনোরঞ্জন। 'গান্ধিজি ও নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৫–১২৯

৪৫। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৪

৪৬। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। কৃপালনী, কৃষ্ণ। 'শিল্প ও সামাজিক মূল্যবোধ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৭

৪৭। সামন্ত, কানাই (১৯৬২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৮–৪৯

৪৮। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। সামন্ত, কানাই। 'শিল্পীগুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮০–৮১

৪৯। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৮

৫০। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। সামন্ত, কানাই। 'শিল্পীগুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭০

৫১। জৌসা – জৌসা হল চিত্রাঙ্কনের এক বিশেষ পদ্ধতি, যেখানে ছবিটিকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য ছবির মূল রঙের উপর একটি পাতলা অর্ধ স্বচ্ছ পদার্থের আস্তরণ দেওয়া হয়। See: https://www.oldholland.com/academy/how-to-use-the-glaze-technique-effectively/?. Last accessed: 10.06.2023

৫২। কৎবেল আঠা – পট আঁকার সময় পুরীর পটুয়ারা কৎবেলের আঠা ব্যবহার করে থাকেন। দ্রষ্টব্য: বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৮

৫৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৬

৫৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৯

৫৫। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। দুগার, ইন্দ্র। 'রূপপতি নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬০

৫৬। দে, বিষ্ণু (১৪০৩)। *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ*। কলকাতা: দেজ। পৃ. ৫০

৫৭। বেঙ্গল স্কুল – ভারতীয় শিল্পের যে ধারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, অবনীন্দ্রনাথ সেই অতীতের সেই ধারার সঙ্গে যোগরক্ষা করে স্বকীয় একটি ধারা এবং শিল্পগোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। এই শিল্পগোষ্ঠীই ইউরোপ ও ভারতে বেঙ্গল স্কুল ও নিও-বেঙ্গল স্কুল নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্য: গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১৫৪

৫৮। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। পাইন, গণেশ। 'স্বেচ্ছায় তিনি স্রোতের বিপরীতে'। *রূপতাপস যামিনী রায়*। কলকাতা: প্রতিভাস। পৃ. ২২৯

৫৯। বড়পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৫

৬০। বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১১)। *যামিনী রায় শ্রদ্ধার্ঘ্য*। কলকাতা: সুতানুটি বইমেলা। পৃ. ৪৫–৪৬

৬১। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। রায়চৌধুরি, দেবীপ্রসাদ। 'যামিনীদা প্রসঙ্গে'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৩

৬২। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। *যামিনী রায় : তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক*। কলকাতা: আশা প্রকাশনী। পৃ. ১৪

৬৩। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। *সাধক-শিল্পী যামিনী রায়*। কলকাতা: আভাষ। পৃ. ৪৩

৬৪। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। কোটস, অস্টিন। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০৪

৬৫। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। নন্দী, সুধীর। 'শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রসাধনা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৬-১৩৭

৬৬। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। কোটস, অস্টিন। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০৫

৬৭। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। নন্দী, সুধীর। 'শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রসাধনা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৬-১৩৭

৬৮। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। মিত্র, অশোক। 'চিন্তায় মহাজ্ঞানী, কথোপকথনে সরল কৃষক'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৬

৬৯। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ২০১৭)। সোম, শোভন। 'যামিনী রায়ের ছবি: রীতি ও তাৎপর্য'। যামিনী রায়: পত্রাবলী ও প্রবন্ধ। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ১০০-১১০

৭০। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। মৈত্র, রথীন। 'যামিনীদার ছবি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৪

৭১। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৯৩)। গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ। 'যামিনী রায়ের শিল্পের উৎস সন্ধানে'। পৃ. ৩৪

৭২। মুখোপাধ্যায়, আদিত্য (২০০৫)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: অমর ভারতী। পৃ. ৯৫

৭৩। চিত্রকর পটুয়া – এই শ্রেণির পটুয়ারা পট আঁকেন, পটের গান বাঁধেন ও ঘুরে ঘুরে পট দেখান। দ্রষ্টব্য: মাইতি, চিত্তরঞ্জন (২০০১)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪১

৭৪। সরকার, প্রভাতচন্দ্র (সম্পাদিত, ২০২১)। বিশ্বাস, মিলনকান্তি। 'পট ও পটের গান : বিবিধের মধ্যে ঐক্য'। *বহমান লোকসংস্কৃতি চর্চা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ১৪০

৭৫। বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১১)। শান্তা দেবী। 'শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৪-৬৫

৭৬। Dey, Bishnu and Irwin, John (1944). *Jamini Roy*. Indian Society of Oriental Art. P. 11

৭৭। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। দুগার, ইন্দ্র। 'নতুন ফর্ম ও ডিজাইনের উদ্ভাবক'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২২০

৭৮। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩

৭৯। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, বুদ্ধদেব। 'ধন্য যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৬

৮০। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। সেন, সুনীলমাধব। 'দিনপঞ্জীর পাতা থেকে'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৩

৮১। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৯

৮২। চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ (১৯৯২)। ভারত-শিল্পের পথিকৃৎ। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৭১

৮৩। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৩

৮৪। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫২

৮৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১১

৮৬। Ghosh, Anuradha (2022). *Jamini Roy*. Kolkata: Niyogi Books. P. 39–40

৮৭। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৯৩)। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী। 'শিল্পী যামিনী রায়'। *দেশ*। পৃ. ৩০

৮৮। হালদার, অসিতকুমার (২০১৫)। *শিল্পকথা*। কলকাতা: পত্রলেখা। পৃ. ১০৫–১০৬

৮৯। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। শিল্পী মানুষ যামিনী রায়। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৭৫

৯০। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। পাইন, গণেশ। 'স্বেচ্ছায় তিনি স্রোতের বিপরীতে'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২২৯

৯১। দাঁ,প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ। 'যামিনীদা প্রসঙ্গে'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৪

৯২। বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১১)। ভট্টাচার্য, বিকাশ। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৫

৯৩। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৭

৯৪। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৬

৯৫। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬

৯৬। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ২০১৭)। সোম, শোভন। 'যামিনী রায়ের ছবি: রীতি ও তাৎপর্য'। পূর্বোক্ত। পৃ.১২১

৯৭। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার(২০১৪)। যামিনী রায়। রাজ্য চারুকলা পর্ষদ। পৃ. ২৮

৯৮। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৪

৯৯। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২২

১০০। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৫

১০১। বড়পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৬

১০২। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। শান্তা দেবী। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১৫

১০৩। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ২০১৭)। সোম, শোভন। 'যামিনী রায়ের ছবি: রীতি ও তাৎপর্য'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২

১০৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১০

১০৫। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০

১০৬। বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১১)। ঘোষ, শঙ্খ। 'শিশুর সারল্য চাই বয়স্ক মননে'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫০

১০৭। গুহ, নরেশ (২০১৫)। যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর। কলকাতা: লালমাটি। পৃ. ৩০

১০৮। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। মালিক, অহিভূষণ। 'যামিনী রায় কি লোকশিল্পী'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩০

১০৯। দাঁ,প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ। 'যামিনীদা প্রসঙ্গে'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৩

১১০। চৌধুরী, কমল (সংকলিত ও সম্পাদিত)। *বাংলার ব্রত ও আলপনা*। কলকাতা: দেজ। পৃ. ১৮১

১১১। চক্রবর্তী, বরুণ (সম্পাদিত, ২০১১)। মুখোপাধ্যায়, সোমা। 'বাংলার আলপনা'। *লোকজশিল্প*। কলকাতা: পারুল। পৃ. ৪

১১২। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (২০১৮)। *অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলী*। নবম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন। পৃ. ৪৬৫

১১৩। ঘোষ, স্বাতী (২০১৫)। *রবীন্দ্রভাবনায় শান্তিনিকেতনের আলপনা*। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ৫-৭

১১৪। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৫০)। *বাংলার ব্রত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। পৃ. ৬০

১১৫। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত, ২০০৫)। ঘোষ, শান্তিদেব। 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীপ্রকৃতি'। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১৯৮

১১৬। সোম, শোভন (১৯৮৫)। *তিন শিল্পী: নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর*। কলকাতা: বাণীশিল্প। পৃ. ৩৪

১১৭। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৭-৬৮

১১৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৬২

১১৯। অধিকারী, সুশোভন (২০১৯)। *কেন্দ্রবিন্দুতে রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: পত্রলেখা। পৃ. ২৪

১২০। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯০

১২১। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৮

১২২। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ঘোষ, ইন্দুসুধা। 'পুণ্যস্মৃতি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫০

১২৩। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। *শিল্পকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১৪

১২৪। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ভঞ্জ, গৌরী। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৪

১২৫। মুখোপাধ্যায়, প্রণতি (সম্পাদিত, ১৯৮৪)। ভঞ্জ, গৌরী। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। *রবীন্দ্রভাবনা:* নন্দলাল সংখ্যা। কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। পৃ. ১০২

১২৬। মুখোপাধ্যায়, প্রণতি (সম্পাদিত, ১৯৮৪)। খাস্তগীর, অনুকণা। 'আমাদের মাষ্টারমশাই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২২

১২৭। মুখোপাধ্যায়, প্রণতি (সম্পাদিত, ১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯১

১২৮। অধিকারী, সুশোভন (২০১৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩২

১২৯। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ভঞ্জ, গৌরী। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৪

১৩০। অধিকারী, সুশোভন (২০১৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯

১৩১। ঘোষ, স্বাতী (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৭

১৩২। বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৮

১৩৩। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৪-৩৫

১৩৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০

১৩৫। বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫০-১৬০

১৩৬। দেওয়ালচিত্র – গুহাবাসীরা গুহার গায়ে ছবি এঁকে চিত্রর পিপাসা মিটাতো, গ্রামবাসীরা দেওয়ালে আলপনা ও ছবি এঁকে অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করে। কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এইগুলি চিত্রিত হলেও উৎসব শেষে মুছে ফেলা হয় না, সারা বছর দেওয়ালের গায়ে থেকে যায়। দ্রষ্টব্য: আহমদ, ওয়াকিল (১৯৬৫)। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ৭১

১৩৭। ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাদিত, ২০০৪)। জসিমুদ্দিন। 'পল্লিশিল্প'। *বঙ্গীয় শিল্পও পরিচয়*। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ. ৫১

১৩৮। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ। 'শিল্পী যামিনী রায়ের ছবি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩৫

১৩৯। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ। 'যামিনী রায়ের বাঁকুড়া'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০

১৪০। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায় সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭২

১৪১। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪১

১৪২। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৭

১৪৩। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৬-৯৭

১৪৪। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০

১৪৫। যামিনী রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র অমিয় রায়, রবীন্দ্রনাথ সামন্তকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন - বিস্মিত হয়ে দেখেছি যিশুর ক্রুশিফিকেশনের ছবিতে বাংলা আলপনার কাজ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৮

১৪৬। দাঁ প্রশান্ত (সম্পাদিত,২০০৫)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩২

১৪৭। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত,২০০৫)। ভট্টাচার্য্য, বিকাশ। 'যামিনী রায় ও তাঁর বরণীয় চিত্রকল্প'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৬

১৪৮। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৩

১৪৯। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৫

১৫০। চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত, ২০১১)। মণ্ডল, অমিতা। 'নকশি কাঁথা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮৯

১৫১। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (২০০৪)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। প্রথম খণ্ড। নিউ দিল্লী: সাহিত্য আকাদেমী। পৃ. ৫৭৯

১৫২। বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলিত ও প্রকাশিত, ১২৯৯)। *বিশ্বকোষ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি। পৃ. ৩৬৫

১৫৩। রায়, কামিনিকুমার (১৯৬০)। *লৌকিক শব্দকোষ*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্। পৃ. ৮৯

১৫৪। ভট্টাচার্য, মিহির (সম্পাদিত,২০১৮)। দুয়ারী, নবকুমার। 'লোকশিল্পের আঙিনায় নকশিকাঁথা'। *লোকশ্রুতি*, সৌজন্য সংখ্যা, জানুয়ারি । লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ. ৭১

১৫৫। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। সেন, প্রভাস। 'আচার্য নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪৪

১৫৬। কাঠিয়াবাড়ের সূচীশিল্প - কাঠিয়াবাড় সূচীশিল্প হল গুজরাটের কাঠিয়াবাড় অঞ্চলের বিখ্যাত এক সূচীশিল্প। কাঠিয়াবাড় এমব্রয়ডারির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চেন, ড্যামিং, হেরিংবোন, ইন্টারলেসিং স্টিচ অ সিল্কি টপ্রা সহ নানা আকৃতির আয়নার টুকরোর জমকালো প্রয়োগ। See: Pooja, Singh, Vivek and Arya, Nisha 2019. Devolopment of Contemporary Kathiawar Embroidery Design for Jacket. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.8(02): 2073–2080. Doi: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.802.240 Last accessed 08.12.2022

১৫৭। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ঘোষ, শিশিরকুমার। 'মাস্টারমশাই'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৩

১৫৮। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। বসু, নন্দলাল। 'ফুলকারী'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫০

১৫৯। ঘোষ, ইন্দুসুধা (_)। *সীবনী*। কলকাতা: বুক কোম্পানী। পৃ. ১।

১৬০। পূর্বোক্ত। পৃ. ২

১৬১। সেন, যমুনা (১৯৮৪)। *সেলাইয়ের নকশা*। কলকাতা: আনন্দ। ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

১৬২। পূর্বোক্ত। পরিচয় অংশ দ্রষ্টব্য।

১৬৩। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। দেব, চিত্রা। 'শিল্পক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৫

১৬৪। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭২

১৬৫। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। রায়, প্রণব রঞ্জন। 'যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত ড্রইং ও স্কেচ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৯

১৬৬। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৯

১৬৭। চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত, ২০১১)। রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপা। 'নকশি কাঁথা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪৯

১৬৮। চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত,২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭৬

১৬৯। মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ (১৯৯৯)। *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্ত বঙ্গের প্রেক্ষাপটে*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ. ১৬

১৭০। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। হালুই, গণেশ। 'আধুনিক শিল্পের দুই পুরোধার একজন'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫২

১৭১। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। রায়, বিশ্বনাথ। 'বাঁকুড়ার যামিনীরঞ্জন'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩

১৭২। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। ভেঙ্কটচলম, জি। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮১

১৭৩। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত, ২০১১)। *বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ*। প্রথম খন্ড। কলকাতা: দেজ। পৃ. ১১৮

১৭৪। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। সেন, পরিতোষ। 'যামিনী রায়ের চিত্রকলা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪

১৭৫। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯৬

১৭৬। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯

১৭৭। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮

১৭৮। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯৭

১৭৯। চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত, ২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭৭

১৮০। মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৭)। *দশদিশি*। শিল্পকলা সিরিজ। দ্বিতীয় ভাগ। পৃ. ২১৮

১৮১। সাঁতরা, তারাপদ (২০১৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭-৪০

১৮২। চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০১৬)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*। কলকাতা: দে বুক স্টোর। পৃ. ২১৪

১৮৩। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। মিত্র, রথীন। 'যামিনী রায়ের দোভাষী'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪৩

১৮৪। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ। 'যামিনী রায়ের বাঁকুড়া'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬

১৮৫। মল্লিক, ঋত্বিক (২০১৪)। *বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির ডার্করুম থেকে আলোয়*। ভারত সরকার: কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮

১৮৬। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮

১৮৭। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। সেন, পরিতোষ। 'যামিনী রায়ের চিত্রকলা'। দেশ। পৃ. ২৪

১৮৮। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭-১৮

১৮৯। দাঁ, প্রশান্ত সম্পাদিত (২০০৫)। সান্যাল, ভবেশ। 'কিছু স্মৃতি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৬

১৯০। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। সেন, পরিতোষ। 'যামিনী রায়ের চিত্রকলা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪

১৯১। চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৫

১৯২। মাইতি, চিত্তরঞ্জন (২০০১)। *পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৩*

১৯৩। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯১

১৯৪। মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ (১৪১৪)। *বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প।* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। পৃ. ১৯৯

১৯৫। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১৭)। সোম, শোভন। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৭

চিত্র ১: বীণাবাদিনী, হরিপুরা পট, নন্দলাল বসু

চিত্র ২: উট, হরিপুরা পট, নন্দলাল বসু

চিত্র ৩: মহাদেব ও গণেশ, যামিনী রায়

চিত্র ৪: চিংড়ি মুখে বিড়াল, যামিনী রায়

চিত্র ৫: নন্দলাল বসু কৃত আলপনা

চিত্র ৬: শান্তিনিকেতনে খ্রিস্টোৎসবের আলপনা

চিত্র ৭: আলপনা, যামিনী রায়

চিত্র ৮: গোপিনী, যামিনী রায়

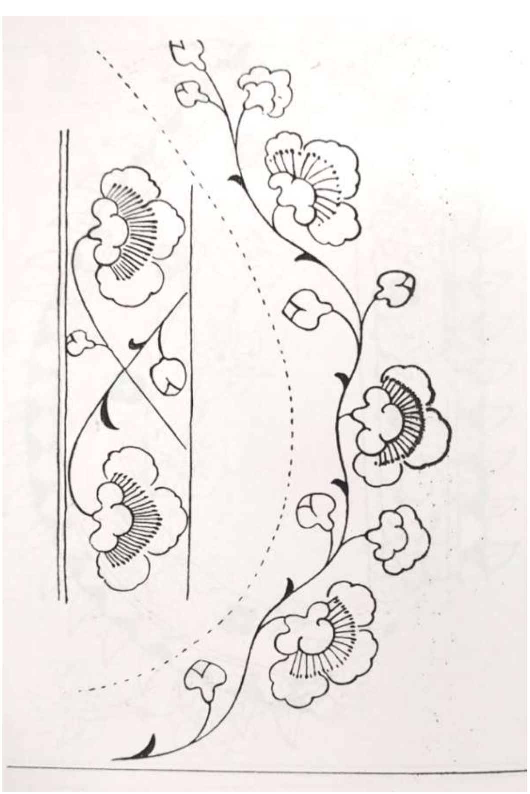

চিত্র ৯: সূচীশিল্পের নক্সা, নন্দলাল বসু

চিত্র ১০: সূচীশিল্পের নক্সা, ইন্দুসুধা ঘোষ

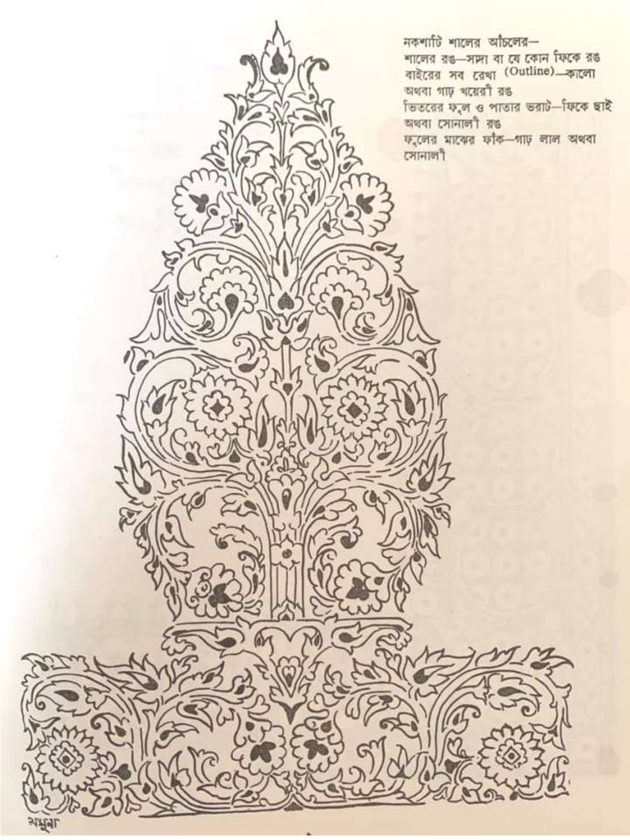

চিত্র ১১: সূচীশিল্পের নক্সা, যমুনা সেন

চিত্র ১২: সীতাহরণ, যামিনী রায়

চিত্র ১৩: মাটির পুতুলের আদলে আঁকা একরাঙা ছবি, যামিনী রায়

চিত্র ১৪: মাটির পুতুলের আদলে আঁকা একরাঙা ছবি, যামিনী রায়

চিত্র ১৫: কাঠের পুতুল, যামিনী রায়

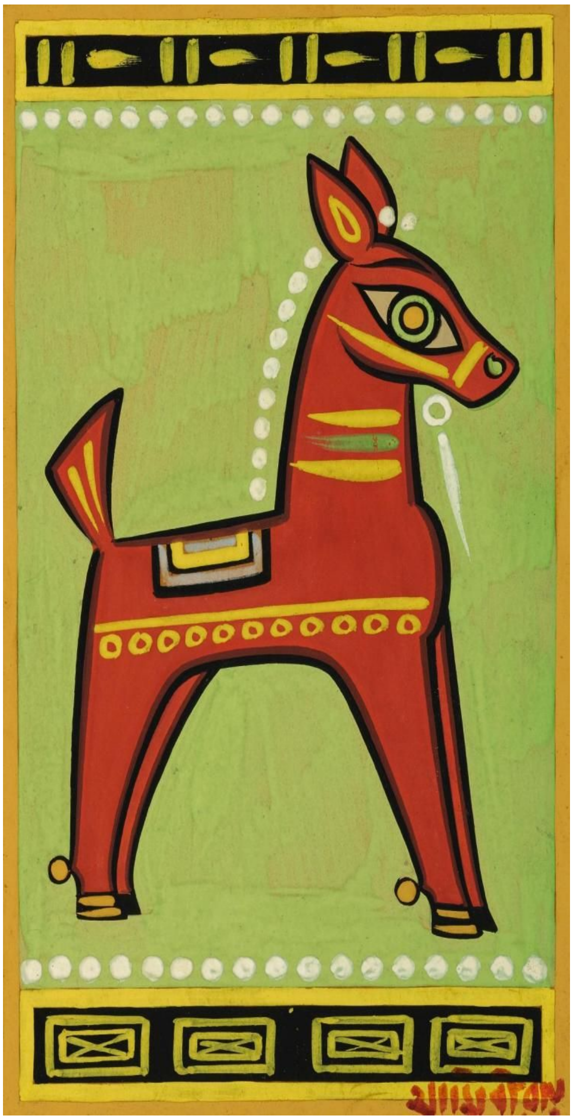

চিত্র ১৬: লাল ঘোড়া, যামিনী রায়

তৃতীয় অধ্যায়

বিদেশি অনুষঙ্গ: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৩.০ ভূমিকা

নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র হওয়ার সুবাদে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দেশ বিদেশের শিল্পী ও শিল্পপ্রেমী মানুষজনের সঙ্গলাভের সুযোগের ফলে তাঁদের চিন্তা চেতনার প্রভাব তাঁর জীবনে পড়ে। ছাত্রাবস্থাতেই জাপানি শিল্পী ওকাকুরা, টাইকান, হিশিদা প্রমুখ জাপানি শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ফলে কাছ থেকে তাঁদের কাজ দেখার সুযোগ পান। ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা সভায় কাম্পো আরাইয়ের কাছ থেকে হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ পান। ফলে জাপানি ছবি ও জাপানের শিল্পভাবনা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা তিনি লাভ করেন। ওকাকুরার কথায় তাঁর স্থির প্রত্যয় হয়, এশিয়া এক। এই ধারণা নিয়ে এশিয়ার অন্যান্য দেশের শিল্প সম্পর্কে জানতে শুরু করেন। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেন। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি এবং রবীন্দ্রভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরে ধীরে তিনি দেবদেবী বা ঐতিহাসিক চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা থেকে সরে আসতে থাকেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসাবে প্রাচ্য দেশভ্রমণ তাঁকে বৃহত্তর পরিসরে এনে ফেলে। প্রাচ্যের বিপুল শিল্পসম্ভার বিশেষত চিন ও জাপানের শিল্পকলা আঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এছাড়া ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাজের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণে তাঁর ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক দেশের মানুষের আদল, ভাষা যেমন স্বতন্ত্র শিল্পও তেমনি সেই দেশের আলাদা চেহারা এবং তার আত্মাকে ব্যক্ত করে।[১] তাই তিনি এমন এক শিল্পশৈলী নির্মাণ করেন যাতে নানা দেশের শিল্প–সংস্কৃতি মিশে থাকলেও ভারতীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুলের ভাবধারায় শিল্পচর্চা শুরু করলেও তাঁর নব উদ্ভূত শিল্পশৈলীকে বেঙ্গল স্কুলের সীমায় সীমায়িত করা যায় না। পুরাণ ও ইতিহাসের কাহিনি নির্ভরতা, ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণ, পৌনঃপুনিকতা বেঙ্গল স্কুলকে যে

গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রেখেছিল, নন্দলালের ছবি সেই গণ্ডীকে অতিক্রম করে অন্য মাত্রায় উন্নীত হয়েছে।

ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পচর্চার ইতিহাসে যামিনী রায় একটি স্তম্ভ স্বরূপ। সংক্ষিপ্তকরণ, সারলীকরণ, জ্যামিতিক গড়ন ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকধর্মী যে শিল্পশৈলীর জন্ম দেন তা একই সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পশৈলী চর্চা এবং বাংলার লোকশিল্পের জ্ঞানসমৃদ্ধ। অর্থাৎ তাঁর নতুন আঙ্গিক গড়ে ওঠার পিছনে বেলিয়াতোড়ের লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ পরিবেশে বেড়ে ওঠার ফলে শৈশব অভিজ্ঞতা এবং কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য রীতির শিল্পশিক্ষা দুটি উৎসই সমান্তরালভাবে কাজ করে। তিনি সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পের প্রবণতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ আলোচনা, পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের উপর নানা গ্রন্থ এবং *The Studio*-সহ ইউরোপের নানা শিল্প পত্রিকার নিবিড় অধ্যয়ন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। পাশ্চাত্য রীতির শিল্পী অতুল বসুর[২] সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বও তাঁকে এই নতুন শিল্পশৈলী গঠনে উৎসাহিত করে। রিয়েলিজম[৩], ইম্প্রেশনিজম[৪], পোস্ট ইম্প্রেশনিজম[৫], কিউবিজম[৬], পয়েন্টিলিজম[৭], ফবিজম[৮] ইত্যাদি পাশ্চাত্য শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত হন। একাডেমিক রীতির শিল্পী রেমব্রান্ট এবং আধুনিক শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী পল গগ্যাঁ (১৮৪৮–১৯০৩), পল সেজান (১৮৩৯–১৯০৬), ভিনসেন্ট ভ্যান গগ (১৮৫৩–১৮৯০), হেনরি মাতিস (১৮৬৯–১৯৫৪), পাবলো পিকাসো (১৮৮১–১৯৭৩) প্রমুখ শিল্পীদের ছবি যেমন তিনি কপি করেছেন তেমন তাঁদের শিল্প আঙ্গিককের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুন বিষয় নিয়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে কিউবিজম ধারণা এবং ভিন্ন পথে গিয়েও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব, সেই বিশ্বাস পান। পাশ্চাত্যরীতি চর্চা, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও বাংলার লোককলার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যামিনী রায়ের নিজস্ব শিল্পশৈলী।

৩.১ বিদেশি অনুষঙ্গে নন্দলাল বসু

নন্দলাল পরিবারের অমতে প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেখে সমকালীন ভারতীয় শিল্প আন্দোলন ও শিল্পকলাচর্চার পথেই জীবনকে চালিত করেন। শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে তিনি *প্রবাসী*

পত্রিকায় মাসে মাসে প্রকাশিত ছবি দেখে পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকা ছবি, রবিবর্মার ছবি দেখে কপি করেন। অবনীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর শিল্পবিদ্যালয়ে তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

৩.১.১ ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পবিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় উপাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলে ভারতীয় শিল্পচর্চা বিভাগটির গুরুত্ব কমে গিয়ে ইউরোপীয় শিল্পরীতির চর্চার ফাইন আর্ট বিভাগটি মূল আকর্ষণের জায়গা হয়ে ওঠে। অতুল বসু, মুকুল দে প্রমুখ শিল্পীরা শিল্পবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পের জায়গা আরো পাকাপোক্ত হয়। আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিল্পীদের নিয়ে গড়ে ওঠে ‘Young Artist Union’। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের অভিঘাতে শিল্পচর্চায় যে তরঙ্গ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাতে নন্দলাল সামিল হন। তাঁর শিল্পচর্চার দিকে খেয়াল রাখলে বোঝা যায় তিনি প্রাচ্য মেজাজ বজায় রেখেই পাশ্চাত্য শৈলীর চর্চা করেছেন।[৯]

ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পচর্চার পূর্বে পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চায় পৌরাণিক কাহিনি বা প্রতিকৃতি অঙ্কনকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও প্রাকৃতিক চিত্র বা Still life-কে[১০] উৎকৃষ্ট শ্রেণির শিল্প বলে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা বাস্তব অনুকরণের একাডেমিক রীতিকে অমান্য করে যে প্রকৃতি চিত্রণ করেছেন তা বাস্তবে দেখা প্রকৃতির থেকে অনেকটাই আলাদা। তাঁরা লক্ষ করেন বস্তুর রূপ স্থির নয়; আলোর পরিবর্তনে প্রকৃতির রূপ বদলে যায়, রঙ বদলে যায়। ছবিতে আলো ফুটিয়ে তোলার দিকেই অধিক মনোযোগ দিতে ছোট ছোট ঘন তুলির আঁচড়ে চাপ চাপ রঙের প্রয়োগে তাঁরা বস্তুর মৌল রূপটি ফুটিয়ে তোলেন। এইভাবে বর্ণ প্রয়োগে ছবিকে অনেক উজ্জ্বল দেখায়।[১১] উল্লেখ্য যে নন্দলাল কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এলে তাঁর ছবিতে পৌরাণিক কাহিনি ও দেবদেবীর রূপবর্ণনার ব্যতিরেকে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য ধরা দেয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে নন্দলালের প্রকৃতি রূপায়ণের আঙ্গিক বদলে যায়। প্রকৃতি রূপায়ণের যে বিদ্যা তিনি এতদিন ধরে লাভ করে এসেছেন এই বাঁকে এসে দাঁড়িয়ে তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। আলোয় উদ্ভাসিত প্রকৃতি তাঁর কাছে কতগুলি রঙের স্তর হিসাবে ধরা পড়ে। তিনি উপলব্ধি করেন প্রকৃতির এই রূপকে বাস্তবের নিখুঁত বর্ণনায় বা আলংকারিক

রেখায় ধরা সম্ভব নয়; ছোট ছোট তুলির আঁচড়ে চাপ চাপ রঙের বিন্যাসেই তাকে দেখানো সম্ভব। পরিবর্তিত রীতিতে আঁকা ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' (শরৎ), 'মধ্যাহ্নস্বপ্ন' (গ্রীষ্ম), 'বসন্ত' (কৃষ্ণচূড়া), 'রাত্রি' (শীত), 'বোলপুরের পথে' ইত্যাদি। এইসব ছবিতে তিনি অমসৃণ চাপ চাপ রঙে বস্তুরূপ ধরতে চেয়েছেন। বস্তুর আদল ও বস্তুর বর্ণগত বৈশিষ্ট্য অবিকৃত থাকলেও বাস্তবের অনুপুঙ্খ বর্ণনা তাতে নেই। 'বসন্ত' ছবিটিতে দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল আর মধ্যে মধ্যের পাতার আভাস পটের উপরিভাগকে ঢেকে রেখেছে, দু-চারটে ঝরা ফুল মাটিতে পরে রয়েছে। আর দেখা যাচ্ছে একটি মেয়ে যেন নিবিষ্ট মনে প্রেমাস্পদের চিঠি পড়ছে। লাল ফুল ছবিটিতে বসন্তের আগমন আর মেয়েটির মনের রক্তিম আভা ফুটে ওঠে। কিন্তু ছবিটিতে কোথাও অনুপুঙ্খ বর্ণনার ঝোঁক, রঙকে মসৃণ করার বাসনা নেই। 'মধ্যাহ্নস্বপ্ন' ছবিটিতে ঘরের ভিতর লাল ও হলুদ রঙের ব্যবহারে তুলির অমসৃণ আঁচড় টের পাওয়া যায়। 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' ছবিটিও বাস্তব অনুপুঙ্খ বর্জিত। সামনে এগিয়ে থাকা গাছ বা ঘরের মধ্যে থাকা মেয়েটি কোনটাতেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার প্রয়াস নেই। তুলির ব্যবহার যেন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের মতই। এই ছবিগুলি তিনি আঁকেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আঁকা 'বোলপুরের পথে' ছবিটি তাঁর এই ধরনের কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এই ছবিটিতে গাছপালা বা ঘরের সারি বা চলমান মানুষের গতিভঙ্গি কিছু আলাদা মনোযোগের বিষয়ই নয়, আলোর গতি বা আলোর প্রতিসরণের বৈচিত্র্য ধরাই শিল্পীর লক্ষ্য। ছবিটি ইউরোপীয় ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কোন বিখ্যাত কাজের সমতুল্য।[১২] নন্দলালের আঁকা এই সমস্ত ছবিগুলি তাঁর পূর্বের আঁকা ছবিগুলি থকে স্পষ্টতই আলাদা। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি তিনি এই ধরনের ছবি এঁকেছেন। তবে এই সময় তিনি অন্য ধরনের কাজ করেননি তা নয়। তাঁর এই ধরনের কাজে কোন কোন সমালোচক পাশ্চাত্য ইম্প্রেশনিজমের থেকে জাপানি শৈলীর প্রভাবকে বেশি করে দেখেছেন। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরাও ছিলেন জাপানি শৈলী দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রাচ্য শৈলীর প্রভাবের কথা কোন কোন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরাও স্বীকার করেছেন। জাপানের থেকেই তাঁরা শেখেন একই বিষয় আলোর হেরফেরে কত বিচিত্ররূপে প্রকাশ করা যায়। জাপানি ছাপছবি থেকে অনুপ্রাণিত নবোদ্ভূত এই বিদ্যার দ্বারা আবার জাপান ও প্রাচ্য দেশগুলিতে প্রভাব ফেলে। তাঁর এই ছবিগুলি ইউরোপ না জাপান কোন দেশের শৈলী দ্বারা অধিক প্রভাবিত এই তর্কে না গিয়ে বলা যায় তাঁর এই ছবিগুলি পূর্বে রচিত

অন্যান্য ছবির থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নন্দলাল আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি ভারতীয়ত্ব বজায় রেখে পাশ্চাত্য শৈলীকে গ্রহণ করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেন। তিনি তাঁর এই কাজগুলোকে বলেছেন ছাপ ছোপের কাজ, টাচের ছবি। 'ছোপের ছবি হবে যেন প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের ইশারা', সংক্ষিপ্ত, প্রবৃত্তিহীন।[১৩] তাঁর এই কথার মধ্যে দিয়েই এই সময়ের আঁকা ছবিগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। ছবিগুলি যেন সত্যই আভাসের দ্বারা অঙ্কিত। সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নেই, রঙকে মসৃণ করবার পেলব করবার বাসনা নেই, ছবি ছকে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আছে শুধু দ্রুত সংহত কল্পনার প্রকাশ; তুলির তড়িৎ গতি যা ইম্প্রেশনিস্ট ছবির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়।

৩.১.২ চিনের প্রেরণা

রবীন্দ্রনাথ ঠকুর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথমবার প্রাচ্যদেশ ভ্রমণে যান তখন সেই দেশের শিল্পভাণ্ডার দেখে নন্দলালের কথা স্মরণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ থাকা সত্ত্বেও সম্ভাবনাময় এই তরুণ শিল্পীটির কথা মনে আসা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্র-ভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের একটি সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে তোলা।[১৪] উন্মুক্তমনা নন্দলাল প্রাচ্য শিল্প সংস্কৃতির আত্তীকরণ ঘটিয়ে ভারতশিল্পকে উন্নততর করে তুলবেন, এই বিশ্বাস থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় প্রাচ্য ভ্রমণে গেলে নন্দলালকে সঙ্গে নিয়ে যান সেখানকার কলা সংস্কৃতির পরিচয় করিয়ে দিতে। সুদূর প্রাচ্যের শিল্পপরম্পরা থেকে তিনি তুলি চালনার কৌশল আয়ত্ব করেন। চিন জাপান ও ভারতীয় রেখাঙ্কনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সচেষ্ট হন।[১৫]

প্রাচ্য ভ্রমণে নন্দলাল প্রথম বর্মা দেশে গেলে সেখানে এক বর্মী গৃহস্থের ঘরে তাঁদের দেশের ক্লাসিকাল নৃত্য আঙ্গিক 'পোয়ে'[১৬] উপস্থাপিত হতে দেখেন। নৃত্যরতা মেয়েটির নৃত্যভঙ্গি, সাজসজ্জায় অভিভূত নন্দলাল নৃত্যরতা মেয়েটির কতগুলি স্কেচ করেন এবং নৃত্যভঙ্গি ও সাজসজ্জার বিবরণ দিয়ে কন্যা গৌরীকে চিঠি লিখে মেয়েটির ধীরে ধীরে নাচার ধরনকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন।[১৭] সেখানে নৃত্যরত মেয়েটির নৃত্যভঙ্গি, চুলবাঁধা ও সজসজ্জার ধরন যা নন্দলাল আয়ত্ত করেছিলেন, পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন আশ্রমের উৎসব অনুষ্ঠানে তা ব্যবহৃত হয়ে দেখা যায়। পোয়ে নাচের

প্রভাবে চুলবাঁধা অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছদের ধরন এবং সজসজ্জায় যে পরিবর্তন আসে তা শান্তিনিকেতনের উৎসব অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রা দান করে।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁরা চিনের সাংহাইতে গিয়ে এক অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার সাক্ষী হন। অভ্যর্থনা জানাতে সেখানকার মেয়েদের তাঁদেরকে প্রণাম করে আঁচল দিয়ে পায়ের ধুলো মুছে নেওয়ার এই কল্যাণ সুন্দর দৃশ্যটি শিল্প মনে চিরস্থায়ী আসন পায়। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি ছবি অ্যাঁকেন, স্কেচ করেন। চিনের বৌদ্ধগুহা আর বৌদ্ধমন্দিরগুলি দেখার সময় নন্দলাল মন্দিরের পাথরের হুড়কো আর কাঠের থামগুলির সঙ্গে অজন্তার থামের সাদৃশ্য খুঁজে পান। সেখানকার গ্রামের পরিবেশ এবং বাড়িগুলির সঙ্গে বীরভূমের গোয়ালপাড়ার দারিদ্র জর্জরিত গ্রামের সঙ্গে মিল খুঁজে পান। নন্দলাল নিয়মিত চিনের কারিগরদের বাড়িতে গিয়ে চিনামাটির পাত্র, কাগজ তৈরি ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ দেখতেন। চিনের পেকিঙে গিয়ে তিনি তাঁদের পুরাতন ছবির সংগ্রহ দেখার সুযোগ পান। একদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপলক দৃষ্টিতে দু-তিনশো ছবি দেখে ও তার আদি অন্ত ব্যাখ্যা শুনে সমৃদ্ধ হন। চিনের রাজপ্রাসাদের প্রত্ন সংগ্রহ দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন।[১৮] চিনের রাজার কাছ থেকে ট্রাপিস্ট্রি[১৯] উপহার পেয়ে নতুন ধরনের শিল্প বস্তুটির সম্বন্ধে জানতে পারেন। চিনের শিল্পসম্ভার সম্পর্কে তিনি বলেন –

> চীন বিশাল দেশ এবং মহান্ — বিশেষ করে শিল্পচর্চায়। মনে হয় জগতের মধ্যে চারু ও কারু শিল্পে চীন শ্রেষ্ঠতম।[২০]

নন্দলাল লক্ষ করেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে চিনাদের পোশাক-আসাক, সাজসজ্জা, গৃহসজ্জার সামগ্রী, এমনকি ঘরবাড়ির ডিজাইনও বদলে গেছে। সমৃদ্ধশালী চৈনিক সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ঢুকে পড়ায় তিনি চিন্তিত হয়েছেন। তিনি দেখেছেন আধুনিকপন্থী শিল্পীরা পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাবে দেশের সমস্ত ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করতে চায়, আবার প্রাচীনপন্থীরা নতুন কোন কিছুকে গ্রহণ করতে নারাজ। তবে সেখানে কিছু উঁচুদরের মানুষ দেখেছেন যাঁরা আর্টের ঠিকঠাক কদর করতে জানে। এঁরা একটি সোসাইটি গড়ে তুলেছেন। তিনি এঁদের সঙ্গে কলকাতার সোসাইটির কাজের মিল পান। তাই দুই দেশের দুই সোসাইটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হন। চিনের লোকশিল্পীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁদেরকে ভারতে আমন্ত্রণ জানালেও ঘরকুনো স্বভাবের জন্য তাদেরকে নিয়ে

যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলেই তিনি মনে করেছেন।[২১] পেকিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসা একদল শিল্পীর কাজ কাছ থেকে দেখে বুঝতে পারেন কত নিখুঁতভাবে তাঁরা ক্যালিওগ্রাফির রেখার বিন্যাসে ছবির ত্রুটি সংশোধন করতে পারেন।[২২] চিন-জাপান ভ্রমণের শুরু থেকে তিনি যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেন তারই খসড়াচিত্র অতি দ্রুত হাতে অঙ্কন অথবা ক্যামেরাবন্দী করেছেন। চিন ভ্রমণকালীন তাঁর রচিত রেখা চিত্রমালাগুলি হল – চিনাগুহায় ভারতীয় ভিক্ষু, চিনা পরিবারের গৃহিণী, চলন্ত হোটেলওয়ালা চিনা, সেকালের চিনা পণ্ডিত, দরিদ্র পরিবারের চিনা মা, চিনা হিন্দু পণ্ডিত, চিনাদের ঠেলা গাড়ি, চিনা পূজার উপকরণ ইত্যাদি।[২৩]

প্রাচ্য সফরের সেরে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর নন্দলালের কথাবার্তায় কাজে প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর *শিল্পকথা* ও *শিল্পচর্চা* গ্রন্থের নানা আলোচনায় চৈনিক শিল্প ও শিল্প পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। চিনের শিল্পকলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল ক্যালিগ্রাফি রেখার ব্যবহার। এই রেখা চিনা লিপিতে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত চিনা লিপি আবিষ্কার হয়েছে ছবি থেকে। চিনা ছবির রেখার টানে এমন এক কৌশল এবং ছন্দ আছে যা ছবির বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তোলে। রেখার ব্যবহার সীমানা নির্দেশকের থেকেও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।[২৪] নন্দলাল ক্যালিগ্রাফি শব্দটির বাংলা অনুবাদ করেছেন লোখাঙ্কন। তাঁর মতে লেখাঙ্কনের কৌশল বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত্ব করতে হয়। উৎকৃষ্ট মানের লেখাঙ্কনে তাড়াহুড়ো ভাব থাকে না, অথচ একটি সাবলীন ছন্দে লেখকের নিজস্ব ধরন ও তাঁর চরিত্র ফুটে ওঠে। তুলি ও কালির ভিন্নতায় রেখা সরু, মোটা, গাঢ়, হালকা, চ্যাপ্টা, ধ্যাবড়া নানা রুমের হয়ে থাকে। চিনা লেখা তুলি দিয়ে হয় বলে রেখাটি আগাগোড়া সমান না হয়ে সরু মোটা হয়ে থাকে। চিনা শিল্পীদেরকে সামনে থেকে ছবি আঁকতে দেখায় নন্দলাল তাদের তুলি ধরা ও তুলি চালনার নিয়মটি জানতে পারেন। প্রতিটি বস্তু আঁকতে বা ভিন্ন চিন্ন ভাবভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে চিনা শিল্পীরা নানা ধরনের তুলির টান আবিষ্কার করে গেছেন। *শিল্পচর্চা* গ্রন্থে বর্ণিত চৈনিক ছবিতে ব্যবহৃত মোট সতেরটি তুলির টান হল –

> ১. তারের মতো দেখতে ২. তাঁতের মতো দেখতে ৩. ঘাসের পাতার মতো দেখতে ৪. রেশমি সুতোর মতো দেখতে ৫. মাকড়সার সুতোর মতো টান (মাকড়সা যেমন চলার সঙ্গে সঙ্গে সুতো ছাড়ে তুলির মুখ দিয়েও তেমনি রেখা বেরোবে) ৬. মেঘের গতির মতো টান ৭. জলের লহরের মতো টান ৮. কেঁচোর মতো দেখতে ৯. জঙ-ধরা পেরেকের মতো দেখতে ১০. গিটওয়ালা দড়ির মতো দেখতে ১১. শুকনো

> কাঠের মতো দেখতে ১২. কাঠে উইয়ে-খাওয়ার দাগের মতো দেখতে ১৩. সাপের গতির মতো টান ১৫. মাথাওয়ালা গজালের মতো দেখতে ১৬. ভাঙা শরপাতার মতো দেখতে ১৭. চুলের মতো দেখতে (কেবল সরু নয়, রেখার টানটা আগা–গোড়া সমান চওড়া এবং কালির ঘনতা ও একরূপ হওয়া চাই)।[২৫]

নন্দলাল চিন ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার শিল্পী মিস্ লীঙের থেকে বিশেষ ধরনের প্রাচীন স্টোন-কালারের কেক দেখার সুযোগ পান। চিনা রঙের গুণ ও খ্যাতি প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি চিন দেশের শিল্পশাস্ত্র থেকে রঙ তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখান।[২৬] *শিল্পচর্চা* গ্রন্থে চিনা শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত সোনালি রঙ তৈরির পদ্ধতির সঙ্গে তিনি ভারতীয় পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করেন।

নন্দলালের শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় প্রাধান্য পাওয়া প্রাণছন্দের ধারণাটি চিন ও জাপান দুটি দেশের শিল্পশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। চিনারা একে বলেন Chi-yun She^ng-tung, জাপানিরা বলেন 'সেই দো'। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রাণছন্দ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[২৭] অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গ 'রূপভেদাঃ'র সঙ্গে চৈনিক ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গ Chi-yun She^ng-tung (Life-movement বা Rhythmic vitality) মিল খুঁজে পেয়েছেন। ভারতীয় শাস্ত্রে প্রাণছন্দের কথা স্পষ্ট করে না বলা হলেও এদেশীয় ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গটির মূল কথাটিই যে প্রাণছন্দ তা তিনি দেখেছেন। রূপভেদ ও Chi-yun She^ng-tung যে একই সেটি প্রমাণ করতে তিনি বলেন –

> 'রূপভেদ' আমাদের এবং 'জীবনছন্দ' চীনের যে মূলমন্ত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু রূপ লইয়া চিত্র হয় না; শুধু প্রাণ লইয়াও চিত্র হয় না। যদি বলা যায় শুধু রূপ তবে ভুল হয়; যদি বলা যায় প্রাণ তবেও ভুল হয়। এইজন্য চীন-ষড়ঙ্গ-কার Vitality বা প্রাণের সঙ্গে Rhythm অর্থাৎ ছন্দ বা ছাঁদটি জুড়িয়া উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন, আর আমাদের ষড়ঙ্গকার শুধু 'রূপ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন না, বলিলেন 'রূপভেদাঃ'।[২৮]

অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা ও চিন-জাপানের শিল্পশাস্ত্র আহরিত যে প্রাণছন্দের ধারণা নন্দলাল লাভ করেন তার প্রকাশ ঘটে তাঁর *শিল্পকথা* ও *শিল্পচর্চা* গ্রন্থে। প্রাণছন্দকে প্রাচ্য শিল্পের মূল বুনিয়াদ বলে মনে করে তিনি বলেন – বস্তুর আকার আকৃতি, গুণ, অভিব্যক্তি, গতি সমস্ত কিছুই এই প্রাণছন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর মতে এই জ্ঞান ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারলে পাশ্চাত্য শিল্পের অ্যানাটমি ও পরিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞান না শিখেও উচ্চমানের ছবি আঁকা সম্ভব। পাশ্চাত্য শিল্পীরা আগে বিজ্ঞান শিখে

তারপর প্রাণছন্দে উপস্থিত হতে চেষ্টা করেন, আর প্রাচ্য শিল্পীরা প্রাণছন্দের জ্ঞান অর্জন করে তার পর বিজ্ঞানের দিকে যাত্রা করেন। দুটি শিল্প পদ্ধতিগত ভাবে বিপরীত পথে যাত্রা করলেও প্রাণছন্দই শিল্পের মূল কথা।[২৯]

নন্দলাল চিত্রকলার দেশ চিনে গিয়ে দেখেন তাঁরা প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন করেছেন। একদিকে শান্তিনিকেতনের অন্য দিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত চৈনিক শিল্পীদের অফুরন্ত শিল্প ভাণ্ডার তাঁকে প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে ছবি আঁকার প্রেরণা দান করে। কেবলমাত্র দৃশ্যবর্ণনা না করে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে রূপকার্থের দ্যোতনা সৃষ্টির চৈনিক রীতি ও শুদ্ধদৃষ্টির প্রতি নন্দলাল আসক্ত হয়ে ওঠেন। ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ ঘের থেকে বেরিয়ে প্রকৃতি চিত্রণের মাধ্যমে নিজেকে বাইরের জগতে মুক্ত করার উপায় তিনি চিন দেশের ঐতিহ্য থেকে আহরণ করলেও রূপক সৃষ্টিতে আগ্রহ বোধ করেননি।[৩০] তিনি দেখেন চৈনিক শিল্পীরা টেকনিকের সাহায্যে ক্যালিগ্রাফি রেখার দ্বারা নিসর্গ চিত্রগুলিতে জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই আয়তনের মধ্যে কেমন করে ভারতীয় ভাস্কর্যের মতো দূরত্বের রসসঞ্চার করেছেন, কালির পোঁচ তুলির ছোপের সাহায্যে বস্তুকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সমস্ত পাকা আর্টিস্টের টেকনিক পাখির ওড়ার মতো, এক গাছ থেকে অন্য গাছে গিয়ে বসলেও বাতাসে পথের কোন চিহ্ন থাকে না। অর্থাৎ তাঁর মতে দক্ষ চিত্রশিল্পী দৃষ্টিনন্দন ছবি আঁকবেন, অথচ তার মধ্যে ছবি আঁকার কসরত প্রকাশ পাবে না। তুলি চালনার কৌশল, বর্ণ লেপনের দক্ষতা তিনি এমনভাবেই অর্জন করবে যে দেখে মনে হবে সহজাত, পরিশ্রমহীন অথচ সুন্দর। এই ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব চিত্রাঙ্কিত বস্তুটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে।[৩১] বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া চিনাশিল্পীদের শিল্পচর্চার একটি প্রাথমিক শর্ত বলেই বিবেচিত হয়ে এসেছে। শিল্পী যা আঁকবে তার রূপ এবং ভাব নিজের উপর আরোপ করে তার সঙ্গে সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, বস্তু আর ব্যক্তির এই অভিন্ন হওয়ার তত্ত্বটি নন্দলাল নিজেও বিশ্বাস করেন। এই তত্ত্বটি সম্পর্কে তিনি মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮–১৯৫৬), গিরীশ ঘোষ (১৮৪৪–১৯১২), বহু চৈনিক গ্রন্থ ও শিল্পীদের থেকে জানতে পারেন এবং তিনি তাঁর ছাত্রদেরকেও বহুবার নানারকম কাহিনির অবতারণা করে সম্পর্কে অবহিত করেন। চিনভ্রমণের পর ক্যালিগ্রাফির রেখা নিয়ে নানা তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তাঁর অসংখ্য ছবিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ক্যালিগ্রাফির প্রাণবন্ত গতিশীল রেখা। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ ও ছাত্র ছাত্রীদেরকে পাঠানো ছবি ও

স্কেচগুলিতে এই রেখার ব্যবহার চোখে পড়ে। নারীমূর্তি, পুরুষমূর্তি, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, পশুপাখি, গাছপালা, ফুল সমস্ত কিছুতেই প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যালিগ্রাফি রেখার বিন্যাসে ছবিতে ঘনত্ব ও দূরত্বের বোধ এনেছেন। সমুদ্রের ঢেউয়ের বর্ণনায় চিনা মোটিফ সম্পর্কে নন্দলালের প্রখর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লেখেন –

> সমুদ্রের রূপ অনন্ত, নিত্যগতিশীল। দেখে কখনো মনে হয়, সহস্রশীর্ষ অনন্তনাগ গজরাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে। ...তার ছুটন্ত ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চকিতে দেখা যায়, আগুনের হলকা আর ড্র্যাগনের পাঞ্জা।[৩২]

তিনি চিনা ভিত্তিচিত্রের সঙ্গে অজন্তার ভিত্তিচিত্রের মিল দেখে বিস্মিত হয়েছেন। কেবলমাত্র পোশাকের ভাঁজ এবং অবয়বের ডৌলসৃষ্টিতে দুই দেশের ভিত্তিচিত্রে পার্থক্য ঘটে গেছে।[৩৩] চিনা ও জাপানি শিল্পের প্রতি আঁর আকর্ষণের মূলে ছিল ভাবগত ঐক্য। ভারতীয়দের মতো তাঁরাও বস্তুর দৃশ্যরূপের থেকে ভাবরূপের প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। চিনা শিল্পীদের পরিশ্রম ও কর্মনিষ্ঠা তাঁকে অবাক করেছে।[৩৪]

৩.১.৩ জাপানের প্রেরণা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে জাপান স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ করলে বিশ্ববাসীর সামনে জাপানের দ্বার যেমন উন্মুক্ত হয় তেমনি পাশ্চাত্য দেশের প্রভাব তাদের সমাজ রাজনীতি শিল্প সাহিত্যের উপর এসে পড়ে। এই অবস্থায় আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের স্রোতে নিমজ্জিত না হয়ে ঐতিহ্যকে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করেন একদল শিল্পীগোষ্ঠী। কাকুজো ওকাকুরা এই আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে 'নিপ্পোন বিজুৎসু ইন্' প্রতিষ্ঠা করলে সমমনস্ক তরুণ শিল্পীদল এতে যোগদান করেন। এঁরা পরম্পরাগত শৈলীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের শিল্প প্রকরণের সামঞ্জস্য সাধনের মাধ্যমে নতুন চিত্রভাষা নির্মাণ করলে জাপানে প্রকৃত আধুনিকতা প্রতিষ্ঠা পায়। ওকাকুরার বিশ্বাস ছিল জাপানি শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে চৈনিক ও ভারতীয় শিল্প। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। 'Asia is one'[৩৫] এই ধারণা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ওকাকুরার প্রচেষ্টায় জাপানি শিল্পীরা কলকাতায় এলে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্ররা জাপানের প্রাচীন শিল্পকলার ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথমবার

ওকাকুরার ভারতভ্রমণে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও শিক্ষাদানের নীতিতে তাঁদের দুজনার অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা দুজনেই শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ রুচি, প্রবণতা ও দক্ষতার উপর ভিত্তিতে আঙ্গিক শিক্ষা ও ভাবাবেগের স্ফুরণের পক্ষপাতী ছিলেন। এঁরা পুরাণ, ইতিহাসের কাহিনি পাঠ ও শ্রবণ, মানুষদেরকে স্টাডি, প্রকৃতিপাঠের উপর গুরুত্ব দেন। যে ভাবনা ও নীতি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে গড়েছিলেন তাতে সন্দেহাতীতভাবে ওকাকুরার শিল্পচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল। সুতরাং নিশ্চিতভাবে নন্দলালের শিল্পচরিত্র গঠনে পরোক্ষভাবে জাপানের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর আঁকা 'পার্থসারথি' ও 'শীতের পদ্মা' ইত্যাদি বিভিন্ন চিত্রগুলিও ছিল অবনীন্দ্রানুসারী পাশ্চাত্য জলরঙ ও জাপানি ওয়াশ পদ্ধতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট মিশ্র ওয়াশ পদ্ধতির।[৩৬] ওকাকুরা দ্বিতীয়বার কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এলে তাঁর সঙ্গে নন্দলালের শিল্প বিষয়ক আলোচনা তিনি *শিল্পকথা* গ্রন্থে লেখেন। নন্দলালের ফেলে দেওয়া বা নষ্ট হওয়া ছবি দেখে ওকাকুরার মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁর 'কালো দিঘির পাড়ে ইন্দিরা' ছবিটি দেখে বলেন, মেয়েটির মুখের অভিব্যক্তি খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু জৌলুসহীন রঙের ব্যবহারে ছবিটি রঙের কারণে অপরিচ্ছন্ন ঘোলাটে দেখাচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথের থেকে পাওয়া পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতার বোধ ওকাকুরার এই মন্তব্যে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর 'অগ্নি' ছবিটি দেখে মন্তব্য করেন ছবিটি দেশি পদ্ধতিতে আঁকা ছবিটি ভালো হয়েছে তবে এতে আগুনের সেই 'আঁচ' অর্থাৎ বস্তুর গুণ নেই। রামায়ণের ছবিগুলি দেখেও বলেন, যে সেগুলিতে আরো সূক্ষ্মতার প্রয়োজন। 'অগ্নি' ছবিটি সম্পর্কে করা মন্তব্যটি তাঁকে বস্তুর প্রাণচ্ছন্দের উপলব্ধি এনে দেয়। কোন বস্তুর ছবি আঁকতে গেলে সেই বস্তুর সঙ্গে তদাত্ম্যতার শিক্ষা যা ওকাকুরা দিতেন তা নন্দলাল তাঁর ছাত্রছাত্রীদেরও দিয়েছেন। সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আর্ট হওয়ার তিনটি মূল সূত্র ওকাকুরা নন্দলালকে বলেন। তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ত্রিভুজ নির্মাণ করে এই গূঢ় তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করেন। স্বভাব (Nature), পরম্পরা (Tradition) ও স্বকীয়তা (Originality) তিনটি দেশলাই কাঠি এই তিনটি গুণের পরিচয় বাহক। এর একটি গুণের এদিক ওদিক হলে ছবি সার্থক সম্পূর্ণ হবে না। ওকাকুরার এই ব্যাখ্যা নন্দলালের মর্মে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকেও এই তিনিটি বিষয়ে নজর রাখতে বলেন। তাঁর *শিল্পকথা* গ্রন্থে ওকাকুরার এই ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। পুরী ও কোনারক মন্দির ঘুরে এসে ওকাকুরা স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে

ভারতবর্ষ ভাস্কর্যের দেশ। সুতরাং ভারতীয় ছাত্রদের ভাস্কর্য চর্চা করা উচিত।[৩৭] ভারতীয় ভাস্করদের অফুরন্ত সৃষ্টি ও মহৎ কীর্তিতে অভিভূত নন্দলালের ছবিতে তাই ভাস্কর্যের গুণ লক্ষ করা যায়। তিনি ভাস্কর হতে চেয়েছিলেন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সেই আশা তাঁর পূর্ণ হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে এমন একজন শিক্ষককে পেয়েছিলেন যিনি তাঁকে 'তুলিকে ছেনি করে ছবিতে ভাস্কর্য রচনার সাধ মেটাবার কারিগিরি' শিখিয়েছিলেন।[৩৮] অবনীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা, টাইকান, হিসিদার সঙ্গলাভের ফলে নন্দলালের জাপানি কলা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা হয়। এঁদের কারোর থেকেই হাতে কলমে জাপানি শিল্পবিদ্যা শেখা হয়ে ওঠেনি। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রায়' জাপানি কলা হাতে কলমে শেখার সুযোগ পান কাম্পো আরাইয়ের কাছ থেকে। কাম্পো যখন ক্লাস নিতেন নন্দলাল তখন তাঁর চিত্রপরিকল্পনা, কৌশল ও সিল্কের উপর রঙ প্রয়োগের পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতেন।[৩৯] বিচিত্রায় থাকাকালীন কাম্পো এবং নন্দলাল একত্রে পুরী কোনারক ভ্রমণ করেন। সেখানে গিয়ে কাম্পোর থেকে প্রকৃতিচিত্রণ এবং জাপানি শিল্পীদের স্কেচ করার বিশিষ্ট রীতি পদ্ধতি শেখেন।[৪০] অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও ভারতবর্ষে আগত অন্যান্য জাপানি শিল্পীদের কাজ দেখায় অভিজ্ঞতা থেকে নন্দলাল ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে জাপানি কায়দায় বেশ কিছু ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। ড্রইং না করে সরাসরি তুলিতে কালির টোন দিয়ে বা সামান্য রেখাবিন্যাসের দ্বারা এই সময় তিনি যেসব ছবি আঁকছিলেন তাতে জাপানি রীতি অবলম্বন করে ছবি আঁকার তাগিদ লক্ষ করা যায়। এই সময়ে আম, শিশু, আতা, তেঁতুল, খেঁজুর, কদম, কাঁঠাল ইত্যাদি বিভিন্ন গাছের স্টাডি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ের ছবিগুলি তাঁর বিখ্যাত একরাঙা ছাপ-ছোপের কাজের সমান হয়ে উঠতে পারেনি ঠিকই, তবে এই ধরনের ছবি আঁকার প্রবণতা যে এই সময় থেকেই সৃষ্টি হচ্ছিল তা বোঝা যায়। কাম্পোর সঙ্গলাভ তাঁকে জাপানি করণ কৌশল ও অন্যান্য বিশিষ্ট গুণের প্রয়োগে দক্ষ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *Gitanjali and Fruit Gathering* (১৯১৬) গ্রন্থে নন্দলালের আঁকা বেশ কিছু ছবিতে জাপানি কালি তুলির কাজ ও স্পেস বিভাজন রীতি দেখা যায়। এছাড়া গ্রন্থটির *Fruit Gathering* অংশের একাত্তর সংখ্যক কবিতার রঙিন ছবিটিতে ঢেউ-এর কিনারার অলংকরণ জাপানি শিল্পী ওগাতা কোরিনের আঁকা সমুদ্রের দৃশ্যের সঙ্গে মিলে যায়। ওগাতা কোরিন মণ্ডনধর্মী রেখাবিন্যাসে দক্ষতা দেখিয়েছেন। আলংকারিক সুষমা বজায় রেখেই তিনি ক্যালিগ্রাফিক রেখাবিন্যাস করতে পারতেন। ক্যালিগ্রাফিক রেখাবিন্যাসে

দক্ষতা নন্দলাল কাম্পোর থেকে শেখেন। জাপানি পত্রিকা *কোক্কা*-য় প্রকাশিত ছবিও তাঁকে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করে। কড়ি ও কোমল রেখার বিন্যাসে রূপায়িত নন্দলালের বিশিষ্ট শৈলীটির উৎস অবশ্যই ভারতীয়।[৪১]

দীর্ঘ বিদেশ ভ্রমণের ক্লান্তি এবং সময়াভাবে জাপানের অনেক কিছু অদেখা থেকে গেলেও ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে চিন-জাপান ভ্রমণ নন্দলালের শিল্পচেতনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। জাপানে পৌঁছেই সেখানকার বিখ্যাত শিল্পী, কবি ও বিভিন্ন পেশার মানুষদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা, প্রাচ্য শিল্প নিয়ে আলোচনা করেন।[৪২] তিনি লক্ষ করেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনগুলির প্রভাবে জাপানি শিল্পীরা পাশ্চাত্য শৈলীর আলোছায়ার ব্যবহার, প্রতিকৃতি অঙ্কনের বেশ কিছু গুণ তাঁদের শৈলীর সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন। পাশ্চাত্য তেলরঙের বিভা আনতে এঁরা জাপানি রঙের সঙ্গে ঝিনুকের গুঁড়ো মেশান। পাশ্চাত্য শৈলীর আত্তীকরণ ঘটিয়ে কীভাবে নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব নন্দলাল এঁদের মধ্যে তা দেখেন। এই সময় এঁদের আঁকা বিখ্যাত কিছু ছবির প্রভাব পরবর্তীকালে তাঁর ছবিতে পড়তে দেখা যায়। তাঁর সাদা-কালো ছবিগুলিতে জপানি কলার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের টুকরো ঠুকরো মুহূর্ত, মানুষজন, পশুপাখি, মাছ, প্রকৃতি ইত্যাদি চোখে দেখা সমস্ত দৃশ্যকেই তিনি সাদা পটভূমিতে কালি-তুলি বা কালি-কলমে স্কেচ করে রাখেন। শেষের বেশ কিছু বছর প্রতিদিন সাধনার মতো অনেকগুলো করে স্কেচ করেছেন। সেই সময় তিনি রঙ করার পরিশ্রমসাধ্য কাজ ছেড়ে শুধু চিনে-কালির কালো রেখায় মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। এই সমস্ত ছবি দেখতে বোঝা যায় তিনি স্তিমিত হলেও নিবৃত্ত হননি।[৪৩] বস্তুর ঘনত্ব, ভার, গতিশীল ছন্দ, জীবনের স্পন্দন সবই সাবলীল রেখাঙ্কনে প্রকাশ পেয়েছে।[৪৪] তাঁর এই স্কেচ 'হাইকু'[৪৫] কবিতা লেখার সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে।[৪৬] স্কেচ করার অভ্যাস তাঁর বরাবরের। তিনি সবসময়ই সঙ্গে করে পোস্টকার্ড বা পোস্টাকার্ড সাইজের শক্ত কার্ড নিয়ে রাখতেন। চলতে ফিরতে যা কিছু দেখেছেন, পাহাড়, সমুদ্র, নদী, নদীর ঘাট, দেশ বিদেশ ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতা, ঐতিহাসিক স্থান, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বসবাসকারী মানুষ, বিচিত্র সব মুখের আদল, তাদের জীবিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নির্ভুল রেখায়, আয়াসহীন সাবলীল তুলি কলমে ফুটে উঠেছে। তাঁর এই কাজের সঙ্গে জাপানি উকিইয়ো ধারার শিল্পীদের তুলনা করা যেতে পারে। এঁরাও পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ছেড়ে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রাণময় রেখা

ও রঙের বিন্যাসে ছবি এঁকেছেন। তবে জাপানি শিল্প পরিবারকেন্দ্রিক হওয়ায় একএকটি বিশেষ বিষয় অঙ্কন এক একটি বিশেষ পরিবারের হাতে থাকে। কিন্তু নন্দলালের ছবিতে এই ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। স্কেচধর্মী ছবিগুলিতে রঙের ব্যবহার খুব কমই করেছেন। কখনো কখনো সামান্য রঙের ছোঁয়া দিয়েছেন। কালি-কলমে আঁকা অশোক ফুলে ভরে দিয়েছেন লাল রঙ, পুটি মাছের ছবিতে কানকো ও চোখগুলি পেয়েছে লালের ছোঁয়া, কালো কালিতে আঁকা সাদা কালো মোরগের ছবিটিতে মাথার ঝুঁটি ও মুখের কিছু অংশে লালের ছোয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কেঁদুলি মেলায় যাবার ছবিটিতে পথের মধ্যে পড়ে থাকা পাথরের গায়ে রয়েছে সোনালি রঙের চমক। সাদা কালো ছবিতে প্রয়োজনমতো ভিন্ন রঙের আলতো ছোঁয়ায় উজ্জ্বল করে তোলার পদ্ধতি সপ্তদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবন করেন জাপানি শিল্পী তাওয়ারাইয়া সোতাৎসু। পরে অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। নন্দলাল এই পদ্ধতিটির পরিচয় জাপানি ছবি থেকে পেয়ে থাকতে পারেন।[৪৭] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর স্কেচগুলির মধ্যে Structure, Form, Volume, Mass ইত্যাদি আধুনিক শিল্পের গুণগুলিকে দেখতে পেয়েছেন। নন্দলালের কার্ড স্কেচ সম্পর্কে তিনি বলেন –

> পোস্টকার্ডের এক পিঠে ছোট ছোট ও ভঙ্গি করতেন অত্যন্ত দ্রুতভাবে। ...তিনি এইগুলির নাম দিয়েছিলেন shorthand। তারপরে ঘরে এসে তিনি এইসব structure সাদৃশ্যযুক্ত করে আবার একবার করতেন। পরবর্তীকালে নন্দলাল জাপানি আর্টিস্টদের মতো তুলি দিয়ে স্কেচ্ করতেন। সরাসরি কালিতুলিতে কাজ করতেন বলে এই সব স্কেচের মধ্যে modelling, volume, টানটোনের বাহার ইত্যাদি অনায়াসে প্রকাশ করতে পারতেন।[৪৮]

নন্দলালের কালি-তুলি, কালি-কলম বা ছাপ-ছোপের কাজের পিছনে জাপানের প্রেরণা যতটা না কাজ করেছে তার থেকে অনেক বেশি পরিবেশ পরিস্থিতি বা সময়ের প্রভাব পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই কাজের সুবিধার জন্য তিনি এই রীতি অবলম্বন করেছেন। কালো রঙের নানা টোনের ব্যবহারে ছবিতে কি করে প্রাণসঞ্চার করতে হয় তা ছিল তাঁর নখদর্পণে।

জাপান এবং চিনে সর্বাধিক প্রচলিত সিল্কের উপর ছবি আঁকার পদ্ধতিটির বর্ণনা তিনি তাঁর *শিল্পচর্চা* গ্রন্থে করেছেন। চিনা ও জপানিদের ছবি আঁকার কায়দাটি একটু আলাদা। চিনারা টেবিলের চারধারে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকেন, আর জাপানিরা ছবির ক্ষতি না করে এমন দূরত্বের পরিমাপ করে পিঁড়ে রেখে তার উপর বসে ছবি আঁকেন। প্রয়োজনমতো সেই পিঁড়ে সামনে পিছনে সরানো যায়।[৪৯]

ছবি আঁকবার চিনা ও জাপানি পদ্ধতিটি তিনি ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। চিনা এবং জাপানি চিত্রাঙ্কন পক্রিয়ায় তুলির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী এই দুটি আঙ্গুলের মধ্যে তুলিটাকে সরাসরি লম্বাভাবে স্থাপন করে ব্যবহার করার ফলে তুলির টানে আলংকারিক ধনের সজীবতা ও গতিশীলতা সৃষ্ট হয়।[৫০] নন্দলাল মনে করেন সিল্কের উপর ছবি আঁকার ক্ষেত্রে জাপানি তুলির সাহায্যে জাপানি বা চিনা শিল্পীদের মতো তুলিচালনার এই পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচ্য ভ্রমণের পর নন্দলাল চিন-জাপানের ছবি আঁকার পদ্ধতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে বহু ছবি এঁকেছেন। রাজগীর পর্যায় ও গোপালপুরের সমুদ্রের ছবিগুলিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া অসংখ্য স্কেচে এই নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর একরাঙা ছবিগুলি দুই দেশের রঙ, তুলি ও আঙ্গিক ব্যবহারের নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

৩.১.৪ কলাভবনের পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চা ও নন্দলালের মনোভাব

জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সামনে রেখে শিল্পচর্চায় ব্রতী নন্দলাল প্রয়োজনবোধে অন্যান্য দেশের শিল্প থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে এবং শিক্ষাদান করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। যে ধারা তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজন হয়েছে তাকেই তিনি নিজ অভিজ্ঞতার আবেষ্টনে গ্রহণ করেছেন।[৫১] তিনি ছবি আঁকার ক্ষেত্রে আন্যাটমি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কলাভবনে অ্যানাটমি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪), ডুরার (১৪৭১-১৫২৮) প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা ছবি তিনি নিজে অনুশীলন করেন এবং প্রয়োজনমতো ছাত্রদেরও তাঁদের আঁকা ছবি অনুকৃতি করার পরামর্শ দেন।[৫২] তবে ছবিতে তেলরঙের ব্যবহার, পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক বিভিন্ন শিল্প আন্দোলন যেমন কিউবিজম, সিম্বলিজম[৫৩] ইত্যাদি বিষয়ে তিনি একমত হতে পারেননি। সাদৃশ্যবর্জিত এই শিল্পরূপগুলির প্রতি তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে – 'নিরঙ্কুশ প্রকৃতি বা নিরঙ্কুশ জ্যামিতি এই দুই চরম সীমায় সার্থক শিল্পরূপ আত্মপ্রকাশ করে না'।[৫৪] তবে তাঁর ছাত্ররা পাশ্চাত্য শিল্প-আঙ্গিক ও পাশ্চাত্য উপকরণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলে তিনি তাঁদেরকে বাধা দেননি। কলাভবনে তাঁর ছত্রছায়ার বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০) ও রামকিঙ্কর বেইজের (১৯০৬-১৯৮০) ভিন্নধর্মী শিল্পচর্চা এর প্রমাণ দেয়। ভিন্ন চিন্তাধারা সত্ত্বেও নন্দলাল কলাভবনের শিক্ষক হিসাবে

তাঁদেরকে নিযুক্ত করেন। কলাভবনের উন্মুক্ত শিল্পচর্চার পরিবেশ গড়ে তোলার পিছনে রবীন্দ্রমননের প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সংকীর্ণ জাত্যভিমানের বাইরে এসে না দাঁড়ালে চিত্তের প্রসার হয় না। তাই তাঁর উদ্যোগে স্টেলা ক্রামরিশ, আঁদ্রে কারপেলে, মিলওয়ার্ডসহ দেশ-বিদেশের বহুগুণীজন বিশ্বভারতীতে এসে তাঁদের মূল্যবান বক্তৃতা, কাজের দ্বারা বিশ্বভারতী ও কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের বক্তৃতা ছাত্রদের তরুণ মনে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি নন্দলালের শিল্পভাবনারও প্রসার ঘটে। নন্দলাল জানতেন ভারতশিল্পে যা নেই তা যদি পাশ্চাত্য শিল্পে থাকে তবে তাকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।[৫৫] তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছু কিছু বিষয় যে তাঁর পছন্দ নয় তা তাঁর ছাত্রদের বুঝিয়ে দেন। কলাভবনে রামকিঙ্কর ছিলেন প্রথম ছাত্র যিনি নন্দলালের ভারতীয় শিল্পচেতনা ও শিল্পপদ্ধতি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। নন্দলালের কাছে শিক্ষাগ্রহণের পূর্ব থেকেই পাশ্চাত্য বাস্তবানুগ শিল্পরীতির প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল। নন্দলালের শিল্পচেতনা ও ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হলেও তিনি পাশ্চাত্য রীতিতেই কাজ করে গেছেন। রামকিঙ্করের প্রথম দিকে ইউরোপীয়দের মতো মডেল ব্যবহার করে ছবি আঁকাকে নন্দলাল সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মতে মডেল বসিয়ে ছবি আঁকার প্রথা পাশ্চাত্য দেশের, এই প্রথা ভারতের শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে বেমানান। নন্দলালের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি মডেল ব্যবহার করেছেন, তবে সেটা লুকিয়ে। নন্দলালের কথা সেদিন মানতে না পারলেও পরবর্তীতে তিনি তাঁর ছাত্রদের নির্দেশ দেন মডেল ব্যবহারের পরিবর্তে জীবন থেকে গড়তে। শোভন সোমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন –

> সামনে জড়ের মতো বসানো মডেল আর জীবন এক ব্যপার নয়। জীবনকে আড়ষ্টতার মধ্যে পাওয়া যায় না। জীবন গতিময়। সচল জীবনের সেই স্বচ্ছন্দতা দেখবে, বুঝতে চেষ্টা করবে, তারপর আঁকবে বা গড়বে। তোমার কাজে তাকে ধরতে চাইবে। ...ছবি মানে অ্যানাটমির নকল নয়। নিষ্প্রাণ জড়ত্বকে হুবহু নকল করলে তা ছবিও হবে না, মূর্তিও হবে না।[৫৬]

তবে নন্দলাল তাঁকে মডেল ব্যবহার করে ছবি আঁকতে নিষেধ করলেও একবার তিনি নিজেই এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। মিসেস মিলওয়ার্ডের থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্পীদের আঁকা ছবির নকল করতে করতে রামকিঙ্কর বুঝতে পারেন ইউরোপীয় শরীরের গড়ন ও ভারতীয়দের শরীরের গড়ন এক নয়। এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে তিনি শান্তনিকেতনের আবাসিক ইটালিয়ান যুবক

তুচ্চিকে নগ্ন অবস্থায় স্টাডি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নন্দলাল সেকথা জানতে পেরে রামকিঙ্করকে সঙ্গে করে নিয়ে নিজে যান তুচ্চি জিউসেপের (১৮৯৪-১৯৮৪) কাছে। নন্দলালের সহায়তায় তিনি তুচ্চিকে মডেল হিসাবে ব্যবহার করে ইউরোপীয়দের শারীরিক গঠনের স্টাডি করতে সমর্থ হন। অ্যানাটমি শেখার জন্য রামকিঙ্কর ও তাঁর সতীর্থরা বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলার শ্মশান থেকে মানুষের মাথার খুলি ও হাতপায়ের হাড় খুঁজে আনেন। নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের আগ্রহ দেখে কলকাতা থেকে তারে গাঁথা আস্ত নরকঙ্কাল আনিয়ে দেন। রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনের প্রথা ভেঙে প্রথম তেলরঙে কাজ করা শুরু করলে তিনি বাধা দেননি ঠিকই কিন্তু অসন্তুষ্ট হন।[৫৭] রামকিঙ্কর আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনজাত কিউবিজমের দ্বারা প্রভাবিত হলে গুরু-শিষ্যের মধ্য তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ছাত্রের অদম্য জেদের কাছে হার মেনে উদারমনস্ক নন্দলাল ছাত্রকে তাঁর পূর্ণসত্তা বিকাশের পথে ছেড়ে দেন। এরপর রামকিঙ্কর বিমূর্তবাদের প্রতি আসক্ত হলে নন্দলাল তাতে আপত্তি জানাননি। এমনকি সমালোকদের বিরূপ সমালোচনায় তাঁকে ছাত্রের পক্ষ অবলম্বন করতে দেখা যায়। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করেননি। যার যে বিষয়ে আগ্রহ তাঁকে সেই পথেই উৎসাহ দিয়েছেন। ছাত্রের অভিরুচি অনুযায়ী নিজেকে ভাবিয়ে সেই মতই তাদের কাজ অবিকৃত রেখে কোথায় গলদ হচ্ছে তা ধরিয়ে দেন। কলাভবনের মুক্ত পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে আধুনিকমনস্ক ছাত্ররা দেশ বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে সেখানে আসতে থাকায় এবং কলাভবনের ছাত্রদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় নন্দলাল প্রাচ্যশিক্ষার বিষয়গুলিকে আরো প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি আকর্ষণের বিশেষ বিশেষ শিক্ষকের প্রতি ছাত্ররা আসক্ত হয়ে পড়ছে তাই কলাভবনের মঙ্গলের কথা ভেবে কোন বিশেষ শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের ভিড় দেখা দিলে তিনি তা ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করেন। পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে কলাভবনকে রক্ষা করার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের পর বিজাতীয় প্রভাবকে বহু পরিমাণে দূর করতে তিনি সক্ষম হন।[৫৮] ছাত্ররা পাশ্চাত্য শৈলী অনুসরণ করুক তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না তবে তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে হাত পাকবার আগেই পাশ্চাত্য শৈলীর চর্চা করে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে। দেশের সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা করা নড়বড়ে ভিতের উপর প্রাসাদ তৈরির সমান বলে তাঁর মনে হয়েছে। তাই তিনি কলাভবনের পাঠক্রমকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে

ভারতীয় শিল্পচর্চাকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য শৈলীর দিকে ছাত্ররা না ঝুঁকতে পারে। কোন ছাত্রের মধ্যে তিনি যখন নিজস্ব রুচি তৈরির গুণ দেখেছেন তখন তিনি তাঁকে ব্যক্তিগত চর্চার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি ছাত্রদের প্রতিভা ও ব্যক্তিসত্তাকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই বলতে পারেন –

> এঁরা আমার ছাত্র হলেও শিল্পী, তাঁদের সৃষ্টি কর্মকে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। যা আমাদের নেই তা বাইরে থেকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।[৫৯]

ভারতশিল্পের অসম্পূর্ণ দিকগুলি বিদেশি শিল্পের গুণদ্বারা পূরণ করতে হয়, অর্থাৎ গঠন মূলক গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়েই যে শিল্পীর প্রকৃত বিকাশ সম্ভব তা তিনি জানেন। তবে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি কঠোর হয়েছেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নন্দলালের এই ভয় প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন –

> ...দেশের জলহাওয়ার মধ্যে একটা শিশু বড় হয়, তার মার কাছে থেকে বাপের কাছ থেকে ভাষা শেখে। সে চট করে বিদেশী হয়ে যায় না। সে যাই করুক, শুনতে যতই অন্যরকম হোক, তবু সে তার নিজের জাতের কথাই কয়।[৬০]

রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণীতে নন্দলাল ছাত্রদের বাধা দেননি, ছাত্ররা কলাভবনের চৌহদ্দিতে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের রুচি অনুযায়ী কাজ করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু তারা যখন তাঁর কাছ থেকে বা মতাদর্শ থেকে দূরে সরে গেছেন তখন মনে মনে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। এই অসন্তুষ্ট হওয়ার পিছনে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি তাঁর বিরাগ কাজ করেছে তা নয়; এই মধ্যে লুকিয়ে আছে ছাত্রদের প্রতি তাঁর আকুলতা। তিনি তাঁর ছাত্রদের ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন তাই তিনি খোলা মনে তাঁদের কাজের প্রশংসা করেছেন। ভিন্ন মাধ্যমের ভিন্ন আঙ্গিকের রচনা হলেও ছাত্রদের আঁকা শিল্পসৃষ্টিগুলি নিজ তত্ত্বাবধানে প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছেন। কলাভবনের সমস্ত বিষয়ে নন্দলাল উৎসাহ দেখালেও মূর্তিকলা বিভাগের সম্পর্কে তিনি খানিকটা উদাসীনতা দেখিয়েছেন। অন্যান্য বিষয় বিশেষত আলংকারিক শিল্পকে তিনি যতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন মূর্তিকলা বিভাগকে ততটা নয়। মূর্তিকলাতে তিনি ছাত্রদেরকেও তেমনভাবে উৎসাহ দেননি। তবে মূর্তিকলা বিভাগকে নন্দলাল উপেক্ষা করেছেন তা নয়। ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে নিয়ে আসেন। তাঁর অনুরোধে দেবীপ্রসাদ ছাত্রদেরকে মূর্তি নির্মাণ সম্পর্কে কিছু উপদেশ দেন। এছাড়া ছুটির সময় যাতে

বাড়ি ফিরে কাজ করতে অসুবিধা না হয় তার জন্য ছোট ঘুরনচৌকি বানিয়ে দেন।[৬১] এই বিভাগে যখন প্রতিকৃতি নির্মাণ শুরু হয় তাতে তিনি আপত্তি করেন না, বরং বিষয়টি চর্চার সুযোগ করে দেন। কলাভবনে একই ঘরে বসে ছাত্রছাত্রীরা দেশ বিদেশের নানা আঙ্গিকের চর্চা করেছেন। কলাভবনে একদিকে যেমন আলংকারিক শিল্পচর্চা চলেছে, অন্য দিকে উডকাট, লিথোগ্রাফের চর্চা চলেছে, আবার মূর্তিকলা বিভাগে পুরোপুরি পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চা চলেছে। এরই মাঝে নন্দলাল নিজের কাজ করে গেছেন।[৬২]

৩.২ বিদেশি অনুষঙ্গে যামিনী রায়

৩.২.১ যামিনী রায়ের পাশ্চাত্যধর্মী চিত্রচর্চা: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রদর্শনী

যামিনী রায় যখন শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন সেই সময় ই.বি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত 'Indian Style of Painting' বিভাগটি অধিক জনপ্রিয়তা পেলেও ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার বা প্রতিকৃতি অঙ্কন করে উপার্জনের সুবিধার কথা ভেবে তিনি 'Fine Arts 'বিভাগটি বেছে নেন সম্ভবত তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে। তিনি মনে মনে যা চাইতেন আর্ট স্কুলের আবহাওয়ায় তার কিছুই না পায়ে শিল্পবিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।[৬৩] পুনরায় যখন তিনি ভর্তি হতে আসেন তখন তৎকালীন অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের নিয়ম অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নিয়ম থাকলেও যামিনীর শিল্প প্রতিভার স্বীকৃতী স্বরূপ প্রবেশিকা পরীক্ষা ছাড়াই ব্রাউন তাঁকে ভর্তি নিয়ে পছন্দমতো যে কোন ক্লাস বেছে নেওয়ার অনুমতি দেন এবং শিক্ষানবিশির পুরো সময় জুড়ে পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করেন। শিল্পবিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণরত অবস্থাতেই ব্রাউন ক্লাসরুমে যামিনীর আঁকা ছবি প্রদর্শন করতে দিয়েছিলেন। কোন ছাত্রের পক্ষে বিদেশি শিক্ষকদের থেকে ছাত্রজীবনে এই সম্মান, এই স্বীকৃতি, এত সুযোগ সুবিধা লাভ অকল্পনীয় ছিল।[৬৪] শিল্পবিদ্যালয়ের 'Fine Arts' বিভাগটিতে লক নির্ধারিত পাঠ্যসূচির সঙ্গে ন্যাচারালিজম[৬৫] এবং রিয়েলিজম চর্চার উপর জোর দেওয়া হয়। যামিনী নির্ধারিত পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করে একাডেমিক রীতির চিত্রাঙ্কনে দক্ষ হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্য রীতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি, স্বাধীন এবং সাহসী মনোভাব তাঁকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে তোলে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি নানা পেশার

সঙ্গে যুক্ত হন। এলাহাবাদে চিন্তামণি ঘোষের (১৮৪৪-১৯২৮) ছাপাখানায় কাজ করার সময় সেখানে কর্মরত ইউরোপীয় শিল্পী সামারের অধীনে কাজ করার সুবাদে তিনি বিভিন্ন রঙ ও এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মেশাবার নানা কৌশল বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করেন।[৬৬] উত্তর-কলকাতার বটতলায় বড় বড় গরানহাটা এন্‌গ্রেভিং ছবির বর্ডারে রঙ করতেন।[৬৭] বিষ্ণু দে যামিনীর আঁকা এই ধরনের মোটা লাইন যুক্ত বর্ডারের সঙ্গে ফরাসি চিত্রশিল্পী ফার্নান্দ লেগারের (১৮৮১-১৯৫৫) চিত্রকর্মের ব্যবহৃত সীমানা নির্ধারক মোটা লাইনগুলোর সাদৃশ্য খুঁজে পান।[৬৮] উল্লেখ্য যে এই ফরাসি চিত্রশিল্পী সেই কালীঘাটের পটের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন যে শৈলীর প্রেরণা যামিনীর ছবিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।[৬৯] শাড়ির দোকানে কাজ করার অভিজ্ঞতায় তিনি বিভিন্ন বৃত্তির মানুষদের রুচি, ছবির ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন ও রঙ নির্বাচনে সাহায্য করে। আবার নাটকের বাস্তবধর্মী সিন আঁকার কাজের অভিজ্ঞতা তাঁকে দূর থেকে মানুষের গোটা রূপ ধরতে এবং ছবি আঁকার নানা টেকনিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।[৭০]

Western School of Realistic Art-এর অনুসরণকারীদের পুরোভাগে ছিলেন যামিনী রায়।[৭১] ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি হেমেন মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'শিল্পীচক্র'-এর সক্রিয় সদস্য হন। এই সংস্থায় শিল্পী ও সমালোচকরা প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত মিলিত হয়ে ভারতীয় শিল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা তাঁদের শিল্পচর্চায় প্রকৃতপক্ষে ভারতশিল্পকে কতখানি পুনরুজ্জীবিত করেছিল, জাতীয়তাবাদী শিল্পচর্চায় তাঁদের ভূমিকা কতখানি এবং স্বদেশী অন্দোলনের সাপেক্ষে পাশ্চাত্য রীতির সাধকরা জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে আপস করছে কি না সেই বিষয় নিয়ে প্রায়ই বিতর্কমূলক আলোচনা হত। পাশ্চাত্য রীতিতে প্রতিকৃতি ও নিসর্গচিত্র অঙ্কনে যামিনী রায় ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি যে জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন, এবং এই দলের সদস্য হলেও ধীরে ধীরে তাঁর ছবিতে ভারতশিল্পকে নতুন রূপে প্রকাশ করতে চাইছিলেন তা অনুভব করা যায়। তাঁর এই প্রবণতা সংস্থার বিতর্কিত বিষয় হলেও তাঁর ছবি সতীর্থদের কাছে প্রশংসনীয় ছিল।[৭২] প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা হেমেন মজুমদার, বাগ্মী শিল্পী সতীশ সিংহের সঙ্গে তাঁর প্রবল মতবিরোধ ও বাগবিতণ্ডা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে পড়েনি।[৭৩] কঠোর অনুশাসনে পাশ্চাত্য শিল্পচর্চায়রত শিল্পীদের সঙ্গে যামিনীর সখ্য প্রমাণ করে যে তাঁরা গোঁড়া ছিলেন না। তৎকালীন সময়ে বেঙ্গল স্কুলের প্রভাবে তাঁদের শিল্পচর্চা যে

প্রচারবিমুখ হয়ে পড়ছিল সেই সত্য তাঁরা টের পাচ্ছিলেন। নবব্যঙ্গীয় শিল্পচর্চার সপক্ষে ও প্রচারে সেই সময় বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, পত্রপত্রিকা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। এই অবস্থায় প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য রীতির শিল্পীরা যে উপযুক্ত মান পাচ্ছে না একথা অনুভব করে এই দলের সদস্যরা তাঁদের প্রতিভার প্রচারের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চার সপক্ষে Indian Academy of Art নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা তাঁরা প্রকাশ করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি এঁদের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সুকুমার রায় পাশ্চাত্যপন্থী এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পত্রকাটির জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠান U. Ray and Sons থেকে সস্তায় হাফটোন ও লাইন ব্লক তৈরি করে দিতেন।[৭৪] এই পত্রিকায় প্রকাশিত যামিনীর আঁকা ছবিগুলিতে 'তাঁর ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতির জীবন্ত সাক্ষর রয়ে গেছে'।[৭৫] এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'Divine Moment' ছবিটি আঙ্গিকগত ও বিষয়গত দুদিক থেকে নতুনত্বের দাবি করে। ছবিটিতে পশ্চাদপটকে শূন্য দেখানো এবং আবছায়া সৃষ্টির প্রবণতা প্রাচ্য শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রমাণ করে। সাঁওতাল মা ও মেয়ের পোশাক পরিকল্পনা তাঁর দেখা সাঁওতাল জনজীবন থেকে প্রাপ্ত। পুরো ছবিতে পাশ্চাত্য রীতির আলো-ছায়ার বিন্যাস ও প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজনকে কঠোরভাবে মানা হয়নি।[৭৬] এই সময়ে আঁকা সাঁওতাল মহিলার জল আনতে যাওয়া ছবিটির রূপ কল্পনায় অসাধারণত্বে সাঁওতালদের সহজ সরল জীবনযাপনের গ্রামীণ ছোঁয়া দর্শক পেয়ে থাকে। এই ছবিটিতে মহিলাটির দেহে সমান শেডের ধূসর রঙ, একটি অঙ্গের সঙ্গে আরেকটি অঙ্গের বিভাজন বোঝাতে সরু কালো রেখা দিয়ে সীমায়িত করার এই প্রবণতা প্রাচ্যরীতির ছবির বৈশিষ্ট্য। এই ছবিগুলিতে সাঁওতাল রমণীদের শরীরের বিভঙ্গ লক্ষ করলে মনে হতে পারে পাশ্চাত্য ন্যুড ছবি থেকে তিনি তখনও সরে আসেননি। যদিও এই নগ্নতা যতটা না পাশ্চাত্য রীতির ছবির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত তার থেকে অনেক বেশি সাঁওতাল সংস্কৃতি, তাদের বেশভূষা, পোশাক পরিধানের ধরনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ছবির নগ্নতা কামোত্তেজক হিসাবে দেখা হবে নাকি আদিবাসী সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে দেখা হবে তা দর্শকের মানসিকতার উপর নির্ভর করবে। তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে এই ছবিগুলি থেকে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আবেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিশ্রণে ছবিগুলি তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের প্রাথমিক দিকনির্দেশক।[৭৭]

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে Indian Academy of Art অর্থের অপ্রতুলতার কারণে তা বন্ধ হয়ে গেলে Society of Fine Arts গঠিত হয় এবং যামিনী সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবছর একটি করে সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।[৭৮] সভার তরফ থেকে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলে কলকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন শিল্পবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণটি ব্যবহারের অনুমতি দেন। সেই প্রদর্শনীতে ভারতীয় রীতির ছবির সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতির ছবি প্রদর্শিত হয়। যামিনী রায়ের ছবি ছিল এই দুই শিল্পরীতির সংমিশ্রণে এক অভিনব সৃষ্টি। এই পর্যায়ে তাঁর জীবনে এক বড় পরিবর্তন আসে। তিনি বুঝতে পারেন পাশ্চাত্য রীতি বা নব্যবঙ্গীয় রীতি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় লালিত শিল্পীমনন কোনটারই উপযুক্ত নয়। তাই ভালো কি মন্দ সেই বিচারের পরিবর্তে আলাদা হওয়াটা বেশি জরুরি বলে মনে করে তিনি লোকশিল্পের আঙ্গিকে নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন। লোকশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হল দ্রষ্টব্য বস্তুর হুবহু অনুকরণ না করে প্রতীকের মাধ্যমে তা রূপায়িত করা। যামিনী লোকশিল্পের সরল আঙ্গিক চর্চার সঙ্গে এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রতীকের মাধ্যমে মূল বস্তুর আভাস দেন। পটুয়াদের মতো সামান্য লক্ষণের জগতে তিনি আবাধ বিচরণ করেন। ছবিতে প্রতীকের ব্যবহার এই সময় ইউরোপীয় শিল্পীদের ছবিতেও দেখা যায়। উল্লেখ্য যে পাশ্চাত্য শিল্প সম্পর্কে সদা সচেতন যামিনীর এই প্রতীকী জগতে বিচরণের পিছনে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

লোকায়ত শিল্প উপাদানগুলি থেকে যামিনী রায় যে নতুন রীতি উদ্ভাবন করেন তার গুণগ্রাহীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। 'শিল্পীচক্র' নামে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা তখনও পর্যন্ত প্রতি পূর্ণিমায় মিলিত হতেন। শিল্পচর্চা সম্পর্কিত নানা আলোচনা সেখানে হতো। এছাড়া বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, স্টেলা ক্রামরিশের মতো খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, সমালোচকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্টেলা ক্রামরিশের উদ্যোগে যামিনী রায়ের বাগবাজারে বাড়িতে ডিসেম্বরের ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবিতে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখে শান্তা দেবী লেখেন –

> ...তাঁহার আঁকা বাঙালা ঘরোয়া ছবিও দেখিয়াছি। সেগুলির অঙ্কন পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বদেশী ছিল না। ...রঙ ছাড়িয়া শুধু সাদা পটের উপর কালো তুলির রেখার সাহায্যেই তিনি কিছুদিন ছবি আঁকেন। ছবিগুলি সম্পূর্ণ বাংলা ধরনের নয়, খানিকটা আধুনিক পাশ্চাত্য ইম্প্রেস্যনিষ্ট রেখাচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।[৭৯]

এই প্রদর্শনীতে রাখা দুই সখীর চিত্রে, কৃষ্ণ বলরামের চিত্রেও তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব দেখতে পান। ছবির চরিত্র অনুযায়ী প্রদর্শনী কক্ষগুলো সাজানো হয়। প্রথম কক্ষে কালীঘাটের পটের অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট কাজ, দ্বিতীয় কক্ষে পাশ্চাত্য ইম্প্রেশনিস্ট ও পয়েন্টিলিস্ট ধরনের ছবি, তৃতীয় কক্ষে পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর পটধর্মী চিত্র দিয়ে সাজানো ছিল। এই প্রদর্শনীতে বহু বিদেশি শিল্পবোদ্ধা মানুষের সমাগম হয়। ১৯৩৪ খিস্টাব্দে Academy of Fine Arts-এ আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে যামিনী রায়ের বেশকিছু ছবির সঙ্গে 'উত্তরা-অভিমন্যু' ছবিটি প্রদর্শিত হয়। এই ছবিটির জন্য তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে Society of Oriental Art-এ তাঁর আঁকা একশো পঁচাত্তরটি ছবি নিয়ে তাঁর একক প্রদর্শনী হয়। গগনেন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকলেও এই প্রদর্শনীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। Flat technique-এ আঁকা যামিনীর 'মা ও ছেলে' ছবিটি কেনেন।[৮০] ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের স্টুডিওতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই খাঁটি পাশ্চাত্যধর্মী এবং লোকশিল্পনুসারী অথচ পাশ্চাত্য রীতি প্রভাবিত দুধরনের ছবিই প্রদর্শিত হয়।[৮১] একাডেমিক রীতির বিশ্বাস থেকে সরে আসা বিদেশি শিল্পবোদ্ধারা যামিনীর এই ভিন্ন রীতির ছবির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যামিনী রায়ের চিত্রচর্চা সম্পর্কে স্বদেশবাসীকে অবহিত করেন। বিদেশি লেখকদের লেখায় এবং পত্র-পত্রিকায় তাঁর ছবি নিয়ে আলাপ আলোচনাগুলি তাঁর পরিচিতি বাড়িয়ে তোলে।

৩.২.২ একাডেমিক রীতির প্রভাব

শিল্পবিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষা তাঁকে প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে সাহায্য করে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কোন রকম ডিগ্রি না নিয়ে তিনি শিল্পবিদ্যালয় ত্যাগ করার বহু পূর্ব থেকেই ফরমায়েশী প্রতিকৃতি আঁকার কাজ করেন। শিল্পবিদ্যালয়ের একাডেমিক রীতির শিক্ষার প্রভাব তাঁর আঁকা প্রথমদিককার প্রতিকৃতিগুলিতে দেখা যায়। বিত্তবান জমিদার, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিল্পবোদ্ধা শিক্ষিত মানুষরাও তাঁর প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কনের গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

আহ্বানে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে শশী হেসের আঁকা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতির অনুকৃতি করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধি, যদুনাথ সরকার (১৮৭০–১৯৫৮), যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯–১৯৫৬), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, ও. সি গাঙ্গুলীর বাবা-মা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের অনেকের প্রতিকৃতি যামিনী রায় আঁকেন।[৮২] তাঁর আঁকা প্রতিকৃতিগুলি আমেরিকান শিল্পী হুইসলারের (১৮৩৪–১৯০৩) মতো 'দর্শনীয় ও তীব্র সজীব গুণাবলি সমন্বিত হত'।[৮৩] প্রতিকৃতি চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনে তখন ফরমায়েশের চাপে সপ্তাহে অন্তত দুটি করে প্রতিকৃতি তাঁকে আঁকতে হত। বিপুল পরিমাণ কাজের ফরমায়েশ এবং প্রাপ্ত কমিশন প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে খ্যাতি ও দক্ষতাকে প্রমাণ করে।[৮৪] প্রতিকৃতি অঙ্কনকালে বেশিরভাগ সময়েই সামনে মডেল বসিয়ে স্টাডি করার সুযোগ তিনি পাননি। সেই যুগে পুরুষ চিত্রশিল্পীর সামনে বসে সিটিং দিয়ে প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কন করানোর কথা মহিলারা ভাবতে পারতেন না। ফলে ধনী পরিবারের মহিলাদের আলোকচিত্র দেখেই তাঁকে প্রতিকৃতি আঁকতে হয়।[৮৫] অথচ শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণকালে তাঁরা মডেল বসিয়ে প্রতিকৃতি অঙ্কনের শিক্ষালাভ করায় প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান এবং আলোকচিত্রের বৈশিষ্ট্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে নতুনত্ব আনেন। আলোকচিত্র আকারের সঙ্গে ক্যানভাসের আকারের মিল না থাকায় প্রতিকৃতি আঁকবার সময় মডেলের আকার প্রয়োজনবোধে বাড়াতে কমাতে হয়েছে। আলোকচিত্রের সঙ্গে তাঁর আঁকা প্রতিকৃতি তাই কখনই মেলেনি। ইংল্যান্ডের রয়্যাল একাডেমিতে আলোকচিত্র দেখে প্রতিকৃতি আঁকবার প্রচলন ছিল না। এখানেই রয়্যাল একাডেমির সঙ্গে তাঁর ছবির পার্থক্য ঘটে যায়।[৮৬] ইংল্যান্ডে সিকার্ট নামে এক শিল্পী Royal Academy-র ছাত্রদেরকে আলোকচিত্র থেকে প্রতিকৃতি আঁকার এই রীতির সঙ্গে পরিচয় করান। যামিনী তাঁর বন্ধু অতুল বসুর থেকে সিকার্টের এই ধরনের শিল্প পদ্ধতির কথা জানতে পারার আগে থেকেই তিনি এদেশে প্রতিকৃতি আঁকার এই বিশেষ রীতির চর্চা শুরু করেন। ভারতবর্ষে পরীক্ষামূলক এই ধরনের ছবি আঁকার চর্চা সম্ভবত তিনিই প্রথম শুরু করেন। ইউরোপীয় রীতিতে যাঁরা সেই সময় ছবি আঁকছেন তাঁরা এবং সমালোচকরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হওয়ার সেই সময় এই নতুন ধরনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়নি। এই সময়ের ছবিগুলিতে অবয়বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, আলোছায়া ও পরিপ্রেক্ষিতের বাস্তবসম্মত ব্যবহার দেখা যায়। প্রতিকৃতিগুলি লক্ষ

করলে বোঝা যায় আঙ্গিকগত দিক থেকে ছবিগুলি ছিল নিখুঁত। তাঁর এই সময়ের ছবিগুলিকে রেমব্রান্টের (১৬০৬–১৬৬৯) ছবির সঙ্গে তুলনা করা চলে। তবে যামিনী রায় ভাবলেশহীন প্রতিকৃতি অঙ্কনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছবির শুধু আঙ্গিকগত নৈপুণ্যের দিকেই নজর দেননি প্রতিকৃতি-ধৃত মানুষটির চারিত্রিক গুণকেও প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন।[৮৭] এই ব্যাপারে তাঁর অ্যানাটমি ও অভিব্যক্তি সম্পর্কিত স্বচ্ছ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। শিল্পতাত্ত্বিক অশোক মিত্র যামিনী রায়ের শেষ জীবনে আঁকা গান্ধিজি ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের পোর্ট্রেট সম্পর্কে বলেন –

> সেগুলি চিরাচরিত ইওরোপীয় প্রথায় পোর্ট্রেট হত না অথচ তাতে ইওরোপীয় ভঙ্গি সুস্পষ্ট। মুখের রেখা হয় অবশিষ্ট, যেন মানুষের মুখের মত দেখালেই হল। ...তাঁর পোর্ট্রেট আসে একই ধরনের তীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট বড় বড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অলঙ্কারের রীতিতে আঁকা সমান একাগ্রভাব। ...তাতে মনস্তত্ত্বের চিহ্ন বিশেষ থাকে না।[৮৮]

এই মতামত সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা দেখতে পাই তাঁর আঁকা মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতিতে তুলির টান ও বর্ণ প্রয়োগের দক্ষতায় স্মিত হাসি উদ্ভাসিত হয়। ঘাড়ের বক্রভঙ্গিতে চরিত্রটির গতিচঞ্চল ভাবমূর্তি প্রকাশ পায়। সাদা-কালোয় আঁকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতিতেও অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। কথোপকথনের খোলামেলা ভাব, আলাপচারিতার মাধুর্য একরাঙা ছবিতেও দৃষ্ট হয়।[৮৯] গান্ধিজির পাঁচ-ছয়টি, রবীন্দ্রনাথের চার-পাঁচটি, সুধীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যামিনী এঁদের চারিত্র্যকে খুবই স্পষ্টভাবে ধরেছেন।[৯০]

প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি দশের দশকেই তেলরঙ ও জলরঙ দুটি মাধ্যমেই তিনি নিসর্গচিত্র অঙ্কন করেন। প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি দশের দশকেই তেলরঙ ও জলরঙ দুটি মাধ্যমেই তিনি নিসর্গচিত্র অঙ্কন করেন। বাঁকুড়ার মিশ্র সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা যামিনী রায়ের চিত্রে আদিবাসী সমাজের ছবি, গ্রামীণ জীবনযাত্রা এবং নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটে ওঠে। ছবিগুলিতে তেলরঙ ও জলরঙ ব্যবহারের দক্ষতায় উৎকৃষ্ট মানের পাশ্চাত্য রীতির ছবি হিসাবে সেগুলিকে গণ্য করা হয়।[৯১] নামাজ, স্বায়ংসন্ধ্যা, প্রভাত, অলসবেলায়, প্রণাম, প্রসাধন, নন্দী, Two the Unknown প্রভৃতি ছবি উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য শৈলীতে তিনি যখন ছবি আঁকছেন সেই সময় ইউরোপের বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্মের দিকে এবং একই সঙ্গে এদেশের শিল্পচর্চার দিকে নজর রাখেন এবং ক্রমে বাস্তবতা বা বাস্তব অনুকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিসমাপ্তির দিক থেকে সরে আসতে থাকেন। পশ্চিমাশৈলী নিয়ে নানা

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন। ইউরোপীয় রীতির ছবিতে দ্বিমাত্রিকতা ও ত্রিমাত্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেখানে প্রায় অসম্ভব ছিল সেই সময় চৈনিক ছবির অনুপ্রেরণায় সমতল কাগজে দ্বিমাত্রিক ছবি আঁকার প্রচেষ্টায় প্রথমেই তিনি পিছনের ল্যান্ডস্কেপ বাদ দেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন চৈনিকে ছবিতে পশ্চাদপট বাদ দিয়ে তুলির সামান্য আঁচড়ে একটা গাছের ডাল, গাছ, পাথর এঁকে ছবি আঁকা সম্পন্ন করছে। ইউরোপীয় রীতি থেকে চৈনিক রীতির দিকে যাত্রা সম্পর্কে তিনি বলেন –

> ছবির বেলায় আমার বেশ মনে হল যে ইওরোপীয় ধরনের আঁকাটা যেখানে শেষ হয়েছে, চৈনিক শিল্পের সেখানে আরম্ভ হয়েছে।[৯২]

পাশ্চাত্য শৈলীর হাতেকলমে শিক্ষা ও চৈনিক শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞতা থেকে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে লাইন ড্রয়িঙের দিকে ঝোঁকেন।

৩.২.৩ ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব

পাশ্চাত্য শিল্পের মোহ ত্যাগ করে তিনি রেখা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। তেল রঙের ছবি আঁকতে আঁকতে তাঁর মনে হয় রঙ ব্যবহার না করেও রেখার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করা যেতে পারে। তখন রঙের বাহুল্য বর্জন করে সাদা পটের উপর কালো তুলির রেখার সাহয্যে বেশ কিছুদিন ছবি আঁকেন। এই একরাঙা ছবিগুলিকে ঠিক বাংলার ছবি বলে বলা যায় না। পাশ্চাত্য ইম্প্রেশনিস্ট ছবির সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়।[৯৩] যামিনী রায় তাঁর বেশিরভাগ ছবিকেই একটি ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ করে আঁকতে পছন্দ করেন। ফ্রেম করে আঁকার ফলে ছবিতে একটা বাঁধনের সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট কোন ঘটনা বা নির্দিষ্ট চরিত্র যেন সেখানে বাঁধা পড়ে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ফ্রেমের এই বাঁধন ভেঙ্গে ছবিতে আঁকা বিষয়বস্তু ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অর্ধেক গাছ, অর্ধেক শরীরের অংশ ফ্রেমের মধ্যে রয়েছে বাকিটা ফ্রেমের বাইরে রয়েছে। ফ্রেমের বাইরে বাকি যে অংশটুকু রয়েছে তা রূপায়ণের ভার দর্শকের কল্পনার উপর ছেড়ে দেন। ছবির ক্যানভাস হয়ে ওঠে প্রাণচঞ্চল সৃজনক্ষেত্র যেখানে শিল্পী ও দর্শকের যৌথ প্রচেষ্টায় ছবির পূর্ণতা প্রকাশ পায়। এই ধরনের ছবিগুলি দেখলে যেন মনে হয় গোটা একটি বিষয়ের খানিকটা অংশ কেটে বসিয়ে দিয়েছেন। দেখার জগতকে সীমায়িত করার জন্য ফ্রেমের সাহায্য নিয়েছেন। আলোকচিত্র যেমন লেন্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ,

লেন্সের বাইরের বিষয় সেখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাঁর আঁকা এই ধরনের চিত্রগুলি যেন আলোকচিত্রের লেন্সের গুণেরই প্রতিনিধিত্ব করে। লেন্সের মধ্যে যেটুকু আসা সম্ভব সেটুকুই যেন ছবিতে উপস্থাপিত। গোটা দৃশ্য থেকে খানিকটা অংশ কেটে উপস্থাপন করা এবং উপস্থাপিত বিষয়ের বাইরের জগতের ইঙ্গিত দেওয়ার এই প্রবণতা পশ্চিম দেশীয় শিল্পেও আসে। একাডেমিক রীতিতে ছবির জমি, আয়তন, গভীরতা নৈকট্য নির্ণয়ের নির্দিষ্ট নীতির নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করা হয়। যে সামঞ্জস্যবোধ ও প্রথাগত সমাপ্তির ধারণা একাডেমিক রীতিতে প্রচলিত ছিল তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। খণ্ডিত বস্তু পরিবেশনের ভাবনা আলোকচিত্র থেকে উদ্ভুত বলে মনে করা হয়। ইম্প্রেশনিস্ট ছবিতে এই ধরনের উপস্থাপনা প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। যামিনী রায় পাশ্চাত্যের শিল্প আন্দোলনের খবর রাখতেন। তাই ইম্প্রেশনিস্ট ছবির সঙ্গে তাঁর ঘটেছিল তা বলাই যায়। তবু একথা স্পষ্ট করে বলা যায় না এই ধরনের ছবি আঁকার প্রবণতা তিনি ইম্প্রেশনিস্ট ছবি থেকেই পেয়েছিলেন। আসলে ছবিতে কেবলমাত্র বিষয়ের একটি অংশ নির্বাচন করা এবং দৃশ্য ক্ষেত্রের বাইরে আরো কিছুর ইঙ্গিত দেওয়া, এই ধরনের উপস্থাপনা আমাদের দেশে কয়েক শতাব্দী আগেই হয়েছে। বাংলার মন্দির গাত্রের টেরাকোটা প্যানেলগুলিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইম্প্রেশনিজম তত্ত্ব উদ্ভবের বহু আগেই মন্দির টেরাকোটাগুলির নির্মাণ আমাদের দেশের শিল্পীরা করে গেছেন সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। যামিনী রায় যিনি বাংলার লোকশিল্পের প্রতি আত্মিক টান থেকে পাশ্চাত্য রীতিতে চিত্রাঙ্কনের নিশ্চিত পথ পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি যে টেরাকোটার এই লক্ষণটির দ্বারা প্রভাবিত হননি তা ভাবা অনুচিত। তাঁর আঁকা কৃষ্ণ-বলরাম, গোপিনী চিত্রগুলিতে ত্রিভঙ্গ মূর্তির আদল ভারতবর্ষে বহুকাল থেকেই প্রচলিত। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরের গায়ে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। এই ধরনের মূর্তির মধ্যে যে ছন্দের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের কন্ট্রাপস্ট্রোর[৯৪] মিল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে ভারতবর্ষের স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলাতে এই ধরনের মূর্তির আবির্ভাব হাজার হাজার বছর আগেই হয়েছিল।[৯৫]

পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি অনুযায়ী উৎকৃষ্ট শিল্প মানেই ছিল বাস্তবের নিঁখুত প্রতিলিপি। যে শিল্পী তাঁর ছবিকে বাস্তবের সঙ্গে যতটা মিলিয়ে ফেলতে পারবেন তিনি ততটাই সার্থক শিল্পী বলে বিবেচিত হবে। ছবি ও বাস্তবের মধ্যে কোন ফাঁক রাখায় তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। পাশ্চাত্য শিল্পীদের

কাছে কল্পনা অনুসারী আকার প্রদান বা বর্ণ প্রয়োগ ছিল রীতি বিরুদ্ধ। একাডেমিক রীতির এই অচলায়তন ভাঙার সাহস ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা প্রথম দেখিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিল্পে যা এতদিন অকল্পনীয় ছিল ইম্প্রেশনিশট শিল্পীরা তা সম্ভব করে তুললেন। পরিপ্রেক্ষিত, গড়ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট রঙের পরিবর্তে বস্তুনিরপেক্ষ রঙ ব্যবহার করলেন। যামিনী রায়ের ছবিতে এই বস্তু নিরপেক্ষ রঙের ব্যবহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। তাঁর ছবিতে আঁকা মানুষ সবুজ, হাতি সাদা নীল, পাখি নানা রঙের সমাহারে সজ্জিত হয়ে বিচিত্র ক্যানভাস সৃষ্টি করতে পারে। বস্তু নিরপেক্ষ বর্ণ ব্যবহারের এই ধারণা ইউরোপীয় শিল্পীদের কাছে নব উদ্ভুত আন্দোলনজাত হতে পারে কিন্তু ভারতীয় শিল্পে এই রীতি বহুকাল থেকেই চলে এসছে। ধ্রুপদী এবং লৌকিক দুটি ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা দেখা গেছে। সুতরাং যামিনী রায়ের চিত্রে এই প্রবণতা ইউরোপের অনুসারী না ভারতশিল্প অনুসারী সেকথা ভবে দেখতে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীর ছবি কি কেবলই গ্রামীণ লোকশিল্পের দিকে যাত্রা নাকি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনে সামিল হওয়ার প্রচেষ্টা সেই প্রশ্ন থেকে যায়। যামিনী রায়ের ছবিকে তাই কেবলমাত্র লোকশিল্পের আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা যায় না। আধুনিক শিল্প আন্দোলনের প্রেক্ষিতেও তাঁর ছবিকে দেখতে হয়। পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির কারাগার থেকে মুক্ত হতে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা যেমন ছক ভাঙার খেলায় নেমেছিলেন যামিনী রায়ও পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির অসারতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। এখানেই হয়তো মিলে গেছে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর শিল্প ভাবনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলির মধ্যে পাশ্চাত্যে নিসর্গচিত্রের ক্রমবিকাশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে সমাজের চেহারা যখন বদলে যেতে শুরু করেছিল তখন পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি ধীরে ধীরে তার প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিল। এই সময় নিসর্গচিত্রগুলি নতুন আবেদনে প্রতিভাত হল। বস্তুর চাক্ষিক প্রতিফলনের বদলে ছবিতে প্রাধান্য পেল কল্পনা। বাহ্যবস্তুর থেকে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধির দিকে মনোযোগ বাড়ল। একাডেমিক রীতির আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, উপকরণ সমস্ত কিছু থেকেই যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন চিত্রশিল্পীরা। এই ভাবনা থেকেই ইম্প্রেশনিজম ও পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের জন্ম হল। নিয়মভাঙার এই প্রয়াসকে সকলেই খোলা মনে মেনে নিতে পারেননি। একসময় বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তাঁদের ছবিকে

এলোমেলো, বিশৃঙ্খল বলে মনে হয়েছে। ইম্প্রেশনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ ঐতিহ্যকে ভাঙতে চাইলেও ঐতিহ্যের প্রাণহীন গতানুগতিকতায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

দেগার (১৮৩৪-১৯১৭) অধ্যাবসায়ের সঙ্গে যামিনীই রায়ের অধ্যাবসায় যেন মিলে যায়। দেগার বলেছিলেন একনাগাড়ে কয়েক ঘন্টা কাজ না করলে তাঁর নিজেকে কেমন যেন অপরাধী, নির্বোধ, অপদার্থ বলে মনে হয়। যামিনীর রোজকার জীবনও যেন এই ভাবনায় বাঁধা। তিনি ভোরে উঠে কাজে বসে যান এবং ক্লান্তির সীমায় টেনে না নিয়ে নিজেকে থামতে দেন না।[৯৬] যখন ছবি আঁকায় মন বসাতে পারেননি তখন অস্থির হয়ে উঠেছেন। পরিচিত বন্ধুদেরকে তাঁর মনের অস্থিরতা বর্ণনা করেছেন। অসুস্থ অবস্থাতে তাঁর ছবি আঁকা থামেনি। দেগার একই ছবি বারবার এঁকেছেন। একই ছবি আঁকতে তিনি ক্লান্তি বোধ করেননি, বরং বলেছেন একই ছবি প্রয়োজনে একশো বার আঁকা যেতে পারে। তিনি কখনো কখনো তাঁর আঁকা এক দশকের পুরনো ছবিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। ছবির মধ্যে নতুন কোন অবয়ব বা অনুপুঙ্খ যোগ করেছেন। ছবির পুনরুৎপাদনের এই প্রবণতা যামিনীর মধ্যে লক্ষ করা যায়। কখনো একই ছবিকে অবিকল রেখে পুনরায় এঁকেছেন, আবার মূল বিষয়টিকে অবিকৃত রেখে ছবির মধ্যে সামান্য খানিকটা পরিবর্তন করেছেন। দেগার ছবির বিশেষত্ব হল চিত্রিত অবয়বের বেশ খানিকটা অংশ ইচ্ছাকৃত ভাবে কেটে দেওয়া। তাঁর ছবিতে কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রসংস্থান সম্পর্কিত এই পরিবর্তন ফটোগ্রাফির ধারণা থকে পাওয়া। যামিনী রায়ের চিত্রেও উপস্থাপিত বস্তুর খানিকটা অংশ কেটে উপস্থাপন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আবেগশূন্য জগতের নির্মাণ যেমন দেগার ছবিতে দেখা যায় যামিনী রায়ের ছবিতেও সেই নির্মাণ চোখে পড়ে। দেগার মতো যামিনী রায়ও তাঁর ছবির নিজস্ব ভাষা গড়ে তুলতে চান।

৩.২.৪ পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব

ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রধারার প্রধান শিল্পীরা মধ্যে ঐতিহ্য রক্ষা ও ঐতিহ্য ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে বিচরণ করেছেন। কিন্তু তাও ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা সৃজনশীলতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে গেছেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঐক্যবদ্ধতা ও সমমানসিকতার অভাবে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্প আন্দোলন জোট বেঁধে উঠতে পারেনি। ইম্প্রেশনিজমের পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৮

খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পোস্ট ইম্প্রেশনিজম আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করা যায়। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন পল সেজান, পল গগ্যাঁ ও ভিনসেন্ট ভ্যান গগ। সেজান বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রথাবদ্ধ শিল্প প্রকরণে বিশ্বাসী হলেও প্রকরণ ভাবনায় অভিনবত্বের পরিচয় দেন। তিনি প্রকৃতি দেখার ভঙ্গিকে নিসর্গ ছবিতে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। তিনি জ্যামিতিক আকার দিয়ে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। দৃশ্য বস্তুর আকার ভাঙার প্রবণতার মধ্যের রয়েছে তাঁর ছবির বিশেষত্ব। প্রথাগত রীতির কৃত্রিমতাকে ভেঙে দিয়ে গড়তে চেয়েছেন সৌন্দর্যবোধের নতুন স্বপ্ন। ত্রিমাত্রিক গড়নের পরিবর্তে দ্বিমাত্রিক রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যামিনীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এখানেই সেজানের দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যায়। বাস্তব জগতের দেখার সঙ্গে যামিনী রায়ের ছবিগুলি স্পষ্টতই আলাদা। তাঁর ছবিতে আঁকা মানুষ থেকে পশু-পাখি, গাছপালা, ফুল-পাতা সমস্ত কিছুই আমাদের দৃশ্য জগতের বাইরের কল্পনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের অনেক ছবিতেই পাশ্চাত্য রীতি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের আঁকার ধরন লক্ষ করা যায়। ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, গগ্যাঁ ও পল সেজান প্রমুখ পোস্ট–ইম্প্রেশনিস্টদের ছবির দ্বারা আকৃষ্ট হন। এঁদের আদর্শে ভ্যানগগের প্রতিকৃতি, 'Two Gentaleman' প্রভৃতি চিত্র অঙ্কন করেন। এই সময় ছোট ছোট তুলির আঁচড়ে চাপ চাপ পুরু রঙ ব্যবহারে ছবিগুলি সমুজ্জ্বল। ছেঁড়া ছেঁড়া অথচ ঘনসংবদ্ধ রঙে ছবিগুলি অসাধারণত্বের দাবি জনাতে পারে।

পোস্ট–ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী পল গগ্যাঁর সঙ্গে যামিনী রায়ের জীবন ও শিল্পের মিল পাওয়া যায়। গগ্যাঁ যামিনী রায়ের মতো ছবি আঁকার জন্য স্বেচ্ছায় অর্থ উপার্জনের লাভজনক পথ পরিত্যাগ করেছিলেন। যাথারীতি আর্থিক প্রতিবন্ধকতায় অনাহারে অসুস্থতায় বহুদিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। নাগরিক জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি পুঁজিবাদী সমাজের বলয় থেকে দূরে সরে গিয়ে আদিম সারল্য ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পরিমণ্ডলে নিজেকে সিরিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ফিরে আসতে হল ব্রিত্তানির নাগরিক সমাজেই। অর্থউপার্জনের নেশায় তখনকার ধনবাদী ইউরোপীয় সমাজের চক্রব্যূহে মানুষ কীভাবে স্বেচ্ছা বন্দীত্ব স্বীকার করে নিচ্ছিলেন, এইটা গঁগ্যার সংবেদনশীন মন মেনে নিতে পারেনি। তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। আদিম সারল্যের সন্ধানে তাই তাঁকে যেতে হয় তাহিতি দ্বীপের কল্পিত স্বর্গরাজ্যে।[৯৭] সেখানে গিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন এঁকে দেখান প্রতীকের মাধ্যমে। যামিনী রায়ও নাগরিক সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শৈশবের স্মৃতি থেকে লোকশিল্পের আঙ্গিককে

গ্রহণ করেছেন। সাঁওতাল জীবনের নারীপুরুষের জীবনচিত্র তাঁর ছবিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। গগ্যাঁ ছবিতে যেমন আদিম রূপকল্পনা প্রতীকের মাধ্যমে আসে যামিনীও দৃশ্য জগতের বস্তুকে প্রতীকের আকারে উপস্থাপন করেন। তিনি আদিম রূপকল্পনার মাধ্যমে শুদ্ধ সত্যে পৌঁছাতে চান।

পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট শিল্প আন্দোলনের অন্যতম শিল্পী ভ্যান গগ ইম্প্রেশনিস্টদের অসমতল তুলির আঁচড় ও পয়েন্টিলিস্টিক তুলির ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। বিপরীতধর্মী রঙে ব্যবহারে আঁকাবাঁকা সুতোর মতো রেখা ব্যবহার করে ভিন্ন ধরনের শৈলী উদ্ভাবন করেন। তাঁর ছবি দেখলে মনে হয় যেন সেগুলি রঙ দিয়ে আঁকা নয়, তাল তাল রঙ দিয়ে মল্ড করা। রঙ ব্যবহারের কৌশলে স্ফীত ভাব যেন ছবিগুলিতে ফুটে ওঠে। তুলির প্রতিটি আঁচড়ই আলাদা আলাদাভাবে আলো-ছায়ার অনুভব আনে। ক্যানভাসের কোথাও সমান করে মসৃণ করে রঙ ব্যবহারের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।[৯৮] যামিনী রায়ের নিসর্গচিত্রগুলিতে এই ধরনের তুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ভ্যান গগের ছবিতে বিপরীতধর্মী হলুদ ও নীল রঙের ব্যবহার যামিনী রায়ের ছবিকেও উজ্জ্বল করে তোলে।

ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা মূলত স্টুডিও থেকে বেরিয়ে জগৎকে নতুন আলোকে দেখতে চেয়েছেন। বিষয়বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক প্রদর্শনের প্রতি একাডেমিক শিল্পীদের ঝোঁকের পরিবর্তে বস্তুর সামগ্রিক রূপের প্রতি যত্নবান হয়েছেন। একাডেমিক রীতির বর্ণ প্রয়োগের কঠোর নিয়ম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে রঙ ও ফর্মগুলিকে ভেঙ্গেছেন। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে ছবিগুলি থকে আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যামিনী রায় একাডেমিক শিল্পরীতিতে শিক্ষাগ্রহণ করলেও ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট ছবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। জর্জ সোরা (১৮৫৯-১৮৯১), গগ এবং সেজান চিত্র ক্ষেত্রকে যেভাবে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র বলে ধরে, বর্ণান্তরহীন একভার রঙের পুঞ্জের সাহায্যে নক্সা গড়ে তুলতেন, দ্বিমাত্রিক ডৌলের দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিম্বকে যে-ভাবে ভেঙে রঙিন নক্সায় পরিণত করতেন, যামিনী এই শৈল্পিক গুণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এঁদের কিছু নিসর্গচিত্র আঁকলেন এবং বেশকিছু চিত্র নিজের মতন করে কপি করলেন।[৯৯] প্রথমদিককার একেডেমিক রীতির প্রতিকৃতিগুলি বাদ দিলে তাঁর আঁকা অনেক প্রতিকৃতিতেই ইম্প্রেশনিজম বা পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পড়েছে। চাপ চাপ অমসৃণ রঙ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিকৃতিগুলিতেও জ্যামিতিক গড়ন ফুটে উঠেছে। গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতিতে এই অমসৃণ চাপ চাপ রঙ ব্যবহার

লক্ষ করা যায়। রঙ নির্বাচনেও একাডেমিক রীতির ভাঙনের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজিরকে পিছন থেকে দেখে আঁকা হলেও পরস্পর সম্বোধনের নিবেদন ছবিটিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। বোঝা যায় একাডেমিক রীতির সূক্ষ বিশ্লেষণ এবং একটি রঙের সঙ্গে অপর রঙ মিশে যাওয়ার মোলায়েম ভাব সেই ছবিগুলিতে নেই। এই পর্যায়ে নতুন বর্ণ ব্যবহার, তুলি চালনা, গড়ন ভাঙার খেলায় সমকালীন পাশ্চাত্য শিল্পভাবনার সঙ্গে নিজের মনের মিল খুঁজে পান। বাস্তববোধের বিপরীতে নতুন চিত্রভাষা ভিন্ন অনুভূতি ও বোধ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নীল হলুদের ব্যবহারে আলো অন্ধকারের খেলায় মেতে উঠেছে প্রতিকৃতি থেকে নিসর্গ দৃশ্য। প্রতিকৃতি অঙ্কনে রঙ ও রেখার ব্যবহারে দ্বিমাত্রিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কৌণিক টুপি পরিহিত দাড়িওলা মুখের ও তিনটি সাহেবের চিত্রে এই দ্বিমাত্রিক বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে। দুটি চিত্রেই নীল হলুদ রেখার বৈপরীত্য মিলে গেছে আকারে জ্যামিতির সঙ্গে। তিনটি সাহেবের চিত্রটিতে পোষাকের নীল বহিঃরেখা এবং মুখের চারপাশের সবুজ প্রান্তরেখার ব্যবহার ছবিটিকে বাস্তববাদী উপস্থাপনা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। কৌণিক টুপি পরিহিত দাড়িওলা মুখের চিত্রটিতে মুখের উপরে হলুদ রঙের ব্যবহারে আলোকজ্জ্বল দীপ্তি ফুটে উঠেছে। এর পাশে নীল রঙের ব্যবহার প্রেক্ষাপটের অন্ধকারময় গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছে। ভ্যান গগের প্রতিকৃতি অঙ্কনকালে মোটা তুলির চাপ চাপ রঙ ব্যবহারের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সরু আঁকা বাঁকা রেখার ব্যবহার হয়েছে। ছবিটিতে আলোআঁধারির প্রচলিত নিয়ম মানা হয়নি। হলুদ নীল কমলা ও সাদারঙের রেখার ব্যবহারে দূরত্ব নৈকট্য ছাড়াও মুখের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। কৌণিক টুপি পরিহিত দাড়িওলা মুখের চিত্রটির সঙ্গে যেন তাঁর আঁকা ভ্যান গগের প্রতিকৃতির সূক্ষ্ম সম্বন্ধ টের পাওয়া যায়। ভ্যান গগের প্রতিকৃতির পাশে এই ছবিটি রাখলে লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর আত্মিক টান প্রকাশ পায়। পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের ভাষাতেও লোকায়ত রূপকল্পনায় অনবদ্য সৃষ্টি এটি। তাঁর আঁকা ‘স্টিল-লাইফ’ চিত্রগুলিতেও বাস্তববাদ থেকে উত্তরণের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এইগুলিতেও স্থানীয় সত্তার প্রভাব পড়ে। ফুল ও ফুলদানিগুলি একান্তভাবেই ভারতীয়। এই সময়ে তাঁর আঁকা নিসর্গ চিত্রগুলিকে নির্দ্বিধায় পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলা চলে। রঙ ও তুলির স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে পৃথিবীর স্পন্দমান আলোর উদ্ভাস দেখা যায়। নিসর্গচিত্রগুলিতে চেখে দেখা জগৎকে কখনই সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয়নি আবার প্রাকৃতিক ছন্দকে শুধুমাত্র নক্সার ছকে নামিয়ে

আনা হয়নি। নীল হলুদ রঙের ক্রমবিন্যস্ত তুলির আঁচড়ে পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।[১০০] নিসর্গ দৃশ্যগুলিতে অনেক সময় পাশ্চাত্য ইম্প্রেশনিস্ট বা পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের প্রভাব দেখা গেলেও এইগুলি একান্তভাবে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষার অনুকরণ থেকে ছবিগুলির দূরত্ব অনেকখানি। বাস্তববাদী শিক্ষার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসা অভিনবত্বের স্বর ছবিগুলিতে স্পন্দিত। কলকাতা শহরের গলি, ঘেঁষে থাকা বাড়ি, গ্রামের প্রকৃতি, সাঁওতাল অঞ্চলের ঢেউ খেলানো ভূমি, বৃক্ষছায়া ঘন দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতি, লাঙল কাঁধে চাষী, জোলো জমিতে মেয়েদের বীজরোপন, নদীতে ভাসমান নৌকা, নৌকার সারি, স্পন্দমান রহস্যময় জলরাশি, রেললাইনের সমান্তরাল রেখার মিশে যাওয়া, দক্ষিণেশ্বরের বট গাছ, কাশীপুরের দোতলা বাড়ি, মফস্বলের বাংলো বাড়ি এরূপ অসংখ্য ছবিতে এই দুই পাশ্চাত্য শিল্প আঙ্গিকের পরীক্ষামূলক ব্যবহারে যামিনী রায়ের স্বতন্ত্রসত্তা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে তাঁর ছবিতে একটা সময় পর্যন্ত লোকজীবনের রূপকল্পনায় বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিল্পভাবনা কাজ করে। পাশ্চাত্য শিল্পীদের মতই যামিনী রায় তাঁর নিসর্গচিত্রে কালোরঙের ব্যবহার করেননি। কালোর পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন নীলের বিভিন্ন শেড। নীলের প্রাধান্য থাকায় বাকি রঙগুলিও সেই সুরেই বাঁধেন। রামধনুর সাতটি রঙের সঙ্গে সাদা মিশিয়ে যে অজস্র রঙ তৈরি হয় তারই ব্যবহারে সমৃদ্ধ হয় তাঁর নিসর্গচিত্রগুলো। তেল রঙের পরিবর্তে টেম্পেরার ব্যবহারে চিত্রগুলি সত্যিই বিস্ময় উদ্রেক করে। ছবিগুলি যে তেল রঙের নয় তা সহজে বোঝার উপায় থাকে না। নিসর্গচিত্রগুলি যামিনী রায়ের মুখ্য কীর্তির মধ্যে পড়ে না। তিনি নিজেও এই ছবিগুলিকে উৎকৃষ্টশ্রেণির বলে মানেন না। তবুও তৎকালীন সময়ে যাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁদের শিল্পকর্মগুলির তুলনায় যামিনী রায়ের এই পর্যায়ের ছবিগুলি অভিনব ও অনন্য।[১০১]

৩.২.৫ পয়েন্টিলিজমের প্রভাব

অন্যতম পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী জর্জ সোরা পয়েন্টিলিস্টিক চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনেন। তুলি ও রঙের অভিনব প্রয়োগে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। তিনি পুরো ক্যানভাসকে অসংখ্য বিন্দুখচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে বিন্যস্ত করে চিত্র বর্ণিত প্রতিটি উপাদানকে

আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক ও গৌণ রঙের সমাবেশ ঘটান। বিপরীতধর্মী রঙের বিন্দুগুলি পাশাপাশি ব্যবহৃত হওয়ার ফলে রঙ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি হয়।[১০২] যামিনী রায়ের ছবিতে পয়েন্টিলিজমের ব্যবহার দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের জমির উপর বিপরীতধর্মী রঙের বিন্দুর ব্যবহার তিনি করেছেন। নির্দিষ্ট রঙের বিন্দুগুলিকে সুসংহত ভাবে সাজানোর ফলে নির্দিষ্ট অবয়ব পেয়েছে। অবয়বগুলির পরিসীমায় ভিন্ন রঙের বিন্দু ব্যবহৃত হয়েছে আর অবয়বটিকে সীমায়িত করতে গতিশীল রেখার ব্যবহার করেছেন। এই ধরনের ছবির সঙ্গে পয়েন্টিলিস্টিক ছবির সামঞ্জস্য অবশ্যই রয়েছে, তবে এই ধরনের ছবি দেখে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লিখিত ছোট ছোট রঙিন পাথর দিয়ে চিত্র রচনার কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর কথা থেকে জানা যায় ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে বৈঠকখানায় যবার পথে রঙিন পাথর সংগ্রহ করতেন। পরে তাঁর বাবা যখন অন্য বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে মশগুল থাকতেন তখন তিনি বৈঠকখানার এককোণে বসে বিভিন্ন জীবজন্তু এঁকে সেই রঙিন পাথর দিয়ে সেগুলির গা রাঙিয়ে দিতেন। শৈশবের এই অভ্যাসের স্মৃতি হয়তো তাঁর পয়েন্টিলিস্টিক ছবি আঁকার পিছনে কাজ করতে পারে। একথা মনে করা প্রাসঙ্গিক কারণ যামিনী রায়ের শিল্পসৃষ্টিতে শৈশবের স্মৃতিই বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল।[১০৩] এছাড়া বাংলার মন্দিরে মাকড়া পাথরের ভাস্কর্যের মধ্যে থাকা বিন্দুর ধারণা তাঁর এই ধরনের ছবি আঁকার প্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে।

৩.২.৬ ফবিজমের প্রভাব

ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের পরে বিংশ শতাব্দীর যে দুজন শিল্পী তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখে গেছেন তাঁরা হলেন মাতিস ও পিকাসো। ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল একাডেমিক রীতির সমস্ত নিয়ম ও বিষয়কে মুছে ফেলা। তাই একাডেমিক রীতির রেখা, রঙ, পরিপ্রেক্ষিত ও সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা থেকে তাঁরা অনেক দূরে সরে আসেন। এই নিয়ে আধুনিকপন্থীদের সঙ্গে ঐতিহ্যপন্থীদের বিরোধ ছিলই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হল। আধুনিকপন্থীরা শিল্প বলতে কেবলমাত্র পশ্চিম ইউরোপের শিল্পকে বুঝলেন না। অন্যান্য দেশের শিল্প, গুহাচিত্র, এমনকি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সৃষ্টিকেও শিল্প পদবাচ্য বলে মনে করতে চাইলেন। শুদ্ধ সত্যের সন্ধানে মাতিস শিশুর মতো অবাধ স্বাধীনতার ছবি আঁকার পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেন। তিনি

চোখে দেখার স্বাভাবিক আকৃতিকে আঁকলেন না, স্বাভাবিক রঙও ব্যবহার করলেন না। বস্তুর প্রকৃত যা মাপ হওয়া উচিত তা না এঁকে ইচ্ছামতো বাড়িয়ে কমিয়ে এমনভাবে আঁকলেন যা বাইরের জগতের সঙ্গে বেমানান অথচ সুন্দর। মাতিসের এই দৃষ্টিভঙ্গি ফবিজমের জন্ম দেয়।[১০৪] যামিনী রায়ের মধ্যেও দেখা যায়। তিনিও শিশুর সরলতায় ছবিকে ভাবতে চান। তাঁর ছবির নরনারী, পশুপাখি স্বাভাবিক আকারের হয় না। অস্বাভাবিক মোটা পা, অসম্ভব লম্বা গলা, বিসদৃশ রকমের সরু কোমরয়ালা মানুষ আঁকেন। এছাড়া তাঁর আঁকা গরু, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ ইত্যাদি রূপকল্পিনায় ও বর্ণ ব্যবহারে শিশুর মতই সরল। কিন্তু মাতিস যেমন শিশুর মতো সরল হতে চাইলেও এলোমেলো হতে পারেন না তাঁর শিক্ষার গুণে যামিনীও তেমনি ভাবেই শিশুর বোধহীন জগতে স্থিতিলাভ করতে পারেন না। তাই তাঁর ছবিগুলিতে শেষ পর্যন্ত বৈদগ্ধ্য ও দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর ছবিতে সমতলধর্মী রঙ প্রকৃতিকে অতিক্রম করে কল্পনাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। বস্তুর অখণ্ড রূপ প্রকাশে তিনি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। এভাবেই যামিনী রায়ের ভাবনা ফবিস্ট শিল্পীদের সঙ্গে মিলে যায়। ফবিস্ট শিল্পী মাতিস যেমন শ্রমকাতর লোককে বিশ্রামের শান্তি দিতে চেয়েছিলেন, তেমনি যামিনী চেয়েছিলেন ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে। ‘এ আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়, এ প্রতিবাদে ভেঙে গড়ারই পরোক্ষ প্রেরণা’।[১০৫] ফবিস্ট শিল্পী আন্দ্রে দেঁরার (১৮৮০-১৯৫৪) প্রভাব যামিনী রায়ের নিসর্গচিত্রে দেখা যায়।[১০৬] প্রচলিত রঙ দিয়ে না দিয়ে অনুভূতির পরিবর্তনশীল রঙকে ব্যবহার করেন। চোখে দেখে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতে তাঁর মতই চাপ চাপ রঙ লাগান। এমনকি পোর্ট্রেট অঙ্কনের ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ ড্রয়ং করলেও রঙের ব্যবহার করেন ফবিস্ট শিল্পীদের মতই।

৩.২.৭ কিউবিজমের প্রভাব

কিউবিজম বিংশ শতাব্দীর শিল্প আন্দোলন হলেও এর প্রকৃত উদ্ভাবক ছিলেন সেজান। নানা আকারের নানা গড়ন, চাপ চাপ রঙের স্তর বিন্যাসে তাঁর ছবিতে তাঁর ছবিতে দৈঘ্য-প্রস্থ-গভীরতা এই তিনটি গুণই এসেছে বলেই কিউবিজমের জন্ম হয়েছে। কিউবিস্টরাই প্রথম দৃশ্যজগতের সঙ্গে ছবির জগতেকে একেবারে আলাদা করেদিলেন। এঁদের পুরোভাগে থাকা পিকাসো বস্তুর প্রকৃতরূপকে ত্যাগ করে চোখে দেখা দৃশ্যকে ভেঙেচুরে আবার গড়লেন। সেজানের মতো সমতল জ্যামিতিক আকার নিয়ে

সন্তুষ্ট না হয়ে ঘনকের বিভিন্ন তলকে সমতলে বিশ্লেষণ করে দেখালে যা হয় তাই করলেন। ফলে নাক মুখের একপাশে সরে গেল, চোখ মুখে তার স্বাভাবিক জায়গা পরিবর্তন করে বসল। মাথাটাও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। শুধু তাই নয় চোখ, নাক, মুখ, গোটা শরীরটাই ঘনকের বিভিন্ন তলকে নির্দেশ করতে থাকল। নাক হল প্রিজমের মতো, চোখ হল ত্রিকোণ, গাল দুটি হল গোলাকার ইত্যাদি। এর ফলে ছবি হয়ে উঠল বিমূর্ত।[১০৭] জ্যামিতিক আকার নিয়ে পরীক্ষার ফলে যামিনীর আঁকা গরুর মুখ ত্রিকোণ, চোখ দুটি পটলের মতো, শরীর আয়তাকার, অনেক সময় সেটিও স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক প্রসারিত হয়ে ওঠে। হাতি, ঘোড়া, বিড়াল বা বাঘ সবই যেন নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারে গড়া। মানুষের মুখাবয়ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কখনো ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, অর্ধ গোলাকার, বা শঙ্কু আকৃতির হয়ে থাকে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সময় কিউবিস্ট ধরনের ছবি আঁকছিলেন সেই সময় ইউরোপেরও কিউবিজমের চর্চা চলছিল। যামিনীর চিত্রে জ্যামিতিক রূপকল্পনায় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। তবে এঁদের দুজনের ছবির বিন্যাস স্পস্টতই আলাদা। কিন্তু কিউবিস্টধর্মী ছবি আঁকার পিছনে গগনেন্দ্রনাথের মনে যে নান্দনিক অনুভব জড়িয়ে থাকে যামিনীর ছবিও জ্যামিতিক গড়ন ব্যবহারে সমানভাবে নান্দনিক। আসলে যামিনীর এই রূপকল্পনায় থাকে লোকশিল্পের সরলতা। বস্তুর মূল গড়নকে অবিকৃত রেখে প্রকাশ করার মূলে থাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাবনা। যামিনী রায়ের বহুমুখী শিল্পচর্চা ও জ্ঞান দেখে বিষ্ণু দে তাঁকে পিকাসোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অস্টিন কোটস্ তাঁকে এশিয়ার পিকাসো নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বিখ্যাত চিত্রসমালোচক শোভন সোম যামিনী রায়কে পিকাসোর সমকক্ষ মনে করেন না। তাঁর মতে সমকালের সঙ্গে পিকাসোর যেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল যামিনী রায়ের তা ছিল না। পিকাসো সমকালীন প্রতিটি শিল্প আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। পিকাসোর ছবিতে স্পেনের গৃহযুদ্ধ, বঞ্চিত মানুষের আর্তনাদ, তাদের বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে তাঁর ছবিতে রীতিগত পরিবর্তন এসেছে। সেখানে যামিনী রায়ের চিত্রে সমকাল ও সমাজ উপেক্ষিত হয়েছে।[১০৮] তবে একথা মানতে হয় রূপের মৌলিক বিভাজন, রেখা ও উজ্জ্বল রঙের সমতলীয় বিন্যাস, পিকাসোর মতো যামিনী রায়ের ছবিতেও এসেছে।[১০৯] রঙের সমতলীয় ঐক্য অতি প্রাচীন শিল্পরীতিতে, এমনকি গুহাচিত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনে ফেরার তাগিদ পিকাসোর মধ্যে অন্যভাবেও দেখা যায়। তাঁর ছবিতে আদিম সংস্কৃতির

প্রভাব তাঁর ছবিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিগ্রো ভাস্কর্যের কাঠের পুতুলের গড়নকে কাজে লাগান। আফ্রিকান ব্রোঞ্জ মুখোসের মতো টেরা টেরা আঁচড় তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'দাভিনিয়ঁর-নারীরা'র (১৯০৭) নারীদের মুখে পড়েছে দেখা যায়। রূপকল্প নির্মাণে পিকাসো যেমন আদিম লোকশিল্পের দ্বারস্থ হন যামিনী রায়ও তাঁর নিজস্ব শৈলী নির্মাণকালে বিভিন্ন লোকশিল্প আঙ্গিককে বেছে নেন। বাংলার লোকশিল্পের সারল্যে প্রাগৈতহাসিক যুগের শিল্পের শুদ্ধ সত্যের সন্ধান পান। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে পিকাসোর ছবি আঙ্গিক হয়ে উঠল নিরলংকার সারল্যের পক্ষপাতী। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পিকাসো সহজ সরল আঙ্গিকের দ্বারা যুদ্ধের বিপরীতে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে চাইলেন বিশ্ববাসীর কাছে। যদিও তাঁর ছবিতে এসেছিল যুদ্ধ বিদ্ধস্ত সমাজের ছবি। যামিনী রায়ও এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শুদ্ধ আনন্দদান করতে চেয়েছিলেন। তবে যুদ্ধ, মহামারী, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ইত্যাদি সমাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অসুখীকর বিষয়গুলি ছবিতে দেগে দিয়ে সেগুলি থেকে মুক্তির বার্তা তিনি দেননি। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের কাটাছেঁরা যন্ত্রণাময় বিষয়গুলিকে বাদ দিয়ে সহজ-সরল রেখা, রঙ ও আঙ্গিকের ব্যবহারে দর্শকের মনে শান্তি দিতে চেয়েছেন।

৩.২.৮ বাইজেন্টাইন মোজাইক চিত্রকলার প্রভাব

যামিনী রায়ের চিত্রে পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অবসম্ভাবীভাবে এসে পড়ে বাইজেন্টাইন মোজাইক শিল্পের কথা। পাশ্চাত্য বিষয়বস্তু এবং পাশ্চাত্য রীতির মেলবন্ধন লক্ষ করা যায় বাইজেন্টাইন মোজাইক ধরনের চিত্রগুলিতে। বিষ্ণু দের লেখা থেকে জানা যায় এ সময় একটা বাইজেন্টাইন মোজাইকের বই তাঁর হাতে আসে।[১১০] খ্রিস্ট বিষয়ক কাহিনি নির্ভর ছবি আঁকার প্রেরণাও তিনি এই বইটি থেকেই পেয়ে থাকবেন। উল্লেখ্য যে বাইজেন্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তাঁদের শিল্পে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশ্ররূপ দেখতে পাওয়া যায়।[১১১] যামিনী রায় পাশ্চাত্যের এই মিশ্রশিল্প মাধ্যমটিকে গ্রহণ করে মিশ্ররূপটিকে আরো খানিকটা উন্নীত করেন। তাঁর বাইজেন্টাইন মোজাইক ধরনের খ্রিস্ট বিষয়ক ছবিগুলিতে দেখা যায় খ্রিস্ট উলম্বভাবে অবস্থান করছেন। কিন্তু দেহের মাপে তাঁর স্বকীয়তা লক্ষণীয়। শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় মাথা এবং গলা অনেকটা বড়, চিত্রপটের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে। মোজাইকের পরিকল্পিত ছকে ছবিকে বেঁধেছেন। মোজাইকের

চৌকো বুনটকে রূপ দিতে সমতল জমিতে ছোট ছোট রঙিন তুলির সারিবদ্ধ ছোপে মোজাইকের মেজাজ এনেছেন। বাইজেন্টাইন যুগের পরে গথিক যুগের শিল্পী জোত্তোর (?–১৩৩৭) চিত্রে খ্রিস্ট বিষয়ক কাহিনির নবরূপায়ণ দেখা যায়। বাইজেন্টাইন যুগের অভিব্যক্তিহীন ছবির বদলে তাতে দেখা যায় বেদনার্ত মানুষের মানসিক যন্ত্রণা ও পীড়নের অভিব্যক্তি। জোত্তো ও যামিনীর খ্রিস্ট বিষয়ক ছবি আঁকা সম্পর্কে শোভন সোম বলেন –

> বাইজেন্টাইন ছবির অবাস্তবতা ও রক্তহীন বর্ণসুষমার বদলে জোত্তো তুলে ধরেছিলেন ডৌল ও পরপ্রেক্ষিতসহ এক প্রত্যক্ষ অনুভবের জগৎ। কিন্তু বর্ণাঢ্য নকশার মোহে যামিনী রায় তাঁর ছবিতে সেই স্তরে উঠে আসতে পারেন নি। ...তাঁর ছবিতেও অবয়বগুলি বাইজেন্টাইন ছবির অবয়বের মতো মঞ্চের একই মাত্রায় দণ্ডায়মান, তাঁর ছবির রেখাও তেমনি মাপা মাপা, তাতেও রয়েছে একই বর্ণাঢ্যতা এবং তাঁর ছবিও একই রকম অভিব্যক্তিহীন।[১১২]

এই অভিযোগ সত্যি ভিত্তিহীন। কারণ যামিনী রায় সচেতনভাবেই তাঁর ছবি থেকে অভিব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখেন। নক্সার বিন্যাসে তাঁর ছবি দৃষ্টি নন্দন হয়ে ওঠে। ভাবাবেগহীনতা তাঁর ছবির লক্ষণ। তাই কেবলমাত্র বাইজেন্টাইন শৈলীতে আঁকা খ্রিস্ট বিষয়ক ছবিকে ভাবাবেগহীন বলে দেগে দেওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জোত্তোর অঙ্কন শৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গি যামিনীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। খ্রিস্ট বিষয়ক কাহিনি অবতারণার কারণে এই দুই ভিন্ন মেরুর শিল্পীর তুলনা টানা অপ্রাসঙ্গিক। তাছাড়া যামিনী রায় বাইজেন্টাইন শৈলীর ব্যবহার পাশ্চাত্য দেশীয় পুরাণকে রূপ দেবার জন্য ব্যবহার করেছেন তা নয়। এই রীতিতে খ্রিস্ট বিষয়ক চিত্র ছাড়াও অন্যান্য নানা বিষয়ের চিত্র এঁকেছেন। ছোপ ছোপ রঙ দিয়ে ছোট ছোট টালির ভাব এনে গোপিনী, গনেশ জননী, কৃষ্ণ বলরাম, কীর্তন, হাতি ইত্যাদি নানা ধরনের ছবি এঁকেছেন।[১১৩]

মোজাইক ধরনের ছবির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় তালপাতার চাটাই বা শীতলপাটিতে আঁকা ছবিতে। তিনি মোজাইকের চৌকো বিন্যাস বজায় রাখতে তালপাতা বা শীতলপাটির ব্যবহার করে থাকতে পারেন আবার উল্টোটাও হতে পারে। তালপাতার চৌকো বিন্যাসের অনুকরণ করেছেন সমতল জমিতে। যাই হয়ে থাকুক না কেন, তিনি হয়তো মোজাইকের টেক্সচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মোজাইকের চৌকো বুনটকে কাজে লাগিয়েছেন সার্থকভাবেই। এই ধরনের ছবিতে বর্ণিত বিষয়গুলি ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁধনে আবদ্ধ হয়েছে। গোটা ছবিটাকে একটি ফ্রেমে আবদ্ধ করেছেন। সেই ফ্রেম কখনো

হয়েছে রঙিন সমান্তরাল চওড়া রেখা দিয়ে, আবার কখনো হয়েছে কাঁথায় ব্যবহৃত মোটিফ দিয়ে। বাইজেন্টাইন মোজাইক শিল্পে ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ করা প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে ভারতীয় শিল্পেও ছবিকে ফ্রেমবন্দী করার প্রবণতা রয়েছে। যামিনী রায়ের আঁকা এই ধরনের চিত্রের ফ্রেমের বৈচিত্র্য দেখে মনে হয় তা যেন আসলে ভারতীয় সংস্কৃতির ফসল।

৩.২.৯ পাশ্চাত্য প্রভাব ও মূর্তিকলা

যামিনী রায় চিত্রও রচনা ছাড়াও বেশকিছু মাটি ও কাঠের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বেলিয়াতোড় গ্রামে থেকে কাঠখোদাই ও ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বেশ কিছু মূর্তি তিনি মাটিতে গড়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন বেলিয়াতোড়ের ছুতোর মিস্ত্রীরা পারিবারিক পরম্পরায় কাঠ দিয়ে বিশিষ্ট গড়নের পিলসুজ, পিড়ি, চৌকি, মুড়ি ভাজবার চেপটা টানা আকারের খুন্তি, গৃহদেবতার আসন, দরজায় খোদাই করা নক্সা, কাঠের বিভিন্ন ধরনের ফল, পালকি, রথ, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করতেন। তাঁদের তৈরি করা ব্যবহারিক, অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় অথবা খেলনা সামগ্রীগুলোর প্রতিটিতে আঙ্গিকের খোলাখুলি প্রকাশ, আকারের বিশেষত্ব অনুযায়ী কৌণিক যোজনা এবং জ্যামিতিক গঠন ছিল। শিল্পবিদ্যালয়ের মূর্তি শিক্ষার তালিম না নিয়ে মূর্তি নির্মাণের আঙ্গিক এবং শৈলীগত বিকাশে অসাধারণ প্রত্যয় তিনি পেয়েছিলেন গ্রামীণ কারিগরদের সান্নিধ্যে এবং ‘গ্রামমুখী সরল অন্তরঙ্গতা’য়। মূর্তি নির্মাণের জন্য মাটি তৈরি করে কাঠামোর উপরে মৃত্তিকা লেপনের কারসাজিতে কীভাবে পূর্ণ রূপাবয়ব নির্মিত হয় তা তাঁর পূর্বজ্ঞাত হলেও মূর্তিকার যামিনী রায় ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাঠের যে সকল মূর্তি তিনি রচনা করেছিলেন সেই সকল মূর্তি পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাসের পরিবর্তে উলম্ব (Vertical) রচনায় তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। স্তম্ভের মত আকারের কাঠ নির্বাচন করে বাটালির সাহায্যে কাঠের অনভীষ্ট অংশ কেটে কমিয়ে কল্পিত আকার বের করেন।[১১৪] যেহেতু লম্বাটে এবং গোলাকার গাছের গুঁড়ির টুকরো থেকে ভাস্কর্যগুলি নির্মাণ করেছেন তাই তাতে একটা উল্লম্বভাব বজায় রেখেছেন কাঠের ধর্মকে প্রাধান্য দিতে। মাটি দিয়ে গড়া মূর্তিগুলি গড়েছেন মাটির নমনীয়তার কথা মাথায় রেখে। কাঠের মূর্তিগুলোর তুলনায় আকৃতিতে ছোট হলেও সেগুলিতে ‘মনুমেন্টাল কোয়ালিটি’ বজায় রাকতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ভাস্কর্যগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল, মাথায় টুপি, মুখে সিগারেট নিয়ে সাহেব, টুপিওয়ালা সাহেব, দুহাত বুকের উপর রাখা পুরুষ, টোটেমের মতো গড়া অ্যাবস্ট্রাক্ট জ্যামিতিক মূর্তি।[১১৫] এছাড়া দু-একটি রচনায় বাংলার তিন কোণ বিশিষ্ট কাঠের পুতুলের গায়ের মত খাঁজ দেখতে পাওয়া যায়।[১১৬] মূর্তি নির্মাণের প্রেরণা তিনি পেয়ে থাকতে পারেন দেশ বিদেশের আদিবাসী লোক সমাজের শিল্পের নমুনা থেকে অথবা ইউরোপের Avant Garde[১১৭] ভাস্করদের তৈরি মূর্তি থেকে।[১১৮] ইউরোপের বাস্তববর্জনের যুগের ভাবনার মিল পাওয়া যায় যামিনী রায়ের মাটি ও কাঠের মূর্তিগুলির মধ্যে। ইউরোপে পিয়ের অগুস্ত রেনোয়া (১৮৪১–১৯১৯), আমেদেও মেদিগ্লিয়ানি (১৮৮৪–১৯২০), গগ্যাঁ, দেগা, মাতিস এবং পিকাসো মূর্তি গড়ার যে পরিসর রচনা করেছিলেন এদেশে যামিনী রায় তাকে দৃপ্তভাবে সামনে এনেছেন।[১১৯]

৩.৩ উপসংহার

নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় ভারতীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে প্রয়োজনবোধে বিদেশি শিল্পরীতিগুলিকে গ্রহণ করে পাশ্চাত্য বা নব্যবঙ্গীয়পন্থীদের গোঁড়া মানসিকতা থেকে ভারতশিল্পকে মুক্ত করেছেন। যুগের হাওয়া থেমে গেলেও তাই তাঁদের শিল্প অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিক্ষাগ্রহণ কালে সমগ্র প্রাচ্য শিল্পকে একসূত্রে বেঁধে রাখার মন্ত্র পেয়েছিলেন। সেই সময় বিদেশি মনীষীদের ভাবধারা ও শিল্পচর্চা তাঁর ভাবনা-চিন্তাকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে চিন-জাপান ভ্রমণ তাঁকে বৃহত্তর জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। প্রাচ্যদেশীয় গ্রন্থপাঠের ফলে তাঁর মধ্যে যে ধারণার উদয় হয়েছিল এই ভ্রমণে তাঁর সেই ধারণা পূর্ণতা পায়। চিন জাপান ছাড়াও ভারতের প্রতিবেশী দেশ যেমন, তিব্বত, নেপাল, সিংহল ইত্যাদি প্রাচ্য দেশের শিল্প সম্ভারকে গ্রহণ করেছেন। তিব্বতি টঙ্গা, নেপালি ও সিংহলি ভিত্তিচিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর *শিল্পচর্চা* গ্রন্থটিতে। এছাড়া তাঁর কথায় ও লেখায় নানাভাবে প্রাচ্য সংস্কৃতির নানা দিক উঠে এসেছে। ভারতশিল্পের মূল ধ্যানধারণা ও পদ্ধতির সঙ্গে তিনি অন্যান্য প্রাচ্যদেশের শিল্প-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছেন। তবে নন্দলালকে কেবলমাত্র প্রাচ্য সংস্কৃতি ঘেঁষা বললে ভুল করা হবে। বিংশ শতাব্দীতের পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবাহে তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের যা কিছু ভালো, যা ভারতশিল্পে নেই তাকে গ্রহণ করতে পিছপা হননি।

পাশ্চাত্য শিল্প সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্মক জ্ঞানের অধিকারী। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের তুলনা টানতে পেরেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় কোনটা কতটুকু গ্রহণ করলে তাঁর মানসিকতার অনুকূল হবে তা সহজেই স্থির করতে পেরেছেন। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প আঙ্গিকগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ইম্প্রেশনিজমকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে তাঁর। কিউবিজম, ফবিজম, এক্সপ্রেশনিজম ইত্যাদি আধুনিক শিল্প আন্দোলন যেগুলি রূপের বিকৃতি ঘটিয়েছে, সেগুলিকে মন থেকে সমর্থন জানাতে পারেননি। আধুনিক শিল্প আঙ্গিকগুলি ছাড়াও ইউরোপে সাবেক চিত্রকলার কোন কোন পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছেন। ইতালির ফ্রেস্কো পদ্ধতির অনুকরণে বহু ভিত্তিচিত্র অঙ্কন করেছেন। ইতালির ফ্রেস্কো পদ্ধতির নিয়মকানুন, সুবিধা অসুবিধা, সাবধানতা সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন। মধ্য প্রাচ্যের দেশ মিশরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁর স্বর্ণকুম্ভ নামক ছবিটিতে। জাভার বাটিক শিল্প নিয়েও নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সুতরাং নন্দলালের ছবিতে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। তাঁর শিল্প ও ভাবনাতে অন্যান্য দেশের শিল্প সংস্কৃতির আত্তীকরণ ঘটেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এতগুলি দেশের শিল্প সংস্কৃতি তাঁর ছবিতে মিশে থাকলেও ভারতীয়ত্ব কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

অন্যদিকে যামিনী রায় পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতিতে চিত্রচর্চা শুরু করলেও পরবর্তীকালে লোকশিল্পানুসারী নক্সাপ্রধান বিশুদ্ধ শিল্পরীতির দিকে ঝোঁকেন। এই ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটেনি। পাশ্চাত্য শিল্পচর্চা থেকে লোকশিল্প অভিমুখে যাত্রার মধ্যবর্তী পর্যায়ে তিনি ভারতীয় শৈলী ও পাশ্চাত্য শৈলী নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ছবিতে ফিগারের আঙ্গিক বা ফর্ম নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন। ইউরোপের আধুনিক শিল্প আন্দোলনগুলির মূলেও ছিল আঙ্গিকের সন্ধান; রঙ-রেখা-গড়ন সমস্ত দিক থেকেই বাস্তবের দেখা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা; একাডেমিক রীতির পরিপ্রেক্ষিত ও অ্যানাটমিকে নস্যাৎ করা। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের মূলে যে কথাগুলি বলা হচ্ছিল, যার সন্ধানে তাঁরা ইউরোপীয় শিল্পীরা ব্যাপ্ত ছিলেন যামিনী রায় বাংলার লোকশিল্পের মধ্যে তার সন্ধান পান। বাংলার পট, পুতুল, আলপনা, কাঁথা, টেরাকোটার যা আদিকাল থেকে চলে আসছিল তার সঙ্গে আধুনিক শিল্প আন্দোলনজাত লক্ষণগুলির মিল ছিল। বাংলার লোকশিল্পের যে লক্ষণগুলি সুপ্ত ছিল তাকেই উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে তিনি ভারতশিল্প উপযোগী নক্সাপ্রধান বিশুদ্ধ শিল্প গড়ে

তোলেন। আমাদের দেশের আলো বাতাস আর প্রকৃতি থেকে পাওয়া উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ আর আলপনা, কাঁথা ইত্যাদি কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতাজাত সংকেতবাহী বক্ররেখার সুগোল ডৌল হল তাঁর ছবির উপাদান।[১২০] সম্পূর্ণ বাস্তববর্জিত বিমূর্ত গুণযুক্ত আকার, সীমাসূচক রেখার ব্যবহার যা পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যামিনী রায়ের চিত্রে এই গুণগুলিও লক্ষ করা গেল। এখন প্রশ্ন আসতে পারে লোককলার অনুকরণে যামিনী রায়ের নিজস্বতা কোথায়? যদি তিনি লোককলাকেই কেবলমাত্র অনুকরণ করে থাকেন তবে কোথায় তিনি আধুনিক? এ প্রশ্নের উত্তরও পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের মধ্যে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। দেখা যায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা রূপকল্পনায়, রঙের ব্যবহারে সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মাতিস শিশুর মানসিকতা দিয়ে এঁকেছেন। কিন্তু এই রূপকল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ছিল। যামিনী রায় বাংলার লোককলা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তার সঙ্গে বিমূর্ত চেতনা যুক্ত হয়ে থাকলেও তা তাঁদের সচেতন সৃষ্টি ছিল না। যামিনী রায় লোকশিল্পের আঙ্গিকগুলিকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁর চিত্রকল্পনা ছিল তাঁর সচেতন মনের প্রয়াস। বাস্তববর্জিত আঙ্গিক গঠনে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্প যে বুদ্ধির দাবি করে যামিনী রায়ের সৃষ্টি সেই দাবি পূরণ করেন। তাঁকে লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবক কিংবা তিনি পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকারক মাত্র, এত সহজ সমীকরণে তাঁকে বেঁধে ফেলা যায় না। তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর শিল্পচেতনাকে বুঝতে হলে পাশ্চাত্য শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁকে যেমন দেখতে হয় আবার বাংলা তথা ভারতশিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই শিল্পভাবনা মিলেই যামিনী রায়। নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় দুজনেই ভারতের বাইরে অর্থাৎ অন্যান্য দেশ থেকে শিল্প রচনার রসদ সংগ্রহ করেছেন। একথা ঠিক যে নন্দলাল প্রাচ্য দেশ এবং যামিনী পাশ্চাত্য দেশের শিল্প শৈলী দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছে। তবে পাচ্য পাশ্চাত্যের মিশেলে তাঁরা যে আধুনিক ও অভিনব শিল্পশৈলী গড়ে তোলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। শিল্পরচনার ক্ষেত্রে এঁরা দুজনেই বিদেশি অনুষঙ্গগুলোকে গ্রহণ করলেও নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। বিদেশি শৈলীর আত্তীকরণ ঘটেছে গ্রহণ বর্জন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে। অন্ধ অনুকরণের মতো সংকীর্ণ মানসিকতার ঊর্দ্ধে উঠেছে তাঁদের ছবি ও শিল্পভাবনা।

উৎস ও অনুষঙ্গ

১। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। দুগার, ইন্দ্র। 'রূপপতি নন্দলাল'। *মাস্টারমশাই নন্দলাল*। পৃ. ৫৮

২। অতুল বসু – অতুল বসু বিদেশের রয়্যাল আকাডেমিতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিমদেশীয় শিল্প আন্দোলনগুলির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বেঙ্গল স্কুলের বিপক্ষে গড়ে ওঠা পাশ্চাত্য রীতিতে বিশ্বাসী গোষ্ঠীগুলিতে তিনি যোগদান করেন। দ্রষ্টব্য: দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। *শিল্প ও শিল্পী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক। পৃ. ৩৯২

৩। রিয়েলিজম – রিয়েলিজম বলতে সাধারণত বাস্তববাদী রীতিকে বোঝায়। রোমান্টিসিজমের ভাবাবেগ ও কল্পনার বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই শিল্পরীতিটি গড়ে ওঠে। এই ধারার শিল্পীরা সমকালীন সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ, আদিম আচরণগুলিকে কেন্দ্র করে চিত্ররচনা করেন। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। *শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ৪৯৪

৪। ইম্প্রেশনিজম – শিল্পী ক্লদ মনের (১৮৪০–১৯২৬) চিত্র 'Impression Sunrise' থেকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইম্প্রেশনিজম কথাটি প্রচলিত হয়। এই সময় যে সমস্ত শিল্পী ঘটনার বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দিয়ে কোন দৃশ্যপট থেকে প্রাপ্ত দৃশ্যপ্রভাবকে তুলে ধরে ছবি এঁকেছেন, তাঁদের ছবিই ইম্প্রেশিজমের অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে। এই ধরনের ছবিতে বাস্তব বস্তু বা দৃশ্য শিল্পীর অনুভূতি, চিন্তা চেতনা মিশ্রিত হয়ে আলো ও রঙের অভিনব প্রয়োগের মাধ্যমে চিত্রিত হয়। দ্রষ্টব্য: Read, Herbert (1985). Art and Artist. London: Thames and Hudson. P. 170–171

৫। পোস্ট ইম্প্রেশনিজম – ইম্প্রেশনিজমের চেয়ে আরো গভীর, শাশ্বত, গুরুত্বপূর্ণ চিত্ররচনার বাসনায় পল্ সেজান্ (১৮৩৯–১৯০৬) চিত্রকলায় যে রীতির জন্ম দিলেন তাকে পোস্ট ইম্প্রেশনিজম বলা হয়। এই রীতিতে বাহ্যাড়ম্বরের থেকে ছবিতে বস্তুর ঘনত্ব, ওজন, অস্থিমজ্জা বা কঙ্কালের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্রষ্টব্য: মিত্র, অশোক (১৯৮৮)। *পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ১৭৭–১৭৮

৬। কিউবিজম – মানুষের মুখের দিকে তাকালে দেখা য়ায় মুখটি অসংখ্য জ্যামিতিক তলে বিভক্ত। নাকের দুধার থেকে দেখলে তাকে যেমন ত্রিভুজের মতো মনে হয়, আলাদা ভাবে নাককে পিরামিড, কপালকে আয়তক্ষেত্র ইত্যাদি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে সমগ্র দেহ, বসনভূষণ, আসবাবপত্র, গৃহ, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকেই জ্যামিতিক তলের সাহায্যে চিত্রিত করা যেতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গৃহীত চিত্ররীতিকে কিউবিজম বলে। এই রীতির শিল্পীকে জ্যামিতির অন্যান্য আকারের থেকে ঘন আকৃতি বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। দ্রষ্টব্য: দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮৩)। *শিল্প ও শিল্পী*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক। পৃ. ৩০৯

৭। পয়েন্টিলিজম – ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পয়েন্টিলিজমের ধারণা গড়ে ওঠে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্যালেটে রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে বর্ণক্রম তৈরির পরিবর্তে বিভিন্ন রঙের বিন্দু বা ফোঁটাকে পাশাপাশি বা একটার উপর আরেকটা এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করে চিত্রও রচনা করা হয় যাতে বিভিন্ন রঙের বিন্দুগুলি দৃশ্যত মিশে ইপ্সিত ফলাফল তৈরি করে।

এইভাবে সমগ্র চিত্রপটকে ছোট ছোট বিন্দুতে বিভক্ত করে ফেলআ হত বলে এর নাম ডিভিশনিজম বা পয়েন্টিলিজম। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১৯

৮। ফবিজম – ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মাতিস (১৮৬৯–১৯৫৪) স্বতস্ফূর্ত রঙের প্রলেপে ফবিজমের জন্ম দেন। অবিমিশ্র নীল ও কমলা রঙের প্রাচুর্যে বিস্ময়কর এই চিত্রপদ্ধতিটি নির্মিত হয়। মাত্র তিন বছর এই চিত্র রীতিটি স্থায়ী হয়। দ্রষ্টব্য: আহসান, সৈয়দ আলী (২০০২)। *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ*। ঢাকা: বইপত্র। পৃ. ১৩৯

৯। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। *নন্দলাল*। কলকাতা: দেশ। পৃ. ৫৮–৫৯

১০। Still life – কোন স্থির বস্তু বা নির্জীব বস্তুর পরিকল্পনামাফিক চিত্রাঙ্কন। স্থির চিত্র অঙ্কনের সময় আঙ্গিকগত দিক থেকে বস্তুর আকৃতি বা গড়ন, চরিত্র, ত্বক, ভঙ্গিমা, ছন্দ, আলোছায়ার মাত্রা, রঙ ও রঙের নানা মাত্রা টান টোন ইত্যাদি অনুশীলন করতে হয়। বস্তুগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে আই-লেভেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাজাতে হয়। স্থিরচিত্র অনুশীলনে বস্তুর প্রেক্ষাপটে অনেক সময় কাপড়ের পর্দা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্রষ্টব্য: চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। *শিল্পের ব্যাকরণ*। মুর্শিদাবাদ: বাসভূমি প্রকাশন। পৃ. ৩৮

১১। মিত্র, অশোক (১৯৮৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭২

১২। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬১

১৩। বসু, নন্দলাল (১৪২৪)। দত্ত, অম্লান ও সুব্রহ্মণ্যন্, কল্পাতি গণপতি (সম্পাদিত)। *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। পৃ. ২০৫

১৪। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। পাল, রবি। 'প্রাচ্য সফরে নন্দলালের ভাবনা'। *দেশ*। পৃ. ১৮২

১৫। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। চক্রবর্তী, কাঞ্চন (সম্পাদিত)। *চিত্রকথা*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী। পৃ. ২৬৩

১৬। পোয়ে – মায়ানমারের শস্ত্রীয় নৃত্য-নাটক হল পোয়ে। বৌদ্ধ জাতক এবং বার্মিজ ঐতিহাসিক কাহিনি এই নৃত্য নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়। https://disco.teak.fi/asis/zat-pwe-the-burmese-dance-drama/. Last accessed – 11.11.2013

১৭। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। পাল, রবি। 'প্রাচ্য সফরে নন্দলালের ভাবনা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮২

১৮। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৩)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। দ্বিতীয় খণ্ড। বীরভূম: রাঢ় গবেষণা পর্ষদ। পৃ. ১৭৭–১৮০

১৯। ট্রাপিস্ট্রি – ট্রাপিস্ট্রি হল নক্সাকার ও তাঁতিদের যৌথ উদ্যোগে উল, সিল্ক বা দুটো মিশিয়েই তৈরি তাঁতে বোনা এক ধরনের ছবি। সাধারণত রিপিটিশন সম্পন্ন আলংকারিক নক্সা এতে থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফিগারেটিভ দৃশ্য চিত্রিত থাকে। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০৬

২০। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৯

২১। বসু, নন্দলাল (১৪২৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৩-২৫৬

২২। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৫

২৩। রায়, মীরা (১৯৯৫)। *নন্দলাল: জীবন ও শিল্প*। বার্ণপুর: উদয়াচল সাহিত্য পরিষদ। পৃ. ১৯২-১৯৩

২৪। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৬

২৫। বসু, নন্দলাল (১৩৩২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯৩

২৬। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯৩

২৭। চৌধুরী, সত্যজিৎ (১৪১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১০

২৮। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৪২৪)। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*। নবম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন। পৃ. ১৮৫

২৯। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। *শিল্পকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ২৫-২৮

৩০। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮০

৩১। বসু, নন্দলাল (১৩৩২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৫

৩২। বসু, নন্দলাল (১৩৩২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৫)

৩৩। কৌশিক, দিনকর (১৯৯৫)। সোম, শোভন (অনুবাদিত)। *নন্দলাল বসু ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*। কলকাতা: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া। পৃ. ৫২-৫৩

৩৪। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০৪

৩৫। Okakura, Kakuzo (1920). *The Ideals of the East.* New York: E. P. Dutton And Company. P. 1

৩৬। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৯-৯২

৩৭। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। প্রথম খণ্ড। বীরভূম: রাঢ় গবেষণা পর্ষদ। পৃ. ১৭৯-১৮০

৩৮। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। কর চিন্তামণি। 'নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যে-স্মৃতি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২২

৩৯। রায়, মীরা (১৯৯৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৬

৪০। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪২২

৪১। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৯

৪২। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। পাল, রবি। 'প্রাচ্য সফরে নন্দলালের ভাবনা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৮

৪৩। অধিকারী, সুশোভন (২০১৬)। দেববর্মা, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। 'শিল্পাচার্য'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৬

৪৪। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০২

৪৫। হাইকু – 'হাইকু' শব্দটি ১৮৯০ খিস্টাব্দ নাগাদ মাসাওকা শিকি নামে একজন জাপানি কবি প্রবর্তন করেন। হাইকু বলতে একভাব-সংবলিত তিন পঙ্‌ক্তির জাপানি কবিতাকে বোঝানো হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইমোজিস্ট কবিরা অনেকেই তাঁদের কবিতায় হাইকুর ভাবয়ানুকরণের চেষ্টা করেন। দ্রষ্টব্য: বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (১৯৯৯)। *সাহিত্যের শব্দার্থকোশ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ১১১–১১২

৪৬। ভট্টাচার্য, তপন (২০০৭)। শিল্প ও শিল্পী ভাবনা। কলকাতা: উর্বী প্রকাশন। পৃ. ৪৮

৪৭। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৩–১০৪

৪৮। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। চক্রবর্তী, কাঞ্চন (সম্পাদিত)। *চিত্রকথা*। কলকাতা: অরুণা। পৃ. ২৭২–২৭৩

৪৯। বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১০৪

৫০। আহসান, সৈয়দ আলী (২০০২)। *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ*। ঢাকা: বইপত্র। পৃ. ১২০

৫১। দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮৪

৫২। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৯

৫৩। সিম্বলিজম – ১৯৮০–১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে মূলত ফ্রান্সে সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে এই শিল্প আন্দোলন প্রসারিত হয়। সিম্বলিজমের মূর্তিরূপ কখনোই যথার্থভাবে ধারণা এবং আবেগের সমতুল্য প্রতিমূর্তি নয়, বরং তা একটু দ্ব্যর্থ্যকভাবে এর কথাকে ফুটিয়ে তোলে। সিম্বলিস্টদের শিল্পকর্মে ঘুরেফিরে এসেছে স্বপ্নের প্রসঙ্গ। স্বপ্নের শিল্পরূপের প্রতি দায় ও আবেগ এঁদের চিত্র ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে দঁড়ায়। লক্ষণীয় বিষয় হল এইআন্দোলনে ছিল বিষয়গত, আঙ্গিকগত নয়। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৬৯–৫৭১

৫৪। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৯

৫৫। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৬

৫৬। গুপ্ত, মনীন্দ্র (২০১৬)। *রং কাঁকর রামকিঙ্কর*। কলকাতা: অবভাস। পৃ. ৭৮

৫৭। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। বেইজ, রামকিঙ্কর। 'আচার্যদেব নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২২২

৫৮। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৯

৫৯। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৬

৬০। গুপ্ত, মনীন্দ্র (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৮

৬১। অধিকারী, সুশোভন (২০১৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। 'গুরু স্মরণ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭২

৬২। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৬

৬৩। মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ (সম্পাদিত, ১৯৭২)। *যুগান্তর সাময়িকী*। ১৫ ফেব্রুয়ারি। পৃ. ৮

৬৪। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, অতুল। ''যামিনী রায়'। *রূপতাপস যামিনী রায়* । কলকাতা: প্রতিভাস। পৃ. ৬৯

৬৫। ন্যাচারালিজম – দৃশ্যমান বস্তুকে অবিকল চিত্ররূপদান কে ন্যাচারালিজম বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এই রীতির শিল্পচর্চার প্রচলন ছিল। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৫

৬৬। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬৪

৬৭। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। *সাধক-শিল্পী যামিনী রায়*। কলকাতা: বাংলার আভাষ। পৃ. ২১

৬৮। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭

৬৯। Ghosh, Anuradha (2022). *Jamini Roy*. New Delhi: Niyogi Books. P. 26

৭০। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। *যামিনী রায়: তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক*। কলকাতা: আশা প্রকাশনী। পৃ. ৩৯

৭১। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬

৭২। Ghosh, Anuradha (2022). Ibid. P. 30

৭৩। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, অতুল। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬১

৭৪। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। চক্রবর্তী, পূর্ণ। 'যামিনীদা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯০

৭৫। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, অতুল। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬১

৭৬। Ghosh, Anuradha (2022). Ibid. P. 31

৭৭। Ibid. P. 31–33

৭৮। মিত্র, অশোক (১৯৯৪)। *বাংলার চিত্রকলা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি। পৃ. ১৪৭

৭৯। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১৪

৮০। দাঁ, প্রশান্ত (২০০৫)। নন্দী, সুধীর। 'শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকলা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৬

৮১। মল্লিক, সঞ্জয়কুমার (২০১৪)। *যামিনী রায়*। কলকাতা: রাজ্য চারুকলা পর্ষদ। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯

৮২। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৫

৮৩। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। ভেঙ্কটচলম, জি.। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮০

৮৪। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায় সুমনা (সম্পাদিত)। দত্ত, অজিতকুমার। 'যামিনী রায়'। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৫১

৮৫। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। কোটস, অস্টিন। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। ২০৩

৮৬। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬০

৮৭। মল্লিক, সঞ্জয়কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯

৮৮। বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১১)। *যামিনী রায় শ্রদ্ধার্ঘ্য*। কলকাতা: সুতানটি বইমেলা। পৃ. ৪৪

৮৯। মল্লিক, সঞ্জয়কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯

৯০। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪

৯১। Ghosh, Anuradha (2022). Ibid. P. 32

৯২। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬১–৬২

৯৩। মজুমদার, লীলাময় (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১৪

৯৪। কন্ট্রাপস্ট্রো – কন্ট্রাপস্ট্রোর অর্থ হল বিপরীতভাবে রাখা। এই শৈলীতে মানুষের শরীরকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে নিতম্ব, কাঁধ, মাথা, ভিন্নভিন্ন মুখে বাঁক নেয়। ক্লাসিকাল গ্রিক ভাস্কর্যের ভঙ্গিমার কাঠিন্যকে হ্রাস করতে এই শৈলীর প্রবর্তন হয়। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯১

৯৫। Ghosh, Anuradha (2022). Ibid. P. 91–92

৯৬।দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, বুদ্ধদেব। 'ধন্য যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২০

৯৭। মিত্র, অশোক (১৯৫৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮২

৯৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮০–১৮১

৯৯। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। রায়, প্রণবরঞ্জন। 'যামিনী রায়ের ছবির ঠিকানা'। *দেশ*। পৃ. ৪৩– ৪৪

১০০। মল্লিক, সঞ্জয়কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪

১০১। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩২-৩৩

১০২। https://www.britannica.com/biography/Georges-Seurat

১০৩। মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ (সম্পাদিত, ১৯৮৫)। পূর্বোক্ত।

১০৪। মিত্র, অশোক (১৯৫৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩–১৪

১০৫। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০

১০৬। Ghosh, Anuradha (2022). Ibid. P. 91–92

১০৭। মিত্র, অশোক (১৯৫৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৫–১৮৯

১০৮। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ২০১৭)। সোম, শোভন। 'যামিনী রায়ের ছবি: রীতি ও তাৎপর্য'। *যামিনী রায় পত্রাবলী ও প্রবন্ধ*। পৃ. ১২৪–১২৫

১০৯। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৬

১১০। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪২

১১১। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। পৃ. ২০১

১১২। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ২০১৭)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১০–১২৬

১১৩। Ghosh, Anuradha (2022). Ibid. P. 97–98

১১৪। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত,২০০৫)। চক্রবর্তী, অজিত। 'মূর্তিকার যামিনী রায়, শতবর্ষ-আলোচনা'। পূর্বোক্ত। পৃ-২১০–২১৪

১১৫। ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত, ১৯৮৭)। সেন পরিতোষ। 'যামিনী রায়ের চিত্রকলা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩

১১৬। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত,২০০৫)। চক্রবর্তী, অজিত। 'মূর্তিকার যামিনী রায়, শতবর্ষ-আলোচনা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১০

১১৭। Avant-Garde – বাস্তবধর্মী কাজের বিপরীতে নতুন ধরণের সৃজনশীল শিল্পভাবনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুর্জোয়া সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিপরীতে গড়ে ওঠা শিল্পভাবনা। আমেরিকায় এই ধারণাটি গড়ে ওঠে এবং বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। আধুনিকপন্থী শিল্পভাবনার সঙ্গে এই ধারণাটি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।
See: Murphy, Richard (1999). Theories of the Avant-Garde: Modernism, Expressionism, and the Problem of Postmodernity. P. 9.
http://assets.cambridge.org/97805216/48691/excerpt/978052164891_excerpt.pdf

১১৮। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। সেন, পরিতোষ। 'যামিনী রায়ের চিত্রকলা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩

১১৯। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। চক্রবর্তী, অজিত। 'মূর্তিকার যামিনী রায়, শতবর্ষ আলোচনা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০৯

১২০। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। রায়, প্রণবরঞ্জন। *যামিনী রায়ের ছবির ঠিকানা*। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪

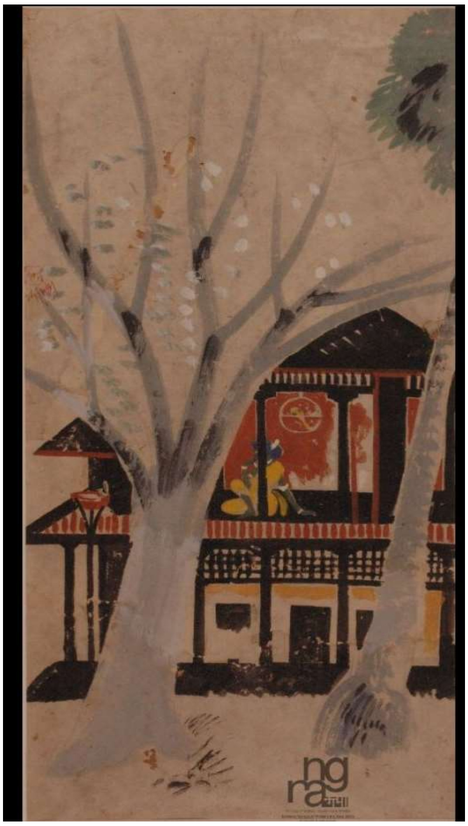

চিত্র ১: মধ্যাহ্ন স্বপ্ন, নন্দলাল বসু

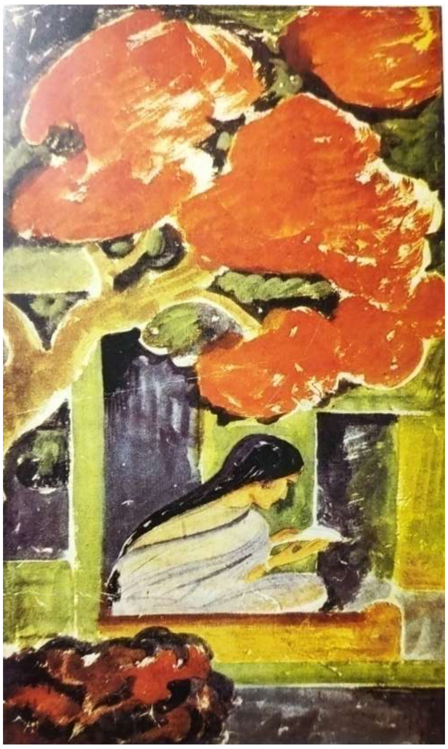

চিত্র ২: বসন্ত, নন্দলাল বসু

চিত্র ৩: শরপাতি রেখা, নন্দলাল বসু

চিত্র ৪: আগুনের হলকা

চিত্র ৫: ড্রাগনের পাঞ্জা

চিত্র ৬: মোরগ, নন্দলাল বসু

চিত্র ৭: গোপালপুরের দৃশ্য, নন্দলাল বসু

চিত্র ৮: Devine Moment, যামিনী রায়

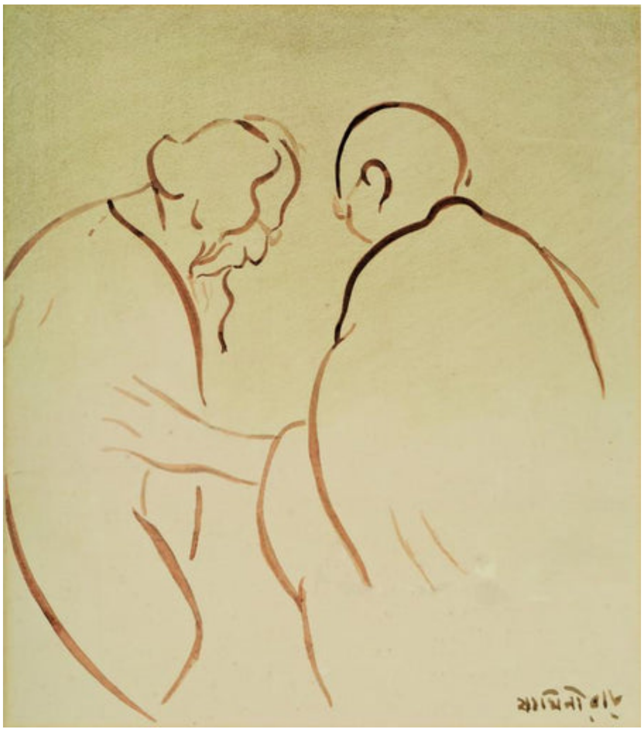

চিত্র ৯: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতি, যামিনী রায়

চিত্র ১০: কৃষ্ণ ও বলরাম, যামিনী রায়

চিত্র ১১: ভ্যানগগ, যামিনী রায়

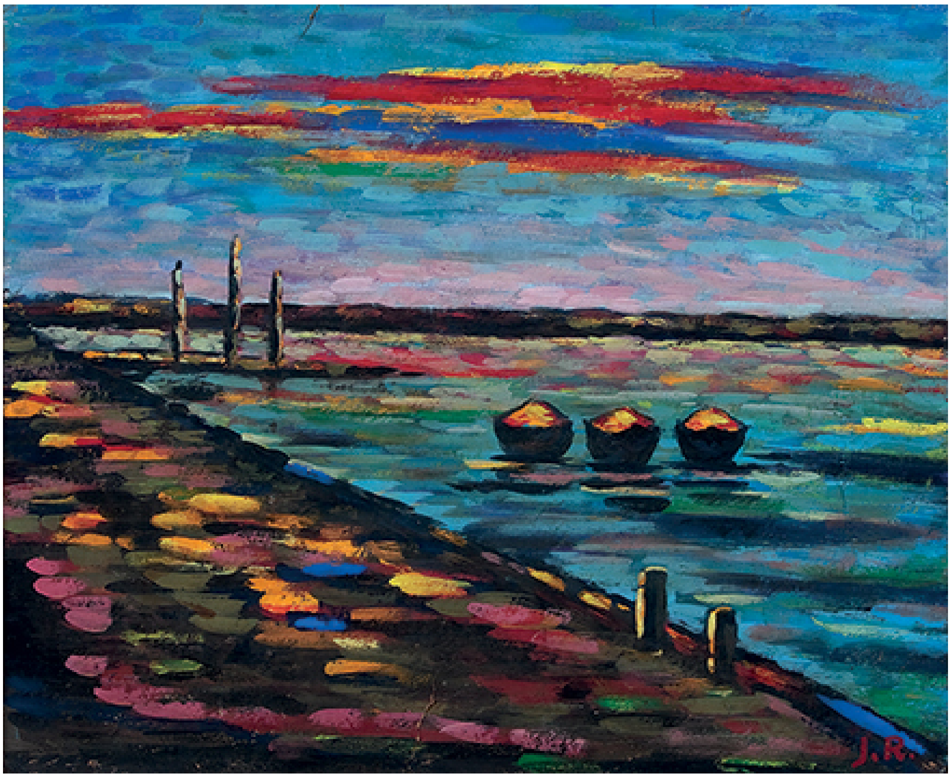

চিত্র ১২: নৌকার সারি, যামিনী রায়

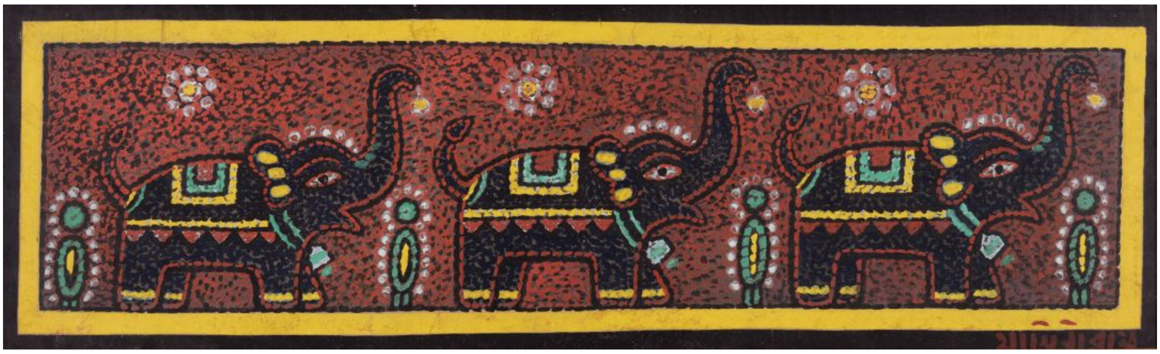

চিত্র ১৩: হাতির দল, যামিনী রায়

চিত্র ১৪: মানুষ ও পাখি, যামিনী রায়

চিত্র ১৫: স্কেচ, যামিনী রায়

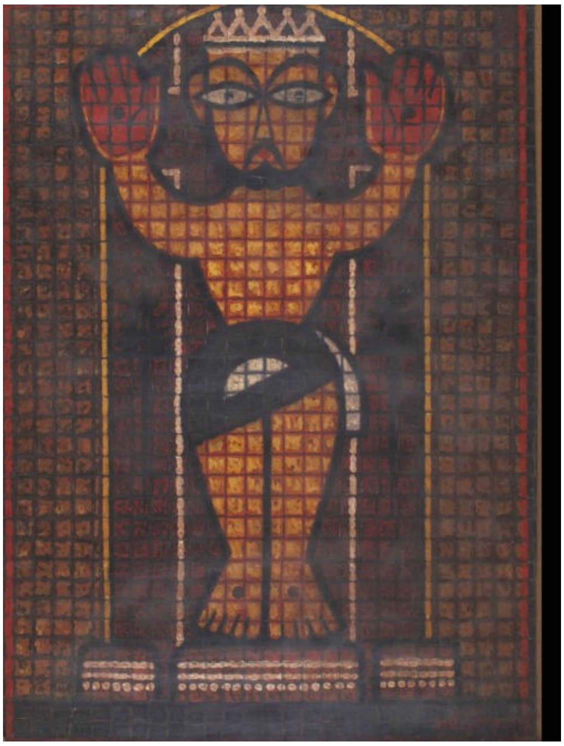

চিত্র ১৬: ক্রুশবিদ্ধ যিশু, যামিনী রায়

চিত্র ১৭: ভাস্কর্য, যামিনী রায়

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র-সাহিত্য: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

৪.০ ভূমিকা

শব্দ ও চিত্রের সম্পর্ক যেমন, সাহিত্য ও চিত্রের সম্পর্কও তেমন। চিত্র ও সাহিত্য দুটি ভিন্ন শিল্প মাধ্যম, ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও এই দুই শিল্প মাধ্যম পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাহিত্য পাঠ কালে বা শ্রবণকালে আমাদের সকলের মনেই সেই সংক্রান্ত একটি চিত্র উদ্ভাসিত হয়। সাধারণ পাঠকের প্রকাশ দক্ষতার অভাবে মনের মধ্যে তৈরি হওয়া সেইসব চিত্র মনের অন্তরালেই থেকে যায়। দক্ষ শিল্পী সেই মানসচিত্রের রূপায়ণে সক্ষম হন। শিল্পবস্তুটি অবশ্যই সাহিত্য পাঠে শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির ফসল। সেখানে শব্দ বিশ্লেষণের কোন দায় শিল্পীর থাকে না। তাই সেই চিত্রটিকে কখনই সাহিত্যটির আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায় না। সেটিকে সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণায় শিল্পসৃষ্টি বলা যেতে পারে। অনেক সময়ই সেটি শিল্পীর স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে ওঠে। আবার চিত্রশিল্পীর অমোঘ সৃষ্টি সাহিত্যিকের সংবেদনশীল মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নির্দিষ্ট চিত্র, চিত্রশিল্পী বা সেই শিল্পীর শিল্পতত্ত্ব ও দর্শনের সুতীব্র আকর্ষণে রচিত হয় সাহিত্য। দুই সৃজনশীল শিল্প মাধ্যমের পরস্পরমুখী আদান প্রদান চলতে থাকে। চিত্রশিল্প ও সাহিত্যের নিবিড় সান্নিধ্য প্রত্যক্ষ করা যায় সচিত্র গ্রন্থ ও গ্রন্থের প্রচ্ছদে। সাহিত্যভাষাকে চিত্রভাষায় রূপান্তরিত করার প্রথা বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে। সাহিত্য অবলম্বন করে যুগ যুগ ধরে ছবি আঁকারপ্রমাণ গুহাচিত্র, প্রাচীন পুঁথি ও পাটাচিত্রগুলি থেকে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বটতলার ছাপাখানাগুলির হাতধরে পুস্তক সচিত্রকরণের ধারাটি মুদ্রণযন্ত্রের ছোঁয়া পায়। এরপর বটতলার ছাপাখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেলেও বিংশ শতাব্দীতে পুস্তক সচিত্রকরণের মধ্যে বৈচিত্র্য আসে। নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় প্রচ্ছদ শিল্পকে অন্য মাত্রা দান করেন।

চিত্রশিল্পী সাহিত্যিক নন, সাহিত্য রচনা তাঁদের মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সাহিত্য জগতের সঙ্গে তাঁদের নানা দিক থেকে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কাব্য, নাটক, সংগীত প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব

পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের শিল্পচেতনায় সংরূপগুলি নতুন মাত্রা পায়। অক্ষয়কুমার মৈত্র 'ভারত শিল্পের ইতিহাস' প্রবন্ধে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকে সাহিত্য বলে গণ্য করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি এই সম্পর্কে যা বলেন তা উদ্ধারযোগ্য –

> যে উপায়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহাকেই 'ভাষা' বলিতে হইলে, চিত্রকে ও ভাস্কর্য্যকে ভাষা বলিতে ইতস্ততঃ করিব কেন? তাহারও ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, ছন্দ আছে, যতি আছে, অলংকার শাস্ত্র আছে- তাহাকেও এক শ্রেণীর কাব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার মধ্যে পুরাকালের কত ভাব, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত শিক্ষা, কত লোকচরিত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে, ইতিহাস সংকলিত হইবে কি করিয়া?[১]

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। তারপর থেকে চিত্রশিল্পী, চিত্রসমালোচক ও চিত্রপ্রেমী সাহিত্যিকগণ এই ধারাটিকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন। চিত্রকলাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন ধারায় সংযোজন ঘটে তাকে চিত্র–সাহিত্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই ধারার বহু রচয়িতার মধ্যে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় স্মরণীয়। তাঁদের চিঠিপত্রগুলি গভীর মনন ও শিল্পদর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র বিষয়ে মতাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমনের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এইগুলির স্বতন্ত্র ভাষাভঙ্গি পত্রসাহিত্যের এক মূল্যবান সামগ্রী হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

৪.১ গ্রন্থ অলংকরণ ও প্রচ্ছদ ভাবনা

৪.১.১. নন্দলাল বসু

ক. রবীন্দ্র গ্রন্থ অলংকরণ ও প্রচ্ছদ

নন্দলাল বসু সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ অলংকরণ ও প্রচ্ছদ রচনা করেন। এই দুই যুগপুরুষের পারস্পরিক বিনিময়ে গ্রন্থচিত্রণে এক নবযুগের সূচনা হয়। কবির সৃষ্টির প্রেক্ষিতে শিল্পীর তুলি যেমন রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, তেমনি শিল্পীর সৃষ্টি মাহাত্ম্যে কবি ধরেছেন কলম। নন্দলাল বসুর 'তারা' এবং 'সাবিত্রী ও যম'-এর চিত্র দুটি দেখে তাঁকে দিয়ে গ্রন্থচিত্রণের পরিকল্পনা কবির মনে আসে। ছবি দুটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ দেখেন। এরপর অবনীন্দ্রনাথ প্রেরিত

এক সাধুর পূজার জন্য নন্দলাল বসু তারামূর্তি এঁকে দিলে সেই ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে জোড়াসঁকোয় ডেকে পাঠান। সেই প্রথম পরিচয় সম্পর্কে নন্দলাল স্মৃতিচারণায় বলেছেন –

> কবি বললেন, ...তোমাকে এখন আমার কবিতার বই (চয়নিকা, ১৯০৯, ১৩১৬) ইলাস্‌ট্রেট করতে হবে'। ...বলে, তিনি তাঁর চয়নিকার কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন, - 'পরশ পাথর', 'ঝুলন', 'মরণ মিলন' – এইসব কবিতা। ...তাঁর পড়বার ভঙ্গিতেই আমার মনে যেন নানা ছবি বসতে লাগল।[২]

চয়নিকা-র প্রথম সংস্করণে (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার সঙ্গে নন্দলাল বসুর আঁকা মোট সাতটি ছবি প্রকাশিত হয়। ছবিগুলির নাম – ক) 'কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া', খ) 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে', গ) 'যদি মরণ লভিতে চাও এসে তবে ঝাঁপ দাও', ঘ) 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর', ঙ) 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ' (শিবতাণ্ডব), চ) 'ভূমির পরে জানু গাড়ি তুলি ধনুঃশর' (নকলবুঁদি), ছ) 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিন শেষের শেষ খেয়ায়'।[৩] এই সাতটি ছবির মধ্যে 'শিবতাণ্ডব' (হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নকলগড়' কবিতা অবলম্বনে 'নকলবুঁদি' (ভূমির পরে জানু গাড়ি তুলি ধনুঃশ্বর) ছবি দুটি নন্দলালের আগে আঁকা। রবীন্দ্র কবিতার অনুপ্রেরণার আঁকা 'নকলবুঁদি' তাঁর প্রথম ছবি। বাকি পাঁচটি চিত্র কবির মুখে স্বরচিত কবিতা শুনে তার ভাবচিত্রায়ণ। *চয়নিকা* প্রথম সংস্করণে নন্দলাল বসুর ছবিসমেত প্রকাশ পেলেও ১৩২৪ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ছবিগুলির প্রিন্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসন্তুষ্টতা প্রভৃতি একাধিক কারণেছবিগুলি বাদ দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে কবি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮৭৭-১৯৩৮) চিঠি (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯) লিখে জানান – 'নন্দলালের পটে যে রকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না'।[৪]

নন্দলালকৃত রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্র*-র (১৯১২) প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে সবুজের ওপর সোনার রঙে এম্‌ব্‌স করা পদ্মফুলের পাপড়ি খসার ছবির[৫] স্থানে বর্তমানে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত সংস্করণগুলিতে মেটে হলদে রঙের উপর খয়েরি রঙের ছবি দেখা যায়। *জীবনস্মৃতি*-র (১৯১২) প্রচ্ছদেও *ছিন্নপত্রে*-র প্রচ্ছদের জন্য নন্দলাল কৃত ছবিটি ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি (*সাধনা,* অগ্রহায়ণ ১২৯৯) পত্রিকায় 'The Cabuliwallah' (*Modern Review*, জানুয়ারি

১৯১২) নামে সিস্টার নিবেদিতার অনুবাদে ও নন্দলাল বসুর কাবুলিওয়ালা ও মিনি ছবিটি প্রকাশিত হয়। পরে *প্রবাসী* (শ্রাবণ ১৩১৯) সংখ্যায় ছবিটি ছাপা হয়।[৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *The Crescent Moon* (১৯১৩) গ্রন্থটিতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অসিতকুমার হালদারের আঁকা ছবির সঙ্গে নন্দলাল বসুর দুটি ছবি সংকলিত হয়। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রথম ছবি 'The Home' 'শৈশব-সন্ধ্যা' কবিতার চিত্ররূপ–একটি শিশু তার খেলনা ফেলে রেখে মায়ের কাঁধে চেপে রয়েছে। দ্বিতীয় ছবি 'The Hero' 'বীরপুরুষ' কবিতার চিত্ররূপ–একটি শিশুর হাতে চাবুক, কাঠের ঘোড়া পালকির সঙ্গে বাঁধা।[৭] নন্দলালের এই দুটি 'অসাধারণ' ছবিকে ইলাস্ট্রেশন না বলে 'নূতন কবিতা, নূতন সৃষ্টি' বলা যায়।[৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *তোতাকাহিনী*-র ইংরেজি অনুবাদ *The Parrot's Traning* (১৯১৮) গ্রন্থের বৃহদাকৃতি প্রচ্ছদটি নন্দলাল কৃত। রবীন্দ্রনাথের *Gitanjali & Fruit-Gathering* গ্রন্থটির সচিত্র সংস্করণে নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা আটটি রঙিন ও তেইশটি সাদা-কালো ছবি দেখা যায়। এর মধ্যে নন্দলালের অঙ্কিত চিত্র সংখ্যা তেরোটি, মুখপত্রের রঙিন ছবিটি শিরোনামহীন হলেও অন্যত্র ছবিটিকে 'অন্তরে মোর বৈরাগী গায় তাইরে নাইরে নাইরে নাইরে না'[৯] নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উদ্ধৃত পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথের *রাজা* (১৯১০) নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে আছে।[১০] এই ছবিটি ছাড়া বাকি ছবিগুলি কবিতার প্রথম ছত্র অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে। *Gitanjali*-র অংশে যে কবিতাগুলির সাপেক্ষে নন্দলাল ছবিগুলি এঁকেছেন সেই কবিতাগুলির শিরোনাম ও ছবিগুলির শিরোনাম যথাক্রমে – ক) 'My song has put off her adornments', খ) 'Leave this chanting and singing', গ) 'The song that I came to song', ঘ) 'Art thou abroad on this stormy night', ঙ) 'I asked nothing from Thee', চ) 'When I bring to you coloured toys', ছ) 'Thou art the sky and Thou', জ) 'I am like a remnant of a cloud'।[১১] নন্দলাল দ্বারা অলংকৃত রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতাগুলি যথাক্রমে – *গীতাঞ্জলি*-এর (১৯১০) 'আমার এ গান ছেড়েছে তার' (১২৫ সংখ্যক), 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' (১১৯ সংখ্যক), 'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার' (৩৯ সংখ্যক), 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' (২০ সংখ্যক),[১২] *খেয়া*

(১৯০৬) কাব্যগ্রন্থের 'কুয়ার ধারে' ও 'লীলা', *শিশু* কাব্যগ্রন্থের 'কেন মধুর, *নৈবেদ্য* (১৯০১) কাব্যগ্রন্থের 'একাধারে তুমি আকাশ তুমি নীড়' (একাশি সংখ্যক কবিতা)[১৩] কবিতার ইংরেজি অনুবাদ।

'Fruit-Gathering' অংশের জন্য নন্দলালের আঁকা চারটি ছবির শিরোনাম ও কবিতাগুলি যথাক্রমে – ক) 'Make me thy poet, O Night, Veiled Night', খ) 'I cling to this living raft, my body', গ) 'She is still a child, my lord' ঘ) 'O the waves, the sky-devouring waves'।[১৪] শিরোনামাঙ্কিত কবিতাগুলি যথাক্রমে – *কল্পনা* (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের 'রাত্রি', *বলাকা* কাব্যগ্রন্থের (১৯১৬) 'এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সঁতার গো' (তিরিশ সংখ্যক কবিতা)।[১৫] *খেয়া* কাব্যগ্রন্থের 'বালিকা *বধূ', গীতবিতান*-এর (১৯৩১) 'বিপুল-তরঙ্গ রে'[১৬] ইত্যাদি মূল বাংলা কবিতা ও গান থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিশ্বভারতী* পত্রিকার জন্য নন্দলাল দুটি প্রচ্ছদপট আঁকেন। রবীন্দ্রনাথের *বিসর্জন*-এর (১৮৯০) জন্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এক জনৈকা নারী ও রঘুপতিরছবি আঁকেন। রঘুপতির ছবিটি প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছিল বলা হলেও সচিত্র প্রচ্ছদ সমেত *বিসর্জন* প্রকাশিত হয়নি।[১৭] রবীন্দ্রনাথের *নটীর পূজা*-র (১৯২৬)[১৮] প্রচ্ছদে নন্দলাল কোলাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন নৃত্যরতা নটী। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে (আষাঢ়, ১৩৩৪) *বিচিত্রা* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী 'বিচিত্রা' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি নন্দলালের আঁকা অলংকরণ (ভিনেট) সহ প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাতেই নন্দলালের অলংকরণ সমেত প্রকাশিত কবির লেখা *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা* সম্পর্কে বলা হয়–

> নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণদক্ষতার ভিন্ন দিগন্ত...'ঋতুরঙ্গশালা তাঁর চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। ...এসব ছবিতে আমাদের চোখের সামনে শিল্পীর অলৌকিক ও কাব্যময় অন্তর্দৃষ্টি যে রূপ নিয়ে ধরা দেয় তাকে নিছক গ্রন্থ-অলংকরণ বলা যায় না, এ এক উচ্চাঙ্গের মৌলিক সৃষ্টি।[১৯]

বিচিত্রা-য় সাদা-কালো ছবিগুলির সঙ্গে 'বসন্ত' নামে জলরঙের একটি চিত্র ছাপা হয়। ১৩৮০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *ঋতুরঙ্গশালা*য় সেই ছবিটি আর দেখা যায়নি।

নন্দলাল বসুর গ্রন্থচিত্রণ প্রসঙ্গে আলোচনায় অবশ্যম্ভাবীভাবে *সহজ পাঠের* কথা এসে পড়ে। *সহজপাঠ* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে (চৈত্র ১৩৩৬)। নন্দলাল বসুর সাদা-

কালো লিনোকাটের ছবিতে সজ্জিত হয়ে ওঠে গ্রন্থ দুটি। কথার সঙ্গে ছবির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন লক্ষ করা যায় *সহজপাঠে*। শিশু পাঠ্য-পুস্তকের উপযুক্ত দৃশ্যচয়ন ও রূপায়ণে এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। তাই পুস্তকে ব্যবহৃত ধ্বনিগুচ্ছ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত চিত্র শিশু মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে। *সহজপাঠ*-এর প্রথম ভাগের খসড়া অনুযায়ী লিনোকাট[২০] করে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পছন্দ না হওয়ার সংবাদ দিয়ে তিনি সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে দেন। অবনীন্দ্রনাথ কলাভবনের একটি প্রদর্শনীতে সেইসব ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে চিত্রগুলির অনুমোদন করেন।[২১] লিনোকাট পদ্ধতিতে চিত্রায়ণ ও সাদা-কালোর অভিনব বণ্টনের মাধ্যমে গ্রন্থচিত্রণে ব্যস্ত নন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে লেখেন –

> 'নন্দলাল, প্রশান্ত অনেকবার আমাকে জানিয়েছে যে, সব ছবিগুলি পায় নি বলে সহজপাঠের ব্লক তৈরি সমাধা হল না – সামনে পূজোর ছুটি। ইতিমধ্যে শিশুদের জন্য প্রথম পাঠ্য বই আরো একখানা Longmanরা প্রকাশ করেছে। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। সহজপাঠের দ্বিতীয় খণ্ডের ছবি যদি দীর্ঘকাল দেরি হয় তাহলে এ বই প্রকাশের উপযোগিতা ও উৎসাহ চলে যাবে – এবং নকল বের হতে আরম্ভ হলে ক্ষতি হবে।[২২]

সহজপাঠ-এর প্রথম ভাগের থেকে দ্বিতীয় ভাগের ছবিগুলির ধরন একটু আলাদা। এর প্রকাশকের নিবেদন অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা কিছুটা স্পষ্ট করেছেন –

> ...শিশুরা নিজে নিজে ছবি গুলি রঙ করে নিতে পারবে বলে সেগুলি রেখায় আঁকা হয়েছে। এতে বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা ছবি আঁকার আনন্দও পাবে।[২৩]

রেখায় আঁকা ছবিগুলি ছাড়াও গ্রন্থটিতে কিছু পেনসিল স্কেচ আছে। ক্ষিতীশ রায়ের সম্পাদনায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *সহজপাঠ*-এর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্যান্য লেখকদের রচনা রয়েছে। কাগজে ব্রাশ ও কালির কাজের গ্রন্থচিত্রণ করেন নন্দলাল সহ অন্যান্যরা। এই তিনটি খণ্ডের পাঁচটি ছবি ছাড়া, বাকি সমস্ত ছবি নন্দলালের আঁকা। তৃতীয়ভাগের যে পাঁচটি ছবি তিনি আঁকেননি সেগুলি হল –ক) 'শহুরে ইন্দুঁর ও গেঁয়ো ইন্দুঁর' শিশুবিভাগের ছেলেদের করা একটি উড্‌ব্লক, খ) 'মেঘমালা' গল্পের 'মেঘমালা' শিশুবিভাগের ছেলেদের করা একটি লিনোকাট, গ) 'পথহারা' কবিতার উড্‌কাট্, ঘ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের 'ছাতিমতলার বেদী' কোনো চিনা শিল্পীর আঁকা, ঙ) 'গান' কবিতার 'কেয়াপাতার নৌকা'।[২৪] নন্দলাল-অলংকৃত রবীন্দ্র রচনার 'বর্বর' কবিতাটি বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য, কারণ 'এটি একমাত্র রবীন্দ্ররচনা' যা *খাপছাড়া*-য় (১৩৪৪) রবীন্দ্রনাথের এবং *সহজপাঠ*-এ নন্দলালের তুলিতে 'চিত্ররূপ' পেয়েছে।[২৫]

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই বাঁধাবার জন্য নন্দলাল তিপান্নটি বাটিকের ডিজাইন করেন।[২৬] শান্তিনিকেতনে ২৬ শ্রাবণ ১৩৪১ 'শ্রাবণ-গাথা'-র প্রথম অভিনয় উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকার প্রচ্ছদের জন্য নন্দলাল দু-পাশে বৃক্ষশোভিত নৃত্যরতা দুটি নারীর কাঠখোদাইয়ের ছবি এঁকে দেন।[২৭] *চণ্ডালিকা* (১৩৪৪) নৃত্যনাট্যের জন্য আঁকা প্রচ্ছদটিতে নমস্কারের ভঙ্গিতে নত চণ্ডালিকার ছবিতে নন্দলাল মূর্ত করে তুলেছেন।[২৮] রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে *The Golden Book of Tagore*-এ (১৯৩১) নন্দলালের 'Village Huts' ও 'Natir Puja' ছবি দুটি মুদ্রিত হয়।[২৯] জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ গ্রন্থটি নন্দলাল-চিত্রিত *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ*-এ (১৯৪১) লেখার পাশাপাশি কালো রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলি গ্রন্থটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে।[৩০] 'The Parrot's Traning' (তোতাকাহিনী), 'The Horse' (ঘোড়া), 'Old Man's Ghost' (কর্তার ভূত), 'Great News' (বড়ো খবর) – এই চারটি গল্প নিয়ে *The Parrot's Traning and Other Stories* (১৯৪৪) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রচ্ছদে এবং পূর্বে প্রকাশিত *The Parrot's Traning*-এর (১৯১৮) জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা অন্যান্য ছবিগুলি বর্তমান গ্রন্থটিতে পুনরায় মুদ্রিত হয়। বাকি রচনাগুলির অলংকরণে নন্দলালের আঁকা রেখাচিত্র ব্যবহৃত হয়।[৩১] রবীন্দ্রনাথের *চিত্রবিচিত্র* (১৯৫৪) গ্রন্থটির প্রচ্ছদে হরিপুরা পটের জন্য আঁকা 'সিংহ' ছাড়াও 'চিত্র' পর্যায়ে 'উষা', 'মোতিবিল', 'হাট', 'শীত', 'আগমনী', 'নতুন দেশ', 'পৌষমেলা' কবিতার জন্য নন্দলাল কালি তুলিতে সাতটি ছবি আঁকেন। 'আগমনী'র জন্য আঁকা ছবিটি হল কালি-কলমের স্কেচ। আর 'বিচিত্রা' পর্যায়ে 'এক যে ছিল বাঘ', 'চলন্ত কলকাতা', 'হনুচরিত', 'চলচ্চিত্র' এবং 'পিয়ারি'র জন্য মোট পাঁচটি ছবি আঁকেন।[৩২] প্রবাসী' পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'পিয়ারি' ছবিটি রঙিন এবং বাকি ছবিগুলি কালি তুলির। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন 'ভগবান বুদ্ধের সার্ধদ্বিসাহস্রিক পরিনির্বাণ-জয়ন্তী-উপলক্ষে' বুদ্ধদেব (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩-খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩) সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও প্রবন্ধ সংকলন *বুদ্ধদেব*-এ (১৩৬৩) নন্দলালের 'আরতি' ছবিটি নালন্দায় 'বুদ্ধমূর্তির আরতি-দর্শনে' অঙ্কিত কার্ড-স্কেচ (২০ অক্টোবর ১৯২২) থেকে নেওয়া।[৩৩] রবীন্দ্রনাথের *খৃষ্ট* (১৯৫৯) গ্রন্থটির অভ্যন্তরে ও প্রচ্ছদে নন্দলালের আঁকা

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আঁকা ‘ক্রুশ বহনকারী যীশু’র ছবিটি ব্যবহৃত হয়।[৩৪] ‘শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার সাংবার্ষিক উৎসবোপলক্ষে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে’ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *পল্লীপ্রকৃতি*-তে (১৯৬২) হলকর্ষণ উৎসব (১৯৩০) উপলক্ষে ‘শ্রীনিকেতন-উৎসব-প্রাঙ্গণের’ একটি দেওয়ালে ‘ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে’ নন্দলাল কৃত চিত্রের একটি অংশ প্রচ্ছদ হিসাবে, এবং অন্য বিশেষ কয়েকটি অংশ গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রিত হয়।[৩৫] রবীন্দ্রনাথ বিরচিত *বীরপুরুষ* (১৯৬২) গ্রন্থটির প্রচ্ছদে হরিপুরা কংগ্রেসের পোস্টারের জন্য আঁকা নন্দলালের ‘শিকারী’ ছবিটি মুদ্রিত হয়।[৩৬] *শিশু*-র (১৩৬৭) রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণেও ‘বীরপুরুষ’ কবিতাটির সাপেক্ষে এই ছবিটিই মুদ্রিত হয়। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে *বীথিকা* (১৩৪২) কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে নন্দলালকৃত একটি ‘খোদাই-ছবি’ ব্যবহার করা হয়েছে।[৩৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক প্রকাশিত *রাখী* (১৩৮৫) গ্রন্থটিতে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ‘প্রত্যাগত’ কবিতার জন্য আঁকা স্কেচটি স্থান পায়।[৩৮] রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা-বিষয়ক চিঠিপত্র ও পঠনপদ্ধতির আলোচনা সংবলিত গ্রন্থ *শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ* (১৯৮১) গ্রন্থটির প্রচ্ছদ হিসাবে ব্যবহার করা হয় নন্দলালের আঁকা ‘জ্যোৎস্নারাতে শান্তিনিকেতন’ ছবিটি।[৩৯]

নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু কবিতা লেখেন। তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে কবিগুরুর কবিতা যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে। নন্দলালের আঁকা প্রথম যে ছবিটি দেখে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন তা হল ‘শিবতাণ্ডব’। এই ছবিটি দেখে কবি লেখেন ‘বৈশাখ’ কবিতাটি –

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল

তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল

করে দাও ডাক –

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ! ... [৪০]

পরে *চয়নিকা*য় নন্দলালের আঁকা ছবি সমেত কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ছবি ও ছন্দের অভূতপূর্ব মিলন ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বিচিত্রিতা* (১৯৩৩) কাব্যগ্রন্থে। নিজের ও অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের চিত্রের ভাবনাকে কবি ভাষার জাদুস্পর্শে অভিনব রূপে প্রকাশ করেন। বইটির প্রচ্ছদ ও অনুচ্ছদ

অলংকরণের দায়িত্বপান নন্দলাল। পাখি ও পলাশফুলের ছবিতে ভরে ওঠে অংশ দুটি। এই কাব্যগ্রন্থটিতে নন্দলালের আঁকা তিনটি ছবি কাব্যরূপ–'পসারিণী', 'স্যাকরা' ও 'কন্যাবিদায়'। নন্দলালের 'পসারিণী' (১৯২৪) ছবিটিতে দেখা যায় এক নারী দিনান্তে একাকী বন মধ্যে এক বৃক্ষতলে বসে আছে। পাশে মোটবাঁধা। 'স্যাকরা' ছবিটি নন্দলাল কার্শিয়াঙে থাকাকালীন শিলঙে রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। *জাভা-যাত্রীর পত্র*-তে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই রবীন্দ্রনাথ ছবিটির গদ্যরূপ লেখেন –

> ...ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে আদর। ...আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্তি দিচ্ছে। মুখ্যত এ কাজটি তার আপনারই, গৌণত যে মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে করে ফলকামনাটা হয়ে গেল লঘু, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল, কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে। ...এই স্যাকরা এই যে গয়নাটি গড়লে তার মধ্যে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিলে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েছে, বাইরে থেকে জোগায় নি।[৪১]

কাব্যরূপ প্রকাশ পেল *বিচিত্রিতা*-র 'স্যাক্‌রা' কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থের 'কন্যাবিদায়' কবিতায় নন্দলালের ছবির সঙ্গে কবির লেখনির মিলন ঘটেছে। ছবিটিতে দেখা যায় নববধূ সাজে কন্যা ও তার মাতা। দুজনার মুখচ্ছবিই বিদায়বেলার বিচ্ছেদ ভাবনায় ব্যাথাতুর।[৪২] সেই ভাব ব্যক্ত হয় কবিতায় –

> জননী, কন্যারে আজ বিদায়ের ক্ষণে
>
> আপন অতীতরূপ পড়িয়াছে মনে
>
> যখন বালিকা ছিলে।
>
> ...আজ সেই ছিন্নখণ্ড ফিরে এল শেষে
>
> তোমার কন্যার মাঝে অশ্রুর আবেশে।।[৪৩]

নন্দলালের ছবি ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার চূড়ান্ত মিলন ঘটে *ছড়ার ছবি* (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থে। গ্রন্থটির বত্রিশটি কবিতাই নন্দলাল বসুর ছবির প্রেরণায় রচিত। গ্রন্থটি প্রচ্ছদ এবং 'একত্রিশখানি রেখাচিত্র' ও 'সাতখানি টোনের ছবি' সংবলিত।[৪৪] 'ছবি-আঁকিয়ে' নামক কবিতায় শিল্পীর কাছে কবির ঋণ স্বীকৃত; শিল্পীর প্রতি সম্মান, তাঁর দূরদৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির অপরূপ রহস্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে কবিতার অভ্যন্তরে।[৪৫] কবি লেখেন -

ছবি আঁকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে,

চলছ তুমি আশেপাশে দৃষ্টির জাল ফেলে।

...যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,

তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।

...ওরাই আছে, নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব;

এই ধরণীর মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব।

...সে-সব ছবি সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধা,

আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।[৪৬]

এইসব মানুষদের সত্যি ঘটনা, রুক্ষবাস্তব জীবনের ভাঙাগড়ার কাহিনি রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ভাষায় উন্মোচিত করেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার তলদেশে লুকিয়ে থাকা মানুষেরা এতদিন বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারেনি নন্দলালের ছবির হিল্লোলে তারা মুক্ত হয়। কবির লেখনিতে ব্যক্ত হয় – 'জলযাত্রা'য় সাধারণ এক মানুষের জলপথে দিন-রাতের কর্মকাণ্ড, সংসারের দায়দায়িত্ব, আর ঘরে ফেরার তাগিদ। পোকার দেশের দত্যি, পক্ষীপ্রেমী 'ভজহরি'। বিধবা 'পিস্‌নি'র জীবনযন্ত্রণা। 'খাটুলিতে' বিশ্রামরত বৃদ্ধের বিধবা মেয়ের জীবনগাথার কাঁথা, দাঙ্গায় জেলখাটা ছেলের দেওয়াল জোড়াস্মৃতি, প্রবাসী ছেলের মৃত্যু আশঙ্কা, দেনার বোঝা, কন্যাদায়ে শেষ সম্বলটুকু হারানো পিতার দারিদ্র্যের ছবি। যার, প্রাণটা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন মাংশপেশী। শিশুদের 'যোগীনদা' ও 'কাশী'র স্মৃতিতে মিলিটারি জরিপকরী যোগীনদা। কৃপণ 'বধূ' ও তার মোগ্‌লু নাতি, 'চড়িভাতি' তে ব্যস্ত মানুষ, 'প্রবাসে' বাঙালির ভ্রমণপ্রিয় মন, 'পদ্মায়' নদীকেন্দ্রিক জীবন, 'দেশান্তরী'র ভাগ্যজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও তাঁর স্ত্রীর জীবন সংগ্রাম। 'অচলা বুড়ি'র দরদী মন, সাঁৎরাপাড়ার কায়েতবাড়ির বিধবার পেটের দায়ে রোগীসেবা, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়া রাই ডোম্‌নির ছেলে ও ডোম্‌নি, বামনঠাকুর। 'সুধিয়া' গরুর কৃপায় গয়লার সুদিন ও মন্বন্তর, বন্যা, দেনা, বণিকের ষড়যন্ত্র ও পশুপ্রেম। ক্ষমতাবানের অন্যায়ের গোলাম স্যাকরা জগন্নাথ ও তার স্বাধীনচেতা ছেলে 'মাধো'। পাটকলের ধর্মঘটের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'মাধো' প্রোলভনের ফাঁদে পা না দেওয়া ও কর্মত্যাগ। 'শনির দশা' আধবুড়ো মানুষটির ভবিষ্যত চিন্তা, সংসারের মানুষদের প্রতিটান। 'বাসাবাড়ি'র খোঁজে ব্যক্তি ও তার দেখা ও কল্পনায় থাকা ভাড়াটেরা। ঘাসের আঁটি মাথায় নিয়ে হাট

করতে যাওয়া মেয়ে। পৃথ্বীজয়ী 'ভ্রমণী'। 'আকাশপ্রদীপ' জ্বেলে থাকা দুই মাতৃহীন শিশু প্রভৃতি 'সত্যি মানুষ'। আলমোড়ায় বসে, নন্দলাল বসুর পাঠানো 'ছাগল' ছবিটি পেলেন। ছবিটি দেখে শিল্পীকে সম্বোধন করে লিখলেন –

> ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে,
>
> এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা ত্যেজে।
>
> ...আজ তুমি তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই দেহে
>
> এক মুহূর্তে চমক লেগে বলে উঠলাম কে হে।
>
> ওরে ছাগলওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার –
>
> আমি জানি, একজনের এই প্রথম আবিষ্কার।[৪৭]

নন্দলালের আঁকার ছবি দেখেই কবি ফিরে গেলেন তাঁর স্মৃতিতে। সৃষ্টি হল – 'কাঠের সিঙ্গি', 'আতার বিচি', 'প্রবাসে', 'পদ্মায়', 'বালক'। কবির বিজ্ঞান চেতনা প্রকাশ পেল পাথরপিণ্ড ছবির কাব্যরূপায়ণে। কিছু ছবির প্রেরণায় কবির কৌতুক বোধে সৃষ্টি হল – 'যোগীনদা', 'কাশী', 'শনির দশা'। 'শনির দশা'য় আবার বাঙালির সববিষয়ে অযৌক্তিক ধারণা করার প্রবণতা লজ্জিত হল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিগুলি দেখে সৃষ্টি হল – 'ঝড়', 'ঘরের খেয়া', 'তালগাছ', 'রিক্ত', 'অজয়নদী', 'খেলা'। নন্দলালের আঁকা ছবির মতই এইসব কবিতাগুলির সঙ্গে গভীর অনুভূতি মিশে রয়েছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না 'এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্য লেখা'।[৪৮] নন্দলাল বসুর জীবদ্দশায় বা জীবনাবসানের পর তাঁর আঁকা ছবি বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার অলংকরণে ও প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. অন্যান্য সাহিত্যিকদের গ্রন্থ অলংকরণ ও প্রচ্ছদভাবনা

আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামীর *Art and Swadeshi*' (১৯১২) গ্রন্থে নন্দলাল বসুর 'কৈকেয়ী', 'সতী' ও 'জগাই-মাধাই' ছবি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন –

> Some works by Nanda Lal Bose, too, have very excellent qualities: his 'Sati' is very sincere and sepia drawing of 'Jagai and Madhai' (disciples of Chaitanya) a piece of admirable daughtsmanship.[৪৯]

সিস্টার নিবেদিতা ও আনন্দ কুমারস্বামীর যুগ্ম নামে প্রকাশিত *Mythes of the Hindus and Buddhists* (১৯১৩) গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে শিষ্যদের দ্বারা গ্রন্থটি অলংকৃত হয়।[৫০] অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের আঁকা মোট বত্রিশটি চিত্র গ্রন্থটিতে মুদ্রিত হয়। সেখানে নন্দলাল বসু আঁকাদশটিছবি হল – ক) ‘গরুড়’, খ) ‘একলব্য’, গ) ‘কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রপরীক্ষা’, ঘ) ‘জতুগৃহ দাহ’, ঙ) ‘কিরাত-অর্জুন’, চ) ‘যুধিষ্ঠির’, ছ) ‘জন্মাষ্টমী’, জ) ‘উমার তপস্যা’, ঝ) ‘শিবের বিষপান’, ঞ) ‘যম ও নচিকেতা’। ‘গরুড়’ ছবিটি টেম্পেরায় আঁকা। এই ছবিটি ছাড়া বাকি সবগুলি জলরঙে আঁকা।[৫১]

নিবেদিতার *Footfalls of Indian History* (১৯১৫) গ্রন্থের ‘Rajgir: an Ancient Babylon’ অধ্যায়ে জলরঙে আঁকা নন্দলাল বসুর ‘বুদ্ধ ও মেষশিশু’ (Buddha and the lame kid) চিত্রে নদীতীরে বুদ্ধকে পরিবেষ্টন করে আছে ভেড়ার পাল। তার মধ্যে রয়েছে খোঁড়া মেষশাবকের মা। বুদ্ধ অক্ষম মেষশাবককে কাঁধে নিয়ে নদী পেরোতে সাহায্য করছেন।[৫২] প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা প্রণীত *ভগিনী নিবেদিতা* (১৯৫৯) গ্রন্থের জন্য নন্দলাল দুটি স্কেচ এঁকে দেন। তার মধ্যে একটি সিস্টারের বাড়ির নক্সায় বিভিন্ন স্থান নম্বর দিয়ে চিহ্নিত, নম্বরের সাপেক্ষে স্থানগুলি এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। অপর চিত্রে বোসপাড়া লেনের বসবার ঘরে সিস্টার একটি সোফাতে বসে, আর নীচে বসে আছেন নন্দলাল বসু ও সুরেন গাঙ্গুলি; দেওয়ালে রয়েছে বুদ্ধের ব্রোঞ্জের মূর্তি।[৫৩] কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ কালে লেডি হ্যারিংহামের সঙ্গে অজন্তা ভ্রমণকালে নন্দলাল ১৭ নম্বর গুহাচিত্রের দুটি কপি করেন – ‘Royal love Scene : a palace, pavilion with prince, princess and attendents’ এবং ‘Adoration Group : mother and child before Buddha’। চিত্র দুটি লেডি হ্যারিংহামের লেখা *Ajanta Frescoes* (১৯১৫) প্রকাশিত হয়।[৫৪] অজন্তা থেকে ফিরে নন্দলাল রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে অর্ণবপোত’ (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধের জন্য নৌকার ছবি এঁকে দেন।[৫৫]

নন্দলাল বসুর বয়ান থেকে জানতে পারা যায় কাশ্মীর সম্পর্কে এক সাহেবের একটি গ্রন্থে তাঁর ‘তীর্থযাত্রী’ ছবিটি ‘আরাধনা’ নামে মুদ্রিত আছে। ছবিটিতে রয়েছে – কানবন্ধ নেপালি টুপি পরা এক তিব্বতি লোকটি সকালবেলা, বরফে ঢাকা পাহাড়ের কিনারায় বসে কমণ্ডুল আর পূজার সামগ্রী নিয়ে আরাধনা করছেন।[৫৬] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনূদিত *আরব্য উপন্যাস*-এর (১৯০৯) প্রচ্ছদের জন্য

নন্দলাল 'আরব্য-উপন্যাস-কথন' নামক ছবিটি আঁকেন।[৫৭] 'কর্ণের সূর্যপূজা', 'কৈকেয়ী মন্থরা'র মতো বিখ্যাত ছবিগুলি রামানন্দ বসুকৃত অ্যালবামে মুদ্রিত হয়। 'গান্ধারী ও কুন্তী', 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর', 'অহল্যা উদ্ধার', 'অন্নপূর্ণা ও শিব', 'শিবতাণ্ডব', 'জগাই মাধাই', 'হিমালয়ের শিব' ইত্যাদি বহু ছবি রামানন্দ সম্পাদিত *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় ছাপা হয়। *প্রবাসী*-র প্রচ্ছদের জন্য ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন বৈরাগী ও ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'জলে পদ্ম গাছে খাঁচা'। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের *প্রবাসী*-র প্রচ্ছদ ও তিনি এঁকে দেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা *রাজকাহিনী* (১৯১৯) উপন্যাসে প্রথম খণ্ডের 'পদ্মিনী' নামক অধ্যায়ে নন্দলালের আঁকা 'সতী' চিত্রটি মুদ্রিত হয়।[৫৮] পদ্মিনী কাহিনি চিত্রভূষিত করবার জন্য অবনীন্দ্রনাথের উপদেশে নন্দলাল এই ছবিটি আঁকেন।[৫৯] *প্রবাসী*-র অষ্টম ভাগে ও ছবিটি প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মূর্তি' (*প্রবাসী*, পৌষ-মাঘ, ১৩২০) প্রবন্ধটি সুকুমার রায় (১৮৮৭–১৯২৩) কর্তৃক ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়ে *Some Notes Of Indian Artistic Anatomy* (১৯২১) নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর নন্দলাল বসু পঞ্চানন মণ্ডলকে (১৯১৬–১৯৯৮) জানান এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রতিটি ছবি নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত।[৬০] কিন্তু গ্রন্থটির মুখবন্ধে ও. সি. গাঙ্গুলি লেখেন যে, গ্রন্থটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য নন্দলাল বসু ও ভেঙ্কটাপ্পা দ্বারা অঙ্কিত চিত্রে 'the basis of Indian artistic anatomy' রক্ষিত হয়েছে।[৬১] গ্রন্থটিতে এক থেকে বাইশ পর্যন্ত নানারকম চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। 'সমভঙ্গ', 'আভঙ্গ', 'ত্রিভঙ্গ', 'অতিভঙ্গ', 'উত্তম নবজল' পর্যন্ত ছবিগুলি বিভিন্ন ভঙ্গিমা প্রকাশ করছে। এরপর বিভিন্ন আকৃতির মুখমণ্ডল, বিভিন্ন আকৃতির ভ্রুযুগল, কপাল, চোখ, কান, নাক, ঠোঁট, গলা, বুক, বাহু, কাঁধ, কবজি, হাতের আঙ্গুল, উরু, পায়ের আঙ্গুল, পায়ের পাতা ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গের ছবি স্কেচ করা আছে।

নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সচিব ছিলেন জগদানন্দ রায় (১৮৬৯–১৯৩৩)। প্রাণীতত্ত্ববিদ জগদানন্দের *বাংলার পাখী* (১৯২৪) বইয়ের জন্যে নন্দলাল ছবি আঁকেন।[৬২] জগদানন্দের *পোকামাকড়* (১৩২৬) ও *মাছ-ব্যাঙ্-সাপ* (১৩৩০) গ্রন্থ দুটির অনুবৃত্তি রূপে *পাখী* (১৩৩১) নামে অপর একটি গ্রন্থগুলিও নন্দলাল বসু ও তাঁর দুই শিষ্য বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪–১৯৮০) ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার (১৯০৩–১৯৯৫) অঙ্কিত চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হয়।[৬৩] ফণীন্দ্রনাথ বসুর (১৮৯৬–১৯৩২) *বিক্রমশীলা* (১৯২৫) গ্রন্থের জন্য নন্দলাল বসু প্রচ্ছদপটের ছবি এঁকে দেন।[৬৪]

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে নন্দলাল *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্তীর (সপ্তদশ শতাব্দী) *ধর্মমঙ্গল* কাব্যটি চিত্রভূষিত করেন। সুকুমার সেন (১৯০১–১৯৯২) ও পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায়, নন্দলাল বসুর চিত্রিত এই গ্রন্থটি বর্ধমান সাহিত্য-সভা থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-পরিচয় অংশে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর 'তুলিকাস্পর্শে বাঙ্গালার এই প্রাচীন কাব্যটি মণিকাঞ্চনযোগ সৌভাগ্য' লাভ করার কথা বলা হয়েছে।[৬৫] ক) 'দুটা বাঘ দু-দিগে বসিয়া লেজ নাড়ে, গোটা দুই কাছাড় কাছাড় খাইলাম গোপালদীঘির পাড়ে' রেখাচিত্রটি রূপরামের জীবন সংক্রান্ত। রূপরামের আত্মকাহিনি বর্ণনার চিত্ররূপ এটি। খ) 'বুকেতে বাজিল শাল পৃষ্ঠে হৈল পার, খানি খানি হৈল রানী রক্ষা নাহি আর।' – এই রেখাচিত্রটি রঞ্জাবতীর শালে-ভর পালা অবলম্বনে আঁকা। বনকাটির পিতলের রথের পুতলোর আদলে ধর্মসেবিকা রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্রসাধ্য শালে ভর দিয়ে মৃত্যুবরণ নন্দলালের অনবদ্য সৃষ্টি। এখানে নন্দলাল অঙ্কিত আরো চিত্র রয়েছে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি গড়জঙ্গল ভ্রমণে গিয়ে লাউসেন-গড়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে আঁকেন ইছাইঘোষের দেউল, শামারূপা দেবীর ভাঙামন্দির। মন্দিরের মধ্যে ইছাইঘোষের মূর্তি আট-দশইঞ্চি ছিল বলে কল্পনা করে তিনি তা স্কেচ করেন। পরবর্তীকালে তিনি লাউসেন মল্লবধ করে ভাই কর্পূরধবলকে নিয়ে গৌড়যাত্রা করেন। যাত্রা পথে জলন্দার বনে দেবী প্রদত্ত লোহার গণ্ডার দিয়ে লাউসেনের কেঁদো বাঘ বধের দৃশ্য নন্দলাল বসু আঁকেন। তাঁর ঊনত্রিশ সংখ্যক স্কেচ বুকে এই চিত্র দুটি রয়েছে।[৬৬] সুকুমার সেন সম্পাদিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* (১৩৬২) কাব্যের জন্য নন্দলাল তিনটি চিত্র এঁকে দেন – ক) 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে', খ) 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা' এবং গ) 'নবদলে শশিমুখী – উগারি গিলিছে করিবরে'। সুকুমার সেনের মতে, নন্দলালেরর অঙ্কিত ছবিগুলি এই গ্রন্থের 'মর্যাদা' বাড়িয়েছে।[৬৭] 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে' ছবিটি আত্মকথা ও কাব্যরচনার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়িত হয়েছে। 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা' – নামক ছবিটি আখেটিক খণ্ডের একটি কাহিনির চিত্রায়ণ। 'নবদলে শশিমুখী – উগারি গিলিছে করিবরে' ছবিটি বণিক খণ্ডে বর্ণিত 'কমলে কামিনী'রূপ দেবীর চিত্রায়ণ। *গোর্খ-বিজয়* (১৯৪৯) ও *হরিদেবের রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল* (১৯৬০) গ্রন্থ দুটি নন্দলাল বসুর চিত্রভূষিত হয়ে প্রকাশিত হয়। *গোর্খ-বিজয়* গ্রন্থটির প্রচ্ছদে তাঁর আঁকা বাগগুহার গোর্খী যোগীর

ছবিটির উপরে নন্দলালকে বলা গোর্খযোগীর কথা, রামজী জো দেঁতে হৈঁ রামজী খা লেতেঁ হৈঁ[৬৮] লেখা আছে।

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯১৬ বঙ্গাব্দে নন্দলাল শিলাইদহ যান। তাঁর সেই সময়কার আঁকা শিলাইদহের কয়েকজন অধিবাসীর ও নানা দৃশ্যের যে ছবি বিশ্বভারতীর কলাভবনে সুরক্ষিত ছিল। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর (১৮৯৭-১৯৭৯) *সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ* (১৩৪৯) গ্রন্থটিতে নন্দলাল বসুর আঁকা পাঁচটি ছবি মুদ্রিত হয়।[৬৯] *পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ* (১৩৫২) গ্রন্থটি লেখার সাহায্যার্থে নন্দলাল বেশ কিছু তথ্য এবং 'কয়েকটা বাস্তব-চরিত্রের ছবি' এঁকে দেন।[৭০] নন্দলালের আঁকা পদ্মার চরে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের ছবিটি উল্লিখিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। শচীন্দ্রনাথের *সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ* (১৩৫৩), *কবিতীর্থের পাঁচালী* (১৩৫৩), *রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে* (১৩৬৬) ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে নন্দলালের আঁকা শিলাইদহের স্কেচ মুদ্রিত হয়।

ফরাসি লেখক Edmond Rostand–এর 'Florence Yates Hann: The Story of Chanticleer' গল্পটির অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবানুবাদ *ভারতী* পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৬-অগ্রহায়ণ ১৩২৬) ও পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে *আলোর ফুলকি*-তে (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির একটি মোরগের ছবির প্রচ্ছদ ও 'অন্তঃপট নন্দলাল বসু-অঙ্কিত'।[৭১] এই নামে অপর একটি সংকলন গ্রন্থ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের ১ শ্রাবণ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শিশু ও কিশোর সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে নন্দলালকৃত হরিপুরা কংগ্রেসের 'শিকারী' পোস্টারটি 'বীরপুরুষ' নামে মুদ্রিত হয়েছে।[৭২]

শান্তিদেব ঘোষের (১৯১০–১৯৯৯) *রবীন্দ্রসংগীত* (১৩৪৯) গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট ও রবিবাউল চিত্রটি নন্দলাল বসু 'এঁকে দিয়েছেন'।[৭৩] কানাই সামন্তের (১৯০৪–১৯৯৫) *চিত্রদর্শন* গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি নন্দলাল বসুর আঁকা পদ্মপ্রতীকে অলংকৃত। শান্তিনিকেতন-আশ্রমিকসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত *An Album of Nandalal Bose* (১৯৫৬) গ্রন্থটি থেকে বেশকিছু ব্লক উক্ত গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত হয়েছে।[৭৪] কানাই সামন্তের *নীরঞ্জনা* (১৩৬১) গ্রন্থটির প্রচ্ছদে ব্যবহারের জন্য নন্দলালের আঁকা 'ছবি দিয়েছেন'।[৭৫] সুধীরঞ্জন দাসের *আমাদের শান্তিনিকেতন* (১৩৬৬) নামক গ্রন্থটির অলংকরণে নন্দলাল বসুর আঁকা ক) 'নিচু বাংলা', খ) 'জ্যোৎস্নালোকে', গ) 'মেলার যাত্রী, ঘ) 'খোয়াই' ছবিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।[৭৬]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রাঁচিতে থাকাকালীন ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য 'টাক ডুমা ডুম ডুম' গল্পের নাট্যরূপ রূপ যা বিশ্বভারতী থেকে নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রিত হয়ে *টাক ডুমা ডুম ডুম* (১৩৫১) প্রকাশ পায়। গ্রন্থটিতে প্রচ্ছদ সহ মোট আটটি ছবি কাহিনি অনুসরণ করে আঁকা। ছবিগুলি হল – ক) 'টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্', খ) 'নাপিত ভায়া! নাপিত ভায়া! ঘরে আছো গো?', গ) 'আমার নাকে মস্ত একটা কাঁটা বিঁধে গিয়েছে গো!', ঘ) 'নরুনে যদি তোমার নাক একটু আধটু কেটে যায়?', ঙ) 'এই নাও, আমার এই নরুনটি দিয়ে মাটি খোঁড়ো।', চ) 'তুমি কোন্ দেশি বর হে!', ছ) 'ও কী মালিদাদা! তোমার ফুলঝারি কোথায় গেল?'[৭৭] প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের (১৯০৭–১৯৬৫) *কুমারসম্ভব* (১৩৪৬) নন্দলাল বসু চিত্রিত প্রচ্ছদের ছবি হর-পার্বতীর পার্শ্বমুখের। এছাড়া তিনি ক) 'সখিদের আখি সকলি দেখিল তাই অতি লাজভরে', খ) 'লতাগৃহদ্বারে প্রহরী নন্দী কনকবেত্র করে', গ) 'আর গিরিবালা; - দুনয়নে হেরি/ ব্যর্থ ব্যর্থ সব' – এই ছবিগুলি বিষয়কে কেন্দ্র করে এঁকে দেন।[৭৮]

ক্ষিতিমোহন সেনের *চিন্ময় বঙ্গ*-এর (১৯৫৮) প্রচ্ছদের জন্য চৈতন্যদেবের একটি দিব্যসুন্দর ছবি নন্দলাল বসু এঁকে দেন।[৭৯] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পথের দাবী* (১৯২৬) উপন্যাসের প্রচ্ছদে নন্দলাল বসুর আঁকা একটি ব্যঞ্জনাধর্মী ছবি দেখতে পাওয়া যায়।[৮০] নন্দলালের জীবনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডল। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের নানা পুস্তকের প্রচ্ছদ এঁকেছেন। সত্যেন মহারাজের *শ্রী শ্রী সারদা দেবী*-র প্রচ্ছদটিতে সারদা দেবী নন, প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর একজোড়া পদযুগল দেখা যায়।[৮১] মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৫৪–১৯৩২) লেখা *Gospel of Sri Ramkrishna* (১৯৪৪) গ্রন্থটির প্রচ্ছদও নন্দলাল অঙ্কন করেছেন। চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা ও শিল্পভাবের গভীরতায় প্রচ্ছদটি প্রতীকি হয়ে উঠেছে।[৮২] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের (১৮৮১–১৯১৮) *সঙ্গীত ও সংস্কৃতি* (১৩৬৩) গ্রন্থে নন্দলালের আঁকা নবরসের ছবি ব্যবহৃত হয়েছে।[৮৩]

গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর শ্রেষ্ঠ অবদান স্বাধীন *ভারতের সংবিধান* অলংকরণ। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে একত্রিত করার পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয় *ভারতের সংবিধান*। অলংকরণের জন্য নন্দলাল বসুকে অনুরোধ করা হয়। নেহেরুর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদা (১৯০১–১৯৬৬) তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের (১৮৮৪–১৯৬৩) সঙ্গে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বরে শান্তিনিকেতনে এসে

নন্দলালের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করেন কীভাবে পৃষ্ঠার কতটা অংশ নিয়ে লেখা হবে, আর কতটা অংশ নন্দলাল অলংকরণ করবেন। পরিকল্পনা মাফিক নন্দলাল ও তাঁর বারোজন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলি প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে সযত্নে দুশোটি চিত্র অলংকৃত করেন। তার মধ্যে থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির দৃশ্য রূপায়িত বাইশটি ছবি বেছে নেওয়া হয়। যেমন– গান্ধিজির নোয়াখালির দাঙ্গাকবলিত এলাকা ভ্রমণ, কর্মোদ্যম নিয়ে দেশগঠনের প্রসঙ্গে সম্রাট আকবর; বাণিজ্যের প্রসঙ্গে মহাবলীপুরম ও গঙ্গা অবতারণের দৃশ্য প্রভৃতি। নন্দলালের পরিকল্পনায় এরকমই বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাস ও পুরাণের প্রসঙ্গ মিলিয়ে ভারতের সংবিধান চিত্রিত হয়েছে।[৮৪] পৃষ্ঠাগুলির চারপাশের বর্ডারগুলিও ভারতের নিজ সংস্কৃতির মোটিফের সুচারু সমন্বয়ে অলংকৃত। নন্দলাল-কৃত সংবিধানের প্রচ্ছদচিত্রটি চামড়ার ওপর সোনার জলে খোদাই করা। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি দেরাদুনের সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে দেরাদুন শহরে নন্দলাল বসুর চিত্র সম্বলিত সংবিধান প্রকাশ করা হয়।

৪.১.২. যামিনী রায়

যামিনী রায় শিল্পচর্চার ধারায় একাকী। অথচ তাঁকে সবসময় ঘিরে থেকেছে তাঁর ছবির ভক্ত ও সামালোচক সাহিত্যিক বন্ধুরা। বিষ্ণু দের *পূর্বলেখ* (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থটির জন্য যামিনী রায়ের আঁকা সাংকেতিক প্রচ্ছদের[৮৫] ডিজাইনটি লালে ও নীলে এই 'দুটো রঙে'[৮৬] ছাপা। এরপর যামিনী-চিত্রিত *সাত ভাই চম্পা* (১৯৪৫), *হে বিদেশী ফুল* (১৯৫৭), *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* (১৯৫৮), *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত* (১৯৭১) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র প্রকাশিত হয়। *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত* যামিনীর আঁকা প্রচ্ছদের ডিজাইনটি হারিয়ে যাওয়ার কারণে রমেন মুখার্জী প্রথম সংস্করণের জন্য একটি ডিজাইন এঁকে দেন।[৮৭] বর্তমানে এই গ্রন্থটির প্রচ্ছদে একটি ফ্রেমের মধ্যে আলংকারিক ঢঙে দুটি ময়ূর এবং মাঝে কটি ফুলে ভরা গাছের ছবিটিতে ব্যবহৃত গাঢ় সবুজ রঙের উপর হালকা সবুজ রঙের অদ্ভুত বৈপরীত্য নজর কাড়ে। *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র (১৯৫৫) প্রচ্ছদে কমলা ও সাদার বিন্যাসে যামিনী রায়ের আঁকা আলপনাধর্মী ময়ূরের ছবি দেখা যায়।[৮৮] এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লেখেন যামিনীর নাম উক্ত সংকলনে দিতে পেরে তিনি 'দুর্বিনয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত ও কৃতার্থ বোধ'

করছেন।[৮৯] বুদ্ধদেব বসুর *এক পয়সায় একটি* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থটির যামিনী-চিত্রিত প্রচ্ছদে একটি মাত্র সাংকেতিক গাছের ছবি দেখা যায়। বুদ্ধদেব *কালের পুতুল* (১৯৪৬) গ্রন্থটির প্রচ্ছদশিল্পী যামিনী রায়কেই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন।[৯০] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংকলন *স্বগত*-র (১৩৪৫) জন্য যামিনী-চিত্রিত প্রচ্ছদটিতে রয়েছে লতাবেষ্টিত একটি সাপের ছবি।[৯১] প্রচ্ছদে এই ছবিটি ছাড়াও ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় *পরিচয়*-এর জন্য আঁকা যামিনী রায়ের অপর একটি ছবিও গ্রন্থটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৯২] এই সংখ্যায় *স্বগত* প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১–১৯৮৬) মোট পাঁচটি কবিতা আলাদা করে এক-একটি রঙিন মোটা তুলট কাগজে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। যামিনী রায় উক্ত সংকলনের 'অন্নদাতা' ফোল্ডার-কবিতাটির প্রচ্ছেদ এঁকে দেন। সেটিতে বিজ্ঞপ্তি ছিল, "অন্নার্থীর সাহায্যকল্পে এই কবিতা বিক্রি করা হবে।"[৯৩] 'অন্নদাতা' কবিতাটি পরবর্তীকালে *দেশ* পত্রিকায় (১ আশ্বিন ১৩৫০) প্রকাশিত হয়। যামিনী রায় ১৯৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাগবাজার থেকে ডিহি শ্রীরামপুরে উঠে যাওয়ার সময় প্রতিবেশী দক্ষিণারঞ্জন বসুকে একটি 'স্থায়ী আশীর্বাদ' দেবেন বলে আশ্বাস দেন। এই ঘটনার বহু বছর পর তিনি দক্ষিণারঞ্জনের *রাত্রিকে দিনকে* (?) কাব্যসংকলনের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।[৯৪] নরেশ গুহর *অরণ্যে রোদন*[৯৫] (অপ্রকাশিত) কাব্যগ্রন্থটির প্রচ্ছদশিল্পী যামিনী রায়। ৩ ডিসেম্বর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে লেখা নরেশ গুহর ডায়েরিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে।[৯৬] পাঁচটি দণ্ডায়মান রেখার উপর ফুলের মোটিফ যুক্ত প্রচ্ছদের ছবিটিতে সংকেতে অরণ্যে আভাসিত। আশুতোষ ভট্টাচার্যের (১৯০৯–১৯৮৪) *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (১৩৪৬) গ্রন্থটির জন্য যামিনী রায় প্রচ্ছদ এঁকে দেন।[৯৭] সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা*-র (১৩৪৬) প্রচ্ছদের ছবিটিও যামিনী এঁকে দেন।[৯৮] হিন্দি সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদ (১৮৮০–১৯৩৬)-এর *গোদান* (১৯৩৬) উপন্যাসের হিন্দি ও বাংলা সংস্করণের প্রচ্ছদে যামিনী রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ দেখতে পাওয়া যায়।[৯৯] *কবিতা* ও *বহুরূপী* পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ দেখা যায়।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াণের বছর *যুগান্তর* পত্রিকা থেকে মোটা তুলিতে যামিনী রায়ের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি প্রকাশ করা হয়।[১০০] তিনি গ্রন্থ অলঙ্করণের কাজ তাঁর বলে অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কথা বলার সময় তিনি নিজে জানান,

ইন্ডিয়ান প্রেসে কাজ করার সময় তিনি *রামায়ণ*-এর ইলাস্ট্রেশন করেছেন। সমার শায়েবও তাঁর কাজ দেখে খুব খুশি হন।[১০১]

৪.২ কাব্য ও ধর্মসাহিত্য সংযোগ

৪.২.১ নন্দলাল বসু

ক. কাব্য

নন্দলাল বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পরিচয়ের পরই তাঁদের যুগলবন্দী আমাদেরকে উপহার দিয়েছে একটার পর একটা ছবি ও কবিতা, কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নন্দলাল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল পাকাপাকিভাবে কলাভবনে আসেন। ১২ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। আশ্রমিকদের যথাযথ আয়োজন ও সম্মাননার সঙ্গে তাঁকে উদ্দেশ করে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা উপহার পান –

চিরসুন্দরে কর গো তোমার

রেখাবন্ধনে বন্দী!

শিবজটাসম হোক্ তব তুলি

চিররস-নিষ্যন্দী![১০২]

প্রবাসী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) এবং *Modern Review* (জুন, ১৯১৪) পত্রিকায় এই ঘটনার প্রতিবেদন ও কবিতাটির প্রতিলিপি ছাপা হয়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৯ অগ্রহায়ণ ‘পঞ্চাশ বছরের কিশোর-গুণী নন্দলাল বসুর’ পঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষে ‘সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ একটি কবিতা লিখে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। নন্দলালের কলাভবনে যোগদানের সময় লেখা কবিতাটির সঙ্গে এই কবিতাটি এক সুরে বাঁধা –

...তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,

নব-বালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।[১০৩]

প্রবাসী-তে (পৌষ, ১৩৩৮) নন্দলালের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান এবং জন্মদিন পালনের পর (শ্রাবণ, ১৩৪০) রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি *বিচিত্রিতা* কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'আশীর্বাদ' 'ভারতশিল্পী নন্দলালের' প্রতিভার একটি 'বিশিষ্ট মূল্যাঙ্কন'।[১০৪] নন্দলালের জন্মদিন উপলক্ষে শিল্পীর উদ্দেশে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ অন্তিম আশীর্বাদসূচক কবিতাটি তাঁর ডায়েরির পাতায় প্রথম লেখেন। পরে সেটি কপি করে নন্দলালকে দেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর *প্রবাসী*-তে (মাঘ, ১৩৪৭) মুদ্রিত পাঠটি হল –

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু –

রেখার রহস্য যেথা আগলিছে দ্বার

সে গোপন কক্ষে জানি জনম তোমার।

সেথা হতে রচিতেছ রূপের যে নীড়,

মরুপথশ্রান্ত সেথা করিতেছে ভীড়।।[১০৫]

এর সঙ্গে পাণ্ডুলিপির পাঠের কিছু প্রভেদ লক্ষ করা যায়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কলাভবনের জন্য নব-নির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন-উৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতীর আচার্য রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের আচার্যকে সম্মান ও অভিনন্দন জানিয়ে সংবর্ধনা বাণী রচনা করেন –

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার,

মর্ত্যের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।

অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়,

দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়।[১০৬]

রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের জন্য নির্মিত এই নতুন ভবনটির নাম দেন 'নন্দন'। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে 'নন্দন মেলা' ও *নন্দন* নামে কলাভবনের পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

নন্দলালের ছবির প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ বিরচিত বেশ কিছু কবিতা নন্দলালের চিত্র সহযোগে গ্রন্থে মুদ্রিত হলেও কিছু কবিতা অমুদ্রিত রয়েছে। এই শ্রেণিভুক্ত একটি কবিতা হল 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'। নন্দলালের 'দীক্ষা' ছবিটি দেখে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লেখেন তা *ভারতী* পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭)

উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলঙে ছিলেন সেসময়ে কার্শিয়াং থেকে নন্দলাল তাঁকে 'দেবদারু' ও 'শুকসারী' আঁকা পত্র পাঠান। কবি পত্রের উত্তরে লেখেন 'দেবদারু' কবিতা। ছবি সমেত কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় *বিচিত্রা* (কার্তিক, ১৩৩৪) পত্রিকায় ও পরে *বনবাণী* (১৩৩৮) কাব্যগ্রন্থে। কবিতার ভূমিকা অংশে রবীন্দ্রনাথ লেখেন –

> মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।[১০৭]

কার্শিয়াঙে থাকতে নন্দলালের পাঠানো আরেকটি চিত্রের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'শুকসারী' (৩১ বৈশাখ, ১৩৩৪) কবিতাটি। কবিতাটি প্রথম ছাপা হয় *উত্তরা* (আশ্বিন, ১৩৩৮) পত্রিকায় ও পরে *পরিশেষ* (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থে। কবিতাটির শিরোনামের নীচে লেখা – 'শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পাহাড়-আঁকা চিত্রপত্রিকার উত্তরে'।[১০৮] রবীন্দ্রনাথের *মহুয়া* (১৩৩৬) কব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রচ্ছন্না'[১০৯] ও 'প্রত্যাগত' কবিতা দুটি নন্দলাল বসুর আঁকা ছবির প্রেরণায় সৃষ্টি হয়েছে। ১০ আশ্বিন ১৩৩৫ 'প্রচ্ছন্না' লেখার শেষে ওই দিনেই লেখা নির্মলকুমারী মহলানবীশকে (১৯২৩–১৯৭২) চিঠি থেকে তা জানা যায়।[১১০] নন্দলালের সাঁওতাল দম্পতির ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ ২৭ পৌষ ১৩৩৫ 'প্রত্যাগত' কবিতায় লিখলেন –

> ...হেথা ফিরিবার তরে
> হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ লিখন
> আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ;
> সুদুরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
> আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
> যে পথ করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।।[১১১]

এই কবিতাটি লেখার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবীশকে বলেন -

> আমি একদিন আমার লিখবার টেবিলে বসে লিখছি হঠাৎ নন্দলাল ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সামনের দেওয়াল জুড়ে ছবিখানা এঁটে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। তখন ওর ঘরে 'গৌরীদান' আসন্ন

– সেই সময় বসে ছবিখানা এঁকেছে। ...চেয়ে চেয়ে ছবিখানা দেখলুম আর তখনি কবিতাটা তৈরি হয়ে গেল।[১১২]

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নন্দলাল বসুর একটি রঙিন ছবি দেখে কবি *বীথিকা* কাব্যগ্রন্থের 'গোধূলি' কবিতাটি লেখেন। *বিচিত্রা* (কার্তিক, ১৩৩৯) পত্রিকার 'প্রাসাদভবন' শিরোনামে প্রকাশিত কবিতাটির শেষে সম্পাদকের মন্তব্য ছিল যে কবিতাটি নন্দলাল বসুর ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।[১১৩] আলমোড়া থাকালীন নন্দলালের ছবির অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ *ছড়ার ছবি*-র অন্তর্গত কবিতাগুলি ছাড়াও আরো কিছু কবিতা *সেঁজুতি* (১৯৩৮), *আকাশপ্রদীপ* (১৯৩৯), *নবজাতক* (১৯৪০), *সানাই* (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

শ্রী নন্দলাল বসু (–) নামক গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার কানাই সামন্ত 'রূপরাগের কবি চিত্রকর' নামে একটি কবিতা লেখেন –

এইখানে

দিনযামিনীর উদয়াস্ত যেখানে সহজ,

হরগৌরির মিলন যেখানে সম্পূর্ণ,

অবারিত দিগ্‌বলয়ের কেন্দ্রস্থলে ছোট্টো বাড়ি।

বাস করেন ভক্ত নন্দলাল –

রূপরাগের কবি,

চিত্রকর।।[১১৪]

কানাই সামন্তের *শিল্পীগুরু নন্দলাল* গ্রন্থটির প্রবেশক অংশে 'আত্মকথা: শিল্পী নন্দলাল' নামক একটি কবিতা মুদ্রিত করা হয়েছে। এই কবিতাটি রচনার পিছনে নন্দলালের ভাবনা লুকিয়ে ছিল, নাকি নন্দলালের রচিত কবিতাই কানাই সামন্ত দ্বারা পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা জানা যায় না। সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪–১৯৭৪) তাঁর বান্ধবীকে বরোদা কীর্তি মন্দিরে 'নটীর পূজা' ফ্রেস্কো দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে 'নন্দলালের দেয়াল ছবি' কবিতাটি লেখেন।[১১৫] দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২–১৯৩৫) নন্দলাল বসুর উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে শিলং থেকে ৩১ মে ১৯২৭ তারিখে পত্র মারফৎ কবিতাটি পাঠান। নন্দলালের শিল্প প্রতিভার প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি লেখেন -

মোর মানস পটে ছবি আঁকি বটে

সে যে স্বপনের সাথী;

তব তুলির লিখন সে চিরন্তন

আমি খেলাঘর পাতি।[১১৬]

পত্রটির অন্তপর্বটি কৌতুকাবহ। কৌতুকের মাধ্যমে প্রবাসের বেদনা, অর্থের অপ্রতুলতা, পাহাড়ে বর্ষা আগমনের খবরের পাশাপাশি বন্ধু নন্দলালের সঙ্গে তাঁর সুমধুর সম্পর্কের দিকটিও প্রতিভাত হয়।

নন্দলাল বসু কবি নন, শিল্পী। 'কিন্তু কবির প্রভাবে ছবির নন্দলাল তো কখনো কবিতা রচনা করেন নি'[১১৭] একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। নন্দলালের প্রকৃতি দর্শনের সঙ্গে কাব্যচেতনা সম্পৃক্ত। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে লেখা কিছু চিঠিপত্রে তাঁর কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর ২ জানুয়ারি ১৯২৪ তারিখে কানাই সামন্তকে লেখা চিঠিতে তিনি তাঁকে শিরোনামহীন গদ্যকবিতা লিখে পাঠান –

যারে ভালোবাসি, তার কথা কই।

তার ছবি লিখি, তারি গান গাই।

তুমি সরে দাঁড়াও – আড়াল হয়।

গান শুনতে দাও, গোল থামাও।

তার কথা যদি কও, সুরে সুর মিলাও,

তারই ঢঙে বেঁকে দাঁড়াও, মনে মন দাও,

ভেঙচি রাখো।[১১৮]

নন্দলাল বসুর চিত্রশিক্ষার পদ্ধতি ছিল সহজ সরল অথচ অভিনব। রঙ-রেখার জটিল বিষয়গুলি সহজে মনে রাখার জন্য ছড়ার আকারে লিখে রাখতেন। এইসব ছড়া তিনি পটুয়াদের থেকে সংগ্রহ করে, কখনো এর সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে নতুন রূপ দিতেন। তিনি এই সমস্ত ছড়াকে 'গড়নের ছড়া' বা 'রঙের ছড়া' বলে অভিহিত করে *শিল্পচর্চা*-র 'ছবির ছড়া' অধ্যায়ে বলেছেন –

এগুলি ছড়া, কবিতা নয় বা রসাত্মক বাক্য নয়, নির্দোষ উপমা অলংকার ছন্দ কেউ আশা করবেন না। তবে, শিল্পীর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে পূর্বগামী গুণীগণেরও, সোজা-সরল ভাষায় ব্যক্ত

হয়েছে – যদি কখনো কারও কাজে লাগে। কিছু হয়তো পূর্বপ্রচলিত ‘বচন’ও এর মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে থাকবে, বলা যায় না। বিষয়টি এমন যে, ছড়া-কার আন্‌কোরা নূতনত্বের কোনো প্রকার দাবিদাওয়া রাখেন না।[১১৯]

‘গড়নের ছড়া’, ‘রঙের ছড়া’ ছড়াগুলি তাঁর দ্বারা সংকলিত এবং সংযোজিত হয়েছে। যেমন -

গড়নের ছড়া

পিঠ উঁচা, পেট ধ্বসা –
গড়নের এই ভাষা।।

সিধা সাদা নধর যা
চট্‌ করে ভাঙে তা।।

রঙের ছড়া

তিন হল মূল রঙ আর তিন মিশাল।
মূল বরণ নীল হলদে আর লাল।।...

সম্বাদী বাপ-মা যে বড়ই উদাস
ছোট্টো একটি বাদী রঙ কোলে পেতে আশ।।[১২০]

খ. ধর্মসাহিত্য

১) পাঠ্যপুস্তক ও শিল্প পুস্তকের চিত্রায়ণ

শৈশব থেকেই নন্দলাল ছবি আঁকার প্রতি তিনি আন্তরিক টান অনুভব করেন। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় নন্দলাল সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে *হিতোপদেশ*-এর (সম্ভবত ৮০০–৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) ‘মিত্রলাভ’ প্রসঙ্গে ‘সন্ন্যাসী বীণাকর্ণ চূড়াকর্ণ আর মুষিকের কথা’ গল্পটি পড়েন। এই গল্প অবলম্বনে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি রঙিন ছবি আঁকেন। এরপর জেনারেল অ্যাসম্‌ব্লিতে পাঠগ্রহণকালে ১৯০৩–০৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ওয়ার্ডসওয়ার্থের (১৭৭০–১৮৫০) কবিতা অবলম্বনে পাঠ্যপুস্তকের মার্জিনে ‘Daffodils’, ‘Lucy Gray’, ‘Dora’ ইত্যাদি আট-দশটি রঙিন চিত্র আঁকেন।[১২১] নন্দলালের জ্ঞাতি দাদা দেবব্রত বসুর (১৮৮১–১৯১৮) (পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) কাছে সংস্কৃত

পড়াকালীন ‘কাদম্বরী’ চিত্রাবলি আঁকার প্রেরণা পান। বাণভট্টের (৬০৬-৬৪৭) লেখা *কাদম্বরী*-র (সপ্তম শতক) নানা চিত্রাংশ তিনি নন্দলালকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। সেই ব্যাখ্যা শুনে নন্দলাল ‘বীণাবাদিনী মহাশ্বেতা’ ছবিটি আঁকেন।[১২২]

আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী *রূপমালা* নামক একটি অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথি উদ্ধার করেন। তিনি মূল শ্লোকগুলি বাংলা অক্ষরে, এবং তার ইংরেজি অনুবাদ লেখেন। এই মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুঁথিখানি তিনি তাঁর বন্ধু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেন। শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কালে তিনি ১৯০৭-০৮ সালের দিকে এই বই থেকে দেবদেবীর রূপবর্ণনা করেন। সেই ব্যাখ্যা শুনে নন্দলাল বসু ও তাঁর সতীর্থরা বহু দেবদেবীর ছবি আঁকেন। শিক্ষকতার চিহ্নসমেত এই পুঁথিখানি পরবর্তীকালে তিনি নন্দলাল বসুকে অর্পণ করেন।[১২৩]

২) শৈব-শাক্ত ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনি চিত্রায়ণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাবকত্বে ও স্বদেশ প্রীতির বাতাবরণে নন্দলাল বেঙ্গল স্কুলের ঘরানায় ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অনুসারী চিত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। ফলে তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের ছবিগুলি ভারতবর্ষের কাব্য, মহাকাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মীয় কাহিনি ও লোককথার চরিত্র ও ঘটনাবলি অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে। এর পরে সাধারণ জনজীবন, প্রকৃতি সমস্ত বিষয় নিয়ে বহু চিত্র রচনা করলেও পৌরাণিক চরিত্ররা তাঁর পটে ফিরে ফিরে এসেছে। পট বা বটতলার সৌজন্যে এতকাল ধরে দেবদেবীর যে রূপকল্প চলে আসছিল ছাত্রজীবনেই তিনি তা সযত্নে পরিত্যাগ করেন। বিভিন্ন দেবদেবী ও পৌরাণিক চরিত্রগুলির রূপকল্পনায় তিনি বর্তমান যুগের রুচিকে প্রাধান্য দেন। *শিবপুরাণ*-এর চিত্ররূপায়ণে নন্দলাল অসামান্য কল্পনাশক্তি ও শিল্প প্রতিভার চিহ্ন রেখে গেছেন। বাংলায় মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য লৌকিক সাহিত্যের প্রভাবে গুম্ফ-শ্মশ্রুযুক্ত নধর দেহবিশিষ্ট শিবকল্পনা প্রকাশ পেয়ে আসছিল। নন্দলাল এই লৌকিক শিবের পুনরাবৃত্তি করেননি।[১২৪] তিনি প্রাচীন মূর্তিতত্ত্ব এবং তার ভাস্কর্যরূপের পর্যালোচনা করে শিবের রূপকল্পনা করেছেন –

> তাঁর চিত্রের শিবকে তিনি শাস্ত্রসম্মত ভাবেই তরুণ স্থিতধী, প্রাজ্ঞ ও সুদর্শন করে চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে তাঁর শিব ধ্যানগম্ভীর, যোগী, দেবপ্রতিম। শিবের মূর্তি পরিচয়ের সমস্ত চিহ্নগুলিকে অত্যন্ত

> সুকৌশলে সংস্থাপিত করেছেন শিল্পী। এই সব চিহ্ন গুলির অবস্থান সত্ত্বেও শিবের ধ্যানগম্ভীর উজ্জ্বল মূর্তিটিই চিত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।[১২৫]

পুরাণ এবং শৈববিষয়ক কাব্যকাহিনি অবলম্বন করে তিনি বহু চিত্র এঁকেছেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এ বিষয়ে আঁকা 'শিব-সতী' (সতীর দেহত্যাগ) ছবিটিতে পুরাণবর্ণিত শিবের শোকার্ত প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এই ছবিতে আঁকা শিবের মুখটি বড় করে এঁকে নাম দেন 'মহাদেব'। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের এই কাহিনি নিয়েই ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'শিবতাণ্ডব'। এখানে প্রকাশ পায় শিবের সংহার মূর্তি। ছবিটি সম্পর্কে নিবেদিতা বলেন –

> আমরা সেই সৃষ্টির সাক্ষাৎ পেলাম যা এমনই মনস্তাত্ত্বিক, এমনই ধ্যাননিমগ্ন এবং ভাবগাঢ় যে সমালোচনার ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়।[১২৬]

শিবতাণ্ডব নামক ছবিটি তিনি বহুবার বহুভাবে এঁকেছেন। অন্নপূর্ণা ও শিবের কাহিনি নিয়ে 'দীক্ষা' ছবিটি এঁকেছেন ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। ছবিটি ভারতীতে মুদ্রিত হয়। ছবিটির পরিচয় লিপিতে লেখা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ছত্র – 'মৌনেরে ঘিরিছে গান স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন সফেন চঞ্চল নৃত্য'।[১২৭] পরবর্তীকালে বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে চিত্রটি নবরূপে উপস্থাপন করলেন। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এর পংক্তি অবলম্বনে নাম দেন –

> অন্নপূর্ণা যার ঘরে   সে কাঁন্দে অন্নের তরে
>
> এ বড় মায়ার পরমাদ।।[১২৮]

এই চিত্রে দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে রুদ্ররূপী ক্ষুধাতুর কঙ্কালসার শিবের মূর্তি কল্পনায় প্রকাশ পেল শিল্পীর সমকাল চেতনা। ১৯১০ ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে আঁকা 'হিমালয়ে শিব', 'জীবন ও মৃত্যু' এই চিত্রদুটিতে শিল্পীর কল্পনায় পৌরাণিক শিবের প্রতিমূর্তি ফুটে উঠল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আঁকলেন পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে আঁকলেন 'বর্ষফল কথনে শিব পার্বতী'। এখানে শিব পার্বতী শান্তরসের প্রতিকৃতি।[১২৯] এই সময় শৈবপুরাণের কাহিনি চিত্রায়ণ ছাড়াও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে *Mythes of the Hindus and Buddhists*–এর জন্য অনেকগুলি চিত্র নন্দলাল আঁকলেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে আঁকা 'শিবের বিষপান' এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই চিত্রটিতে ভারতীয় শাস্ত্রসম্মত শিবের শান্ত, স্থিতধী, শিবের যোগী মূর্তি দেখিতে পাই। পৌরাণিক দেবতা হিসাবে নন্দলাল বসু চিত্রে শিব গুরুত্বপূর্ণ

স্থান অধিকার করেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে চিত্রে ও ভাস্কর্যে শিবদেবতা রূপবন্ধ হয়ে এসেছে নানা ভঙ্গীতে, নানা রূপে, নানা ভাবে। দক্ষিণ ভারতের পঞ্চলৌহ নির্মিত শিবের ভাবাভিব্যক্তির সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও নন্দলালের শিবচরিত্র রূপায়ণ মৌলিক ও অনন্য। তাঁর শিব হলেন যৌবনের প্রতীক। শৈব বিষয়ক নানা চিত্রের মূলপরিকল্পনা, রেখা বর্ণ সর্বোপরি গভীর ভাবাভিব্যক্তিতে অতুলনীয়।[১৩০] শৈবপুরাণের দেবতা শিব ছাড়াও শিবপত্নী উমা, কালী, তারা, অন্নপূর্ণা ও সতীর নানা উপাখ্যান অবলম্বন করে নন্দলাল বসু বহু ছবি এঁকেছেন। দেবী উমা বিষয়ক চিত্রগুলি হল 'উমার তপস্যা' (১৯১৩), 'উমার বেদনা' (১৯২১, ১৯৩৪, ১৯৪৯)। কালিদাসের *কুমারসম্ভব* (গুপ্তযুগে) কাব্যের কাহিনি অবলম্বনে ছবিটি আঁকা হয়েছে। উমা শিবকে পদ্মবীজের মালা নিবেদন করতে এলে শিব তা প্রত্যাখ্যান করেন। বরফাবৃত স্থানে উমা তাঁর এক সখীকে অবলম্বন করে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চারপাশে ঝরা পদ্মের পাপড়ি আর ছেঁড়া মালা উমার হৃদয়ভঙ্গের উপমায় ব্যবহৃত হয়েছে।[১৩১] ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে নন্দলাল বসু 'কালী' ছবিটি আঁকেন। সংস্কারবশত কালীমূর্তির গায়ে কাপড় জড়িয়ে দেন তিনি। সিস্টার নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের কালী বর্ণনা পড়ে শাস্ত্রমতে কালী মূর্তি অঙ্কনের পরামর্শ দেন।[১৩২] পুরাণবর্ণনা ও নিজ কল্পনায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'নৃত্যরতা কালী' আঁকেন। এরপরও বহুবার তিনি কালী চিত্র এঁকেছেন।

পৌরাণিক দেবীদুর্গাকেও নন্দলাল বসু নানারূপে বহুবার এঁকেছেন। ইলোরার মূর্তি, মহাবলীপুরমের দুর্গা, অজন্তার অলংকরণ, পুরাণের কাহিনি সমস্তকিছুর প্রভাব পড়েছে দুর্গা রূপকল্পনায়। প্রতি বৎসর পূজার সময় আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক পূজা সংখ্যার জন্য বেশ কয়েক বছর দুর্গামূর্তির রেখাচিত্র আঁকেন। তার মধ্যে যেটিতে দুর্গা মহিষাসুরের ছিন্নমস্তক বর্শাবিদ্ধ করে উর্ধ্বে তুলে ধরে আছেন সেটিও মহিষাসুর নিধনের এক মূর্তিমতী শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়ের ভঙ্গি।[১৩৩] 'আগমনী'তে (১৯৪১) শাক্ত পদাবলির এক অতি পরিচিত কাহিনি চিত্রায়িত হয়েছে। সেটিতে দেখা যায় উমার নৌকা ঘাটে এসে ভিড়েছে। দাসদাসীরা মালপত্র নামাচ্ছে। অন্যদিকে গণেশ তাঁর আসনে উপবিষ্ট হয়েছেন, সম্মুখে মঙ্গলঘট রাখা হয়েছে। মা মেনকা নত হয়ে তাঁকে আবাহন করছেন।[১৩৪]

শিল্পবিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণকালে নন্দলাল *অগ্নিপুরাণ* ও *মহাভারতে*র বর্ণনা অনুযায়ী অগ্নিদেবের রূপকল্পনা করেন। রেখা-বর্ণ-ভাব ও রূপ সব মিলে অগ্নির কল্পনা শিল্পীর অতি অভিনব ও অনবদ্য

সৃষ্টি। বিষয়বস্তু হিসেবে এই ছবিটি ভারতের চিত্রকলায় একটি ‘নতুনযোজনা’।[১৩৫] ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে *বিষ্ণুপুরাণের* কাহিনি অবলম্বনে আঁকেন ‘বিষ্ণুর গজ উদ্ধার’। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অবলম্বন করে আঁকেন হনুমান (১৯০৬), সরস্বতী (১৯০৬), ‘গরুড়’ (১৯১৩), ‘যমুনা ও গঙ্গা’ (১৯২৬), ‘গঙ্গা’ (১৯৩৩), ‘লক্ষ্মী ও সরস্বতী’ (১৯৩৯) প্রভৃতি দেবদেবী। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন *ঋগ্বেদ*-এর ভাবানুসারী ছবি ‘সাতজন মা’। মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে আঁকেন ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন ‘বেহুলা লখিন্দর’। *ধর্মমঙ্গলের* কাহিনি নিয়ে তিনি তাঁর ডায়েরিতে আঁকেন লাউসেনের বাঘবধ, গণ্ডাবধ ইত্যাদি।

৩) রামায়ণ-মহাভারত ও কৃষ্ণলীলার কাহিনি চিত্রায়ণ

সিস্টার নিবেদিতা নন্দলালকে *রামায়ণ মহাভারত* থেকে বীরত্বপূর্ণ সব কাহিনি নিয়ে ছবি আঁকতে বলেন। তাঁর নির্দেশ ও সুপরামর্শে তিনি সেই সময় *রামায়ণ মহাভারত* নিয়ে অজস্র ছবি আঁকেন। সেই সমস্ত ছবিতে বীরত্বব্যঞ্জক ভাব লক্ষ করা যায়। সেই সময় ও পরবর্তীকালে নানা মাধ্যমে এই দুই মহাকাব্যের নানা কাহিনি ও চরিত্রের চিত্ররূপ দেন। *রামায়ণ* সিরিজের ছবিগুলি আঁকার উৎসাহ পান বেলুড়মঠে *রামায়ণ* পাঠের ভিতর দিয়ে।[১৩৬] *রামায়ণ* বিষয়ক প্রথম ছবিটি আঁকেন দশরথ চরিত্রটি নিয়ে। বৃদ্ধ অসুস্থ ‘দশরথের অন্তিমশয্যা’ আঁকেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। ছবিটি সম্পর্কে নিবেদিতা বলেন –

> এখানে শোকের অশালীন উচ্ছ্বাস নেই। সবকিছু শান্ত, নিঃশব্দ, নিয়ন্ত্রিত। জলরঙের কাজ। মূল ছবিটি হাতে নিলে তার বিষয়ে মৃদু চাপা-স্বরে কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না।[১৩৭]

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দেই আঁকেন ‘উর্মিলা’, ‘কৈকেয়ী ও মন্থরা’। ‘কৈকেয়ী ও মন্থরা’ ছবিটিতে নন্দলাল কৈকেয়ীর ছবিটি আঁকেন, এর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের বাড়ির বুড়ি দাসীর আদলে মন্থরা চরিত্রটি যুক্ত করেন।[১৩৮] কৈকেয়ীর কুঞ্চিত ভ্রূযুগল, সর্পিল কেশরাশি, বাঁকাচোরা বসবার ভঙ্গি, এলোমেলো বস্ত্র তাঁর মনের ক্রুরতার প্রকাশ করছে।[১৩৯] ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন ‘অহল্যা উদ্ধার’। ছবিটিতে দেখা যায় বিশ্বামিত্র-রাম-লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন। পাথর ভেঙ্গে উদ্ধার পেয়ে অহল্যা জোড় হাতে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৯১০–১১ খ্রিস্টাব্দে কুড়িটি রামায়ণী পট আঁকেন। ছবিগুলি হল – ক) দশরথের কোলে রামচন্দ্র, খ) কৌশল্যার কোলে রামচন্দ্র, গ) বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণের

তাড়কা-বধে যাত্রা, ঘ) অহল্যা উদ্ধারের পর রামচন্দ্রকে প্রণাম করছেন, ঙ) হরধনুভঙ্গের পর শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার মাল্যদান, চ) পরশুরাম পরাজয়, ছ) গঙ্গাপারঘাটে গুহক কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পাদপ্রক্ষালন, জ) পঞ্চবটীতে সীতা রাম ও লক্ষ্মণ, ঝ) মারীচ মৃগের পশ্চাদ্ধাবন-কুটিরে সীতা একাকিনী, ঞ) মায়ামৃগ বধ ও সীতাহরণ, ট) জটায়ু ও রামলক্ষ্মণ, ঠ) বৃদ্ধা শবরীর প্রেম, ড) বালি সুগ্রীব ও রামচন্দ্র, ঢ) সুগ্রীব ও রামলক্ষ্মণ, ণ) সীতাস্মরণ, ত) সমুদ্রের নিকট রামের ধর্ণা, থ) সেতুবন্ধন বা সমুদ্রশাসন, দ) ইন্দ্রজিৎবধ, ধ) বানরকটক সমেত শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধ, ন) যুদ্ধান্তে সীতার লঙ্কাপ্রবেশ। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আরো একবার *রামায়ণ* চিত্রাবলি অঙ্কন করেন। সেই সময়ে আঁকা চিত্রগুলি হল – রাম ও কৌশল্যা, রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, রাম ও অহল্যা, রামের বিবাহ।

মহাভারত বিষয়ে ছবি আঁকার প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের (১৯১৬–২০১৭) কাছে বলেন যে তিনি *মহাভারত* বিষয়ে নানা ভাবে জানতে চেষ্টা করেছেন এবং এই মহাকাব্য নিয়ে অনেক ছবি করেছেন। শরৎ মহারাজের কাছে মহাভারতের নানা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুঝে নিয়ে তা রূপায়ণ করেছেন।[১৪০] *মহাভারত* তথা কর্ণ বিষয়ে তাঁর প্রথম ছবি 'কর্ণের সূর্যপূজা' (১৯০৭)। ছবিটিতে দেখা যায় কর্ণ পায়ের কাছে তাঁর বর্ম খুলে রেখে সূর্যোদয় কালে সূর্য পূজা করছেন।[১৪১] তাঁর দাদাশ্বশুরের আদলে আঁকেন 'ধৃতরাষ্ট্র' (১৯০৭)।[১৪২] এরপর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে একে একে আঁকেন 'গান্ধারী ও কুন্তী', 'সাবিত্রী ও যম', 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা', 'দয়মন্তীর স্বয়ম্বর', 'কর্ণ'। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে 'জতুগৃহদাহ'। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে 'একলব্য', 'কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রপরীক্ষা', 'হরিশচন্দ্র', 'দ্রোণের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাদান'। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে 'পার্থসারথি'। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'কিরাতার্জুন', 'যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান', 'ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়'। এরমধ্যে অনেক ছবি *Mythes of the Hindus and Buddhists* গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য *মহাভারতের* সাতটি ভিত্তিচিত্র অঙ্কন করেন। চিত্রগুলি হল – ক) 'পার্থসারথি, খ) 'পাশাখেলা', গ) 'কৌরবের মন্ত্রণা', ঘ) 'পাণ্ডবগণের বিষাদ', ঙ) 'দুর্যোধন যুদ্ধ করছেন', চ) 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ পর্ব', ছ) 'যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান'। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী'। এই চিত্রটির বিশেষত্ব হল, কেবলমাত্র দুজোড়া পায়ের ছবিতেই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মনের অবস্থা এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৪৩] ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'শিবিরে কৃষ্ণ ও অর্জুন'। এই ছবিটি আগে আঁকা পার্থসারথি থেকে ভিন্ন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'অর্জুনের

অনুশোচনা', 'কুরুক্ষেত্র'। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'পাণ্ডবের পাশাখেলা'। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'অর্জুন'। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'কর্ণ ও কুন্তী', 'অর্জুনের বিষাদ মূর্তি' এবং 'চিত্রাঙ্গদা'। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে *মহাভারত*-এর কাহিনি অবলম্বনে বরোদা কীর্তিমন্দিরের মুর‍্যাল চিত্র 'অভিমন্যুর বূহ্যভেদ' রচনা করেন। *মহাভারত*-এর পার্থসারথির ছবি নন্দলাল বহুবার এঁকেছেন। এই বিষয়ে ছবি করবার সময় স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা তাঁকে অদ্ভুতভাবে সাহায্য করেছে।[১৪৪] 'শায়িত অর্জুন' ছবিটিতে নিদ্রাভঙ্গে সচকিত অর্জুন যেন ক্রুদ্ধ সিংহের মত, কেশরের মত চুল, দুই হাত যেন সিংহের থাবা, তার দেহের বলিষ্ঠ মাংসপেশী অমিত বীর্যবত্তার পরিচায়ক।[১৪৫]

পুরাণ, *মহাভারত* ও ভারতবর্ষে প্রচলিত নানা লোককাথা, পদাবলি সাহিত্য ও মন্দিরের ভাস্কর্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নানা ছবি নন্দলাল বসু আঁকেন। স্ত্রী সত্যভামার সঙ্গে, অর্জুনের সঙ্গে, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের এবং কেবলমাত্র রাধার বা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নানা ছবি রয়েছে। কৃষ্ণকথা বিষয়ক তাঁর প্রথম ছবিটি হল 'নৌকাবিহার' (১৯০৯)। চিত্রটিতে দেখা যায় কৃষ্ণ নৌকায় বসে রয়েছেন, রাধিকাকে ধরে তুলছেন এবং সেই নৌকায় দুজন সখী বসে রয়েছেন। এরপর 'রাধিকা' (১৯১০), 'শ্রীকৃষ্ণ' (১৯১০), 'কৃষ্ণ রাধা' (১৯১১, ১৯১২), 'জন্মাষ্টমী' (১৯১৩), 'সুদামা ও কৃষ্ণ' (১৯১৯), 'জন্মাষ্টমী আরাধনা' (১৯৩৩), 'শ্রীকৃষ্ণ' (১৯৩৫), 'রাধার বিরহ' (১৯৩৬), 'রাধা' (১৯৪৩), 'কৃষ্ণ সুবলের প্রথম সাক্ষাৎ' (১৯৪৭), 'রাধা' (১৯৪৭), 'যশোদা ও গোপাল' (১৯৪৯), 'গোপালসহ যশোদার দধি মন্থন' (১৯৪৯), 'কৃষ্ণের নিকট রাধার বাঁশীবাদন শিক্ষা' (১৯৪৯), 'গোপালসহ কৃষ্ণ বলরাম' (১৯৪৯), 'রাধাকৃষ্ণের বংশীবাদন' (১৯৪৯) ইত্যাদি।

৪) চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রিস্ট চরিত চিত্রায়ণ

নন্দলাল বসু চৈতন্য চরিত সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে সমস্ত ছবি আঁকেন সেগুলি হল – 'শ্রী চৈতন্যের জন্ম' (১৯০৯, ১৯১৭, ১৯৩০, ১৯৩২), 'জগাই মাধাই' (১৯১০, ১৯১৩), 'গ্রন্থ রচনারত শ্রীচৈতন্য' (১৯২৬), 'শ্রীচৈতন্য' (১৯২৭), 'টোলে শিক্ষাদানরত চৈতন্য' (১৯২৯), 'শ্রীচৈতন্যের জন্ম' (১৯৩২) শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের বারান্দার ভিত্তিচিত্র, 'চৈতন্যের গৃহত্যাগ' (১৯৩৪), 'নীলাচলে কীর্তন'

(১৯৩৫), 'চৈতন্যের তীর্থযাত্রা' (১৯৩৭), 'গৌরাঙ্গ ও হরিদাস' (১৯৪০), 'পূর্ণিমায় সমুদ্রতীরে চৈতন্য' (১৯৪৮), 'পুরীর মন্দিরে চৈতন্যের কীর্তনগান' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

গৌতমবুদ্ধের জীবন, বৌদ্ধ গ্রন্থাদি, জাতকের কাহিনি এবং অজন্তার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গুহাচিত্রগুলির প্রভাবে বৌদ্ধ বিষয়ক বহু চিত্র রচনা করেন। বৌদ্ধ বিষয়ক চিত্র রচনা অজন্তা যাওয়ার পূর্বেই শুরু করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন সিদ্ধার্থ কোলে হাঁস নিয়ে বসে আছেন। তারপর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'বুদ্ধ ও আহত হংস', 'বুদ্ধের গৃহত্যাগ'। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে অজন্তা গিয়ে আঁকেন 'যশোধরা', 'যশোধরা ও রাহুল'। এই সময়ই জাতক কাহিনির প্রেক্ষাপটে আঁকেন নীলপদ্ম হাতে গৌতম, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। এরপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন 'বুদ্ধের আর্তসেবা', 'ভেড়া কাঁধে বুদ্ধ'। 'ভেড়া কাঁধে বুদ্ধ' ছবিটি পুনরায় আঁকেন। তবে দ্বিতীয় ছবিটি রাজগৃহে আর প্রথম ছবিটি নদীতীরে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে 'কুণাল কাঞ্চনমালা' (দুবার), 'সংঘমিত্রা' অঙ্কন করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'জাতক' কাহিনি নিয়ে বৌদ্ধ বিষয়ক এক সিরিজ ছবি আঁকেন। বুদ্ধ সিরিজের ছবিগুলি হল – 'বুদ্ধের জন্ম', 'আত্মত্যাগ', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'বুদ্ধ ও আম্রপালী', 'স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন', 'মহাপরিনির্বাণ'। বৌদ্ধ বিষয়ক আঁকা তাঁর শেষ ছবিটি হল 'সুজাতা' (১৯৪২)। খ্রিস্ট কাহিনি নিয়ে আঁকেন 'ক্রুশ বহনকারী যীশু' (১৯৪৫), ও 'ধীবরদের মধ্যে যীশুখৃষ্ট' (১৯৪৭)।

৫) কিংবদন্তি, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, ঐতিহাসিক কাহিনি চিত্রায়ণ

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিক্রম-বেতালের সংস্কৃত কিংবদন্তি অনুযায়ী 'বেতালপঞ্চবিংশতি' আঁকেন। ওই বছরের *মডার্ণ রিভিউ* পত্রিকার জুন সখ্যায় চিত্রটি সম্পর্কে বলা হয় –

> Through the dimness of reproduction, this picture speaks Vikramaditya marches on through the night, while the skeleton-nugure, on his back curls itself weirdly about him, laughing hollowly at the defeat it foresees for the King. How childlike and determined Vikramaditya! The sketch is full of humour. It belongs of course to the grotesque side of art, and while we love not grotesque, in and for itself, there can be no doubt that Indian fearlessness in dealing with it, is one of its greatest sign of strength and power.[১৮৬]

ঐতিহাসিক চরিত্র রানি পদ্মিনীর কাহিনি বর্ণিত গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি আঁকেন রানি 'পদ্মিনী' (১৯০৭, ১৯০৯), 'পদ্মিনী ও ভিমসিংহ' (১৯০৮)। কালিদাসের *অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম* অবলম্বনে আঁকেন

‘শকুন্তলা’ (১৯৪৬)। নন্দলাল আধুনিক সাহিত্যকদের রচিত নানা গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু চিত্র অঙ্কন করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা *রাজকাহিনী* পড়ে ‘দীক্ষা’ ছবিটি আঁকেন। অনেকে এই ছবিটিকে ‘হাতে-খড়ি’ নামে জানেন। নন্দলাল বসুর মতে সেই নামকরণ সঠিক নয়।[১৪৭] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮–১৮৯৪) লেখা *ইন্দিরা* (১৮৯৩) উপন্যাস অবলম্বনে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নন্দলালের আঁকা ইন্দিরা ছবিটি *প্রবাসী*-তে মুদ্রিত হয়। ছবিটিতে দেখা যায় গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইন্দিরা কালাদীঘির পাড়ে ডুলিতে বসে পর্দা ফাঁক করে দেখছে।[১৪৮] ১৯১১ খ্রিস্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ডাকঘর* (১৯১১) অবলম্বনে আঁকা ‘ডাকহরকরা’ ছবিটিও *প্রবাসী*-তে মুদ্রিত হয়।[১৪৯] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে *গীতবিতান*-এর ক) ‘আমার এ গান ছেড়েছে’, খ) ‘আজি ঝড়ের রাতে’, গ) ‘আমি হেথায় শুধু গাহিতে তোমার গান’ – এই তিনটি গান অবলম্বনে নন্দলাল ছবি আঁকেন।[১৫০] যদিও সচিত্র *গীতবিতান* কখনো প্রকাশিত হয়নি।[১৫১] ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বিরচিত ‘আকাশ হতে আকাশ-পথে’ গানটির দ্বিতীয় পংক্তির শিরোনাম ভূষিত, ‘ঝরছে জগৎ ঝরণা ধারার মতো’ ছবিটি তিনি আঁকেন।[১৫২] ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য’ ও ‘এ মোর প্রার্থনা’ কবিতা দুটি টেম্পেরায় চিত্রায়িত করেন। *শিশু ভোলানাথ*-এর (১৯২২) রেখাচিত্র আঁকেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। সিল্কের উপর ব্রাশ ড্রইং করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আঁকেন ‘চণ্ডালিকা’ (১৯৩৩)।

৪.২.১ যামিনী রায়

ক. কাব্য

শিল্পী সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে ছবি আঁকেন, ভাস্কর্য গড়েন আর সাহিত্যিক সেই শিল্পকীর্তি দেখে শিল্পরসে অভিভূত হয়ে কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেন। এভাবেই শিল্প ও সাহিত্য সম্মিলিত কর্মযোগে সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ চল্লিশের দশকে যামিনী রায় এবং তাঁকে ঘিরে থাকা সাহিত্যিকগোষ্ঠীর হৃদ্যতার সম্পর্ক এই বিষয়ের উদাহরণ হতেই পারে। যামিনীর সাহিত্যিক বন্ধুদের লেখায় ফুটে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্ব, শিল্পচর্চার নানা দিক। বিষ্ণু দের *পূর্বলেখ* কাব্যগ্রন্থে ‘যামিনী রায়ের একটি ছবি’ (১৯৩৭) শীর্ষক কবিতাটি যামিনীর ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা।[১৫৩] *রামায়ণে*

উল্লিখিত জটায়ুর কল্পমূর্তি চিত্রায়ণে সামান্য লক্ষণের জগত সম্পর্কে যামিনীর দর্শনকে বিষ্ণু অভিব্যক্ত করেছেন এই কবিতাটির মাধ্যমে –

নীলিমার শূন্যস্রোতে যত, বিহঙ্গম!

...যদি না জটায়ুভাগ্যে একদিন থেমে যায়

পক্ষবিধুনন, আর অকস্মাৎ নেমে যায়

উর্ধ্বগ্রীব আশা![১৫৪]

যামিনী পুত্র অমিয় রায়ের উদ্দেশে 'যামিনী রায়ের এক ছবি' শিরোনামে (*আলেখ্য*, ১৯৫৮) বিষ্ণুর লেখা আরেকটি কবিতায় যামিনীর ছবির প্রতি কবির আকর্ষণ এবং ছবির ভাবমূল্য ব্যক্ত হয়েছে। কবির ভাষায় –

প্রকৃতি বৃথা গায়, মানুষের ক্ষোভের নির্ঝর

চোখের ধূসরে আঁকে যামিনী রায়ের এক ছবি।[১৫৫]

অন্য এক শিল্পীর ছবির রেখা রঙের বিস্তার দেখে মুগ্ধ কবি বিষ্ণু অনুভব করেন ছবিটি যামিনীর প্রতিদিনের ছবির একটি অংশ মাত্র। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবী যে রূপরাজিকে গড়ে তুলেছে তার একটি মূহূর্ত যামিনীর আঁকা ছবিতে স্তব্ধ হয়ে গেলেও তার মধ্যে থাকে শিল্পীর পঞ্চাশ বছরের সাধনা, তাঁর বংশ, চৈতন্য, ভুলে যাওয়া অতীতের পুণর্জাগরণ, দৈনন্দিন সত্য, সমগ্র দেশ, জন্মভূমির প্রতি রক্তের টান, সমগ্র পৃথিবীর ছায়া। বিষ্ণুর 'তাই তো তোমাকে চাই' কবিতাটিতে এই অনুভূতি ব্যক্ত হয়।[১৫৬] যামিনীর জন্মদিন উপলক্ষে বিষ্ণু তাঁকে 'চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা' (রচনাকাল: ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ থেকে ২৯ মে) দীর্ঘকবিতা উৎসর্গ করেন। হাহাকার-হানাহানির পৃথিবীতে আনন্দরূপ ও চিরন্তনতার সন্ধানী যামিনী রায়ের ভাবনায় অভিভূত কবি বিষ্ণু দে মনেপ্রাণে সেই আনন্দরূপকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়ে লেখেন –

যেহেতু আনন্দরূপ তুমি আমিও বুঝিবা

দেখেছি হয় তো কোনোদিন...[১৫৭]

কবিতার কিছু পংক্তি যামিনীর সংগ্রামকে যেন কুর্ণিশ জানায়। যামিনী সহজ অর্থ উপার্জনের পথ ছেড়ে শিল্পসত্য ও আনন্দরূপের সন্ধানে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটালেও হৃদয়ের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বেচ্ছায় জীবন সংগ্রামের কঠিন পথে পা বাড়ান। শৈশবের স্মৃতির পাতা উলটিয়ে নবসৃষ্টিতে মেতে ওঠেন। অভাবের কাছে হার না মানা মানসিকতাকে সম্মান জানিয়ে কবি বলেন –

> স্মৃতির প্রতাপ আর আশার স্পন্দন শত হাহাকারে
>
> ঈদের রোজায় আর চড়কের ব্রতে আর উপোসী ঈস্টারে।[১৫৮]

এই কবিতার অন্দরেই কান পাতলে শোনা যায় যামিনী রায়ের সমকালীন চিত্রচর্চায় ইতিহাস। যামিনী যেমন করে সমকালের গ্লানি থেকে ছবিকে মুক্ত করে স্বপ্নময় পরিবেশ রচনা করে প্রেমকে লালন করেছেন, ছবিতে এনেছেন অরণ্যের শীতলতা, লোকসমাজের কণ্ঠস্বরকে তুলেধরেছেন, সর্বোপরি প্রকৃতি ও শিশুর সরলতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন; কবিও সেই পথে বিংশ শতাব্দীর সমাজ, রাজনৈতিক ও শিল্পচর্চার ওই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় দেখেছেন। *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থের 'শিল্পের আবেগ' কবিতায় কবি যখন বলেন –

> এ জীবনে তৃপ্তি শুধু তোমাতেই দীপ্তি শুধু তোমাতেই
>
> অশান্তি ও সান্ত্বনা তোমার,
>
> একমাত্র যে লাঞ্ছনা সওয়া যায় যে নিস্তব্ধে দুঃখভার বোয়া যায়
>
> অন্ধকারে সে তোমারই শুকতারা উপহার।[১৫৯]

তখন মনে হয় যামিনীর জীবন সংগ্রাম এবং কঠিন পরিস্থিতে তাঁর হার না মানা ব্যক্তিত্বের বন্দনা করছেন বিষ্ণু। যামিনী ও তাঁর ছবিকে ঘিরে কবির জীবনে যে আশ্রয় তৈরি হয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই অপর একটি কবিতায়। *সন্দীপের চর* (১৩৫৪) কাব্যগ্রন্থের 'কঙ্কালীতলা' কবিতায় কবি কোথাও যামিনী রায়ের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু কোথাও গিয়ে মনে হয় কবিতাটিতে ব্যবহৃত বিশেষ কিছু শব্দবন্ধ ও আবেগ আসলে যামিনীর প্রতি। সত্তার পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি শিল্পীকে ভালোবেসে, সম্মান জানিয়ে মনে মনে বেঁধে থাকার নিরব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন –

> তবু শুকতারা
>
> তোমাকে জেনেছি চিত্তে পৃথিবীর মর্ত্য পারিজাতে

বেঁধেছি হৃদয়ে দুইহাতে

বিভেদের পাহাড়ে নদীতে আমাদের মিল মীনকেতু

আপন আপন সত্তা আনে কড়ি কোমলের গানে।[১৬০]

বিষ্ণুর কবিতায় জরাজীর্ণ স্বার্থমগ্ন সমাজের ছবি থাকলেও শেষ পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয় আশার বাণী, আনন্দরূপ জগতের সন্ধান। কবি বুঝেছিলেন বর্তমান ছিন্নভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় নয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাণ চেতনার মধ্যে নিজেকে তৈরি করতে হবে। তবে তাঁর এই অতীতের দিকে যাত্রাকে সুখবিলাস বলা যায় না। বর্তমানের প্রাক্ষাপটে অতীতকে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে সজীব করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। ঐতিহ্যচেতনার ভিত্তিতে তিনি আরো দৃঢ় হতে পারেন যামিনীর ছবি ও জীবনদর্শনের অনুপ্রেরণায়। লোকচেতনা আর যামিনী তাই তাঁর কবিতায় মিলেমিশে থাকে। *অন্বিষ্ট* (১৯৫০) কাব্যগ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ‘প্রতীক্ষা’ কবিতাতে তিনি লেখেন –

তুমি করো গান,

তুমি আঁকো ছবি,

কর্মে রচনা করো তুমি নব প্রাণ,

তুমি তো আমার ভোরের স্বপ্নে আনন্দভৈরবী।[১৬১]

এই স্বীকারোক্তি তাঁর কবিতায় বার বার ফিরে আসে। কবি নির্দ্বিধায় আবেগ তাড়িত হয়ে ‘পাঁচ প্রহর’ কবিতায় বলতে পারেন –

আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, রাত্রি আদি নীল সমুদ্রের,

স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,

রঙের ঘনঘটা অতন্দ্রিত

অমোঘ শিল্পীর তুলির টান–

পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত–[১৬২]

যামিনী এবং বিষ্ণু উভয়েই সমকালকে উপেক্ষা করার প্রশ্নে বারবার দীর্ণ হয়েছেন। তাই কবি লিখছেন – ‘আমরা উভয়ে বারেবারে দেখেছি সে সম্মিলিত বাদ প্রতিবাদ’।[১৬৩] বিষ্ণু দে *ইতিহাসের ট্র্যাজিক*

উল্লাসে (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থের 'চেনা মুখের আদল' কবিতায় যামিনী রায়ের সর্বজনীন রূপকল্পনায় মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সীর মুখচ্ছবিকে তাঁর ছবির সঙ্গে তুলনা করে লেখেন –

এই মুখে বহু চেনা মুখের আদল।

...এ মুখ সাবেক, দেশি, বাংলা মনের

ঐতিহ্যের ছবি – যেন যামিনী রায়ের,

...সারা মুখে বাংলার আপ্লুত আদল।[১৬৪]

এই একই উপলব্ধি পাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৩–১৯৯৫) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে। তিনি জানান তাঁর চেতনায় জেগে থাকা যামিনী রায়ের আঁকা সার্বজনীন মাতৃমুখের ছবি তিনি কখনই ভুলতে পারেন না। কারণ সেই মুখের মধ্যে তিনি খুঁজে পান তাঁর মাকে, স্ত্রীকে, মেয়েকে।[১৬৫] যামিনী রায়ের প্রতি 'শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মুগ্ধ'[১৬৬] বিষ্ণুর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত যামিনী রায় বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ, যামিনীর লেখা দুটি প্রবন্ধ, যামিনীর সাক্ষাৎকার ও বিষ্ণুকে লেখা যামিনীর কিছু চিঠিপত্র নিয়ে *যামিনী রায়: তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক* (১৩৮৪) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে যামিনীর শিল্পদর্শন, তাঁর বলা নানা তত্ত্বকথা সহ যামিনী ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিষ্ণুর আবেগ, বিশ্লেষণ, প্রত্যয়, নিবেদন গ্রন্থটিকে অমূল্য করে তোলে।

যামিনী রায়ের সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে বিষ্ণু দের পরে স্মরণে আসে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে *Longman's Miscolini*–তে প্রকাশিত ইংরাজি ভাষায় রচিত সুধীন্দ্রনাথের 'যামিনী রায়' শিরোনামের দীর্ঘ প্রবন্ধটি যামিনীর ছবির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেখা। প্রবন্ধকারের মতে ছবির বিষয়ের ভিত্তিতে যদি জাতির পরিচয় গড়ে ওঠে তাহলে যামিনী রায়ের ছবি 'ভারতশিল্পের উজ্জ্বলতম নিদর্শন'। রেখাঙ্কন, বর্ণ (টেম্পেরা) ব্যবহারে তিনি ভীষণ রকম ভারতীয়।[১৬৭] যামিনীর ছবির বিষয়, আঙ্গিক, উপকরণ সবেতেই ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করে দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন – 'এমন বাঙালী মানসিকতা এবং নির্ভেজাল ভারতীয়তার কাছে মাথা আপনি নুইয়ে আসে'।[১৬৮] কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও যামিনীকে 'খাঁটি ভারতবর্ষের মানুষ' বলে অভিহিত করে বলেছেন শিল্পীর 'উপলব্ধি দেশের রক্তে স্নায়ুমণ্ডলীতে জৈব কোশে-কোশে প্রসার লাভ করেছে'।[১৬৯] সুধীন্দ্রনাথ যামিনীর ছবির সঙ্গে কখনো কখনো বিদেশি শিল্পীর তুলনা টেনে ও অন্যান্য নানা যুক্তির

জ্বাল বুনে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিরূপ সমালোচনার যোগ্য জবাব দিয়েছেন। যামিনীর ছবির বিশেষত্ব, গ্রহণ যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে এমন বিশ্লেষণ ছিল যথেষ্ট জরুরি ও সময়োপযোগী।

প্রগতিশীল লেখক-সম্মেলনে সুধীন্দ্রনাথের যামিনী রায় বিষয়ক বক্তৃতা শুনে এবং তাঁর ছবির প্রদর্শনী দেখে বুদ্ধদেব বসু আকৃষ্ট হন। যামিনীর শিল্পসত্তার প্রভাবে 'যামিনী রায়' শিরোনামে বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি *এক পয়সায় একটি* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থে ও পরে *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র (১৯৫৩) প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে কবি আধুনিক শিল্পী সাহিত্যিকদের বিষয়ী ভাবনার বিপরীতে শিল্পীর ত্যাগ, সাধনার মহত্ত্বের জয়গান গেয়েছেন –

জীবনের রসে শিল্পেরে দিলে প্রাণ,

জ্বালালে জীবন শিল্পের শিখা থেকে।

তুমি জয়ী হ'লে আপনার প্রাণ নিঃশেষে করে দান,

আমরা পতিত খানিকটা হাতে রেখে।[১৭০]

আমাদের কবিতাভবন-এ (শারদীয় *দেশ*, ১৩৮১) যামিনী রায় সম্পর্কিত আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু নিজেকে 'যামিনী রায়ের ছবির একজন প্রধান ভক্ত'রূপে গণ্য করেননি।[১৭১] যামিনী রায়ের ছবি সুন্দর, নয়নমোহন; ঘরের দেওয়ালের শোভাবর্ধনকারী হলেও বড্ড বেশি শান্ত, সমতল এবং দু-একটি ছাড়া কোন চাঞ্চল্য বা আবেগহীন। আধুনিক সভ্যতায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি যামিনী রায়ের স্ববিরোধী মনোভাব বুদ্ধদেব বসু সমর্থন করেননি।[১৭২] বুদ্ধদেব যামিনীর সমালোচনা করলেও শিল্পীর সান্নিধ্য যে তাঁদের পক্ষে 'লাভজনক' তা স্বীকার করেন। 'স্বধর্ম' পালনকারী যামিনী রায়ের আপাত যুক্তিহীন অসংলগ্ন, পুনরুক্তিময় কথা শুনে ক্লান্তি আসলেও তাঁর 'ব্যক্তিত্বটি অখণ্ড এবং ভেদরেখাহীন; নিজের মধ্যে একটি স্থির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত'।[১৭৩] দক্ষিণারঞ্জন বসুর মতে, দীর্ঘকাল কলকাতাবাসী যামিনী 'নাগরিকতার মোহমুক্ত' থাকলেও সমাজ-রাষ্ট্রে ঘটমান হানাহানিতে 'ছটফট' করতেন।[১৭৪] 'শিল্পী যামিনী রায়কে নববর্ষের উপহার' দেওয়া বুদ্ধদেবের 'আধা-গল্প আধা-প্রবন্ধ'-এর আদলে রচিত 'তিনজন' (*বৈশাখী*, ১৯৪৬) রচনাটিতে নরেশ গুহ চিত্রশিল্পী চরিত্রটির 'আবেগকম্পিত' বক্তব্যের সঙ্গে যামিনীর বক্তব্যের মিল খুঁজে পেয়ে তাকে যামিনীর 'সাহিত্যিক প্রতিমা' বলে মনে করেছেন।[১৭৫]

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের *আমার সাহিত্য-জীবন* (১৩৬০) ও দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'যামিনীদাকে যেমন দেখেছি'-তে (*অমৃত* সাপ্তাহিক ৫মে, ১৯৭২) মানুষ যামিনী রায়, তাঁর সাধনা, শিল্প পথের অবলম্বন ও শিল্পীর সঙ্গে সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে জানা যায়। যামিনীর শিল্প-প্রতিভার থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা তারাশঙ্করকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। তিনি তাঁর আত্মকথামূলক গ্রন্থ *আমার সাহিত্য-জীবন*-এর (১৩৬০) দ্বিতীয় ভাগে 'অকপটে' স্বীকার করেন তাঁর মতো 'ভক্ত' যামিনীর বোধহয় নেই। তাঁর কাছে 'কীর্তির চেয়ে কীর্তিমান', 'শিল্পের চেয়ে শিল্পী বড়ো'।[১৭৬] যামিনীর ঘনঘন আঁকার আসন বদল দেখে তাঁর মনে হয়, যামিনী তাঁর সাধনার সিদ্ধ আসনটি যেদিন পাবেন সেদিন তিনি যে আসনে বসে ছবি আঁকবেন সেই আসনই হবে তাঁর 'সিদ্ধাসন'।[১৭৭] অবাঙালি সাহিত্যিক ও অভিনেতা নিসিম ইজেকিয়েল (১৯২৪-২০০৪) যামিনী রায় কে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন 'Jamini Roy' শিরোনামে।[১৭৮] কবিতাটিতে শিকড়ের সন্ধানে যামিনী রায়ের যাত্রা, তাঁর ছবির বিশেষত্ব এবং শিল্পীর প্রতি কবির অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। যামিনী রায়ের সমসাময়িক আরো বহু গুণীজন তাঁকে নিয়ে কলম ধরেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে সঞ্জয় ঘোষের (১৯৫৮) *যামিনী কলকাতা সংলাপ* (২০১৮) উপন্যাসটিতে কলকাতা শহরের সঙ্গে যামিনীর কাল্পনিক কথোপকথনে নানা স্মৃতি, নানা ঘটনা, সমকালীন সমাজ, শিল্পসাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, অনেক অব্যক্ত কথা উঠে আসে। যামিনীকে নিয়ে বিতর্কিত উপন্যাস 'বসন্ত-যামিনী' রচনা করেন মানিক ফকির (মানিক মণ্ডল)। তাঁর কাছে যামিনী রায় নয়, 'অবরুদ্ধ শিল্পী বসন্ত জানাই বড়'।[১৭৯]

খ. ধর্ম-সাহিত্য ও যামিনী রায়

১) রামায়ণ কাহিনি চিত্রায়ণ

রামায়ণ-এর নানা উপাখ্যান যামিনী রায়ের শিল্পী জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। ছেলেবেলার স্মৃতি, পরিণত বয়সের অর্জিত জ্ঞান ও পটে চিত্রিত *রামায়ণ*-এর কাহিনি প্রভৃতি এই ধরনের চিত্র অঙ্কনে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর ছবিতে রাম-সীতার বনবাস, ধনুকধারী স্বল্পবসন রাম ও পর্ণকুটীরে নববধু সীতার অবস্থান, তাদের বনবাসী জীবনের আখ্যানকে স্মরণ করায়। মারীচের স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ, ভিক্ষুক-বেশে রাবণ ও সীতা, সীতাহরণ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, লঙ্কায় সীতা, রাম রাবণের যুদ্ধ, রাম ও যোদ্ধাবেশে

বানরকুল, রাম লক্ষণ ও হনুমান, হনুমান ও পাখি, সুগ্রীব-বালীর যুদ্ধ, বাল্মীকির রামায়ণ রচনা, বাল্মীকি ও লব কুশ, সীতা ও লব কুশ প্রভৃতি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সীতার অগ্নিপরীক্ষা ছবিটিতে অগ্নিশিখা 'কারুবৈশিষ্ট্যে বিশেষিত'।[১৮০] এছাড়াও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে যামিনী কে. সি. দাশের বরাত অনুযায়ী সতেরোটি *রামায়ণ* বিষয়ক চিত্রাঙ্কন করেন।[১৮১]

২) কৃষ্ণকাহিনি চিত্রায়ণ

যামিনী রায়ের ছবির নতুন নীতির 'প্রথম অবলম্বন' ছিল 'কৃষ্ণরতি'।[১৮২] কৃষ্ণ বিষয়ক একাধিক উপাখ্যান মূলত *মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ* প্রভৃতি গ্রন্থে ও পরবর্তীকালে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অসংখ্য নাটগীত গীতিকাব্যে কৃষ্ণকে বালক, রঙ্গ কৌতুক প্রিয়, আদর্শ প্রেমিক, দিব্য নায়ক, সর্বোচ্চ ঈশ্বর ইত্যাদি বিভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কৃষ্ণের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দুটি রূপকেই যামিনী সম্পূর্ণ দেশীয় রীতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বালক কৃষ্ণের যে রূপ 'বালগোপাল' রূপে পূজিত হয় সেই মূর্তি যামিনী নিজস্ব শিল্পশৈলীতে বহুরূপে বহুবার এঁকেছেন। তাঁর কৃষ্ণ চিত্রমালার মধ্যে 'ননীচোর', 'কীর্তন', 'গোপিনী', 'কৃষ্ণের দ্বারকা গমন', 'নৌকাযাত্রা', 'কালীয়দমন', গোবর্ধন পাহাড় উত্তোলন, ধেনু ও বেণুবাদকরত কৃষ্ণ, নৌকা যাত্রী তিন গোপিনী, জননী যশোদা, দধিমন্থন, কৃষ্ণ ও দুই সখা, নৃত্যরত কৃষ্ণ, গোপবালক, রথে কৃষ্ণ ও বলরাম, 'Krishna and the cow', গোষ্ঠ লীলা, হোলি খেলা, অক্রুর সহ কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা, বৃক্ষতলে রাধিকা, বংশীবাদনরতা রাধা, দয়াণ্ডমানা গোপিনী, উপবিষ্টা গোপিনী, কৃষ্ণ গোপিনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাসলীলা ও নৌকালীলার উপাখ্যানে কৃষ্ণের সঙ্গে বলরাম চরিত্রটি যুক্ত করে মূল কাহিনির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'কৃষ্ণ-বলরাম' ছবিটি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। ছবিটিতে কৃষ্ণ-বলরামের দেহ সৌষ্ঠবে ঐশ্বর্য আরোপিত হয়েছে। লীলামাধুরীর চিত্রগুলিতে শিল্পীর 'ভক্তি ও শ্রদ্ধা' অত্যন্ত গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।[১৮৩] যামিনী কৃষ্ণবিষয়ক ছবিগুলিতে রাধাকে প্রাধান্য না দেওয়ার কারণে মনে করা যেতে পারে তিনি মূলত ভাগবতের নির্দেশ মেনেছেন, জয়দেব বা বাঙালি পদকর্তাদের রাধাকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য সত্তাকে প্রাধান্য দেননি।[১৮৪] কৃষ্ণ-গোপিনী চিত্রগুলি থেকে যৌন অনুষঙ্গগুলিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ভক্তির আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিছু কিছু ছবিতে গাত্রবর্ণ, চুলের বাঁধন, পোশাকের সামান্য পার্থক্য ছাড়া কৃষ্ণ ও

গোপিনীদেরকে আলাদা করবার উপায় থাকে না। তাঁর ছবিতে কৃষ্ণ-গোপিনীর অভিন্ন দেহাবয়ব পরিকল্পনার মাধ্যমে ভক্ত-ভগবানের বিরহ-মিলনের তত্ত্বটিই যেন প্রতিষ্ঠা পায়।[১৮৫] এছাড়া নগর সংকীর্তন, নৃত্য বাদনরত চৈতন্য ভক্তমণ্ডলী ইত্যাদি একাধিক বৈষ্ণব বিষয় সম্পর্কিত ছবি যামিনী এঁকেছেন।

৩) পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবী বিষয়ক কাহিনি চিত্রায়ণ

যামিনী রায় *মনসামঙ্গল* কাব্যের কেন্দ্রিয় চরিত্র সর্পদেবী মনসার বেশ কয়েকটি অবয়ব, *অন্নদামঙ্গল*-এর কাহিনি অবলম্বনে 'অন্নপূর্ণা ও শিব', সিংহ বাহিনী, অশ্বারোহী, যোদ্ধা দুর্গা, মঙ্গলকাব্য বর্ণিত একাধিক শিব, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় গণেশ, 'গণেশ জননী', ব্যাঘ্র বাহিনী দুর্গা ও গণেশ, অশ্বারূঢ় দুর্গা ও গণেশ, মহাদেব ও গণেশ, শিব দুর্গা ও গণেশ, নন্দী ভৃঙ্গী শিব দুর্গা ও গণেশ ইত্যাদি চিত্রাঙ্কন করেছেন। অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর ছবির মধ্যে 'Garur on Horse', মকর বাহিনী ইত্যাদি চিত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর আঁকা বাঁকুড়ার হাতি-ঘোড়া ও এর সঙ্গে সংযুক্ত মূর্তিগুলির সঙ্গে লৌকিক দেবতা 'সিনি' বা 'সিংবোঙা' এবং ধর্মদেবতার আখ্যান যুক্ত হয়ে যায়। দেবতা এবং তার প্রতীকের সহাবস্থানে ছবিগুলি অন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে।

৪) খ্রিস্টকাহিনি চিত্রায়ণ

ভারতীয় সংস্কৃতি উদ্ভূত দেবদেবী ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশের আরাধ্য ঈশ্বর যিশুখ্রিস্টের কাহিনি নিয়ে যামিনী রায় নানা মাধ্যমে একাধিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে যিশুর স্বাদেশীকরণ ঘটিয়েছেন। কয়েকটি চিত্রে যিশুকে বাউল বলে মনে হয়, তাঁকে ঘিরে যে জগৎ তা যেন বৈষ্ণব।[১৮৬] যিশুর জন্ম, মাতা মেরী, 'flight to Egypt', 'Madonna and Child', 'Crucifucation', 'Massacre of the Innocents', লন্ঠন হাতে যিশু, ক্রুশবাহক যিশু, যিশুর আবক্ষ ও পূর্ণ মূর্তি, শিষ্যদের মাঝে যিশু, যোশেফের কাঁধে বালক যিশু, ইত্যাদি ছবি বহুবার নানা মাধ্যমের ক্যানভাসে বর্ণ ব্যবহারের ভিন্নতায়। যিশুখ্রিস্ট বিষয়ক সবচেয়ে চর্চিত 'Last Supper' ছবিটি তিনি অন্তত তিনবার চিত্রিত করেছেন। প্রথমটি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয়বার আঁকেন অনেক বড়ো করে (৪৫.৫×১৯২.৫

সে.মি), তৃতীয় বারের ছবিটি (সাত ফুট লম্বা, দুই ফুট তিনি ইঞ্চি চওড়া) অসম্পূর্ণ এবং এটিই তাঁর জীবনের শেষ ছবি।

৪.৩ নাটক ও মঞ্চভাবনা

৪.৩.১ নন্দলাল বসু

নন্দলাল বসুর শিল্পচেতনা ছবি আঁকা কিংবা চিত্রকলার বিভিন্ন ফর্মের পরিসরে আবদ্ধ থাকেনি। রবীন্দ্রনাট্যে উপস্থাপনার মঞ্চসজ্জা ও কলাকুশলীদের অঙ্গসজ্জায় তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান। রবীন্দ্রনাথের *বাল্মীকিপ্রতিভা* (১৮৮১), *কালমৃগয়া* (১৮৮২), *ফাল্গুনী* (১৯১৭), *তপতী* (১৯২৯), *অচলায়তন* (১৯১২), *ডাকঘর, বিসর্জন* ইত্যাদি বহু নাটক ইউরোপের আদর্শে বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। এই সমস্ত নাটকগুলিতে 'নাটকীয় দৃশ্যসজ্জার অভিব্যক্তি' ফোটাতে নন্দলাল, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ পারস্পর নির্ভরশীল ছিলেন।[১৮৭] জোড়াসাঁকোয় বর্ষামঙ্গলে মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চের তিনদিকে দর্শকের বসার ব্যবস্থা করে নন্দলালই প্রথম রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চপরিকল্পনায় নতুনত্ব আনেন। মঞ্চের পিছনে আয়তাকার পটে নীলপর্দা লাগিয়ে তার উপর সাদা কাগজ কেটে তৈরি করেন উড়ন্ত বকের সারি। মঞ্চসজ্জা ও কলাকুশলীদের অঙ্গসজ্জায় ব্যবহার করেন বর্ষার সাদা ফুল। অংশগ্রহণকারী গায়ক ও বাদকদের নেপথ্যে না রেখে সকলকেই মঞ্চে স্থান দেন।[১৮৮] শান্তিদেব ঘোষ *শারদোৎসব* (১৯০৯) নাটকটির মঞ্চসজ্জায় নন্দলাল পরিকল্পিত নটরাজের চিত্র ও অলংকরণ রীতিতে শরৎকালের দৃশ্য চিত্রিত প্রকাণ্ড 'ড্রপসীন' দেখেছিলেন।[১৮৯] সেই সময়কার মঞ্চসজ্জায় বাস্তবানুকরণ তখনও সম্পূর্ণ বর্জন না করে ঋতু উৎসব ও ঋতুনাট্যগুলিতে স্বাভাবিক দৃশ্যের প্রয়োজনে যেটুকু দরকার সেই মতই শান্তিনিকেতনের প্রকৃতিকে অদল-বদল সাজিয়ে নেওয়া হতে থাকে। এই সময় রঙ্গমঞ্চের পিছনে মাটির ঢিবি, কাশের বন, শিউলির গাছ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ছাত্রদের মনে প্রকৃতি চেতনা জাগ্রত করতে যে নাটক ও উৎসবগুলির সূচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন মঞ্চসজ্জায় প্রকৃতিকে ব্যবহার করে নন্দলাল তাতে যোগ্য সঙ্গত দেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে, কলকাতার অ্যালফ্রেড ও ম্যাডান থিয়েটারে *শারদোৎসব* অনুষ্ঠিত হলে, নন্দলাল সেই মঞ্চপরিকল্পনায় অভিনবত্ব আনেন। ইউরোপীয় আদর্শের বাস্তবানুগতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে রঙিন

কাপড়ের অর্থবহ বিন্যাস, নাটকের মূল বিষয়বস্তু বা প্রধান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কখনো কখনো দু-একটি বস্তু যেমন – শরতের পরিবেশ সৃষ্টিতে দু-একটি কাশগুচ্ছের ব্যবহারে মঞ্চ সাজান।[১৯০] এরপর থেকে রঙিন কাপড়ের স্থাপত্যধর্মী বিন্যাসেই রবীন্দ্রনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হতে থাকে। এই মূল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বসবার আসনগুলি কিংবা এইগুলির সজ্জা কখনো কখনো পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এইগুলির পাশে প্রদীপদানি কিংবা ফুলের ঝার ইত্যাদি সহজলভ্য ভারতীয় উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে মঞ্চসজ্জায় বৈচিত্র্য আনা হয়। 'উইংস'[১৯১] ছাড়া, কখনো মঞ্চের পিছনের নীল পর্দার মাঝখানে ও ছোট দরজার আকারে ফাঁক রেখে তার চারিদিকে নানা প্রকার কাপড়ে সাজানো হয়। আবার কখনো এর সঙ্গে কাঠের ফ্রেম যুক্ত করে স্থাপত্য কলার ইঙ্গিত ফোটানো হয়।[১৯২] ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকো ও এম্পায়ার মঞ্চে *বিসর্জন* নাটকের মঞ্চসজ্জাতে নীল কাপড়ের পশ্চাদপট, রক্তাক্ত সোপান, 'উইংস'-এর অন্তরাল থেকে লাল আলোর ব্যবহারে মন্দির তোরণের সংকেত দেওয়া হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লি ও মিরাটে মঞ্চস্থ *চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬) নৃত্যনাট্যে স্থাপত্যধর্মী সাংকেতিক মঞ্চসজ্জা লক্ষ করা যায়।[১৯৩] সামাজিক, রাজনৈতিক, রূপক সাংকেতিক সমস্ত প্রকরণের রবীন্দ্রনাটকের এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে থাকে। নন্দলাল ও রবীন্দ্রনাথের সময়ে উদয়ন ও পুরাতন গ্রন্থাগার ভবনের বারান্দার বিন্যাস এইরূপ মঞ্চের উপযুক্ত হওয়ার সেখানেই নাটকগুলি মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়।[১৯৪] যবনিকা ব্যবহার বর্জন হওয়ার পর আলোর জ্বলা-নেভার মধ্য দিয়ে শুরু-শেষের সংকেত দেওয়ার প্রথা শুরু হয়। এছাড়া নাটকের রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোর রঙ নির্বাচন করে তাকে সাংকেতিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মঞ্চের রঙ, কলাকুশলীদের সাজের রঙ এবং আলোর রঙের মধ্যে সাম্য বজায় রেখে নাটকের মূলভাব প্রকাশ করতে চান নন্দলাল।[১৯৫] কোন বিশেষ সময় বা কোন বিশেষ দেশের মঞ্চসজ্জার অনুকরণে এরূপ মঞ্চপরিকল্পনা তিনি করেননি। এই মঞ্চপরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ভারতীয় সংস্কৃতির সম্মিলিত সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' (*বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১৩০৯) প্রবন্ধে বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জার বহুমূল্য উপাদান এবং স্ত্রীচরিত্রে স্ত্রীলোককে দিয়ে অভিনয় করাবার 'স্থূল বিলাতি বর্বরতা' পরিহার করার কথা বলেন।[১৯৬] তিনি বললেন নাটকের সংলাপ অভিনেতার জন্য নিতান্ত আবশ্যক হলেও মঞ্চে ছবির ব্যবহার অভিনেতার অক্ষমতাকে প্রকট, দর্শকের অন্তরের উপলব্ধি ও কল্পনার পরিসরকে রুদ্ধ করে।

অভিনেতার বোঝাবার ক্ষমতা ও দর্শকের বোঝবার ক্ষমতার আপোষেই নাটকের সার্থকতা। তিনি *তপতী* নাটকের ভূমিকায় (১৯ ভাদ্র, ১৩৩৬) লেখেন – পাশ্চাত্যানুসারী মঞ্চসজ্জায় দৃশ্যপট ব্যবহারের ছেলেমানুষিকে তিনি প্রশ্রয় দেন না কারণ এটি 'বাস্তবসত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।'[১৯৭] সুতরাং একথা স্পষ্ট রবীন্দ্রনাথের মঞ্চশিল্পচেতনাকে নন্দলাল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার দ্বারা সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন।

রঙ্গমঞ্চ সজ্জা, কলাকুশলীদের রূপসজ্জায় নন্দলাল বসু নতুন পথে বিশেষত্ব আনেন। যাত্রা-থিয়েটারে যে ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সাধারণ মানুষ দেখে অভ্যস্ত, তিনি প্রথমেই সেগুলি বর্জন করে সহজপ্রাপ্য উপকরণ দিয়ে কীভাবে অঙ্গসজ্জা করা যেতে পারে তিনি তার সকল রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করেন।[১৯৮] সুচিন্তিত পরিকল্পনায় সময়ানুযায়ী মঞ্চসজ্জায় যে স্থাপত্যধর্মী বিন্যাস তিনি করেন সেই স্থাপত্যের মাঝে তাঁর হাতেই সজ্জিত নটনটীরা মূর্তি রূপে প্রতিভাত হয়। নাটকের মূল ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, রবীন্দ্রনাট্যের মহড়ার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচনে তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তিনি প্রয়োজনবোধে কলাভবনের স্টুডিয়োর ক্লাস বন্ধ রেখে এসব কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়োগ করেছেন। শান্তিনিকেতনের অভিনয়ের দল ভারতবর্ষের নানা স্থানে অভিনয় করতে গেলে সেখানে নন্দলালের নির্দেশনায় মঞ্চসজ্জা ও অঙ্গসজ্জার ভার কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা গ্রহণ করেছেন।[১৯৯] এইসব কাজের ভিতর দিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী বা দর্শক সকলের মধ্যেই একটা মার্জিত রুচি গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নন্দলাল বসুর প্রতিটি সৃষ্টিকেই স্পর্শ করলেও তিনি তাতে নতুনত্ব এনেছেন। *তাসের দেশ*-এ (১৯৩৩) অভিনেতাদের মাথায় যে পাগড়ি বাঁধা, প্রধানত পিজবোর্ড ও রঙিন কাগজের ব্যবহার করে জমকালো অঙ্গসজ্জা সৃষ্টি করে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[২০০] কলাগাছের সাদা অংশ কেটে, শিরীষ গাছের শুকনো ফুল, তালপাতা, খেঁজুর পাতা ব্যবহার করে তিনি গয়না বানিয়েছেন। এই সাহসী পদক্ষেপে নাট্য উপস্থাপনার অনাবশ্যক খরচ কমেছে ও বস্তুগুলি নবরূপে মূল্যায়িত হয়েছে।

৪.৩.২ যামিনী রায়

১৯২০ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য আলোচনার নাট্যজগতের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ও অভিজ্ঞতা, দাশু নিয়োগী, ধর্মদাস সুর (১৮৫২-১৯১০) রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬), অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৮৫০-১৯০৮), গুর্মুখ রায় (১৮৬৪-১৮৮৬), অঘোরনাথ পাঠক (১৮৬০-১৯০৪), ক্ষেত্র মিত্র (?-১৯৪৪), সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩২), প্রিয়নাথ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র গুহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৩-১৯৩৯), শিশিরকুমার ভাদুড়ি (১৮৮৯-১৯৫৯), অহীন্দ্র চৌধুরির (১৮৯৬-১৯৭৪), নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২), হীরালাল দত্ত, হরেন ঘোষ (১৮৯৫-১৯৪৭), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯১-১৯৬১), বিনোদিনী দাসী (আনুমানিক ১৮৬৩-১৯৪১), তারাসুন্দরী (১৮৭৮-১৯৪৮), সুশীলা, কুসুমকুমারী (১৮৭৬-১৯৪৮) প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন মঞ্চের উত্থান, পতন, সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অভিনেত্রীদের (সাধারতণত বেশ্যা তারা) প্রতি তাঁর সম্মান, তাঁদের অভিনয় দক্ষতা, ব্যক্তিগত জীবনের ওঠাপড়া, তাঁদেরকে কেন্দ্র করে সেই সময়কার দর্শকদের উন্মাদনার চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি দেখেন সেই সময়কার অভিনেত্রীরা মঞ্চে মহড়া দিতে এসে প্রথমেই সেই পাটাতনে প্রণাম করতেন।[২০১] 'দিশি আনা বা ভদ্রতা' যাই হোক না কেন, এ প্রথাটি তাঁকে মুগ্ধ করে কেননা পেশাটাই তাঁদের ধর্ম। অভিনেত্রীদেরকে তিনি সাধুর চেয়েও বড় বলে মানেন। তিনি বলেন – 'পৃথিবীতে সাধুর চাইতেও আগে স্বর্গে যায় বেশ্যা, আর যায় যারা চোর, কিংবা অধম।'[২০২] নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরির (১৮৮৬-১৯৪১) *সীতা* (১৯৩১) ও *রাবণ* (১৯৩৪) নাটকের জন্য তিনি রিয়েলিস্টিক ধরনের সিন এঁকে দেন।[২০৩] তবে তিনি থিয়েটারে সিনের থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন 'অভিনয় ও সংলাপ'কে।[২০৪] তিনি বিভিন্ন চরিত্রের সাজ পোশাকের ডিজাইন, আলপনা ও ডাকের কাজ দিয়ে বহু ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জা করেন। তৎকালীন বিখ্যাত নট ও নাট্যকারদের সঙ্গে তিনি নাটক ও মঞ্চ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন বলে শোনা যায়।[২০৫] অভিনেতা নরেশ মিত্র (১৮৮৮-১৯৬৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নাট্যবিষয়ে আলোচনা করতে যামিনী রায়কে নিয়ে যান। রিয়েলিস্টিক ধরনের নাটক তাঁর মতে 'সাতবাসি বিলিতির খাস্তা নকল'।[২০৬] ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেহেতু ভাবাবেগকে প্রাধান্য দিয়ে

এসেছে, তাই রিয়েলিজম ছেড়ে নাট্যকলা, শিল্পকলা সমস্ত কিছুকেই শেষ পর্যন্ত পৌরাণিকেই আসতে হবে এ তাঁর বিশ্বাস। তিনি বলেন – 'পার্সপেক্‌টিভ, টাইম, স্পেস-এর ছলাকলা যত শিগ্রি মানুষ ভুলে যায় ততই মঙ্গল'।[২০৭] নাটক থিয়েটারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বহু বছর পর তাঁকে আবার নাটকের সঙ্গে যুক্ত হতে হয় ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘর উদ্যোগে *পুনরুজ্জীবন* (১৯৪৫) নাটকের সূত্রে। নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্য যিশুখ্রিস্টকে পুনরুজ্জীবিত করা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে তিনি নাটকটি শুনে, বিষয়টিকে নিয়ে গভীরে ভেবে জানান, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে মুড়ে যিশুকে এমনভাবে মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান করাতে হবে যাতে তার পায়ের নড়া চড়া কেউ টের না পায়। 'ছাই রঙ-এর জমিতে গাঢ় কালো আর সিঁদুরের রেখা'য় যিশুর জন্য তিনি একটি 'আশ্চর্য' মুখোস এঁকে দেন।[২০৮] তাঁর এই উদ্ভাবনে নাটকটির নাট্যরস ব্যাহত না হয়ে সফল ভাবে মঞ্চস্থ হয়।

৪.৪ চিত্র-শিল্প–সাহিত্যভাবনা

৪.৪.১ নন্দলাল বসু

ক) প্রবন্ধ ও গদ্য

নন্দলাল বসুর শিক্ষা ও দর্শনের সঙ্ঘবদ্ধ রূপ প্রকাশ পায় *শিল্পকথা, শিল্পচর্চা, রূপাবলী* (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ) এবং *ফুলকারী* গ্রন্থে। নন্দলাল *শিল্পকথা* গ্রন্থটি তাঁর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিল্পবন্ধুদের উৎসর্গ করেছেন। শিল্পসাধনার পথে শিল্পবন্ধু ও শিল্পরসিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা থেকে তিনি এই গ্রন্থ লেখার প্রেরণা পেয়েছেন। *ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ* এবং ধনঞ্জয়ের *দশরূপক*-এর শ্লোক দিয়ে সূচিত গ্রন্থের ভূমিকায় নন্দলাল বলেছেন যে সাহিত্যিকের 'ভাষার শিল্প'-এ তিনি অনধিকারী বলে সাহিত্যিক ব্যাখ্যার শক্তি তাঁর নেই।[২০৯] মানুষের দেহবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধির প্রবলতার কারণে পৃথিবীর দুর্দৈব থেকে সাহিত্য ও শিল্প মুক্তি দিতে পারে। *শিল্পকথা* গ্রন্থে শিল্পসাধনা, শিল্পের গতিপ্রকৃতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে বহু প্রশ্নের আলোচনা পাওয়া যায়। রচনাগুলিতে নন্দলালের অর্ন্তদৃষ্টি, বিশ্লেষণধর্মী মন, সাবলীল উপমা ব্যবহার, অননুকরণীয় সহজ-সরল ভারহীন বাচনভঙ্গি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি বাস্তবিকপক্ষে নাতি বৃহৎ হলেও গ্রন্থটিতে এমনই অনেক মৌলিক ভাবনা নিহিত রয়েছে যা ক্রমে শব্দার্থ থেকে বৃহত্তর ভাবার্থের দিকে নিয়ে যায়।[২১০]

'শিক্ষায় শিল্পের স্থান' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির চর্চা ভাষাবাহন হলেও ভাষা দ্বারা সামগ্রিক জ্ঞানানুশীলন ও শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। শিল্পচর্চা অর্থাৎ নাচ, গান, ছবি আঁকা ইত্যাদির চর্চা লেখ্যভাষা দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয়, তাহলে কলাচর্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত।[২১১] ভাষা চর্চার মতো শিল্পকলার ক্ষেত্রেও চারু-শিল্পচর্চার দ্বারা আনন্দলাভ ও কারু-শিল্পচর্চার দ্বারা অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। তাই প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির অর্থাগমের দিক থেকেও ক্ষতিকর। শিল্পচর্চা ও শিল্পবোধের অভাবে অতীতের মূল্যবান শিল্পসৃষ্টির রসলাভ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি, তাই বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিল্পশিক্ষাকে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরদের শিল্পদৃষ্টি জাগ্রত করতে তাঁর তৈরি কার্যাবলির তালিকাটির অনেক উপদেশই বিশ্বভারতীর কার্যাবলির সঙ্গে মিলে যায়। কারণ নন্দলাল যে শিক্ষাদর্শের কথা বলেন তা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত।

'শিল্পসাধনা' প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন – যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির মূলে আনন্দ রয়েছে তাই শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিও আনন্দজাত। আবার শিল্পীর আনন্দজাত সৃষ্টি রসিকের চিত্তে অমর হয়ে থাকে এবং এর অস্তিত্বধারা পুরুষানুক্রমে বয়ে চলে। ধর্মসাধকের মতো শিল্প সাধকও নির্লিপ্ত থেকে একের সন্ধান করে চলেছেন। কালীমূর্তি বা নটরাজ মূর্তি যার ধ্যানে প্রথম এসেছিল সেই ব্যক্তি সাধক হলেও শিল্পী; যার হাতে প্রথম আকার লাভ করেছিল সেই ব্যক্তি শিল্পী হলেও সাধক। কারণ, দুজনেই কোনো একটি রসের ভিতর রঙ রূপ গতি ও ছন্দের বিগ্রহ বা সমষ্টিরূপ সৃষ্টি করেছে, যা দুজনারই মননজাত।[২১২] আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ-উচ্চ, অনিত্য-নিত্যই সবের ভিতরে অবিচ্ছিন্ন একের ঐক্যটি অনুভব করা প্রকাশ করাই শিল্পীর সাধনা, সৃষ্টি। একদিন সাধকেরা প্রকৃতির ধ্যানেই বিগ্রহ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে আমরা সেই প্রকৃতিকে ভুলে বিগ্রহতে বিভোর হয়েছি। নন্দলালের বিশ্বাস, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'[২১৩] – উপনিষদের এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ভারতের ভাবী শিল্পকলা সমস্ত জীবনকে আর জগৎকে সত্য দৃষ্টিতে দেখবে, নতুন করে সৃষ্টি করবে। 'শিল্পপরিচয়' প্রবন্ধে নন্দলাল ক) অনুকারক, যেখানে বাস্তবে দেখা বসুর হুবহু অনুসরণ করা হয়ে

থাকে, খ) ব্যঞ্জক, যেখানে বাস্তবে যে দেখা বস্তুর পরিমার্জিত ও সংযোজিত রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, গ) ছান্দসিক, যে ছবিতে ছন্দের প্রাধান্য থাকে, এই তিন ধরনের ছবির কথা বলেন।

শিল্পচর্চা গ্রন্থে 'জীবনের ভাবভঙ্গি' রচনাটিতে বর্ণিত শিরদাঁড়ার স্থায়ী ভঙ্গি *শিল্পকথা* গ্রন্থের 'শিল্পে শরীরস্থানবিদ্যার প্রয়োগ' প্রবন্ধে 'প্রাণছন্দ' নামে বর্ণিত। নন্দলালের মতে প্রাণছন্দ হল –

> শিল্পসৃষ্টিতে যে রেখার ইঙ্গিতে প্রত্যেক বস্তুর ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মিলিয়ে সমগ্র রচনার একটি ঐক্য ও চারিত্র্য ফুটে ওঠে তাই।[২১৪]

শিরদাঁড়াটি হল প্রাণছন্দের রেখা। এই রেখাটির আশ্রয়েই শরীরের ভারসমতা, কাঠামো এবং ঘনত্ব নির্ণিত হয়। তাই জীবের ছবি আঁকতে গেলে শিরদাঁড়ার স্থায়ী ভঙ্গি জেনে তারপর ভাব অনুযায়ী সেই ভঙ্গির পরিবর্তন করা যায়। প্রতিভাবান শিল্পী প্রাণী বা বস্তুর স্বভাব ভালোভাবে লক্ষ করে মন মত মুদ্রা রচনা করেন। ভারতবর্ষের শিল্প দাঁড়িয়ে আছে এই 'মন-গড়া ছাঁদ'-এর উপর।[২১৫] প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পে শারীরস্থান, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদির বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম লঙ্ঘন করে উঁচুদরের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে ওই সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর সত্তা ও প্রাণছন্দ সম্বন্ধে শিল্পীর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ও পরিপূর্ণ বোধের ফলে। ছন্দ সম্পর্কে তিনি বলেছেন – একটি প্রাণবন্ত বিশেষ রেখার দ্বারা চিত্রে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। প্রাণছন্দের এই আদিম রেখাটির সঙ্গে অনুকূল প্রতিকূল নানা রেখা যুক্ত হয়ে সর্বাঙ্গীণ ছন্দের সৃষ্টি হয়। ছন্দ ভেঙে ভেঙে অলংকার বা কারুকার্য তৈরি হয়। পুরো বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে অসামান্য ভাষা ব্যবহার করে তিনি বলেছেন –

> নদীর প্রবাহ, তার তরঙ্গ – তারপরে তার চূর্ণ সলিলমুষ্টি, ফেনস্তবক ও কীর্ণ শীকররাজি যেমন এও তাই। এই অলংকরণের গুণে ছন্দেরই সর্বশেষ ঝংকার যেন এখানে সেখানে বাজতে থাকে।[২১৭]

'শিল্পসৃষ্টির মূলসূত্র' প্রবন্ধে নন্দলাল বলেছেন শিল্পসৃষ্টির অনন্য পদ্ধতি বলে কিছু হয় না। প্রথমে যে কোনো একটি পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। পরে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব জানা হয়ে গেলে বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা করে, ব্যবহার করে, নিজেরই পদ্ধতিকে সচল সরল ও দৃঢ় করা যায়। শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ও সামঞ্জস্য বোধই হল শিল্পসৃষ্টির গোড়ার কথা। 'শিল্পপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধে নন্দলাল শিল্পকে কল্পনা, সৃষ্টি, শিল্পীর ধ্যান, ছন্দ, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি নানা অভিধায় ভূষিত করেছেন। 'শিল্পসংগতি' প্রবন্ধে নন্দলাল বলেছেন – শরীরে সূক্ষ্ম ও স্থূল যে কটি ইন্দ্রিয় আছে সেগুলিকে আশ্রয়

করে যাবতীয় চৌষট্টি কলা বা শিল্পকলা সৃষ্টি হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে একটি শিল্পের থেকে আরেকটি শিল্পের তফাৎ চোখে পড়লেও রস উপলব্ধির দিক থেকে কোনো শিল্প থেকে কোনো শিল্পের ভেদ নেই। নন্দলালের ভক্তহৃদয় কেন্দ্রীভূত এই অখণ্ড বোধটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার চমৎকার তুলনা টেনে বলেন –

> মাঝখানে অনির্বচনীয় রসঘনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ স্ব-প্রকাশা পরা প্রকৃতিকে নিয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর চারি দিকে বিভিন্ন শিল্প বিভিন্ন রসের হাত ধ'রে, বহু কৃষ্ণ ও বহু গোপিনী-রূপে, মণ্ডলা কারে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছেন – ছন্দে, তালে।[২১৮]

'শিল্পদৃষ্টি' প্রবন্ধে নন্দলাল বলেন – রূপরচনা শিল্পীর পক্ষে সহজ হবে অনুরাগ ও অভ্যাসের ফলে। শিল্পী যখন কোন বস্তুর ছবি আঁকতে যান তখন তাঁকে সেই বস্তুটির নীরব সাধনা করতে হয়। বস্তুটির কোন একটি অংশ বা রূপের প্রতি ভালোলাগার সাধনাই শিল্পসাধনা। ভালোলাগার প্রেরণা, সাধনার ফলে যে শিল্পসৃষ্টি হয় শিল্পীর কাছে তা চিরন্তন। রসসৃষ্টি করতে গেলে অনুরাগের সঙ্গে ধৈর্য, নিত্য অভ্যাস, প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কলাকৌশল আয়ত্ত করা চাই। শিল্পী হবেন ভয় লোভহীন, নির্লিপ্ত ও সর্বদর্শী, স্থিরতা ও চঞ্চলতা উভয়ের বোধ সম্পন্ন। ভারতীয়রা বিষয়কে চারিদিক থেকে দেখে, তাই ভারতীয়দের প্রকাশ করার সঠিক ক্ষেত্র হল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। বুদ্ধমূর্তি, নটরাজ মূর্তি, ত্রিমূর্তি ইত্যাদি বিমূর্ত আইডিয়ার মূর্তি হয়ে ওঠা শিল্পজগতে দুর্লভ। সেজন্য ভারতশিল্প অনন্য। ভারতশিল্পে বুদ্ধমূর্তির তাৎপর্য প্রসঙ্গে নন্দলাল বলেছেন – শিল্পের চোখে বুদ্ধমূর্তি কোন ব্যক্তির মূর্তি নয়। এটি সর্বাঙ্গসুন্দর ঘনীভূত ধ্যানের মূর্তি। জগতের সমস্ত গতি নিয়ত শান্তিতেই বিধৃত হয়ে চেতনারূপে স্থির হয়ে আছে। এরূপ আরেকটি নিখুঁত সৃষ্টি নটরাজ মূর্তি বিশ্বসংসারের ছন্দ বা গতি এক শান্তির কেন্দ্র থেকে বিস্তৃত হয়ে পুনরায় সেই কেন্দ্রে ফিরে আসার বিগ্রহ।

নন্দলাল *শিল্পচর্চা* গ্রন্থটি শিল্পশিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে রচনা করেন। গ্রন্থটি শান্তিনিকেতন-কলাভবনের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও শিল্পবন্ধুদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। নন্দলালের ছাত্রী বাণী প্যাটেল তাঁর মুখের কথা শুনে লেখাগুলি প্রস্তুত করেন। চিত্ররচনার যাবতীয় করণকৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই 'তুলি'র প্রসঙ্গ এনেছেন। ভিত্তিচিত্র আর টেম্পেরার কাজ করার জন্য উদ্ভিজ দ্রব্য থেকে তুলি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন শিল্পশাস্ত্র ও দেশি পোটোদের

অনুকরণে তুলি তৈরির পদ্ধতি চিত্র সহকারে বর্ণনা করেছেন। তুলি তৈরির পক্রিয়া পড়তে পাঠক যাতে ক্লান্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য তিনি তাঁর লেখায় অতি কৌশলে হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন।[২১৮] প্রকৃতিতে বিদ্যমান সমস্ত বস্তুর রঙকে তিনি শুদ্ধ বা মৌলিক ও মিশ্র[২১৯] এই দুই ভাগে ভাগ করলেও সাদা-কালোকে আলাদা রঙ বলে মনে করেননি; তাঁর মতে ঔজ্জ্বল্য ও ম্লান ভেদে সমস্ত রঙের মধ্যেই সাদা কালো আত্মগোপন করে আছে। নানা ধরনের মাটি পাথর, প্রদীপের কালি, হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তামা, ত্রিফলা, নীলগাছ, লটকনা-বীজ, লাক্ষা থেকে রঙ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন 'রঙ' অধ্যায়টিতে। 'রঙের প্রয়োগ'-এর ভিত্তিতে রঙগুলিকে সম্বাদী, বাদী, বিবাদী[২২০] এই হিসাবে ভাগ করেছেন। প্রাচ্য ছবির রঙ অনুভব সিদ্ধ ও সাদৃশ্যমূলক হওয়ায় তিনি প্রকৃতি থেকে উদাহরণ নিয়ে রঙের নামকরণ করতে বলেন। তিনি লক্ষ করেছেন জাতিভদে বর্ণ প্রয়োগের পার্থক্য ঘটে যায়। শান্ত স্বভাবের জাতিরা বিবাদী রঙ বর্জন করে, সম্বাদী ও বাদী রঙের ব্যবহারে ছবি আঁকেন, আর উগ্রস্বভাবের জাতিরা বাদী বিবাদী রঙ বেশি ব্যবহার করেন। রন্ধনশিল্পের সঙ্গে চিত্রশিল্পের তুলনা করে তিনি 'ফ্রেস্কো' সম্পর্কে আলোচনায় উপযুক্ত মশলাকে 'হালুয়া', নরম মশলাকে 'মাখন' এবং 'ওয়াশ' পদ্ধতিতে আঁকা অবনীন্দ্রনাথের ছবির পাশে এই পদ্ধতিতে আঁকা অন্যান্য শিল্পীদের ছবিকে তিনি 'মিয়ানো মুড়ির' সঙ্গে তুলনা করে তাঁর সরস মনের পরিচয় দিয়েছেন।[২২১] 'আঠা বা মিডিয়াম' অধ্যায়ে সিরিশ, পার্চমেন্ট, ডিম, শ্বেতসার, গঁদ ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত নানা রকম আঠা ছাড়াও চিনামাটি, শ্বেতপাথর ও কাচের উপর রঙ করার জন্য বিশেষ একধরনের আঠা তৈরি করবার পদ্ধতি এবং সেগুলি ব্যবহারে সমস্যা ও সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। নন্দলাল প্রাচীন নিদর্শনে কিংবা কলাভবনে হাতেকলমে কাজ করে দেখেছেন কাঠের উপর কাপড় না লাগিয়ে সরাসরি তার উপর ছবি আঁকলে তা অতি দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই 'কাঠের পাটা'র কাপড় লাগিয়ে কাজ করার ইটালিও পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করতে বলেছেন। টেঁকসই এবং কীটনাশক গুণসম্পন্ন 'কাগজের পাটা বা ওয়াস্‌লি' রাজপুত বা মুঘল শৈলীর ছবি আঁকার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এক্ষেত্রে নন্দলাল জয়পুর, আজমীর, ওয়ার্ধা, নেপাল, সিকিমে অনুসৃত পদ্ধতিটি বর্ণনা করেছেন। করণ উপকরণ অংশে বর্ণিত সমস্ত দ্রব্য বাজারে কিনতে পাওয়া গেলেও উপদানগুলি নিজে তৈরি করে নেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ তা তিনি পাঠক ও

শিল্পীদের দিতে চেয়েছেন। শিল্পী যদি এই ব্যাপারে স্বনির্ভর হতে পারে তাহলে ছবি স্বভাবতই ‘সাদাসিধা, বাহুল্যবর্জিত, অথচ ভাবব্যঞ্জক’ হয়ে উঠবে।[২২২]

নন্দলাল *শিল্পচর্চা*-র প্রকরণ অংশে প্রথমেই ‘ফ্রেস্কো’, ‘উলুটি’,[২২৩] ‘আরায়েস’, অজন্তা, সিংহলি, নেপালি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। ফ্রেস্কো করার জন্য সূক্ষ্ম কাজের বদলে ব্যঞ্জনাধর্মী ছবিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই ধরনের কাজে শিল্পীর দক্ষতা ও অল্প আঁচড়ে বিষয় বর্ণনার ক্ষমতা থাকা বিশেষভাবে জরুরি বলে মনে করেছন। উত্তর-পশ্চিমভারতে বিশেষ করে রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত জয়পুরী ভিত্তিচিত্র বা ‘আরায়েস’ পদ্ধতিটি নন্দলাল সেখানকারই শিল্পী নরসিংহ লালের কাছ থেকে শেখা ও শেখানোর ব্যবস্থা করেন। এই পদ্ধতিতে কলাভবনের পুরানো বাড়ি ও লাইব্রেরির দেওয়ালগুলি স্থাপত্যের রূপে সেজে ওঠে। দৃঢ়তা মসৃণতা ও স্থায়িত্বের ভিত্তিতে বাংলার লুপ্তপ্রায় ‘পঙ্কের কাজ’[২২৪] আরায়েসের সঙ্গে তুলনীয়। স্থায়িত্বের বিচারে অজন্তা রীতিতে ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতিটিকে সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করেছেন। এর জমি-তৈরির পদ্ধতিটি কুমোরদের প্রতিমা তৈরির রীতি পর্যবেক্ষণ করে, অজন্তা-ভিত্তিচিত্রের খসে পড়া অস্তর বিশ্লেষণ করে অনুমানের দ্বারা ও পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে।[২২৫] ভারতবর্ষীয় ভিত্তিচিত্রের নানা পদ্ধতি আলোচনার পর আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামীর গ্রন্থ *Mediaeval Sinhalese Art*-এর (১৯০৮) থেকে শিক্ষা নিয়ে ‘সিংহলী ভিত্তিচিত্র’ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থে বর্ণিত ‘নেপালী ভত্তিচিত্র’ পদ্ধতিটি তিনি নেপালি শিল্পী ভিখাজির কাছ থেকে জেনেছেন। নন্দলাল এই দুটি পদ্ধতির সঙ্গেই অজন্তা ভিত্তিচিত্রের পদ্ধতির খুঁজে পেয়েছেন। এছাড়া ‘জগন্নাথের পট’ সম্পর্কে ও ‘তিব্বতী টঙ্গা’[২২৬] সম্পর্কে লিখেছেন। ‘চিকন কাজ: লিপ্ত ছবি’কে তিনি টেম্পেরা ও পর্দাজ এই দুটি ভাগে ভাগ করে প্রথমোক্ত পদ্ধতিটি মোট আটটি ধাপে বর্ণনা করেছেন। পর্দাজের ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন –

> রঙের ছোট-বড়ো রেখায় বা বিন্দুতে গড়ন দেখানো, রঙ মেলানো, রঙের বিভিন্ন পর্দা বা টোন মীড়ের মতো মোলায়েম করে দেখানো – এসব প্রয়োজনে এর ব্যবহার।[২২৭]

চ্যাটাইয়া – চ্যাটাইয়ের মতো, খরাদে – গোল করে গড়ন দেখানো, যবের মতো, দিমক – উইয়ে খাওয়া কাঠের মতো, বুঁদিয়া – ছোট ছোট বৃষ্টিবিন্দুর মতো, কাপড়ের মতো বুনুনি এবং ছেঁচ্‌ড়া – ছেঁড়া-ছেঁড়া টান ইত্যাদি পর্দাজের বিভিন্ন নমুনাগুলি চিত্র সহকারে বর্ণনা করেছেন। চিন জাপানের

'রেশমী কাপড়ে ছবি' আঁকার উপকরণ, ধাপ এবং পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রবর্তিত 'ওয়াশ' পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়াশ সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের পছন্দ অপছন্দের দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। অবনীন্দ্রনাথের ছবির বিশেষত্ব কী, কেন ওয়াশ পদ্ধতিতে অবনীন্দ্রনাথ সকলের সেরা তা ব্যাখা করে বুঝিয়েছেন।

ছবি আঁকার করণ উপকরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও ছবি আঁকতে গেলে আঁকার বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে প্রতিটি জিনিসের আলাদা গড়ন, রঙ, বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পীকে সবসময় সজাগ থেকে অনেক বেশি খুঁটিয়ে দেখতে হয়। নন্দলাল বসু *শিল্পচর্চা* গ্রন্থের রীতি-প্রকৃতি অংশে শিল্পীর এই কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। বিশ্ব প্রকৃতি দর্শনের পদ্ধতি চিত্র সহকারে অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করেছেন। 'গাছপালার ভাবভঙ্গি গঠন' সম্পর্কিত অধ্যায়ে গাছের ধর্ম বর্ণনা করে বলেছেন –

> গাছের প্রকৃতি এই যে, সর্বদা সে চাইছে যথাসাধ্য সর্বাঙ্গ দিয়েই প্রাণদেবতা সূর্যের রৌদ্র পান করে পরিণত হবে, ফলবান হবে সে। ভূমির উপরিভাগে গাছের সমস্ত গতিভঙ্গি সেই ঐকান্তিক ইচ্ছা-দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।[২২৮]

নদী যেমন উৎপত্তি স্থল থেকে বাহিত উপনদী-শাখানদীতে বিভক্ত হয়ে সাগরের বিশালত্বে প্রবেশ করে তেমনি গাছও কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখায় বিস্তীর্ণ পুষ্প-পল্লবে মহীরুহ হয়ে ওঠে। গাছের গুঁড়ি হল গাছের শিরদাঁড়া। বিভিন্ন গাছের গুঁড়ির গড়ন, একটি ডালের সঙ্গে আরেকটি ডালের জোড়, জ্যান্ত-মরা ডাল, শাখা আঁকার সঠিক পদ্ধতি কি হবে তা তিনি লেখায়-রেখায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। গাছ নিজের ক্ষত সারানোর কাজ কত দক্ষতার সঙ্গে করে তা সচিত্র বর্ণনা করেছেন। গাছপালার এই বাস্তব রূপ ছাড়াও ধারাবাহিক ভাবে ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশের এই সমস্ত আলংকারিক রূপ তুলে ধরেছেন। ছবিতে বস্তুর গড়ন, গতি, আয়তন, ওজন, স্পৃশ্য গুণ 'রেখা'র মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো প্রকাশ করা যায়। আঁকার কাজে ব্যবহৃত মূলত দুটি রেখা, লিখনের রেখা এবং গড়নের রেখা সম্পর্কে বলেছেন। ছবিতে লিখনের রেখাটির ব্যবহার পারস্য ও চিনে শিল্পীদের কলম ও তুলির কাজে মূলত দেখা যায়। কলমে লেখা রেখা তারের পাতের মতো দেখতে হয়। অন্যদিকে তুলিতে লেখা রেখা কোথাও সরু কোথাও মোটা হয়। ভারতীয়দের লেখাঙ্কনের রেখা আগাগোড়া সমান চওড়া হয়। তাতে তারের ভাব

থাকে। চিনা লেখাঙ্কনের রেখা সরু, মোটা, গাঢ়, হালকা, চ্যাপ্টা, ধ্যাব্ড়া নানা রকম হয়ে থাকে। কোন রূপের গড়ন বা ভঙ্গি বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলতে যে রেখা ব্যবহার করা হয় তাকে গড়নের রেখা বলে। শিল্পীর অভিজ্ঞতা, মনন ও দক্ষতা এই ধরনের রেখায় প্রতিফলিত হয়। প্রাচ্য-দেশীয় ছবির প্রাণ হল রেখা। নন্দলাল শিল্প-সাহিত্যে ব্যবহৃত নয়টি রসকে রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলেও তাঁর আঁকা নবরস ব্যঞ্জক রেখাঙ্কনকে ফর্মূলা হিসাবে ব্যবহার না করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে নিসর্গচিত্রের রস অনির্দিষ্ট, এতে কোন রসেরই প্রকাশ ঘটে না। বড়জোর শান্তরস বা একাত্মতা রসের প্রকাশ ঘটে থাকতে পারে; তবে নিসর্গচিত্রের ভাবানুভূতি ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন।[২২৯] সংকীর্ণমনা শিল্পীদের তিনি হীননজরে দেখে, শিল্পশিক্ষায় অনধিকারী বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে অনধিকারী সেই, শিল্পসৃষ্টির আনন্দ যার শিল্পশিক্ষার লক্ষ নয়; অর্থের জন্য বা সুনামের জন্যই শিল্পকৌশল সংগ্রহ করা, আর ব্যাবসার পথ খোলাতেই সে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই ধরনের শিক্ষার্থী ‘স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা এবং মেধাহীন’।[২৩০] এই ধরনের শিল্পীদের অনুদারতার ফলেই বহু বিস্ময়কর ও অমূল্য শিল্প কৌশল পৃথিবী থেকে কালে কালে লোপ পেয়ে গেছে। তিনি এই সংকীর্ণমনা শিল্পীদের দলে পড়েন না। তিনি নিজে যতটুকু জেনেছেন তা বিতরণ করে দিতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথি, বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও গুণীব্যক্তিদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন সবই গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে বাহুল্য বর্জিত সহজ-সরল ভাষায়।

নন্দলাল বসু চিত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। সূচীশিল্পের নক্সা সম্বলিত *ফুলকারী* গ্রন্থটির ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন্দলালের বিচিত্র মাধ্যমে শিল্পচর্চার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। *রূপাবলী*-এর বিভিন্ন খণ্ডে প্রাচীন শিল্পসমূহের আদর্শ এবং নিজের অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে নন্দলাল জানান, গ্রন্থ চিত্রিত রেখাচিত্রগুলি বস্তুর ভাব-ভঙ্গি অনুযায়ী রূপ-ছন্দ যুক্ত করে অনুকরণ করতে হবে। গ্রন্থাঙ্কিত চিত্রগুলি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিসমূহের অনুসারী হওয়ায় এইগুলির অনুশীলনে ছন্দের বোধ ও ছন্দে অধিকার ক্রমশ বর্ধিত হতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।[২৩১] মৌলিক চিত্র-রচনা বা পূর্বশিল্পীদের রচনার নকল করার নিয়মগুলি নন্দলাল সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। *রূপাবলী*-র প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট মানুষের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির চিত্রগুলি অজন্তা, বাগ, সিংহলের সিগিরিয়া, কোণার্ক মন্দিরের প্রস্তরমূর্তি,

বাংলার প্রস্তরমূর্তি, কাশ্মীরি চিত্র ও রাজপুত চিত্রের মূল-আদর্শকে সামনে রেখে করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে মানুষের হাত ও পায়ের বিভিন্ন মূদ্রার চিত্রগুলি বাগ ও অজন্তাগুহার কোন না কোন চিত্রের আদর্শে কল্পিত। তৃতীয় ভাগের চিত্রগুলির মূল-আদর্শ হল দাক্ষিণাত্যের অষ্টধাতুনির্মিত সুন্দরমূর্তি, উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দিরের জননীমূর্তি, চিন্তান্বিতা, বুদ্ধগয়ার যক্ষিণীমূর্তি, পূজারত নাগরাজ, অজন্তা-গুহাচিত্রের আন্‌মনা, প্রণতা, দ্বারবর্তিনী, প্রসাধনরতা।

নন্দলালের লেখাগুলি কোনো সাহিত্যিকের নয়, সাহিত্যগুণের বিচার করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি নিজেও বলেছেন 'এ-সব বিষয়ে, পড়াশোনার চেয়ে দেখা ভালো, দেখার চেয়ে করা ভালো।'[২৩২] তবুও তাঁর লেখায় উদ্ভিদবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদদের পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাব্যিক গুণ, সংবেদনশীল হৃদয়ের অভিব্যক্তি। এইগুলি প্রকৃত অর্থে চিত্রসাহিত্য। ঘরোয়া শব্দ বিন্যাস, সহজ সরল ভাষায় আন্তরিক উপমা সঞ্চয়নে লেখাগুলি তাঁর শিল্পদর্শনের মূল্যবান বাণীর মতো। সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী হলেও তাঁর লেখাগুলিতে নিজেকে জাহির করা বা অহং বোধ নেই। বিংশ শতাব্দীতে পরম্পরাকে আশ্রয় করে নতুন শিল্পসৃষ্টির যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, সেই নতুন পরিস্থিতে যথোপযুক্ত শিল্প পরিবেশ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ। তাঁর লেখায় নতুন শিল্পপন্থা সম্পর্কে সঙ্গত প্রশ্ন ও সেগুলির সদুত্তর পাওয়া যায়। নন্দলাল শিল্পসাধনার গূঢ় তত্ত্বগুলিকে রহস্যের মোড়কে আবৃত না রেখে মোক্ষলাভের পথে গুরুর ভূমিকা পালন করেন। যাঁর কাছে, যেখান থেকে যা কিছু শিখেছেন, সেই স্থান, দেশ বা ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেগুলি গ্রন্থে বর্ণনা বা চিত্রিত করেন। শিল্পীকে সমাজের সমস্ত শ্রেণির থেকে শিখতে নির্দেশ দিয়ে শ্রেণিবৈষম্যের ধারণাকে ভেঙ্গে দিতে চান। তাঁর লেখাগুলি শিল্পীর অভিজ্ঞতা, অনুভব, অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও দার্শনিক মনের চরিতকথা।

খ) চিঠিপত্র

ভারতবর্ষে যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়ের অঙ্গ হিসাবে চিঠিপত্র বিনিময়ের রীতিটি চিরকালীন। নন্দলাল বসু তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র-ছাত্রী ও বহু পরিচিত মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পোস্টকার্ড অথবা পূর্ণাঙ্গ চিঠিপত্রের অধিকাংশেরই একপাশে ছবি এঁকে বা কোলাজ করে তার নিচে বা আরেক পাশে দু-চার কথা লিখেছেন। চিঠিপত্রগুলিতে শিল্পীর দরদী মন,

দায়িত্ববোধ, প্রকৃতি চেতনা, স্বদেশ চেতনা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং তাঁর শিল্পতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মনে করা হয় গগনেন্দ্রনাথ ও টাইকানের পারস্পরিক সচিত্র পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে ছবি এঁকে চিঠি লেখার প্রবর্তন হয়েছিল নন্দলাল সেই ধারা কলাভবনে রক্ষা করেছিলেন।[২৩৩] তবে সচিত্র পোস্টকার্ড রচনা আসলে নন্দলালের স্বতস্ফুর্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ। প্রাত্যহিক জীবনপথে চলতে চলতে যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু অনুভব করেছেন সেই অভিজ্ঞতা এমনকি স্মৃতি থেকে উঠে আসা বিষয়কে কেন্দ্র করেও কার্ড এঁকেছেন। কার্ডচিত্র পত্রের বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পরিচিত দৃশ্যমান জগৎ চিত্রায়ণের আড়ালে গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তুলিতে কালির টোনের রকমফের বা স্বল্পতম রেখার বিন্যাসে ছোট ছোট পোস্টকার্ডে বা সাধারণ কার্ডে নন্দলাল যে সব ছবি এঁকেছেন, তা নিশ্চিতভাবে এক নতুন আঙ্গিক সৃষ্টির প্রয়াস বলে মনে হয়।[২৩৪] তাঁর প্রেরিত কার্ডগুলি প্রাপকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকায় কার্ডচিত্রের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাঁর চিঠিপত্র যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকখানি জুড়ে রয়েছে বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর[২৩৫] সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ। ১৩ জুলাই ১৯৫৪ তারিখে বরেন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে নন্দলাল একটি পাখির কোলাজ করে পাশে লেখেন 'রূপ আগে না ভাব আগে'।[২৩৬] ১৮ জুলাই ১৯৫৪ তারিখের পত্রে কোলাজ প্রসঙ্গে তিনি জানান ওইরূপ ছবি করার আগে কিছু না ভেবে এক টুকরা কাগজ ছিঁড়ে ফেলে তার গড়ন দেখে ভাব যোজনা করে, দু-একটা রেখা বা লাইন যোগ করেন। উপলব্ধি করেন 'রূপের ভাবটা আর ভাবের রূপটা শিল্পীর চেতনার মধ্যে আগে থেকেই আছে।'[২৩৭] কানাই সামন্তকে লেখা পত্রগুলিতেও নন্দলাল বসুর শিল্পভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০ মার্চ ১৯৫৪ তারিখে লেখা আর একটি পত্রে তিনি বলেন, তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলিতে স্বাজাত্যবোধ ও প্রাচ্যাদর্শকে তুলে ধরতে গিয়ে ছবি উগ্র হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য শিল্পীদের শিল্পকাজ দেখে মুগ্ধ হলেও তাঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার অবকাশ পাননি। তিনি চান পরজন্মে সকল দেশের মহাশিল্পের রসের অধিকারী হয়ে জন্মাতে। তাঁর মতে মূঢ় জ্ঞানান্ধ সমালোচকরা কেবল আঙ্গিক ও দেশ-কাল নিয়ে তর্ক ও বিচার করে। রস আসলে একটি অখণ্ড অতুলনীয় বস্তু। তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, উপলব্ধি করা যায় মাত্র। অপর একটি পত্রে বলেন হুবহু নকল করে বা সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু একটা খাড়া করলেই তা আর্ট হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ছবি বা মূর্তি আকারে ভাব-

ভঙ্গি-ছন্দ-রস সংযোগে প্রকাশ করাই আর্ট। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মাকে (১৯০৩-১৯৯৫) লেখা একটি চিঠিতে ছন্দবোধ-সুরবোধ ও তাল-মানজ্ঞানের কথা প্রসঙ্গে বলেন –

> ছন্দ বলতে Composition-এর মধ্যে একটা দোলার সৃষ্টি করা, ও খানিকটা ডেকোরেটিভ quality আনা। ভাল ছবি দেখার পর দুটা গুণ থাকলে মনের মধ্যে ছবি দেখার পরও একটা রণন থেকে যায়। যেমন ভাল গান ও কবিতা পড়লে। মেদাটে (dull) গান, কবিতা পড়লে তা সম্ভব নয়।...তাল বলতে যথাযথ, ঠিকঠাক। বেশিও নয় কমও নয়। মান বলতে শিল্পীর ভাবমত বস্তুর নিজ Proportion ও বস্তুর পরস্পর মাপের সামঞ্জস্য। লাবণ্যযোজনাও style genius-এর কাজ।[২৩৮]

বরেন্দ্রনাথকে লেখা ২৫ আগস্ট ১৯৫৪ তারিখের একটি পত্রে নন্দলাল বলেন – শিল্পীদের কাছে বিবেকানন্দের আদর্শ শিল্পের মেরুদণ্ডের মতো। বিবেকানন্দর ছিল জ্ঞানের পথে চলে নান্দনিক পথের সাধন ও পূর্ণতা, আর রামকৃষ্ণর ছিল নান্দনিক পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ।[২৩৯] রামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথ শিল্পীদের পক্ষে বেশি উপযোগী। চিত্রসাধনার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরলাভ সম্ভব বলে তাঁর বিশ্বাস।[২৪০]

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে ২৯ অক্টোবর ১৯২১ তারিখে পাঠানো পোস্টকার্ডে কালি-তুলিতে লোকশিল্পের আদলে 'একটি ঘোড়ার ছবি'র উল্টোপিঠে নন্দলাল লিখেছেন –

> দেয়ালে এক টুকরো ন্যাকড়া ও হাঁড়ি কালি চেঁচে অল্প জল দিয়ে আঁকা ছবি। আর্টিস্টটি পাগলের মত বেড়ায় একটী কৌপীন ও একটা ছেঁড়া চাদর কাল রং-এ ছোবান বলছে কালো রং আমার লক্ষ্মী।'[২৪১]

লেখাটির মধ্যে ছবি আঁকার একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে তিনি এই বিশেষ কৌশলটি ব্যবহার করেন 'নটীর পূজা' ভিত্তিচিত্র করার সময়।[২৪২] শান্তিনিকেতনের এক ছাত্রের কাছে লেখা চিঠিতে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজেকে বোহিমিয়ন বলে উল্লেখ করলে নন্দলাল একটি চিঠিতে তাঁর বোহিমিয়ন হওয়ার নেতিবাচক বাসনাকে ইতিবাচক করে তোলেন বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে। তিনি বলেন শিল্পী বেপরোয়া হন শিল্পের প্রতি তাঁর প্রেম থেকেই। বিশ্বশুদ্ধ মানুষ যেখানে অর্থ, প্রতিপত্তি ও সুখের জন্য পাগল হয়ে বেড়ায় সেখানে শিল্পী রসাস্বাদনে মগ্ন হয়ে থাকেন। তাই বোহেমিয়ান হওয়ার বাসনাকে তিনি সাধুবাদ জানান।[২৪৩] ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও নন্দলালের পত্রালাপে কলাভবন ও বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক বিষয়ে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। ২২ ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে ইন্দুলেখা ঘোষকে লেখা একটি পত্রে বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে কলাভবনে নতুন নিয়ম চালু হওয়া এবং প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে শিল্পশিক্ষার কারাগার হয়ে উঠলে সেই বিষয়ে তাঁর অন্তরের বেদনা ফুটে ওঠে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান, তাঁদের চলে যাওয়া তাঁর অন্তরের বেদনা ও শূন্যতাবোধ চিত্রনিভা চৌধুরীকে (১৯১২-১৯৯৯) লেখা পত্রগুলি থেকে অনুমান করা যায়। তিনি লেখেন –

> তোমরা যাওয়াতে কলাভবনটা ফাঁকা হয়ে গেছে এখন কোনো কাজে পূর্বের মতো উৎসাহ পাই না। ...প্রত্যেক বছরই গাছে নূতন কচি পাতা হয়, পুরাতন পাতা ঝরে যায়, কিন্তু গাছ পুরাতন পাতার কথা ভোলে না, তার প্রমাণ সেও নিজে পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই তার পুরাতনের প্রতি এত টান।[২৪৪]

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে (১৯০২-১৯৫৫) একটি চিঠিতে বলেন – শান্তিনিকেতনে তাঁর চলে আসাতে অবনীন্দ্রনাথ কতটা বেদনা অনুভব করেছিলেন তা তিনি বুঝতে পারেন। কেননা তাঁর ছাত্রছাত্রীরা 'সেই দুঃখ' তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে।[২৪৫] বন্ধু রমেশচরণ বসু মজুমদারের কাছে লেখা পত্রেও কলাভবন ও শান্তিনিকেতনের শূন্যতা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি লেখেন –

> শিব উপস্থিত ধুনি জ্বালিয়ে ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন যদিও ধুনির তাও অসহ্য তথাপি শিবের শান্ত মূর্তি শান্তি দিচ্ছে। চতুর্দিক যেন ধ্যানে স্থির আমি শুধু যেগে বসে আছি।[২৪৬]

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন বীরভূমের সাঁওতাল পল্লীর সঙ্গে নন্দলালের ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাঁর পোস্টকার্ডে তাঁদের সরল জীবনযাত্রার রেখাচিত্র বারবার ফুটে ওঠে। শান্তিনিকেতন থেকে ধীরেনকৃষ্ণকে লেখা বেশ কিছু পত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বংশীবাদনরত সাঁওতাল, তালবনের ভিতর বৃষ্টিস্নাত একদল সাঁওতাল রমণী, রন্ধনরত সাঁওতাল মেয়ের ছবি পাওয়া যায়। আর একবার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ আগরতলা থেকে একটি কাঠুরী রমণীর ছবি এঁকে পাঠালে অপর পত্রে ছবিটির প্রশংসা করে এই রমণীটির সঙ্গে থাকা ঘটটির প্রসঙ্গে জানতে চান। এরসঙ্গে পোস্টকার্ডটির অন্যপিঠে কলম দিয়ে আঁকা তালগাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের ছবি পাঠান। মেয়েটির সামনে জল, দূরে গ্রামের দুটো ঘর ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে। এটি শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়ার চেনা দৃশ্য। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও মানুষ নন্দলালের পত্রে বারবার পাই। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির তার সমস্ত কিছু থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করতে চেয়েছেন, তার কাছে কোন কিছুই অপ্রাসঙ্গিক অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হয়নি। ইন্দু দুগারকে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেন –

> প্রকৃতিদেবী তার সৌন্দর্যের ভাণ্ডার...সদা খুলে রেখেছেন। এ ভাণ্ডারের চাবিকাঠি "ভাল লাগায়"।...শিল্পলক্ষ্মীর বাসা হৃদয়ে, তার চলার রাস্তা – হৃদয় হতে হৃদয়ে, ঐশ্বর্যে নয় – পাণ্ডিত্যে নয় – জ্ঞানে নয় – ধর্মেও নয়।[২৪৭]

পত্রটিতে শিল্পবোধ এবং প্রকৃতি চেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আরো কয়েকটি পত্রে তাঁর এই প্রকৃতি দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যিকের মতো। ১ জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে লেখা একটি পত্রে কালি নদীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কালি নদী কথা বলেনা, সে শুধু কালো বড় বড় চোখ মেলে চায়। তার গায়ে সবুজ ওড়না। নুড়ি, নোড়া, ছোট ছোট গাছ পালাকে ভাইবোনের স্নেহে আদর করে জটিয়ে রেখেছে। তার গতি ধীর কারণ সে মায়ায় আবদ্ধ। তার চোখে জল টলটল করে যেতে হবে বলে। এই কালি নদীকে আবার তিনি তাঁর কল্পনা ও ভাষার জাদুতে রহস্যময়ী করে তুলেছেন। তার হাতে যেন ছোট ছুরি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কালো তার বক্র দৃষ্টি। ঘন বন নিশ্চুপ হয়ে থাকে। সতর্ক করে দেয় ছোট সবুজ পাখি। ১৬ মার্চ ১৯৪৩ তারিখে লেখা আর একটি পত্রে শান্তিনিকেতন আশ্রমে বসন্ত বিদায়ের মুহূর্তগুলিকে কাব্যিক স্বরে বিশ্লেষণ করেছেন –

> শিমূল মধু খেতে ডালে যে সব পাখি বসত তার স্মৃতি বহন করছে তার ফলগুলি। পালাশের সেই কালো পাখি মাঝে ২ ভুলে ডালে বসে কিন্তু তখনই উড়ে যায়। নূতন ফুলরা এসেছে ও আসবে – শিরিষ এই দারুণ গ্রীষ্মে রুদ্রের তপস্যায় নিজেকে শুকিয়ে ফেলেছে। বকুল সকাল সন্ধ্যায় চোখের জল ফেলছে। মহানিমের মভ কালারের শাড়ীর আওয়াজ কানে আসছে। শালের ফুলের বন্যাও এল ২। নিম ফুল তার ছিটের ওড়না গায়ে একবার দিচ্ছে। বনপুলক তার দিকে চেয়ে দেখলেই শিউরে উঠছে।[২৪৮]

পত্রটিতে গ্রীষ্ম আগমন ও বসন্ত বিদায়ের বর্ণনার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির মাধুর্য অনুভব করা যায়।

নন্দলাল বসুর অন্যতমা ছাত্রী রানী চন্দকে (১৯১২-১৯৯৭) পাঠানো নন্দলালের পত্রগুলিতে লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলিও যেন কথা বলে ওঠে। রানী নন্দলালকে একটি মুরগীর ছবি এঁকে পাঠালে তার উত্তরে নন্দলালও জঙ্গলে ছুটে বেড়ানো রঙচঙে একটি মুরগীর ছবি এঁকে পাঠান। তাতে লেখেন – 'মুরগী বাঁচাতে শিখলে মেরে খেও'।[২৪৯] আর একবার তকলিতে সুতো কাটছে এমন একটি রমণীর ছবি রানী নন্দলালকে এঁকে পাঠালে তার উত্তরে নন্দলাল অনুরূপ একটি ছবি পোস্টকার্ডে এঁকে পাঠান। নন্দলাল প্রেরিত ছবি দেখে রানী চন্দ উপলব্ধি করলেন তাঁর নিজের আঁকা মেয়েটি ধীর, সুতো অনেক বেশি মোটা। ছবি যেন স্থির হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে নন্দলালের আঁকা ছবিতে মেয়েটির আঁচল উড়ছে চুল উড়ছে, হাত উঠছে নামছে। তকলি ঘুরছে আর মেয়েটি সুতো কেটে চলেছে। আর এর মিহি সুতো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকেও ছবির প্রত্যুত্তরে এমন অনেক ছবি এঁকে

পাঠান। মণিপুরী নৃত্য ঐতিহ্যের ছবিটি এর মধ্যে অন্যতম। এই সমস্ত পোস্টকার্ডের মাধ্যমে নন্দলাল অজ্ঞাতে, নীরবে শিক্ষাদানের কাজটি করেছেন।

নন্দলাল শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেখানেই গেছেন কলাভবনকে অন্তরে বয়ে নিয়ে গেছেন। ব্যস্ততার মাঝেও কলাভবনের সার্বিক বিকাশের কথা ভেবে ভ্রমণস্থল থেকেই তাঁর নিকট আত্মীয়বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ভাগ করে নিয়ে পত্র পাঠিয়েছেন। ৭ মে ১৯২৭ তারিখে কার্শিয়াং পাহাড় থেকে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে চিনে কালিতে পাহাড়, গাছ ও বাড়ির ছাদের কিছুটা অংশ এঁকে পাঠানো একটি পত্রে মেঘের মুলুক কার্শিয়াং-এর সঙ্গে শান্তনিকেতনের তুলনা করেছেন বলেন – 'শিব মাথার আগুনটা কি তথায় গচ্ছিত রেখেছেন?'[২৫০] কার্শিয়াং ভ্রমণকালে আরো একটি পোস্টকার্ডে কালি তুলিতে পাহাড়ের গায়ে পাইন গাছের বন এবং দূরে পাহাড়ের মাথায় ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ শায়িত শিবের ছবি আঁকেন। ছবিটিতে শিব ও প্রকৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বুদ্ধগয়ায় গিয়ে পাহাড় নদীর এক নিসর্গ চিত্র এঁকে পাঠানো একটি পত্রে পাহাড়টিকে বুদ্ধদেবের আবাসস্থল আর নদীটিকে নৈরঞ্জনা নদী বলে উল্লেখ করেন। সুজাতার গ্রামে গিয়ে সুজাতার বাড়ি যেখানে ছিল তার ছবি সমেত কার্ড পাঠান। হাজারিবাগে গিয়ে সেখানকার আবহাওয়া, রুক্ষ প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে বলেন সেখানকার আকাশটা বিধবার সাদা কাপড়ের মতো, দেখলে যেন বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তাই সেখানে তিনি ছবি আঁকেন কান্নার মতো। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাচ্য সফরকালীন পত্রগুলি কলাভবন, তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সমৃদ্ধ করে। বিশেষত চিন থেকে পাঠানো কার্ডগুলি থেকে চিনের গ্রাম, তাদেরত স্বভাব, চেহারা বা সাজ-পোশাকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পুরীর পাথরের ক্লাসিক সিংহ ভাস্কর্যের সঙ্গে চিনের সিংহ ভাস্কর্যের মিল খুজে পেয়ে তিনি লেখেন – 'পুরীর সিংহ ছানা এই দেশেই হয়েছিল বোধহয়।'[২৫১] রানী চন্দ ও অনিল চন্দকে লেখা কতগুলি পোস্টকার্ডে রসবোধ ও প্রতীকধর্মীতা লক্ষ করা যায়। এইরকম প্রতীকধর্মী সচিত্র পত্র নন্দলাল ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও পুসু[২৫২]কেও পাঠান।

নন্দলাল বসুর ছোটদের জন্য লেখা ও আঁকা পোস্টকার্ডগুলি বিচিত্র ও আকর্ষণীয়। নন্দলাল রানীর পুত্র অভিজিত চন্দ, তাঁর ছাত্রী প্রতিভা সেনগুপ্তর কন্যা 'বাবলি' (রত্নাবলী ঘোষ), নিমাই সেনের (যমুনা সেনের পুত্র) জন্য একাধিক পোস্টকার্ড এঁকেছেন। পোস্টকার্ডগুলিতে খেলনা, টুকরো টুকরো

দৃশ্যাবলি প্রভৃতি একটি শিশুর মন যা কিছু কল্পনা করতে পারে তার চিত্র রয়েছে। দাদু তার প্রিয় নাতি-নাতনিকে যেভাবে স্নেহ করতে পারে, যেভাবে কথা বলতে পারে, উৎসাহ দিতে পারে, সেই স্নেহের পরশ পোস্টকার্ডগুলিতে রয়েছে। একটি পোস্টকার্ডে বাবলিকে তার ছবি আঁকার প্রশংসা করে বলেন যে সে ছবি এঁকে পাঠালে তিনিও ছবি এঁকে পাঠাবেন।[২৫৩] উল্লেখ্য বিষয়, ছোটদের জন্য লেখা পোস্টকার্ডগুলির স্পষ্ট হরফে সহজসরল ভাষায় লেখা। এই ধরনের পোস্টকার্ডচিত্রগুলিও শিশুসুলভ। শিশু যেমনভাবে ছবি আঁকতে সক্ষম সেই ধরণের ছবি এই পোস্টকার্ডগুলিতে আঁকা। কোথাও বেড়াতে গিয়ে খেলনা বা অন্যকিছু যা শিশুদৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারে, শিশুমনে আনন্দ সঞ্চার করতে পারে তা পোস্টকার্ডে এঁকে পাঠিয়েছেন। সাঁওতালদের বিয়ের উৎসবে কাঠের ঘোড়ার নাচ দেখে নাতি নিমাইকে তা এঁকে পাঠিয়েছেন।[২৫৪]

৪.৪.২ যামিনী রায়

ক) প্রবন্ধ ও গদ্য

যামিনী রায় ছিলেন অত্যাশ্চর্য কথক। কথায় গ্রাম্য ধাঁচ এবং কিছু মুদ্রাদোষ থাকলেও তাঁর কথায় ফুটে উঠত শিল্প ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর দর্শন। অসংখ্য গুণগ্রাহী সাহিত্যিক বন্ধুরা তাঁকে লেখবার জন্য বললেও তিনি নিজে হাতে বিশেষ কিছু লেখার আগ্রহ দেখাননি। যামিনী রায়ের নামে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার বেশিরভাগই কোন না কোন লেখক দ্বারা অনুলিখিত। তাঁর স্মৃতিকথা ‘ছেলেবেলা’, প্রশান্ত দাঁ কর্তৃক অনুলিখিত হয়ে *যুগান্তর* (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) পত্রিকায় ‘ছোটদের পাততাড়ি’ পাতায় প্রকাশিত হয়। ছোটদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা মনোগ্রাহি রচনাটিতে বর্ণিত শিল্পীর গ্রামের বাড়ি, বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, বেলিয়াতোড়ের প্রকৃতি-সংস্কৃতি, সেইসঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি উৎসাহ, আর্ট কলেজে আসা, গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে কলকাতার পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার কথাগুলি শিশুমনের প্রেরণা সৃষ্টি করে। চার-পাঁচ বছর বয়সে খেলারছলে রঙিন পাথর দিয়ে আঁকা ছবি দেখে তাঁর পিতার এক শিল্পীবন্ধুর আশীর্বাণী তাঁর শিশুমনে প্রভাব ফেলে। গ্রামীণ শিল্পীদের থেকে তাঁর দেখা, শোনা ও শেখা চলতে থাকে। বাঁকুড়া জেলার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠানো ‘সমাজ’ ছবিটির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে একটি গিনি উপহার পেয়ে তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন –

‘আমিও ছবি আঁকতে পারি।’[২৫৫] এরপর স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতার শিল্প বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর চাহিদার সঙ্গে শিল্পবিদ্যালয়ের পরিবেশের মিল না থাকার কারণে ভালোবাসা সম্মান সত্ত্বেও সেখানে তিনি স্থিতু হতে পারেননি; একাধিক বার তিনি সেখানে ভর্তি হয়েছেন ও ছেড়েছেন। তাঁর মন ‘খাঁচায় বদ্ধ পাখির মত’ ছটফট করত। নিজ বাসভূমের আকাশ, বাতাস, মাটি, পাথর, গাছপালা, সাঁওতাল ছেলে মেয়ে, পাহাড়, নদী, সবুজ মাঠ চোখের সামনে ভেসে উঠত।[২৫৬] পাশ্চাত্যধর্মী ছবি আঁকা ছেড়ে নতুন আঙ্গিকে শিল্পসৃষ্টির পিছনে কোন রহস্য কাজ করেছে এই প্রবন্ধটি পড়ে খানিকটা তার ঈঙ্গিত পাওয়া যায়।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি স্মারক পত্রিকায় ‘স্মৃতিকথা’ নামে এক নাতিদীর্ঘ রচনায় যামিনী রায়ের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির লোকজনের সুসম্পর্কের দিকটি পরিস্ফুট হয়। রচনাটির শুরুতেই তিনি বলেন –

> প্রতিদিনই সেই তিন ভায়ের কথা মনে পড়ে ও আমার প্রতিদিনের জীবনের পথ আলোকিত করে রাখে। তাঁদের সব ভালোবাসার কথা লিখে জানানো আমার পক্ষে সম্ভব তো নয়ই, অন্তরের এই ভাব কারো পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব কিনা বলতে পারি না।[২৫৭]

‘নিত্য কর্মই’ তাঁকে সমরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি ‘শ্রদ্ধা অর্পণের শক্তি দান করেছে’।[২৫৮] স্মৃতিতে ভেসে ওঠা একটি মাত্র ঘটনা উত্থাপনের মাধ্যমেই গগনেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা এবং তাঁর প্রতি গগনেন্দ্রনাথের আবেগের মূল্যবান রসঘন মুহূর্তটির পরিচয় পাওয়া যায়। Indian Society of Oriental Art–এ ছবির প্রদর্শনী উপলক্ষে গগনেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যামিনীর আঁকা ছবিগুলি তাঁর কাছে নিয়ে যান। চলৎশক্তি ও বাক্‌শক্তি রহিত অসুস্থ গগনেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীতে যামিনীর আঁকা ছবি দেখে যামিনীকে জড়িয়ে ধরে সজল নেত্রে ছবির প্রশংসা করে তাঁর অন্তরের কথা জানিয়ে দেন।

সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত যামিনী রায় সাক্ষরিত দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘পটুয়া শিল্প’ ও ‘রবীন্দ্রনাথের ছবি’। এই প্রবন্ধ দুটি লিখতে তাঁর অনেক সময় লাগে কারণ যামিনী সাধারণ প্রবন্ধকারের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতেন না। দেবীপ্রসাদ দিনের পর দিন তাঁর কথা শুনে-ভেবে-বুঝে খসড়া প্রস্তুত করে তাঁকে শুনিয়ে তাঁর মতামত অনুযায়ী সংশোধন

করেছেন।[২৫৮] ‘পটুয়া শিল্প’ প্রবন্ধটির (*সংকেত*, অগ্রহায়ণ ১৩৫০) শুরুতেই বাংলার চলিত চিত্রকলার সাধারণ বর্ণনা করে পটের ছবিকে প্রসাধনের প্রচেষ্টা সংস্কারের উৎসাহহীন ঘরোয়া বা আটপৌরে শিল্প; চরিত্রগতভাবে অভিজাত, বেদ-বেদান্তের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দেবমূর্তি, প্রতিমাকে পালাপার্বণের শিল্প বা পোশাকী শিল্প এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। পটুয়া ছবি আর কালীঘাটের ছবিকে অনেকেই সমার্থক মনে করলেও তাঁর মতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। বিদেশিরা মূলত কালীঘাট থেকে পটুয়া ছবি সংগ্রহ করেছেন বলে এই ভ্রম তাদের মানায়, কিন্তু এদেশীয় সমালোচকদের ‘বিদেশী ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি’তে তিনি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হন।[২৫৯] ছবির মধ্যে কোন বক্তব্য প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ ‘বলবার কথা’ বা প্রসঙ্গ আর কীভাবে ছবিকে প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ ‘বলবার ভাষা’ বা আঙ্গিক পটচিত্রকে এই দুদিক থেকে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। পটুয়া শিল্পে বলবার কথায় বাস্তব অনুকৃতি ব্যতিরেকে প্রকৃতির মূলবার্তাটি অতি কৌশলে প্রকাশ করতে দেখা যায়। এদিক বিচার করে প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে পটের ছবির মিল পাওয়া গেলেও পার্থক্য ঘটে যায় পৌরাণিক জগতে আশ্রয়কে ভিত্তি করে। অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে পুরাণে বিশ্বাস ও ভাবনার ঐক্য ছিল না। সেই সময়কার চিত্রে খাপছাড়া ভাবে সাংকেতিক চিহ্ন আসার ফলে সব মিলিয়ে একটা জগৎ তৈরি হতে দেখা যায় না। বাংলার পটুয়ারা পুরাণের উপর স্থিত সেই সংহত সামান্য লক্ষণের জগতের সন্ধান পেয়েছিল এবং এতেই বিশ্বাস বেঁধেছিল। যদিও পৌরাণিক বিশ্বাস অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় পটচিত্র গতানুগতিক হয়ে পড়ে। নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না ঠিকই, কিন্তু তারা মূল পটুয়া ছবির প্রচলিত ধারার অনুবর্তী হয়ে থাকে। যামিনী বলবার ভাষা অর্থাৎ আঙ্গিক প্রসঙ্গে বলেছেন যে বাংলার পটুয়ারা আড়ম্বর-জটিলতাহীন আশ্চর্য রকমের ঘরোয়া ভাষায় পৌরাণিক জগতের কথাকে বলতে শিখেছিল। অথচ আমাদের দেশে এর সমান্তরালে চলা ধ্রুপদী শিল্প বা ‘পোশাকী শিল্প’-র গম্ভীর ভাষা, শৌখিন দৃষ্টি, অতি সংস্কৃত ভঙ্গিমা ছিল। এই মান্যতাপ্রাপ্ত শিল্প আঙ্গিকের পাশে সহজ কথাকে সহজে বলতে পারা পারার কৃতিত্বে পটুয়া শিল্প অনন্য হয়ে উঠেছিল। পটুয়া ছবি দুটি দিক থেকে পরিপূর্ণ হতে পেরেছিল এবং একটি ব্যতিক্রমী ধারা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পেরেছিল। প্রথমত, পটুয়া ছবি সংহত পুরাণের জগতে পেরেছিল বলে তাতে কৃত্রিমতা আসেনি, আশান্তি আসেনি; এইজন্য অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক ছবির ধারা লুপ্ত হয়ে গেলেও পটুয়া ছবি বিলুপ্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত, পটুয়া শিল্প দৈনন্দিন

জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ওঠা-পড়া ভাঙা-গড়ার সাক্ষী হওয়ায় তার ভাষা ছিল ঘরোয়া আটপৌরে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীরা পৌরাণিক জগতে স্থিতু হতে পারেনি আবার পোশাকী শিল্পের ভাষাও আয়ত্ত করতে পারেনি বলে এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি। তাই অজ্ঞানে যা তারা আবিষ্কার করল তা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শৌখিনতার জৌলুসে দিকভ্রষ্ট হল, আবহমান কাল ব্যাপ্ত হল না; 'বিভূতির আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হওয়া অনেকটা সেইরকম'।[২৬০] রিয়েলিজমের চর্চায় অকল্পনীয় নিখুঁত ও পালিশ করার দরুন শিল্পের গড়ন হারিয়ে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ল। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্পও হাঁপিয়ে উঠলে পরিশ্রান্ত শিল্পীরা রিয়েলিজমের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য পথে প্রাণের সন্ধানে মরিয়া হইয়ে উঠল। খ্রিস্টের পুরাণ বিশ্বাসে চিড় ধরার ফলে সেই পথে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না; হঠাৎ এমন জায়গায় এসে পড়ল যে, 'পথ আর নেই'।[২৬১] তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাংকেতিক চিত্রের ফর্মকে সচেতনভাবে শুদ্ধ-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করল। রিয়েলিজম থেকে বেরিয়ে এসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রের মূল সত্যের পথে পা বাড়ানোর এই সচেতন প্রয়াসে শিল্পীদের অনিবার্য প্রয়োজন ছিল শিল্প-ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। কেননা, যিনি আইন অমান্য করবেন তাঁকে তো প্রথমে আইনের ব্যাপারে পাকা হতে হবে। পিকাসো, মাতিস সকলেই রিয়েলিস্টিক ছবি আঁকার আঙ্গিক চর্চায় দক্ষতা অর্জন করার পরই নতুন পথের সন্ধান করেছেন। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে ভাঙ্গনের রূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে যামিনী বলেছেন ইউরোপীয় শিল্পীরা যদি 'গোড়া বেঁধে খেলতে শিখত' তাহলে এ অবস্থা হত না।[২৬২] অর্থাৎ শৌখিনতার চটকে, বিলাসিতার আতিশয্যে শিল্পসৃষ্টির মূল উৎসকে তারা যদি ভুলে না যেত তবে ইউরোপীয় শিল্প এমন ভাঙ্গনের মুখে পতিত হত না। 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' (*কবিতা,* আষাঢ় ১৩৪৮) প্রবন্ধটিতেও ইউরোপীয় শিল্পের এই সমস্যা ও উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে বুঝতে বলেন। তাঁর মতে 'রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি ইওরোপীয়ান আঙ্গিকে'।[২৬৩] রবীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করে যামিনী জানান, বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কনের রীতিনীতি অনুশীলন ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ প্রাগৈতিহাসিক চিত্রের মত শুদ্ধ সত্যের সাধনা করেন। চিত্রসাধনায় তিনি নবাগত তা তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় থাকে না। 'কল্পনার আসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে' তাঁর অনভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ে যায়।[২৬৪] গুটি কয়েক ছবির স্থানে স্থানে রিয়েলিজমকে অস্বীকার করতে না পারার সমস্যা প্রথম শ্রেণির যে কোনো আধুনিক শিল্পীরই সমস্যা। আসলে সত্যিই

রিয়েলিস্টিক চিত্রকলায় আর অতি-আধুনিক ইওরোপীয়, চিন জাপান সারাবিশ্বের চিত্রকলায় দৃষ্টির কোন তফাৎ নেই। ভারতবর্ষের শিল্পই রিয়েলিজমের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পৌরাণিক জগতে স্থিতিলাভ করে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

যামিনী রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করেন তার শক্তি, ছন্দ, বৃহৎ রূপের যে আভাসের জন্য। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মতো ছবি সম্পর্কে অনেকেই অভিযোগ করেন সেই সমস্ত ছবিতে অ্যানাটমির বড় অভাব। কিন্তু যামিনী এই ধরনের ছবিতেই সবচেয়ে বেশি অ্যানাটমিবোধের ব্যবহার দেখতে পান। তাঁর মতে শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেওয়া ছাড়া অ্যানাটমি শাস্ত্রের আর বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। তাঁর ছবিতে আঁকা মানুষের ওজন-শিরদাঁড়া আছে, দেখলে মনে হয় না সেটা নেতিয়ে পড়বে বা হাওয়ায় দুলবে। রবীন্দ্রনাথের ছবি বলিষ্ঠ তা ওই হাড়ের জোড়ে, ছন্দগঠনে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশ অর্থাৎ ভারতীয় চিত্রকলার ভাববৈশিষ্ট্যের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে তিনি বিস্মিত হন। এই বিষয়টির নিহিতার্থ বোঝাতে যামিনী চাক্ষিক চিত্রায়ণ ও কাল্পনিক তথা ভাব চিত্রায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের মানুষ তাই তাঁর ছবিতে পৌরাণিক জগতের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নেই। তাঁর ছবিতে ভারতীয় রূপকল্পনার বিশেষত্ব তাই ব্যক্তিগত কল্পনার লীলাতেই প্রকাশ পায়। প্রবন্ধের শেষে ছবি বিষয়ে যামিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আলাপচারিতার স্মৃতি ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ একবার যামিনীকে বলেছিলেন তাঁর আর্ট স্কুলে পড়ার বিদ্যা নেই বলেই হয়তো তাঁর ছবি সম্পূর্ণ হয় না। যামিনী তখন রবীন্দ্রনাথকে ছোট একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চান প্রথাগত শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও ছবি আঁকা যায়, যদি তার মধ্যে রসপোলব্ধি থাকে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে আঙ্গিক নয় সবার আগে আসে উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই গুণটি আছে বলেই যামিনীর চোখে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের ছবি খাঁটি ইউরোপীয় আঙ্গিকের এবং ভারতীয় শিল্পকলার ভাববৈশিষ্ট্য যুক্ত; এই বাক্য দুটিকে স্ববিরোধী মনে হলেও এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পী, তাঁর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভাব থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। যদি ভারতীয় মনোভাব, ভারতীয় শিল্পকলার ভাবধর্মী শিল্পের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ছবিতে থেকে থাকে তাহলে তাঁর ছবি খাঁটি ইউরোপীয় আঙ্গিকের হবে কী করে। এখানে খাঁটি ইউরোপীয় আঙ্গিক বলতে যামিনী রিয়েলিজমের বিপক্ষে প্রাগৈতিহাসিক

সংকেতধর্মী ছবি আঁকার সর্বাধুনিক ইউরোপীয় শিল্পগোষ্ঠীর শিল্পীদের চিত্র আঙ্গিকের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তাই প্রবন্ধের মধ্যে ইউরোপীয় শিল্পীদের সমস্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির সমস্যা এক হয়ে গেছে। যামিনীর লেখায় নিজের ছবির বিশ্লেষণ পড়ে অভিভূত শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ২৫ মে ১৯৪১ এবং ৭ জুন ১৯৪১ তারিখে পরপর দুটি পত্র লেখেন। প্রথম পত্রে বলেন –

> আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় ও অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।[২৬৫]

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রে নিজের ছবি সম্পর্কে যামিনীর মতামতকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট করেই বোঝা যায়। তাঁর মন্তব্যে এদেশের সমালোচকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পাশে যামিনী রায়ের দৃষ্টির গভীরতা ফুটে ওঠে।

যামিনী রায় নিজেকে শিল্পী ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে চাননি, সাহিত্যিকদের মতো বক্তৃতা দান করা, লেখাকে তিনি অনধিকার চর্চা বলে মনে করেছেন। শুনতে অবাক লাগলেও যামিনীর কবি সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বিষ্ণু দেকে লেখা পত্রে। শিরোনামহীন ভিন্ন ধরনের লেখাগুলিতে কবিতায় ব্যবহৃত পংক্তি বিন্যাসের নিয়ম মানা হয়নি। যেমন –

মাটী	যাই গড়তে যাও	নূতন গড়ন দিতে হলে, তাকে
পট	মেখে, কেটে, পুড়িয়ে	ভেঙে পুড়িয়ে তবে গড়া হয়
লোহা	হাতুড়ি পেটা কোরে	
সোনা	তবে গড়া যায়[২৬৬]	

আরো বেশ কয়েকটি পত্রে কবিতায় আশ্রয়ে তত্ত্বকথা ও তাঁর অনুভূতি ফুটে ওঠে। যেমন –

> বিশিষ্ট দেহের গড়ন?
>
> দেহই যদি না হয়
>
> তার আর কিছুরই
>
> দরকার হয় না
>
> মানুষটাই প্রথম[২৬৭]

খ) চিঠিপত্র

যামিনী রায়ের অজস্র চিঠিপত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু ও পরিবারবর্গের মধ্যে। কিন্তু কিছু না লেখার যে পণ তিনি করেছিলেন তা বাঁধ ভাঙতে দেখা যায় চিঠি লেখার ক্ষেত্রে। এইগুলির মধ্যেই তাঁর দর্শন ও মূল্যবান মন্তব্যগুলো ভিড় করে থাকে। বিষ্ণু দেকে লেখা পত্রগুলিতে ব্যক্তিগত, সমাজতাত্ত্বিক ও শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনায় রয়েছে তাঁর 'প্রাণশক্তির প্রাচুর্যের' অন্যরূপ প্রকাশ, শিল্পকর্মের বাইরেও যা উপচে পড়ছে।[২৬৮] ১৮ নভেম্বর ১৯৪২ তারিখে যামিনী বিষ্ণু দেকে কাটাকুটি করে লেখা একটি পত্র সংশোধন না করেই পাঠিয়ে দেন। কেননা তিনি মনে করেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ত্রুটিহীন 'কাজ ব্যবহার লেখা ছবি' সামাজিক দিক থেকে দেখতে শুনতে বেশ ভালো হলেও তাতে প্রাণ ও রস থাকে না।[২৬৯] ২০ বা ২১ এপ্রিল ১৯৫১ তারিখের একটি পত্রে বিষ্ণুকে বলেন এদেশের একটি নিজস্ব চিত্রশিল্প ছিল কিন্তু হাজার বছর মুসলিম শাসন এবং তিনশ বছর ইংরেজ শাসনে ভারতীয়রা নিজের শিল্পকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখার ফলে তা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল; আবার ইউরোপীয় শিল্পকেও ভারতীয়রা কোনদিনই সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে বা আয়ত্ত করতে পারেনি। এই অবস্থায় যারা ভারতীয় শিল্পের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করছেন বা ইউরোপীয় রীতিতে চিত্রচর্চা করছেন তিনি তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে এককভাবে ভিন্ন ধরনের শিল্পচর্চা করেছেন। ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৪ তারিখের পত্রে ভিন্নধর্মী ছবি আঁকা সম্পর্কে লেখেন –

> আমার কাজ যে বিপরীত ধর্ম্মী আজকার শিল্প ধর্ম্মীর পটভূমিতে, এটা আমি না বললেও চলে। ... আসল কথা এই দৃষ্টিভঙ্গী আমি মনে, প্রাণে, সম্ভবত সজ্ঞানে বিশ্বাস করি, এ আমার জীবিকা, ইহার উপরে আমার বিশ্বাস প্রয়োগ করি।[২৭০]

তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই যে আজকের দিনের পক্ষে একমাত্র অবলম্বন তা তিনি মনে করেন না। তিনি জানেন তাঁর সমসাময়িক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির লোকের পক্ষেও তাঁর ভাবনা ও কাজকে মেনে নেওয়া কঠিন। তাই তিনি বলেন – 'অন্যে যদি পাগল ভাবে — দোষ দেওয়া যায় না'।[২৭১] ভারতের সমাজ কোন পথে যেতে চলেছে তা তিনি পঁচিশ বছর আগেই উপলব্ধি করেছেন। এর থেকে মুক্তি পেতে এবং স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করতে চেয়েছেন বলে তাঁর ছবি হয়েছে সমকালীন সময়ের সমাজের

ভাঙাচোরা, কলুষিত সত্যের বিপরীত প্রতিচ্ছবি। তিনি নিজে বাস্তববাদী হওয়া সত্ত্বেও জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবি আঁকাকে তিনি ‘লীলা’র সঙ্গে তুলনা করেছেন।[২৭২]

যামিনী রায়ের বেশ কিছু পত্রে তাঁর সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রেডিওতে বিষ্ণু দের বক্তৃতা শুনে ৩ জানুয়ারি ১৯৪৬ তারিখের পত্রে লেখেন – বক্তব্যের ‘গম্ভীর’, ‘সহজ’ ও ‘সংক্ষিপ্ত’ প্রকাশ কতটা শক্ত তা তিনি অনুভব করেন।[২৭৩] আর একটি পত্রে বিষ্ণুর লেখা কোন একটি বই পড়ে তাঁর উপলব্ধির কথা জানিয়ে লেখেন –

> আপনার ভাষার যে একটা বিশিষ্ট রূপ। গতানুগতিক থেকে পৃথক হবার উৎকট চেষ্টাও নাই অথচ পৃথক এবং সংযত।[২৭৪]

সাহিত্যপত্র-র একটি সংখ্যা পড়ে তিনি মন্তব্য করেন, লেখাগুলি সন্ধি কাটিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বনিতে ব্যক্ত। লেখাগুলি সংকলন এবং রসাভাস দোষে দুষ্ট নয়। তবে কিছু ত্রুটি খুঁজে পেয়ে বলেন, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সাহিত্যিকের যখন গ্রামের লোকের মুখের ভাষা জানা নেই তখন লেখায় গ্রামের চরিত্রদের মুখে গ্রামের ভাষার প্রয়োগ না করাই শ্রেয়।[২৭৫] তাঁর এই উপলব্ধি বা মন্তব্যগুলি সাধারণ মানের নয়। সাহিত্য সচেতন এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত। তিনি বিভিন্ন সাহিত্য পত্র-পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর পত্রিকা *রংমশাল*-এর প্রচ্ছদের জন্য তাঁদেরকে বিশেষ করে ভাবতে বলেছেন অন্ততপক্ষে দুটি পত্রে। ২৪ এপ্রিল ১৯৫৪ তারিখে বিষ্ণুকে লেখা পত্রে নাটক সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন একটি নাটক দেখে মন্তব্য করেন, শিশু অভিনেতাদের অভিনয় দিয়ে পৃথিবী জয় করা গেলেও এদের শক্তি ও দক্ষতা ব্যর্থ হয়ে যায় নাটকটির দুর্বল রচনার কারণে। তাঁর মতে অঙ্কের প্রশ্ন ভুল তাকে নিয়ে সারাদিন বসে থাকলেও যেমন অঙ্ক মেলেনা, রং তুলি ছাড়া যেমন ছবি আঁকা যায় না তেমন দুর্বল রচনা নৃত্য, সংগীত, দৃশ্যনাট্য কোন কিছুর দ্বারাই সুঅভিনীত হতে পারে না। ১ মে ১৯৫৪ তারিখের চিঠিতে তিনি নাটকটির প্রশংসা করেন এবং বলেন কোন শিল্প উচ্চাঙ্গের বা নিম্নাঙ্গের তা নির্ভর করে যারা বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন সেই শ্রেণির বিচারের উপর।[২৭৬] ১৬ আগস্ট ১৯৫৫ তারিখের একটি চিঠিতে *চণ্ডালিকা* নৃত্যনাট্য দেখে অভিনেত্রীদের প্রশংসা করে তাদের সাফল্যের পিছনে গোটা নাট্যদলের সংঘটক, প্রযোজক, পোশাক সজ্জকের দক্ষতা ও ভাবনার উল্লেখ করেন।

ফরাসি চিত্রশিল্পী Henri de Toulouse–Lautrec-এর (১৮৬৪-১৯০১) জীবন অবলম্বনে John Huston পরিচালিত *Moulin Rouge* চলচিত্রটি দেখে যামিনী রায়ের অনুভূতি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ তারিখে নরেশকে লেখা পত্রে ধরা পড়ে।[২৭৭] সমকালীন সময়ের নানা ঘটনা, লেখা, ছবি, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, সংসারজীবন সবকিছু এত বিসদৃশ যে তাতে তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে।[২৭৮] ৩০ মে ১৯৫২ তারিখের চিঠিতে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়ে বলেন এই সময়ে যা কিছু গড়ে উঠেছে তা কোন গড়নের মধ্যেই পড়ে না। এই যুগে সৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পের দিকে তাকালে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। এই সময়ের কলঙ্কের ইতিহাসের কথা, এই সমস্ত সৃষ্টিই ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে। এটাকেই তিনি লাভ বলে মনে করেন। এই যুগে সৃষ্ট কবিতা, উপন্যাসের চেয়ে ব্যক্তিগত চিঠিগুলিকেই তিনি ব্যক্তিনিরপেক্ষ কবিতা বা উপন্যাস বলে মনে করেন। তিনি বলেন, ছবি বা সাহিত্য তা আমাদের চক্ষুকর্ণের তৃপ্তি দিতে পারে, এছাড়া এইগুলি থেকে 'সাত্ত্বিক বা শুদ্ধ আনন্দ এবং তামসিক আনন্দ' লাভ করা যেতে পারে। যেমন – *বিদ্যাসুন্দর*-এর (১২৯৩) গান ও খেমটা নাচ তামসিক আনন্দ, আর *রামায়ণ মহাভারত* শুদ্ধ বা সাত্ত্বিক আনন্দ দেয়।[২৭৯] ৯ নভেম্বর ১৯৫৫ তারিখে বিষ্ণুকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, পাশ্চাত্যে শিল্পের সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন তার একটা জাত চরিত্র আছে, কিন্তু আমাদের দেশের চিত্রক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে সমস্ত শিল্প সমস্যার জাত চরিত্র নেই। ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে আমাদের দেশে শিল্পসৃষ্টি হয়েছে সহজাত সংস্কারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে নকল কৃষ্টি নৃত্য, শিল্পে, সাহিত্যকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যাতে এই সমস্ত কিছুর সৃষ্টির মূলে যাঁরা আছেন তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে।[২৮০] শিক্ষা ও সভ্যতার লক্ষ যদি টাকা রেজগার করাই হয় তাহলে লেখাপড়া করে সময় শরীর স্বাস্থ্য নষ্ট করার কোন মানে হয় না বলে তিনি মনে করেন। কারণ তিনি দেখেছেন অনেক শিক্ষিত মানুষকে কর্মহীন অথচ নিরক্ষর মানুষেরা কোটি কোটি টাকার মালিক। তাই এসব না ভেবে 'ভুল-ভ্রান্তি, অকাজ সুকাজ' থেকে জ্ঞান অর্জন করে অগ্রসর হওয়ার বার্তা দেন।[২৮১] যামিনী ছোটদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করতেন। ইরা ও তারার[২৮২] আঁকা ছবি দেখে তিনি একটি পত্রে বলেন ছোটদেরকে স্নেহের বশে তিনি ছবিগুলির প্রশংসা করছেন তা নয়, তাঁর 'দরকার' সেই জন্যই।[২৮৩]

বিষ্ণু দে ও তাঁর স্ত্রী প্রণতি দেকে যামিনী রায় বহু ছবি উপহার দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময় কলকাতায় আগত বিচক্ষণ ও বিদগ্ধ মার্কিন সৈনিকদের যামিনীর বাড়িতে নিয়ে যেতেন ছবি দেখা ও কেনার জন্য। যামিনী তাঁর চিঠিতে এই বিষয়ে বিষ্ণু দেকে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।[২৮৪] Society of Oriental Art-এ অনুষ্ঠিত যামিনী রায়ের ছবির একক প্রদর্শনীতে ছবি সমেত একটি ক্যাটালগ ছাপার কথা হলেও শিল্পীর অসম্মতিতে তা সম্ভব হয়নি। ৫ ডিসেম্বর ১৯৪৪ তারিখে বিষ্ণুকে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেন সোসাইটি যদি উক্ত ক্যাটালগটি প্রকাশ করে তবে তা তাঁর মৃত্যুর কারণ হতে পারে।[২৮৫] তাই তিনি সোসাইটির চুক্তিপত্রটি ফেরত পাঠিয়ে দেন। সম্ভবত এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবিগুলির পুনরুৎপাদনে রঙের যথার্থতা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এমনিতেই তাঁর স্বকীয় রীতি সমকালীন সময়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিল। আর পুনরুৎপাদিত ছবিগুলির সম্ভাব্য অসম্পূর্ণতার কারণে নতুন করে সমালোচনার সম্মুখীন হতে চাননি। তাছাড়া তিনি চাননি তাঁর ছবিগুলি ক্যাটালগের মাধ্যমে সহজলভ্য হয়ে উঠুক। যেখানে তিনি নিজেই মূল ছবির একাধিক কপি করছেন এবং সাধারণের নাগালের মধ্যে ছবি দাম নির্ধারণ করেছেন, সেখানে মূদ্রিত বইটি অর্থনৈতিক দিক থেকেও ক্ষতিকর হবে বলে তাঁর মনে হয়।[২৮৬] যদিও সোসাইটির চুক্তিপত্র প্রত্যাখ্যানের জন্য পরে তিনি পত্র মারফৎ দুঃখ প্রকাশ করেন।

যামিনী রায়ের চিঠিগুলিতে শিল্প, সমাজ, সাহিত্য, জীবন সম্পর্কে তাঁর মতামত তাঁর দর্শন ফুটে ওঠে। এর সঙ্গে ভীষণভাবে তাঁর অন্তরের যন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন পরবর্তীকে পাওয়ার জানার আগ্রহ এবং নতুন সৃষ্টির বাসনার জন্যই কষ্ট ভোগ করতে হয় বলে। তিনি বলেন - এই যন্ত্রণা ভোগ করা তাঁর ভবিতব্য। এই যন্ত্রণাই তাঁকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখে দাঁড় করায়। বস্তুত পক্ষে যন্ত্রণা বিদীর্ণ মনই তাঁর সৃষ্টির পিছনে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। আধুনিক সাহিত্যিক বন্ধুদেরকে তিনি তাঁর সহযাত্রী বলে মনে করেন। কেননা তাঁদেরকেও সমাজ সভ্যতার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই তিনি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে নিজের মনের কথা অকপটে বলতে পারেন। মনের মধ্যে জমে ওঠা তত্ত্বকথা চিঠিরূপে প্রকাশ পায়। যামিনী রায় যখন তাঁর আত্মীয়, ছেলেবেলার বন্ধুকে চিঠি লেখেন তখন সেখানে তিনি চিত্রশিল্পী নন, নিতান্ত সহজ সরল গ্রামের ছেলে। কলকাতার জটিল মনস্তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত নয় চিঠিগুলি। যামিনী রায়ের চিঠির বৈশিষ্ট্য হল চিঠির শুরুতেই ‘শ্রী

শ্রী হরি' লেখা এবং '–' বা '=' চিহ্নের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার। এই চিহ্নগুলি তিনি বিরতি বোঝাতে বা বক্তব্যের পরিবর্তন করতে ব্যবহার করেছেন। বাক্য গঠন ও ভাষা ব্যবহারে তাঁর চিঠিগুলি অনেক সময় জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হয়েছে।[২৮৭] কখনো তিনি দার্শনিকের মতো, আবার কখনো ঘরোয়া সংসারী মানুষের মতো কথা বলেছেন। তাঁর লেখা বেশিরভাগ চিঠিই আকারে বড়। তিনি লক্ষ করেন বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে যে চিঠি দেন তা আকারে ছোট, সংযত। অল্পকথার মধ্যেই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে পারেন। এই ধরনটি তাঁর খুব পছন্দের। অথচ তিনি লিখতে বসলেই 'কত কথা এসে পড়ে বন্যার মতো'; কিছুতেই আর গুছিয়ে লিখতে পারেন না।[২৮৮] তাঁর চিঠি 'নাটুকে' হয়ে যায়,[২৮৯] অসংযত ভাবপ্রকাশের জন্য লজ্জিত হলেও লেখার ধরন বদলাবে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি জানেন অন্যদিকে তিনি যতটা 'সংযত', এই দিকে ততটা 'আলগা'।[২৯০] বোধহয় তিনি 'উচ্ছ্বাস' দমন করতেচান না,[২৯১] কেননা তাঁরএই চিঠিগুলি চিত্র ও দর্শনের সাক্ষ্য বহন করছে।

৪.৫ উপসংহার

সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি শিল্প মাধ্যমগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে কাহিনির প্রকাশ মাধ্যম রূপে চিত্রকলার ব্যবহার হয়ে এসেছে। মনের ভাব প্রকাশের ভাষা যখন সাহিত্যভাষা হয়ে উঠেছে তখনও সাহিত্যের সমান্তরালে চলেছে চিত্রভাষা। গ্রন্থ রচয়িতারা রচনায় ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে চিত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। সচিত্র গ্রন্থগুলিতে এই সমন্বয় এ যাবৎ পর্যন্ত ঘটে চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে প্রচ্ছদ শিল্প ও গ্রন্থ অলংকরণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিল্পীরা সৃজনশীলতা ও দক্ষতার সাক্ষর রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় অগ্রগণ্য। সংখ্যা ও মানের বিচারে নন্দলাল বসুকে নির্দ্বিধায় সেই যুগের সেরা প্রচ্ছদশিল্পীদের একজন হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি চিত্র-সাহিত্যক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর ছবি আঁকার মাধ্যমে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চিঠিগুলিতে শিল্পতত্ত্ব, চিত্র ও সাহিত্যের অদ্ভুত মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। সচিত্র পত্ররচনার ইতিহাসে তাঁর পত্রগুলি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যামিনী রায় সংখ্যায় খুব কম

হলেও সচিত্র পত্ররচনা করেছেন। তাঁর গড়ে ওঠায় সাধনক্ষেত্র কলকাতার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে যামিনী রায় তাঁর ছাপ রেখে গেছেন। আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের গ্রন্থের প্রচ্ছদ অলংকরণে ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্র ব্যবহারে তিনি স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদগুলিতে সহজ সরল আলপনার রেখার ব্যবহার দেখা যায়। ভারতবর্ষের মহাকাব্য, পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবী, বৈষ্ণবধর্ম ও খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থের প্রভাব তাঁর ছবিতে লক্ষ করা যায়। আধুনিক কবি সাহিত্যিকেরা তাঁর শিল্পসৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃত অর্থেই চিত্রশিল্পী, তাই সাহিত্য রচনায় আগ্রহী না হলেও তাঁর কথাবার্তা এবং চিঠিপত্রে শিল্প সম্পর্কে গভীর অনুভূতি ফুটে উঠেছে। নন্দলাল বসু ও যামিনী সৃষ্টি কীর্তিতে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও চিত্রকলা অনেকদূর সম্ভাবিত হয়ে ভিন্ন পথ নির্মাণ করেছে।

উৎস ও অনুষঙ্গ

১। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার (১৩৮৯)। *ভারতশিল্পের কথা*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। পৃ. ৫

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০৭)। *চিঠিপত্র*। চতুর্দশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ৮–৯

৩। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার (১৯৬১)। *রবীন্দ্রজীবনী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ২২৯

৪। চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (১৩৪৮)। *প্রবাসী*। পৃ. ১১৭

৫। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। প্রথম খণ্ড। শান্তিনিকেতন, বীরভূম : রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ। পৃ. ৩৭৭

৬। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। *রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি। পৃ. ২৭

৭। Tagore, Rabindranath (1913). *The Crescent Moon*. New york: The macmillam Company. P. 1, 62

৮। ঘোষ, সাগরময় (১৩৮৯)। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। 'ছবি ও ছন্দ'। *দেশ*। নন্দলাল বসু সংখ্যা। পৃ. ১০৬

৯। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭৭

১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৫৩)। *রাজা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থলয়। পৃ. ৪৭–৪৮

১১। Tagore, Rabindranath (1918). *Gatanjali and Fruit-Gathering*. New-York: The Macmilan Company. P. 6, 8, 12, 18, 48, 52, 62, 74

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৩)। *গীতাঞ্জলি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ১৪৪, ১৩৭, ৪৬, ২৪

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩০৮)। *নৈবেদ্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ৮৮

১৪। Tagore, Rabindranath (1918). *Gatanjali and Fruit-Gathering*. New-York: The Macmilan Company. P. 122, 156, 182, 196

১৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯১৬)। *বলাকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ৮০

১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০০)। *গীতবিতান*। অখণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১৩৫

১৭। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৫

১৮। নটীর পূজা – 'নটীর পূজা' অবলম্বনে নন্দলাল বারবার নানা মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কোলাজে ছবি করার পর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কন্যা গৌরী দেবীর নৃত্যাভিনয় দেখে টেম্পেরায় ছবি আঁকেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে এই বিষয়ে রেখাচিত্র আঁকেন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনের পুরনো লাইব্রেরির দেওয়ালে, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনের চিনা ভবনের দেওয়ালে ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে আঁকেন। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে টেম্পেরা পদ্ধতিতে নটীর পূজার খসড়া চিত্র আঁকেন

এবং ওই বছরেই বরোদা কীর্তি মন্দিরের পূর্বদিকের দেওয়ালে তা মূর্ত করেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৮, ৬৮, ৮৯, ৯৭

১৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৯–৬২

২০। লিনোকাট – লিনোশিটের উপর ছবি এঁকে যে অংশগুলি ছাপা হবে না তা নরুন বা বাটালি দিয়ে খোদাই করে তাঁর ওপর প্রিন্টের কালিলাগিয়ে ছাপা হয়। দ্রষ্টব্য: চন্দ্র, অরূপ (২০২২)। *শিল্পের ব্যাকরণ*। মুর্শিদাবাদ: বাসভূমি প্রকাশন। পৃ. ৪২

২১। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৪৩–৫৪৪

২২। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭০

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯২)। প্রকাশকের নিবেদন। *সহজপাঠ*। দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

২৪। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৪৩

২৫। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৮

২৬। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। পত্রী, পূর্ণেন্দু। 'নন্দলাল বসুর গ্রন্থচিত্রণ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৩

২৭। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮১

২৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৯

২৯। Chatterjee, Ramananda (Edited, 1931). *The Golden Book of Tagore.* Kolkata: Golden Book Committee. P. 33 & 40

৩০। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। 'ছবি ও ছন্দ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৮

৩১। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৯

৩২। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০১

৩৩। নন্দলাল অঙ্কিত ছবির জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৩)। *বুদ্ধদেব*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৩৪। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৫৯)। *খৃষ্ট*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ২১–২২

৩৫। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০)।*পল্লীপ্রকৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ১০৪–১০৫

৩৬। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৯)। *বীরপুরুষ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৩৭। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮৭)। *বীথিকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৩৮। নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮৫)। *রাখী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ২২৬–২২৭

৩৯। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৫

৪০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *চয়নিকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ২৪০

৪১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯২)। *জাভা-যাত্রীর পত্র*। কলকাতা:বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ২৮

৪২। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৬

৪৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪০)। *বিচিত্রিতা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ৫৮

৪৪। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৪)। *ছড়ার ছবি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৪৫। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। 'ছবি ও ছন্দ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৭

৪৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৬–৮৭

৪৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৮

৪৮। পূর্বোক্ত। ভূমিকা। পৃষ্ঠাংক বিহীন

৪৯। Coomerswami, Ananda K. (1912). Plate XVI. *Art and Swadeshi*. Madras : Ganesh and Co. P. 129, 133

৫০। Sister, Nivedita and Coomaraswamy, Ananda K. (1914). *Mythes of The Hindus and Buddhists*. London : George G. Harrap and Company. P. vi

৫১। Ibid. Page.16, 122, 128, 140, 166, 212. 220, 296, 314, 322

৫২। Sister, Nivedita (1915). *Footfalls of IndianHistory*.London: Longmans, Green and Co. P. 40–41

৫৩। নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৫৯)। *ভগিনী নিবেদিতা*। সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল। পৃ. ২৭২–২৭৩ ও ৪৩১

৫৪। Lady, Harringham (1915). *Ajanta Frescoes*. New Delhi: Aryan Books International. P. 63, 69

৫৫। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৯

৫৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩২

৫৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩২

৫৮। *রাজকাহিনী*-তে অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনার সপক্ষে নন্দলালের ছবিটি আঁকা। বর্ণনাটি হল –

> পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলেন, – হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এসো। ...লজ্জানিবারণ, দুঃখবিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি।

দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯১৯)। *রাজকাহিনী*। হিতবাদী লাইব্রেরী। পৃ. ৭৮-৭৯

৫৯। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭২

৬০। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০২

৬১। Tagore, Abanindranath (1914). *Some Notes Of Indian Artistic Anatomy*. Culcutta : Indian Society of Oriental Art. P. i

৬২। নন্দলাল বসুঅঙ্কিত প্রচ্ছদ ও পাখির চিত্রগুলির জন্য দ্রষ্টব্য: রায়, জগদানন্দ (১৩৩১)। *বাঙলার পাখী*। এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড।

৬৩। নিবেদন অংশ দ্রষ্টব্য: রায়, জগদানন্দ (১৩৩১)। *পাখী*। এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড।

৬৪। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: বসু, ফণীন্দ্রনাথ (১৯২৫)। *বিক্রমশীলা*। কলকাতা: আর্য্য পাবলিশিং হাউস।

৬৫। গ্রন্থ-পরিচয় অংশ দ্রষ্টব্য: সেন, সুকুমার ও মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত, ১৩৫১)। *রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল*। প্রথম খণ্ড। বর্দ্ধমান: সাহিত্য-সভা। পৃ. ।৵০

৬৬। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)।পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬১-১৬২

৬৭। গ্রন্থ পরিচয় অংশ ও নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: সেন, সুকুমার (১৩৬২)। *চণ্ডীমঙ্গল*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য একাডেমি। পৃ. ৫৬-৫৭

৬৮। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: মণ্ডল, পঞ্চানন(১৯৯৭)। *গোর্খ-বিজয়*। বিশ্বভারতী: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন।

৬৯। অধিকারী, শচীন্দ্রনাথ। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা। *সহজমানুষ রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড। পৃ. (৪)

৭০। অধিকারী, শচীন্দ্রনাথ (১৩৫২)। *পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা : শ্রীহট্ট প্রকাশন। পৃ. ১১

৭১। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও অন্তঃপটের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৮৬)। *আলোর ফুলকি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

৭২। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, অধীর ও অন্যান্যরা (১৩৮৮)। *আলোর ফুলকি*। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ. ২২৪

৭৩। ঘোষ, শান্তিদেব (১৩৮৬)। ভূমিকা। *রবীন্দ্রসংগীত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

৭৪। সামন্ত, কানাই (১৮৮১ শক)। *চিত্রদর্শন*। কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। পৃ. আট

৭৫। সামন্ত, কানাই (১৩৬১)। লেখকের নিবেদন। *নীরঞ্জনা*। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ লিঃ।

৭৬। নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: দাস, সুধীরঞ্জন (১৯৫৯)। *আমাদের শান্তিনিকেতন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ৩, ৭২, ৭৩, ৯৪

৭৭। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৩৫১)। *টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

৭৮। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, প্রবোধেন্দুনাথ (১৩৪৬)। *কুমারসম্ভব*। কলকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

৭৯। নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: সেন, ক্ষিতিমোহন (১৯৫৮)। *চিন্ময় বঙ্গ*। কলকাতা: আনন্দ।

৮০। কর, বিমল (সম্পাদিত,২০১৯)। *শিলাদিত্য*। জানুয়ারি। পৃ. ৩১

৮১। ঘোষ, সাগরময় (১৩৮৯, সম্পাদিত)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ। 'নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৪

৮২। See cover page painted by Nandal Bose: Gupta, Mahendranath (1944). Swami Nikhilananda (Translate). *Gospel of Sri Ramkrishna*. Kolkata: Ramkrishna-Vivekananda Center.

৮৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৩৬৩)। *সঙ্গীত ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। পৃ. ৩৯

৮৪। সাধু, সুমন (সম্পাদিত, ২০২২)। গুপ্ত, দেবদত্ত। 'নন্দলাল বসুর শৈল্পিক টানেই সেজে উঠেছিল ভারতীয় সংবিধানের পাতা'। *বঙ্গদর্শন*। দ্বিতীয় পর্ব। শনিবারের কড়চা: নন্দলাল বসু বিশেষ সংখ্যা। পৃ. ১৫ www.bongodorshon.com. Last accessed on 6.08.2023

৮৫। যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: দে, বিষ্ণু (১৯৪১)। *পূর্বলেখ*। কলকাতা: কবিতা ভবন।

৮৬। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। *রূপতাপস যামিনী রায়*। কলকাতা: প্রতিভাস। পৃ. ২৭৫

৮৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৭৫

৮৮। যামিনী রায় অঙ্কিতপ্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: দে, বিষ্ণু (২০১৩)। *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: দে'জ।

৮৯। দে, বিষ্ণু (১৯৫৫)। ভূমিকা। *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: নাভানা। পৃ. ৫

৯০। বসু, বুদ্ধদেব (১৯৫৯)। উৎসর্গপত্র। *কালের পুতুল*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৫

৯১। যামিনী রায়ের আঁকা প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (১৩৪৫)। *স্বগত*। কলকাতা: ভারতী ভবন।

৯২। যামিনী রায়ের আঁকা প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (সম্পাদিত, ১৩৪৫)। *পরিচয়*। প্রথম সংখ্যা।

৯৩। সেন, অরুণ (২০২০)। *যামিনী রায় বিষ্ণু দে: বিনিময়*। কলকাতা: প্রতিক্ষণ। পৃ. ৭৪–৭৫

৯৪। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, দক্ষিণারঞ্জন। 'যামিনীদাকে যেমন দেখেছি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৪-১৫৫

৯৫। *অরণ্যে রোদন* – যামিনী রায় *অরণ্যে রোদন* গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকে দেন। কিন্তু গ্রন্থটির নাম পরিবর্তিত হয়ে *তাতার সমুদ্রে-ঘেরা* (১৯৭৬) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য: গুহ, নরেশ (২০১৫)। *যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর*। কলকাতা: লালমাটি। পৃ. ৯৩

৯৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০৪

৯৭। যামিনী রায়ের আঁকা প্রচ্ছদের জন্য দ্রষ্টব্য: ভট্টাচার্য, আশুতোষ (১৯৭০)। *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এম আর পাবলিশার্স।

৯৮। সেন, অরুণ (২০১৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭

৯৯। চৌধুরী, বিকাশ গণ (সম্পাদিত, ২০১৭)। রায়, প্রণবরঞ্জন। 'বাংলা বই-এর প্রচ্ছদ'। *চমৎকার৯শ্ব কাল*। প্রথম সংখ্যা। পৃ. ৮

১০০। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৯

১০১। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭০

১০২। Chatterjee, Ramananda (Edited, January to June 1914). *The Modern Review*, vol. XV. Numbers 1 to 6. P. 598

১০৩। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৫৬–৬৫

১০৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৬০

১০৫। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। ভট্টাভার্য, অমিত্রসূদন। 'ছবি ও ছন্দ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৮

১০৬। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩৬

১০৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৭৫)। *বনবাণী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১৯

১০৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ (১৩৫৪)। *পরিশেষ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ২১১

১০৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রচ্ছন্না' কবিতার আংশিক উদ্ধার করা হল –

বিদেশে ঐ সৌধশিখর' পরে

ক্ষণকালের তরে

পথ হ'তে-যে দেখেছিলেম, ওগো আধেক দেখা,

মনে হ'লো তুমি অসীম একা

দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৩)। *মহুয়া*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ১২১

১১০। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৫

১১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৮

১১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮১)। *চিঠিপত্র*। একাদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১৩২

১১৩। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। 'ছবি ও ছন্দ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৩

১১৪। সামন্ত,কানাই (১৯৬২)। *শ্রীনন্দলাল বসু*। কলকাতা: কথাশিল্প প্রকাশন। পৃ. ১২

১১৫। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নন্দলালের দেয়াল ছবি' কবিতার আংশিক উদ্ধার করা হল–

তুর্কী-নাচন নাচেন নন্দবাবু

চতুর্দিকে ছেলেরা সব কাবু।

...হচ্ছে 'নটীর পূজা'

...তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।

দ্রষ্টব্য: মুজতবা আলী, সৈয়দ (১৩৫৯)। *ময়ূরকণ্ঠী*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স। পৃ. ৪–৫

১১৬। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৬০–৫৬১

১১৭। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্য (সম্পাদিত, ১৩৫৭)। *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ। পৃ. ৩০১

১১৮। অধিকারী, সুশোভন (২০২৩)। *প্রসঙ্গ নন্দলাল*। কলকাতা: বিচিত্রা। পৃ. ৯৩–৯৪

১১৯। বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১৮০

১২০। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮১–১৮৩

১২১। রায়, মীরা (১৯৯৫)।*নন্দলাল : জীবন ও শিল্প*। বার্ণপুর : উদয়াচল সাহিত্য পরিষদ। পৃ. ১৭৮

১২২। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৮

১২৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১৮

১২৪। রায়, সুশীল (সম্পাদিত,১৩৭৩)। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী। 'নন্দলাল'। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। নন্দলাল বসু সংখ্যা। পৃ. ১৪

১২৫। রায়, মীরা (১৯৯৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬২

১২৬। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪২৪)। *লোকমাতা নিবেদিতা*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ২১২

১২৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৮)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দশম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ৪৪

১২৮। দত্ত, জয়িতা (১৯৯৮)। *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী। পৃ. ৮১

১২৯। রায়, সুশীল (সম্পাদিত,১৩৭৩)। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী। নন্দলাল। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪

১৩০। গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দ্রকুমার (১৯৬৯)। *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*। কলকাতা: এ মুখার্জী এণ্ড কোং।পৃ. ১৯০

১৩১। রায়, মীরা (১৯৯৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯৫

১৩২। নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫-২৬

১৩৩। মুখোপাধ্যায়, প্রণতি (সম্পাদিত, ১৯৮৬)। ভঞ্জ, গৌরি। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। *রবীন্দ্রভাবনা*। নন্দলাল সংখ্যা। পৃ. ১০৪

১৩৪। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ভঞ্জ, গৌরী। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। *মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু*। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৬

১৩৫। গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দ্রকুমার (১৯৬৯)। পূর্বোক্ত। পৃ.১৯২

১৩৬। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ। 'নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭১

১৩৭। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪২৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১২

১৩৮। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২২৯

১৩৯। বসু, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত,১৯৮৩)। মজুমদার, নিশানাথ। 'শতবর্ষে আচার্য নন্দলাল বসু স্মরণে'। *জ্ঞান ও বিজ্ঞান*। পৃ. ২৪

১৪০। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ। 'নন্দলালেরর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭১

১৪১। রায়, মীরা। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮১

১৪২। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২২৮

১৪৩। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ভঞ্জ, গৌরী। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৬

১৪৪। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ। 'নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭১

১৪৫। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ভঞ্জ, গৌরি। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৫

১৪৬। Chatterjee, Ramananda (Edited, January to June 1908). *The Modern Review*, vol. III. Numbers 1 to 6. P. 557

১৪৭। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩২

১৪৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৯

১৪৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩৫

১৫০। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত,১৩৮৯)। সরকার, সন্দীপ। 'নন্দলালের জীবন ও রচনাপঞ্জী'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯৮

১৫১। দে, অভীককুমার (১৯৯২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫২

১৫২। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯

১৫৩। সেন, অরুণ (২০২০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৫

১৫৪। দে, বিষ্ণু (২০০৪)। *কবিতাসমগ্র*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১২৬–১৩৭

১৫৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৭

১৫৬। বিষ্ণু দের লেখা 'তাইতো তোমাকে চাই' কবিতাটির আংশিক উদ্ধার করা হল –

> একটিই ছবি দেখি, রঙের রেখার দুর্নিবার বিস্তার
> মুগ্ধ হয়ে দেখি এই কয় দিন, অথচ যামিনীদার
> প্রত্যহের আসনের এ শুধু একটি নির্মাণ একটি প্রকাশ,
> ...যেমনটি সাগরসঙ্গমে এসে অলকানন্দার উৎস মেতে ওঠে
> জটায় জটিল কপিলের দীর্ঘ ইতিহাস
> সামুদ্রিক বন্যা হয়ে ভাগীরথী-মোহনায়।

দ্রষ্টব্য: বিষ্ণু দে (১৪০৫)। *কবিতা সমগ্র*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ২৭৮–২৭৯

১৫৭। দে, বিষ্ণু (১৪১৭)। *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত*। কলকাতা: দেজ। পৃ. ৪৫

১৫৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৬

১৫৯। দে, বিষ্ণু (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮২

১৬০। দে, বিষ্ণু (২০০৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১১

১৬১। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮৩

১৬২। দে, বিষ্ণু (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৭

১৬৩। দে, বিষ্ণু (২০০৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১১

১৬৪। দে, বিষ্ণু (১৪০৫)। *কবিতা সমগ্র*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১১০

১৬৫। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি (১৯৯৭)। বসু, দেবতোষ (সম্পাদিত)। *এই কাব্যে এই হাতছানি*। কলকাতা: দেজ। পৃ. ৪৬-৪৭

১৬৬। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩

১৬৭। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত,২০০৫)। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। 'যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৬-১৬৪

১৬৮। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, দক্ষিণারঞ্জন। 'যামিনীদাকে যেমন দেখেছি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫২

১৬৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর (২০১৫)। *আমার সাহিত্য-জীবন*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ১৯৪

১৭০। বসু, বুদ্ধদেব (১৯৫৩)। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: নাভানা। পৃ. ৬৯

১৭১। বসু, বুদ্ধদেব (২০০১)। *আমাদের কবিতাভবন*। কলকাতা: বিকল্প। পৃ. ৩৮

১৭২। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। *শিল্পী মানুষ যামিনী রায়*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৯৫

১৭৩। বসু, বুদ্ধদেব (২০০১)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৩

১৭৪। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, দক্ষিণারঞ্জন। 'যামিনীদাকে যেমন দেখেছি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫২-১৫৩

১৭৫। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬-২৮

১৭৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯৮

১৭৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯৫

১৭৮। যামিনী রায় সম্পর্কিত সাহিত্যরচনার উদাহরণ হিসাবে NissimEzekiel-এর 'Jamini Roy' কবিতাটির আংশিক উদ্ধার করা হল -

He started with a different style,
He travelled, so he found his roots.

His rage became a quiet smile

Prolific in its proper fruits.

...An urban artist found the law

To make its spirit sing and dance.

Ezekiel, Nissim. 'Jamini Roy'. Journal of South Asian Literature, Vol. 11, No. 3/4, NISSIM EZELIEL ISSUE (Spring, Summer 1976), p. 69. http://www.jstor.org/stable/40873417. Last accessed: 11/06/2014 08:26)

১৭৯। মানিক ফকির (২০১৩)। *বসন্ত-যামিনী*। কলকাতা: কলকাতা প্রকাশন। পৃ. ১০

১৮০। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায় সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭০

১৮১। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)।*যামিনী রায়*। রাজ্য চারুকলা পর্ষদ। পৃ. ৬৯

১৮২। আচার্য, অনিল (সম্পাদিত, ১৩৮৭)। সোম, শোভন। 'যামিনী রায়ের ছবি – রীতি ও তাৎপর্য'। *অনুষ্টুপ*। চতুর্দশ বর্ষ শীত-গ্রীষ্ম যুগ্ম সংখ্যা। পৃ. ৩২

১৮৩। দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। *শিল্প ও শিল্পী*। দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। পৃ. ৩৮৯

১৮৪। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭১

১৮৫। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩–৫৪

১৮৬। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩–৫৪

১৮৭। রায়, সুশীল (সম্পাদিত, ১৩৭৩)। দেবী, প্রতিমা। 'শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহাশয়ের স্মরণে'। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। নন্দলাল বসু সংখ্যা। পৃ. ১০

১৮৮। সোম, শোভন (১৯৮৫)। *তিন শিল্পী*। কলকাতা: বাণীশিল্প। পৃ. ৯০

১৮৯। ঘোষ, শান্তিদেব (২০১৭)। *রূপকার নন্দলাল*। কলকাতা: যাপনচিত্র। পৃ. ৩৮–৩৯

১৯০। মুখোপাধ্যায়, প্রণতি (সম্পাদিত, ১৯৮৬)। ভঞ্জ, গৌরি। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০২

১৯১। Wings – মঞ্চের পাশের ফাঁকা জায়গা, যেখান থেকে অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করে ও প্রস্থান করে।

১৯২। ঘোষ, শান্তিদেব (২০১৭)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮

১৯৩। সোম, শোভন (১৯৮৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯১

১৯৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯১

১৯৫। ঘোষ, শান্তিদেব (১৪১০)। *বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা। পৃ. ৩৩

১৯৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৮৭৯)। *বিচিত্র প্রবন্ধ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ. ৭৮

১৯৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৬)। *তপতী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ভূমিকা

১৯৮। মুখোপাধ্যায়, প্রণতি (সম্পাদিত, ১৯৮৬)। ভঞ্জ, গৌরি। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'।পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৩

১৯৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০২

২০০। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৪

২০১। বসু, বুদ্ধদেব (২০০১)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৩

২০২। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮

২০৩। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭

২০৪। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায় সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৫

২০৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৫

২০৬। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮

২০৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৩

২০৮। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১৭)। *যামিনী রায় পত্রাবলী ও প্রবন্ধ*। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ৮০

২০৯। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। *শিল্পকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ভূমিকা অংশ

২১০। বসু, নন্দলাল (১৪২৪)। দত্ত, অম্লান ও সুব্রহ্মণ্যন্, কল্পাতি গণপতি (সম্পাদিত)। *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। পৃ. ১৭

২১১। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। *শিল্পকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০

২১২। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭-১৮

২১৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত, ১৩৮৬)। *উপনিষৎ গ্রন্থবলী*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়। পৃ. ৩

২১৪। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা. ২৯

২১৫। বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা: বিশ্বভারতীগ্রন্থন বিভাগ। পৃ. ১৩০-১৩৬

২১৭। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৬

২১৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৫

২১৮। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮

২১৯। মৌলিক ও মিশ্র রঙ – যে তিনটি মূল বর্ণের সংমিশ্রণে পৃথিবীর সমস্ত রঙ সৃষ্টি হয় তাকে মৌলিক রঙ বলে। বাকি সমস্ত রঙই মিশ্র রঙ। দ্রষ্টব্য: চন্দ, অরূপ (২০২২)। *শিল্পের ব্যাকরণ*। মুর্শিদাবাদ: বাসভূমি প্রকাশন। পৃ. ২০

২২০। সম্বাদী, বাদী, বিবাদী – পরস্প পরিপূরক রঙ হল সম্বাদী, একটি রঙের পাশে আরেকটি রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠলে তাকে বাদী, পরস্পর বিপরীতধর্মী রঙকে বিবাদী বলা হয়। দ্রষ্টব্য: বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৪

২২১। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৭ ও ১১১

২২২। পূর্বোক্ত। গ্রন্থকারের নিবেদন অংশ।

২২৩। উলুটি – দেওয়ালে প্রলেপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উলুখড় ও মাটি মিশিয়ে যে কাদা প্রস্তুত করা হয় তাই উলুটি। দ্রষ্টব্য: বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০০

২২৪। পঙ্খের কাজ- শামুকপোড়া চুন, বালি, জল ইত্যাদির মিশ্রণে বাস্তু কিংবা গৃহাদি ও দেবালয়াদি অলংকরণের পদ্ধতিকে বলা হয় পঙ্খের কাজ। দ্রষ্টব্য: চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত, ২০১৩)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৪০৩

২২৫। বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭০

২২৬। তিব্বতি টঙ্গা- কাপড়ে আঁকা এক ধরনের চিত্র। এর উপজীব্য বিষয়ের বেশিরভাগই হল মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, জাতকের গল্প, বৌদ্ধ দেবদেবীর নানা অবতার বা রূপ, যে সম্প্রদায়ের গুম্ফা তাঁদের ধর্মগুরুর প্রতিকৃতি। দ্রষ্টব্য: আইচ, কমল (২০০০)। *শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। পৃ. ২৩৩-২৩৪

২২৭। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৭

২২৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৩

২২৯। নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। *শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প দীপঙ্কর নন্দলাল*। কলকাতা: ভারতবাণী প্রকাশনী। পৃ. ৭৩

২৩০। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। গ্রন্থকারের নিবেদন। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠাঙ্ক বিহীন

২৩১। বসু, নন্দলাল (১৪২০)।ভূমিকা। *রূপাবলী*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃষ্ঠাঙ্ক বিহীন

২৩২। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। গ্রন্থকারের নিবেদন। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠাঙ্ক বিহীন

২৩৩। দেববর্মা, শ্রী ধীরেনকৃষ্ণ (১৯১১)। *স্মৃতিপটে*। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন: গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ। পৃ. ১৮৩

২৩৪। বসু, শঙ্খ (২০২২)। *নন্দলাল বসুর কার্ড চিত্র*। কলকাতা: মিউজয়াম ও আর্ট গ্যালারী দ্যা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। পৃ. ৪

২৩৫। বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী –রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শংকরানন্দজীর মারফৎ নন্দলাল বসুর সঙ্গে বরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। নন্দলালের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চিঠিপত্র মারফৎ তাঁরা তাঁদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখেন। দ্রষ্টব্য: নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১–২

২৩৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫

২৩৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০

২৩৮। চক্রবর্তী, শ্যামল (২০২৩)। *চিত্রকর ধীরেনকৃষ্ণ*। আগরতলা: অক্ষর পাবলিকেশন। পৃ. ৩৪১

২৩৯। নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮

২৪০। বসু, নন্দলাল (১৪২৪)। দত্ত, অম্লান ও সুব্রহ্মণ্যন্, কল্পাতি গণপতি (সম্পাদিত)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮০

২৪১। চক্রবর্তী, শ্যামল (২০০৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩২৯

২৪২। বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। সম্পাদকের নিবেদন। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩

২৪৩। চক্রবর্তী, শ্যামল (২০০৩)।পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৩১

২৪৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬৪

২৪৫। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। চক্রবর্তী, রমেন্দ্রনাথ। ‘গুরুবরণ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩৪

২৪৬। Nandalal Basu Archive. The Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata.

২৪৭। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত,২০১৬)। দুগার, ইন্দ্র। ‘রূপপতি নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৯

২৪৮। বসু, নন্দলাল (১৪২৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬৪

২৪৯। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। চন্দ, রানী। ‘মানুষ নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৭

২৫০। চক্রবর্তী, শ্যামল (২০০৩)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৩১

২৫১। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৩

২৫২। পুসু – নন্দলাল বসু তাঁর কোনো কোনো ছাত্রছাত্রীকে তাঁর দেওয়া ডাকনামে আদর করে ডাকতেন। সেইরকম প্রতিভা সেনগুপ্তের নাম দেন ‘পুসু’। See: Gupta, Debdutta (Edited, 2023). Nandalal Bose. Kolkata: Akar Prakar. P. 30–31

২৫৩। Ibid. P. 19

২৫৪। সাধু, সুমন (সম্পাদিত, ২০২২)। গুপ্ত, দেবদত্ত। ‘নন্দলাল বসু’র পোষ্টকার্ড’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪ https://www. Bongodorshon.com. Lastaccessed on – 7.07.23

২৫৫। মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ (সম্পাদিত, ১৯৭২)। রায়, যামিনী। ‘ছেলেবেলা’। *যুগান্তর*। ১৫ ফেব্রুয়ারি। পৃ. ৮

২৫৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮

২৫৭। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯৮

২৫৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯৯

২৫৮। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১৭)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩–১৪

২৫৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৮

২৬০। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৪

২৬১। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৫

২৬২। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৫

২৬৩। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭০

২৬৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮০–৮১

২৬৫। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৪–৮৫

২৬৬। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩১

২৬৭। ন্যাশনাল গাল্যারি আর্ট মিউজিয়াম। Accen. No. ngma–01555

২৬৮। সেন, অরুণ (২০২০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৫

২৬৯। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০০

২৭০। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১০

২৭১। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৬

২৭২। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৭

২৭৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৪

২৭৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৬

২৭৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৯

২৭৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৫-১৩৬

২৭৭। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০১

২৭৮। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৪

২৭৯। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ.৮০-৮১

২৮০। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪১-১৪২

২৮১। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১৭)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪

২৮২। ইরা ও তারা - রুচিরা দে ও উত্তরা দে।

২৮৩। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৫

২৮৪। সেন, অরুণ। 'বিষ্ণু দে ও তাঁর তিনি বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যামিনী রায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র'। http://www.Srishtisandhan.com. Last accessedon – 07/07/23

২৮৫। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৯

২৮৬। Ghosh, Anuradha (2022). *Jamini Roy*. Kolkata: Niyogi Books. P. 53–54

২৮৭। সেন অরুণ (২০২০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৭

২৮৮। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৩

২৮৯। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৮

২৯০। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৮

২৯১। সেন, অরুণ (২০২০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৭

চিত্র ১: ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে, নন্দলাল বসু

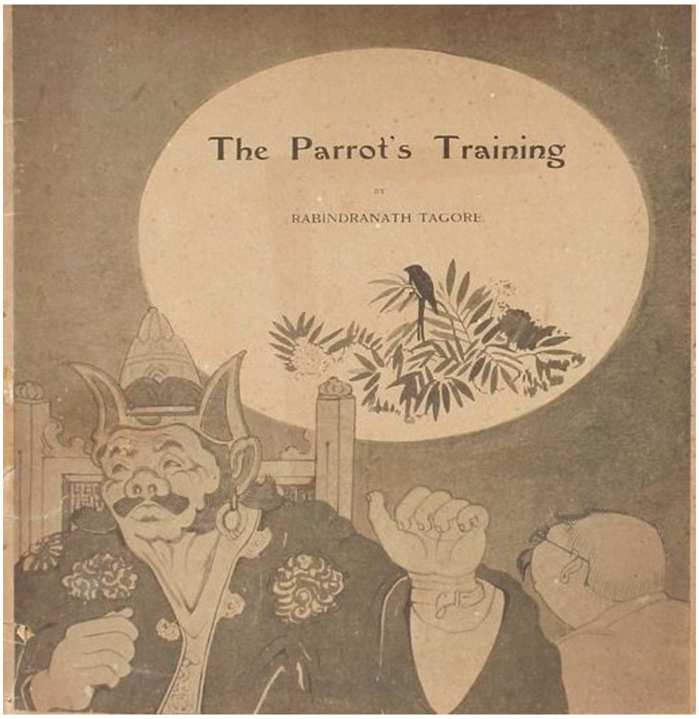

চিত্র ২: *The Parrot Traning*-এর প্রচ্ছদ, নন্দলাল বসু

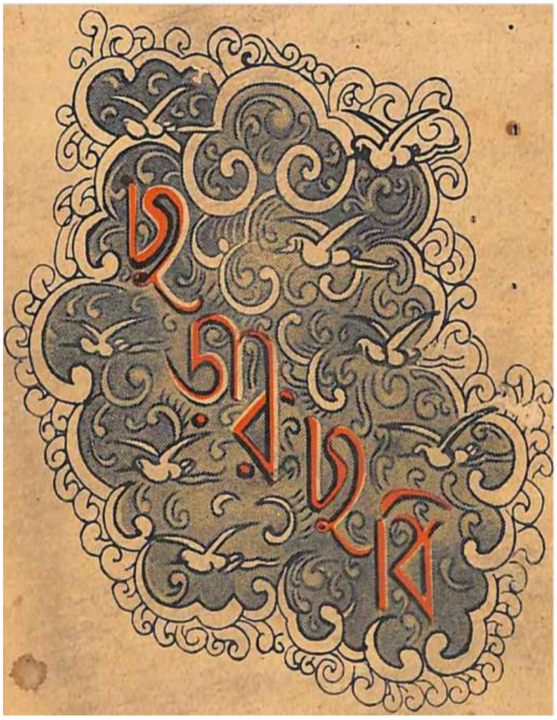

চিত্র ৩: *ছড়ার ছবি*-র প্রচ্ছদ, নন্দলাল বসু

চিত্র ৪: Buddha and the lame kid, নন্দলাল বসু

চিত্র ৫: সতী, নন্দলাল বসু

চিত্র ৬: *টাকডুমা ডুম ডুম*-এর প্রচ্ছদ, নন্দলাল বসু

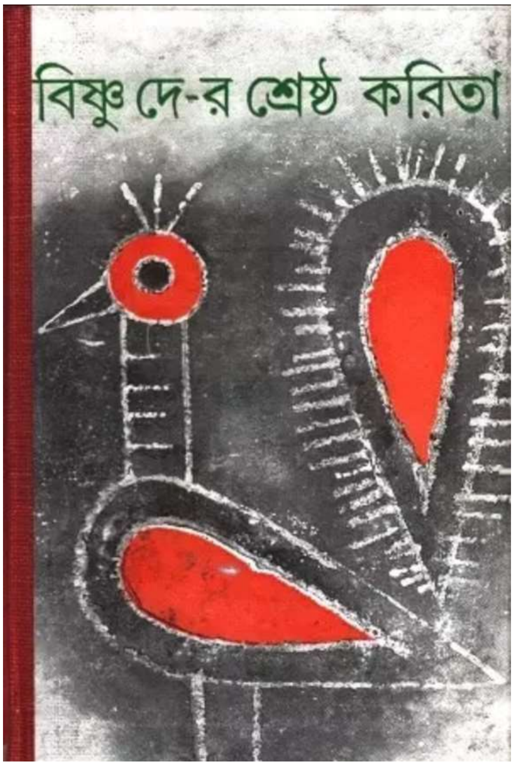

চিত্র ৭: *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র প্রচ্ছদ, যামিনী রায়

চিত্র ৮: *কালের পুতুল*-এর প্রচ্ছদ, যামিনী রায়

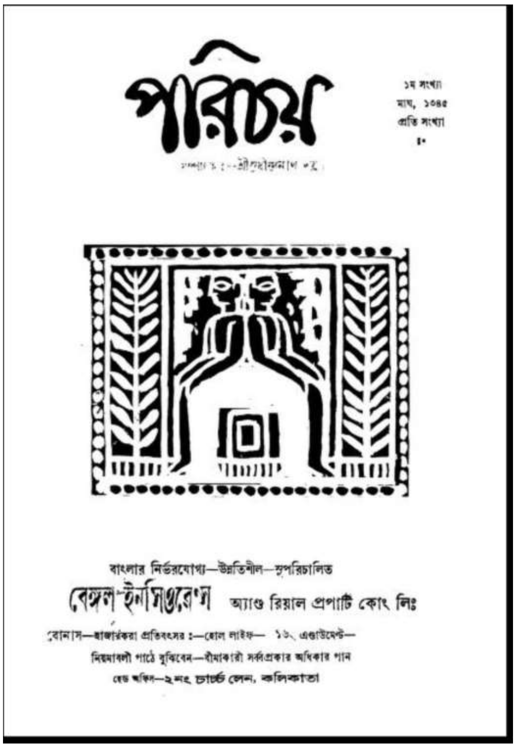

চিত্র ৯: *পরিচয়*-এর প্রচ্ছদ, যামিনী রায়

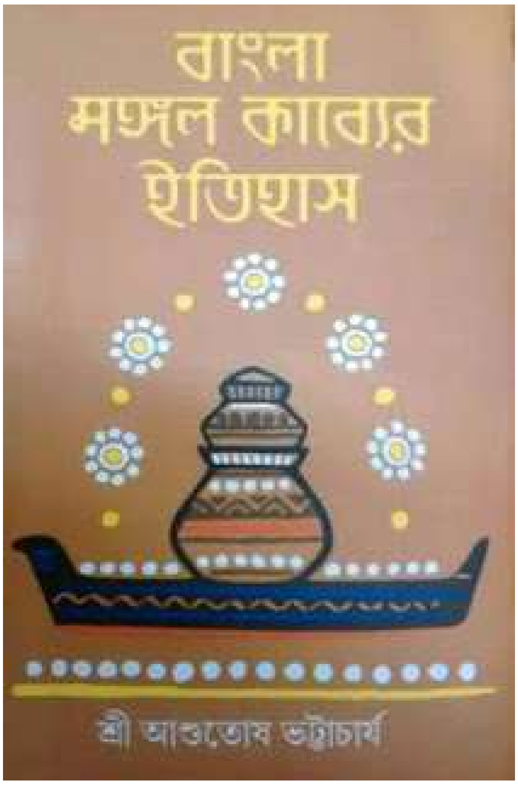

চিত্র ১০: *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*-এর প্রচ্ছদ, যামিনী রায়

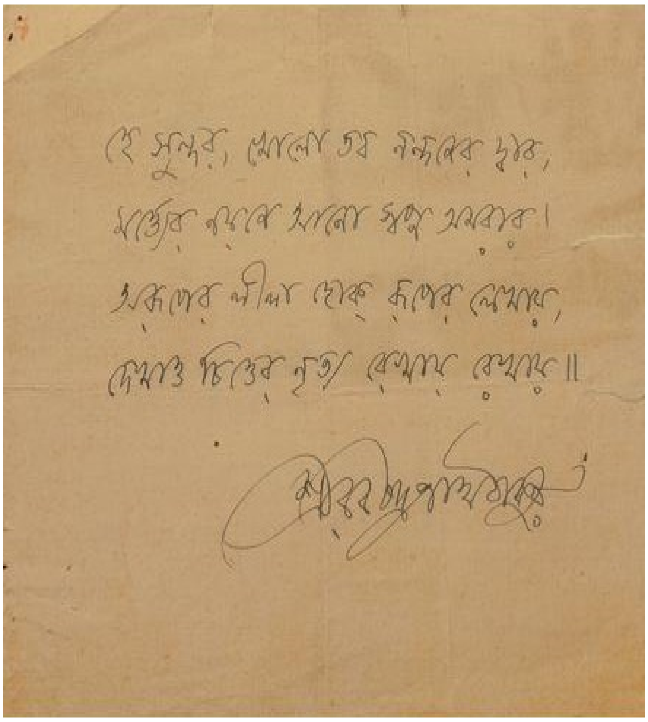

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার,
মর্ত্যের নয়নে আনো স্বপ্ন অমরার।
অরূপের লীলা হোক রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র ১১: নন্দলাল বসুর প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাণী

দেবদারু

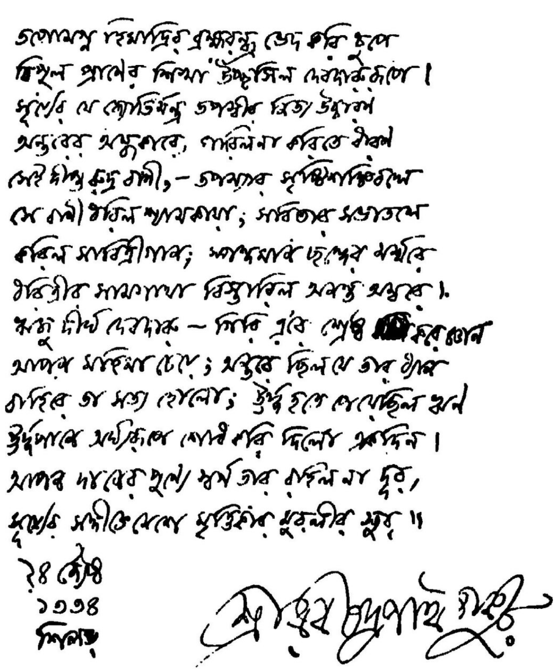

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্যের যে জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিলনা করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী, — তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে বাণী ধরিল শ্যামকায়া; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।
ঋজু দীর্ঘ দেবদারু — শিরে এবে শ্রেষ্ঠ [illegible] করে তোলে
আপন মহিমা চেয়ে; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
বাহিরে তা সত্য হোলো; ঊর্ধ্ব হতে পেয়েছিল ঋণ
ঊর্ধ্বপানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিলো একদিন।
আপন দানের মূল্যে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
স্বর্গের সঙ্গীতে মেশে মৃত্তিকার মুরলীর সুর॥

২৪ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪
শিলঙ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র ১২: নন্দলাল বসুর আঁকা দেবদারু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা

চিত্র ১৩: গরুড়, নন্দলাল বসু

চিত্র ১৪: বাল্মিকির রামায়ণ রচনা, যামিনী রায়

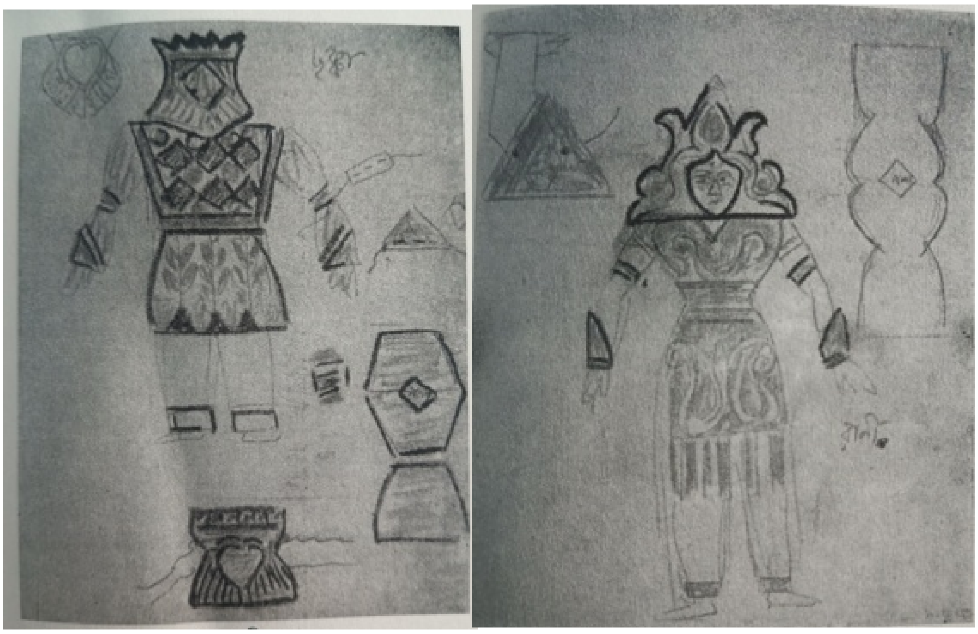

চিত্র ১৫: *তাসের দেশ* নাটকের পোশাক পরিকল্পনা, নন্দলাল বসু

চিত্র ১৬: *সীতা* নাটকের সিন, যামিনী রায়

চিত্র ১৭: বাবলীকে লেখা নন্দলাল বসুর পত্র

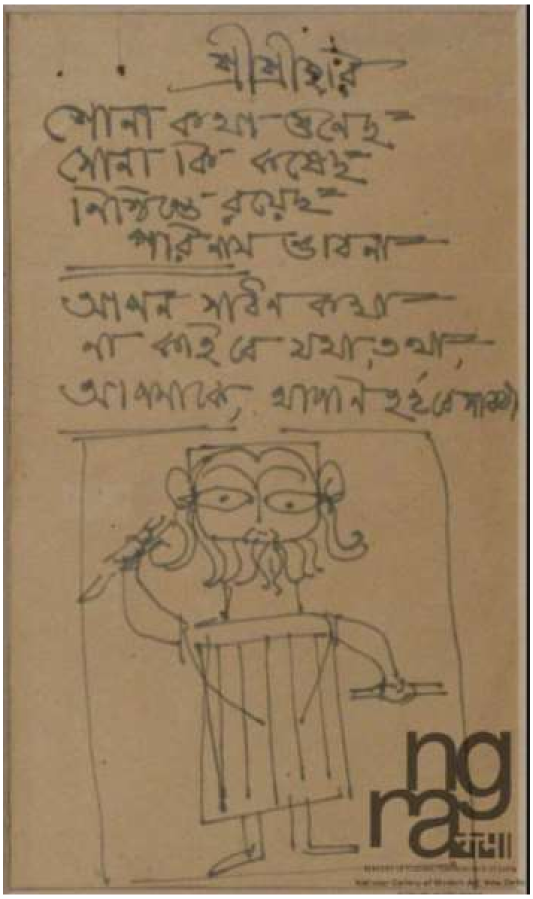

চিত্র ১৮: যামিনী রায়ের পত্রকবিতা

পঞ্চম অধ্যায়

নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের তুলনামূলক আলোচনা

৫.০ ভূমিকা

নন্দলাল বসু এবং যামিনী রায় তাঁদের সমকালে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় অথবা ভারতীয় রীতির শিল্পচর্চায় বিশ্বাসী এই দুই স্পষ্ট নির্দেশিত গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে নিজ প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বেঙ্গল স্কুলের ধারায় শিল্পচর্চা শুরু করলেও অচিরেই গুরুর ছায়াকে অতিক্রম করে যান। মোগল, অজন্তা, রাজপুত শৈলীর অনুকরণ এবং পুরাণ ও ইতিহাস নির্ভর চরিত্র চিত্রায়ণ থেকে পুরোপুরি সরে না আসলেও বৃহত্তর জনসমাজ এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছবি আঁকার রসদ খুঁজে পান। তিনি ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী জগৎসংসারের রূপরাজিকে শিল্পীর নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করার কথা বলেন। ভারতীয় অলংকরণ শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতার প্রকাশ ঘটে আলপনা, সূচের কাজে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোকশিল্প সামগ্রীকে সংগ্রহ করার নেশা ছিল তাঁর। বাংলার পটচিত্রের প্রেরণায় নানা সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বেশকিছু চিত্র রচনা করেছেন। কেবলমাত্র ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির চর্চাতেই তিনি থেমে থাকেননি বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের শিল্পপদ্ধতিকে ছবির প্রয়োজনে অসংকোচে গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলির মধ্যে ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য দেশগুলির শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে শিল্পতাত্ত্বিক ও শিক্ষক নন্দলালের দ্বৈত সত্তার প্রকাশ ঘটে। তাঁর লেখা অজস্র চিঠিপত্রে শিল্প সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত ও ব্যক্তিত্বের হদিশ পাওয়া যায়। সচিত্র চিঠিপত্রে আঁকা স্কেচগুলি তাঁর দেখা দৃশ্যরাজি ও অভিজ্ঞতার ফসল। বিশ্বভারতীতে প্রচ্ছদ ও পুস্তক অলংকরণের যে প্রথা গড়ে উঠেছিল তাতেও নন্দলালের অসামান্য অবদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের বাইরের বহু লেখক বরচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও গ্রন্থ অলংকরণের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানে বহু কবিতা, ছবি রচিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের সাহিত্যচর্চার পরিবেশে তিনি নিজেকে মেলে ধরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চসজ্জা ও অভিনেতাদের অঙ্গসজ্জায় তাঁর সৃষ্টিশীলতা নতুন প্রথার জন্ম দেয়। সাহিত্যকলা ও চিত্রকলার ঐক্য সূত্রে তাঁর পথচলা।

যামিনী রায়ের শিল্পচর্চার শুরুটা হয় পাশ্চাত্য রীতিকে আশ্রয় করে। তৎকালীন সময়ে কলকাতার সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির যে শিল্পচর্চা করা হত তিনি তাতে দক্ষতা অর্জন করেন। প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিদগ্ধ মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ইচ্ছে করলে তিনি প্রতিকৃতি অঙ্কন করে আর্থিক সচ্ছলতাপূর্ণ নিশ্চিন্ত জীবনকে বেছে নিতে পারতেন, কিন্তু মনকে অতৃপ্ত রেখে আর্থিক নিশ্চয়তায় জীবনযাপন তাঁর পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। বেশ কিছুদিন অবনীন্দ্র অনুসারী নব্যবঙ্গীয় শিল্পচর্চা ও পরে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প আঙ্গিকগুলিকে নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন। একটা সময় পর উপলব্ধি করেন পাশ্চাত্য শৈলী কিংবা অজন্তা, মোগল, রাজপুত চিত্রকলা অনুসারী ভারতীয় শৈলী কোনটাকেই অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ভিন্ন পথের সন্ধান করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন বাংলার লোকশিল্প ভাণ্ডারের মধ্যেই পেতে পারেন অরূপ রতন। শৈশবের স্মৃতি, বেলিয়াতোড় গ্রাম তাঁর শিল্পচর্চার মুখ্য অংশ জুড়ে থাকে। পট, সরা, চালচিত্র, আলপনা, কাঁথা, পুতুল, টেরাকোটা ইত্যাদি বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে নবরূপদান করেন। তাঁর শিল্পকর্মগুলিকে যদি কেবলমাত্র লোকশিল্পের অনুকরণ বলে ধরা হয় তাহলে ভুল করা হবে। রেখা ও রঙ নিয়ে আঙ্গিকচর্চার অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার পদধ্বনি। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প আঙ্গিকগুলির প্রভাব অনুভূত হবে। লোকশিল্পের সহজ সরল আঙ্গিক চর্চার পিছনে লুকিয়ে থাকা তাঁর এই আধুনিক শিল্পীমনের সন্ধান পান সমকালীন আধুনিক সাহিত্যিক গোষ্ঠী। তাঁদের সাহিত্যচর্চায় মিশে থাকে যামিনী রায়ের ছবি ও শিল্পব্যক্তিত্ব। যামিনী তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের সংস্পর্শে থাকলেও গ্রন্থ রচনার গুরুভার গ্রহণ করেননি। তবে তাঁর বক্তব্যের অনুলিখনে ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর শিল্পচিন্তা। বিরূপ আলোচনা সমালোচনা, আর্থিক প্রতিকূলতা, সমাজ-রাষ্ট্রের অস্থির পরিস্থিতিতে লক্ষে অবিচল ভিন্ন পথগামী এই শিল্পী প্রেরণা স্বরূপ। নন্দলাল ও যামিনী একই প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন আঙ্গিকের শিল্পশিক্ষাগ্রহণ করা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে নিজ মতাদর্শ ও প্রতিভায় ভারতশিল্পের নতুন পথ নির্দেশ করে গেছেন।

৫.১ লোকশিল্পের আলোকে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

নন্দলাল এবং যামিনী এঁরা দুজনেই লোকশিল্পের আঙ্গিকের চর্চা করেছেন। তবে যামিনী লোকশিল্প নিয়ে যেভাবে ভেবেছেন নন্দলাল তেমনভাবে ভাবেননি। পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চা ত্যাগ করে যামিনী সর্বাধিক যে লোকশিল্প প্রকরণটির দিকে ঝুঁকেছিলেন সেটি হল পট। তিনি বুঝেছিলেন ফারসি বা চিনা শিল্পীর মতো ছবি আঁকা পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর নিজস্ব পরিবেশে তিনি কেবল একজন বাঙালির মতোই বাংলার দেশজ পরম্পরা ধরেই এগোতে পারেন। এই বিশ্বাস থেকে তিনি বাংলার পটচিত্রের করণকৌশল আয়ত্ত করে তার ভাব ও ভাবনাকে গ্রহণ করে, নিজস্ব শিক্ষা ও চিত্রবোধ দ্বারা পরিশীলিত করে তিনি রূপ দেন বাংলার চিরন্তন বিষয়গুলিকে।[১] বহু শিল্পসমালোচক তাঁর ছবির সঙ্গে কালীঘাটের পটের ভিন্নতা খুঁজে না পাওয়ায় তাঁকে তাঁরা সাধারণ পটুয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবেননি। তবে তাঁর আঁকা ছবিগুলিকে নিছক পট বলা যায় না৷ কালীঘাটের পট শিল্পীদের রেখাঙ্কন, বর্ণপ্রয়োগ, বিষয় ভাবনার থেকে তাঁর আঁকা পট অবশ্যই আলাদা। পটুয়াদের আঁকার মধ্যে যে অসচেতন সরলতা দেখা যায় যামিনীর চিত্রে তার পরিবর্তে দেখা যায় সচেতনতা ও সফিস্টিকেশন। কারো কারো মতে তিনি যেহেতু নিজেকে পটুয়া বলে মনে করতেন তাই তিনি একই ছবির পুনরাবৃত্তি করতে সংকোচ বোধ করেননি৷ তবে তিনি কি কেবল পটুয়া হওয়ার জন্যই স্বচ্ছল জীবন ছেড়ে আর্থিক ক্লেশ সহ্য করেছিলেন? হয়তো নয়। তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের শিল্পী, সৃজনশীলতায় বিশ্বাসী, স্বয়ং শক্তির অধিকারী।[২] পটচিত্রভিত্তিক যে নক্সাপ্রধান বিশুদ্ধ রীতিকে যামিনী রায়ের রীতি বলে জানি, সেই রীতিতে উপনীত হতে তাঁকে পর্যায়ক্রমিক বহু শৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়।[৩] তাঁর জীবন-যাপন, মনন, চিন্তন পটুয়াদের মতো নয়। তবু তিনি নিজেকে কেন পটুয়া বলতে পচ্ছন্দ করেন সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে। তাঁর এই স্বীকারোক্তি পটশিল্পীদের থেকে অনুপ্রেরণার কারণে বলে মনে হয়। একথা ঠিক যে পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চার পথ ত্যাগ করার পর থেকে পট তাঁর ছবিতে চিরস্থায়ী প্রেরণা হয়ে থেকে গিয়েছে।

পটের প্রতি আকর্ষণ থেকে নন্দলালের ছাত্রাবস্থায় বাণীপুরে বাড়িতে এবং হরিপুরা পর্যায়ের ছবিগুলি আঁকেন। বাণীপুরের বাড়িতে আঁকা পটে তিনি কালীঘাটের পটশৈলী ব্যবহার করেছেন অভিনব বিষয়বস্তুর রূপায়ণে। নানা কারণে সাময়িকভাবে তিনি এই ধরনের বিনোদনমূলক পট আঁকা

থেকে বেরিয়ে আসেন। কালীঘাট পটের প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধের প্রকাশ ঘটে হরিপুরা পটে। যদিও হরিপুরার পট আর কালীঘাটের পট সমগোত্রীয় নয়। কালীঘাটের পটের সঙ্গে এঁদের আঁকা পটধর্মী ছবিগুলির তফাৎ দৃশ্যতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুই শিল্পীর কাছে কালীঘাটের পট প্রেরণার স্তরেই রয়ে যায়। নন্দলালের পট ক্যালিগ্রাফি রেখার টানে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, আর যামিনীর পটে গ্রামীণ পটুয়াদের সহজ সরল রেখার ছোঁয়া পাওয়া গেলেও তা কালীঘাটের মতো ডৌল সৃষ্টিকারী রেখার বিন্যাস থেকে মুক্ত। কালীঘাটের পটের স্বচ্ছ জলরঙের প্রয়োগের বদলে তাঁদের চিত্রগুলিতে গাঢ় রঙের প্রয়োগ দেখা যায়। দুজনেই ব্যবহার করেন গ্রামীণ পটুয়াদের মতো প্রকৃতিজাত রঙ। স্বেচ্ছায় বা দারিদ্রতায় যামিনীকে পটোদের মতই প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার শিখতে হয়। তাই তাঁকে মোটামুটি সাতটি রঙ ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয় – যা তিনি নানারকম ধাতু, মাটির গুঁড়ো এবং উদ্ভিদ থেঁতো করে তৈরি করতেন।[৪] নন্দলাল কেবল পট অঙ্কনের ক্ষেত্রে নয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় থেকেই কলাভবনে দেশি পাথর, মাটির রঙ ব্যবহারের প্রবর্তন করেন।[৫] জৈনশাস্ত্র থেকে রঙ তৈরি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তার প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করেন।[৬] নন্দ-যামিনী পটের স্পেস বিভাজন নীতিকে মানেননি। কালীঘাটের পটে পশ্চাদপটে শূন্যতা লক্ষ করা গেলেও ছোট-খাটো মোটিফের ব্যবহারে এঁরা পশ্চাদপটের শূন্যতা পূরণ করেন। এঁদের বিষয় নির্বাচন কালীঘাট পটের মতো নয়। কালীঘাটের পটে প্রথমদিকে পুরাণ নির্ভরতা দেখা গেলেও পরবর্তীকালে শহুরে সংস্কৃতির প্রভাব পড়তে দেখা যায়। সমাজের কদর্য দিকগুলিকে ব্যঙ্গের আকারে তুলে ধরেন। যামিনী ও নন্দলালের পটধর্মী ছবিগুলি কালীঘাটের এই চটুল রসিকতা থেকে মুক্ত। যামিনী পট শিল্পের আঙ্গিককে বেছে নেন অশ্লীল চটুল বিষয় ব্যতিরেকে। প্রাচীন পটুয়ারা যে বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন সেই বিষয় এবং বাল্য ও কৌশর বয়সে যা তিনি চোখে দেখেছিলেন কানে শুনেছিলেন যেমন রাধাকৃষ্ণ লীলা, রামায়ণের নানা প্রসঙ্গ, দেব-দেবীর ছবি, বৈষ্ণব আর নানা সম্প্রদায়ের নরনারী, সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ, গ্রামে কর্মরত লোকজন, তাদের আমোদ প্রমোদ, নানারকমের পশুপাখি, পুতুল, খেলনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন।[৭] তাঁর ছবিতে পটের বিষয় নয় প্রাধান্য পায় পটের ফর্ম। হরিপুরাতে নন্দলাল ভারতবর্ষের গ্রামীণ সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ব্যবহার করেন পটের ফর্ম। সেখানে সমাজের নানা চরিত্রের নানা পেশার মানুষের দেখা মেলে। সাধারণ দরিদ্র পল্লীবাসীর গার্হস্থ্যজীবনের ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন দৃশ্য দেশি রঙে মোটা

তুলিতে ফুটিয়ে তোলেন।[৮] কালীঘাটের পটুয়ারা যেহেতু প্রতিমাগড়া বা মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাই পেশাগত কারণে কালীঘাটের পট ত্রিমাত্রিক। সেখানে নন্দলাল ও যামিনীর আঁকা পট দ্বিমাত্রিক গুণযুক্ত। চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত শিল্পীদ্বয়ের মার্জিত রুচি আর সচেতন মনের প্রকাশ ঘটে তাঁদের আঁকা পটগুলিতে। পটশিল্পীদের মতো তাঁরা কেবল প্রথার অনুকরণ করেন না। কতটা গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জন করা উচিত তা তাঁরা তাঁদের মতো করে নির্বাচন করেন। দেওয়ালে সারিবদ্ধ করে সাজানোর পরিকল্পনায় নন্দলালের আঁকা পটগুলিতে বাঁকা খিলানের মতো ঘের লক্ষ করা যায় যা ফ্রেমের কাজ করে এবং ভিত্তিচিত্রের অনুভূতি এনে দেয়।[৯] ছবির চারপাশে বিভিন্ন রঙের ফ্রেম এঁকে তাকে মূল ছবির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা মিনিয়েচার চিত্রকলা ও লোক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য। যামিনী ছবির স্পেসকে আবদ্ধ করে দেন চারপাশের একাধিক রঙের একাধিক ফ্রেম এঁকে। তাঁর ফ্রেম অলংকৃত হয় সমতল রঙ, ফুলপাতার নক্সা বা জ্যামিতিক প্যাটার্নে।[১০] তবে তাঁর ছবির বিষয় অনেক সময়ই ফটোগ্রাফির মতো ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এভাবে তিনি ফ্রেমের বাইরের জগতের কল্পনা দর্শকের উপর ছেড়ে দেন। এছাড়া তাঁর আঁকা পটে আয়নার মতো প্রতিবিম্ব সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। ডান দিকের ছবিটি যেন বাঁদিকের ছবিটিরই প্রতিবিম্ব হতে ধরা থাকে। উদাহরণ হিসাবে 'কৃষ্ণ-বলরাম' ছবিটির কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া তাঁর যে ছবিতে একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি ঘটে সেখানেও চরিত্রগুলির মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে না। সব চরিত্রই যেন একটি অপরটির প্রতিবিম্ব। কিন্তু নন্দলালের ছবি ভাবাবেগহীন নয়। চোখের চাওনি, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি সবেতেই প্রতিটি চরিত্র আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য যুক্ত। রেখাগুলি গতিপ্রধান ও ছন্দিত। রঙ ব্যবহারে তিনি পরিসীমার প্রাচীরকে মানেননি। রেখা ছাপিয়ে রঙ উজিয়ে উঠেছে। অন্যদিকে যামিনী রায়ের রেখা অনেক নির্দিষ্ট। রঙ ব্যবহার পরিকল্পিত এবং সীমার মধ্যে আবদ্ধ।[১১] জগন্নাথ পট সম্পর্কে নন্দলালের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায় *শিল্পচর্চা* গ্রন্থটিতে। সেখানে জগন্নাথের পট অঙ্কনের প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি, তার ব্যবহার, এই ধরনের পট অঙ্কনের ধাপগুলি বর্ণনা করে ভবিষ্যৎ শিল্পী ও ছাত্রদের এই শ্রেণির পটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। করণ-কৌশল ও প্রকরণগত আলোচনা সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। যামিনী রায়ের 'পটুয়া শিল্প' প্রবন্ধে পট সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মেলে। পটচিত্র বলতে যেসব বাঙালিরা কেবলমাত্র কালীঘাটের পটকে বোঝেন

তাঁদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। পটুয়া শিল্পের বক্তব্যের বিষয় এবং উপস্থাপন পদ্ধতি বা আঙ্গিককে আলাদাভাবে ব্যাখা করেছেন। পটুয়াদের পৌরাণিক জগতের আস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইউরোপীয় শিল্পের প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর মতে ইউরোপীয় শিল্পীরা পৌরাণিক জগতে স্থিতি হতে পারেনি বলে তাঁদের শিল্পে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগেও পটুয়াদের শৈল্পিক অবস্থানের মূলে রয়েছে পৌরাণক জগতে স্থিতি। পৌরাণিক জগতকে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন এবং শুদ্ধসত্যের প্রকাশ তাঁদের সচেতন মনের কৃতিত্ব নয়। তাই তাঁরা মূল্য পায়না। আধুনিক শিল্পী তাঁর ছবিতে পৌরাণিক জগতের নিরাভরণ শুদ্ধ রূপকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন তাই তাঁর শিল্পকর্ম মূল্য পায়। পট বা পটুয়া শিল্প সম্পর্কে যামিনী রায়ের বিশ্লেষণ শিল্প তাত্ত্বিকের। এই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে তাঁর ছবিতে। তিনি উত্তরাধিকারের উৎসে, তার সুসঙ্গত ও সুসংহত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে, পুরাণ ও কিংবদন্তিকে, মৌলিক গঠন ও প্রাথমিক রঙকে সহজাত অধিকারের মতো আত্মস্থ করে নেন।[১২] যামিনী রায় যেমনভাবে পটচিত্র নিয়ে ভেবেছেন, সহজ সরল আঙ্গিকের আড়ালে থাকা শুদ্ধসত্যের সন্ধান করেছেন নন্দলাল তেমনভাবে করেননি। নন্দলালের কাছে পট কখনো বিনোদনের উপায় হিসাবে, কখনো দ্রুত কাজ সারার সর্বোত্তম উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তাঁরা গ্রামীণ পট বা কালীঘাটের পটের অনুকরণ করেননি। পটের সারল্যকে বজায় রেখে নিজস্ব ভঙ্গি অনুযায়ী তাকে ব্যবহার করেছেন। যামিনী যেমন বাংলার পোড়ামাটির মন্দির এবং বাংলার পটচিত্রের ধারাকে অঙ্গীকার করে নিয়ে নিজের মতো করে রূপ দিয়েছিলেন, নন্দলাল তেমনি জৈন পুঁথিচিত্র, পটচিত্র এবং গ্রামের খেলনার অনুভবে ছবির দিক পরিবর্তন করেছিলেন।[১৩]

অস্থায়ী অথচ আবহমান কাল ধরে চলে আসা লোকশিল্পের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা আলপনা পরম্পরাক্রমে ব্রতাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজও তার ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। নন্দলাল ও যামিনী দুজনেই এই লোকশিল্পটির নান্দনিক মূল্য অনুধাবন করে নবরূপদান করেছেন। নন্দলালের আলপনায় ব্রতাচারের গতানুগতিক মোটিফের বদলে প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতিজাত উপাদানগুলির আলংকারিক রূপ। ধ্রুপদী রীতিতে শিক্ষার ফলে রেখা ও নক্সার উপর অসামান্য দখল তিনি আগেই অর্জন করেছিলেন। শান্তিকেতনের বিশ্বপ্রকৃতি তাঁকে সেই প্রতিভা শতমুখী হয়ে ওঠে।[১৪] যামিনী রায় ছবিতেও আলংকারিক ভঙ্গিমা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি এই বৈশিষ্ট্যকে চিত্রকল্পে এনেছেন অত্যাশ্চর্য

সংযমের সঙ্গে।[১৫] আলপনাধর্মী ছবি তো বটেই তিনি বিষয় অনুযায়ী কোথাও কোথাও নক্সাকারী কাজের নমুনার অবতারনা করেছেন।[১৬] তাঁর 'চার নারী'র ছবিতে তিনি খুব কম বর্ণময় অলংকরণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, সামান্য যা করেছেন তা সহজ 'নির্মাণকৌশলগত উপাদানে অথবা অবয়ব অঙ্কনের বাঁধনে'।[১৭] জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্তরকম কাজে আলিংকারিক ভঙ্গিমা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেছেন। ভারতশিল্পেরও অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলংকারিক ভঙ্গিমাকে কেন্দ্রে রেখে এই দুই শিল্পী নিজ প্রতিভা ও সৃজনশীলতায় দ্রষ্ট বস্তুর রূপায়ণ করেছেন। যামিনী আলপনার সাবেক রূপকে বজায় রাখতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে আলপনা দেওয়ার উপযুক্ত স্থান মাটির মেঝে; তাই তাঁর আঁকা আলপনাধর্মী ছবিগুলির পশ্চাদপটে বাঁকুড়া এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলের মাটির রঙ ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই ধরনের পশ্চাদপটের উপর সাদা রঙে বস্তুর আলংকারিক রূপ প্রকাশ বাংলার সাবেক আলপনার অনুভূতি এনে দেয়। অপর দিকে নন্দলালের আলপনা নানা রঙে রঞ্জিত। প্রকৃতির যে উপাদানটির আলঙ্কারিক রূপ আলপনায় প্রকাশ পাচ্ছে তার মূল রঙটিকে যথা সম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা তিনি করেন। উৎসব অনুষ্ঠানে আলপনার উপাদান বদলে ফেলেন। নানারকমের ফুল, শস্যদানা আলপনার উপকরণ হসাবে ব্যবহৃত হয়। যামিনী সাবেক ধারাটিকে বজায় রেখে নতুনত্বের সন্ধান করেন আর নন্দলাল সাবেক ধারাটিকে প্রাধান্য দেওয়া জরুরি মনে করেন না। এখানেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এ প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের থেকে শোনা বিষ্ণু দের সাক্ষ্য উদ্ধারযোগ্য –

> সাহিত্যপরিষদের এক অনুষ্ঠানে নন্দবাবুও ঐ রকম আলপনা-শিল্প করেন – বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কিন্তু মার্বেলের মেঝেতে! যামিনী দা চলতি দেশজ ভাষায় নন্দবাবুকে বলেন যে বঙ্কিম বেঁচে থাকলে বিষ্ঠা লেপে দিতেন, কারণ আলপনা মার্বেলের মেঝেতে মানায় না।[১৮]

বিষ্ণু দে যামিনী রায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে ঔচিত্যবোধ দেখেন। শোভন সোম এর মধ্যে দেখেন রক্ষণশীলতা। নন্দলাল আলপনাকে মাঙ্গলিক উপাচার হিসবে দেখেননি, তিনি ধর্মীয় প্রতীককে বর্জন করে প্রকৃতিজাত উপাদানের আলংকারিক রূপনির্মাণ করে এমন এক স্বতন্ত্র ধারার আলপনার সৃষ্টি করেন যা সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানের উপযোগী। তাঁর কাছে আলপনা একটি শিল্প মাধ্যম মাত্র। তাই তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে, সান বাঁধানো মেঝেতে, মঞ্চে, ক্যানভাসে, বাড়ির দরজায় আলপনা দিয়ে সাজাতে দ্বিধা বোধ করেন না। যামিনীও তাঁর আলপনা থেকে ধর্মীয় প্রতীকগুলিকে বর্জন করে ব্রতাচারের গণ্ডী থেকে আলপনাকে মুক্ত করেন। তিনি নির্দ্বিধায় ক্যানভাসের জমিতে আলপনাধর্মী ছবি আঁকেন, ঘরে

রাখা মাটির পাত্র, প্রদর্শনী কক্ষের মেঝে সাজিয়ে তোলেন আলপনায়। তাহলে কেন তিনি মার্বেলের মেঝেতে নন্দলালের আলপনা দেখে এমন আপত্তিকর মন্তব্য করেন সেই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে হয়তো মেঝের বর্ণের মধ্যে। যামিনী ব্রতাচারের গণ্ডী থেকে আলপনাকে সরিয়ে আনলেও আলপনা আঁকতে তিনি ক্যানভাসকে মাটির বর্ণে রঞ্জিত করে তার উপর পিটুলী গেলার সাদা রঙের প্রয়োগ করেন। মার্বেলের মেঝের সাদা রঙের প্রেক্ষাপটে আলপনা দেওয়াকে তাঁর বিসদৃশ মনে হয়। হতে পারে যামিনীর সঙ্গে নন্দলালের মতাদর্শ মেলেনা তবুও শিল্পীর শিল্প কর্মের প্রতি শিল্পীর এই মন্তব্য অসহিষ্ণু বলে মনে হয়। এই বিতর্কিত বিষয়টিকে বাদ দিলে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত দুই ভারতীয় শিল্পী যামিনী রায় এবং নন্দলাল বসু আলপনা নামক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামীণ লোকশিল্পটিকে ব্রতের ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে পৃথক করে নান্দনিক স্তরে উন্নীত করেছেন। আলপনাকে তাঁরা ধর্মাচারণের অঙ্গ হিসাবে নয়, কেবলমাত্র শিল্প হিসাবে দেখেছেন। এই চিত্রিত লোকশিল্পটিকে মার্জিতরূপে পরিবেশন করে নিজ সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্মৃতপ্রায় বাঙালিকে ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। এর ফলস্বরূপ বর্তমান সমাজে আনুষ্ঠানিক ও ঐতিহ্যানুসারী লৌকিক আলপনার পাশাপাশি কেবলমাত্র সৌন্দর্যচর্চার জন্য আলপনা দেওয়ার রীতির প্রচলন দেখা যায়।

আলপনা যেমন মেয়েদের নিজস্ব সম্পদ, সূচীশিল্পও তাই। এই দুই শিল্প মেয়েদের হাতে লালিত হয়ে আবহমানকাল ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই শিল্পটি যামিনী রায় ও নন্দলাল বসুর শিল্পচর্চায় পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যামিনী রায় তাঁর চিত্র রচনার মধ্যে সূচীশিল্পের ভাববস্তু, মোটিফ এবং প্যাটার্ন এনেছেন। অন্যদিকে নন্দলাল বসু সূচীশিল্পের মধ্যে প্রকৃতি চেতনাকে যুক্ত করে সার্বজনীন চর্চার ক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়েছেন। যামিনী বাংলার কৃষ্টির মধ্যে শিল্প রচনার উপাদান খুঁজে নেন। শৈশব মথিত করে তিনি দেখতে পান বাংলার ঘরের গৃহলক্ষ্মীদের বোনা কাঁথার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নান্দনিক উপাদান, শিল্প রচনার রসদ। তিনি কাঁথার ফোঁড়ের মতো ছোট ছোট লাইন ব্যবহার করে বেশকিছু ছবি এঁকেছেন। কাঁথার পাড়ের বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়েছে তাঁর কাজে। নন্দলাল সূচীশিল্পকে বুঝেছেন সর্বভারতীয় পরিসরে। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সূচীশিল্পের কাজ দিয়ে শান্তিনিকেতনের মঞ্চসজ্জা করেছেন। ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করেছেন নানা দেশের সূচীশিল্পের

নমুনা থেকে দেখে শিখতে। বাংলার কাঁথার ফোঁড়ের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের সূচীশিল্পের মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁরই উদ্যোগে। প্রকৃতি থেকে মোটিফ সংগ্রহের শিক্ষা তাঁর থেকে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চারিত হয়েছে। তিনি বাংলার কারুশিল্প, সূচীশিল্পকে কলাভবনের ছাত্রীদের জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য করেছেন। আসলে নন্দলাল সূচীশিল্পকে দেখেছিলেন বৃহত্তর পরিসরে, আর যামিনী লোকসমাজের এই শিল্পপ্রকরণটিকে দেখেছিলেন চিত্ররচনার অন্যতম আঙ্গিক হিসাবে, ব্যক্তিগত পরিসরে। তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতিকে আশ্রয় করেছিলেন আঙ্গিকধর্মী চিত্র রচনায়। পট, আলপনা, কাঁথা, চালচিত্র, সরা, দশাবতার তাস, পুতুল, প্রতিমা, টেরাকোটা, শোলার কাজ ইত্যাদি বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্পগুলি কোন না কোনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর চিত্রে। তাঁতি, কুমোর, ছুতোর, বিভিন্ন লোকশিল্পের কারিগর এরা সকলেই যামিনীর শিল্পীমানস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।[১৯]

৫.২ বিদেশি অনুষঙ্গে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

যামিনী রায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ষোলো বছর বয়সে যখন কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্তি হন তখন লক প্রবর্তিত একাডেমিক রীতির শিল্পচর্চা চালু থাকায় তিনি রিয়েলিজম ও ন্যাচারালিজমে দক্ষ হয়ে ওঠেন। প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে তাঁর সাফল্যের কথা শোনা যায়। অন্যাটমি ও মডেল ব্যবহারে কৃতিত্বের পরিচয় মেলে তাঁর আঁকা নগ্ন চিত্রগুলিতে। পরবর্তীকালে ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম, পয়েন্টিলিজম ইত্যাদি নানা রকম আধুনিক মতবাদের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। পাশ্চাত্য রীতিতে পাশ্চাত্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে বহু চিত্র আঁকেন। শহর কলকাতা, গঙ্গার পাড়, ভাসমান নৌকার সারি, সাঁওতাল জীবন, গ্রামের প্রকৃতি ইত্যাদি নানা বিষয় পাশ্চাত্য রীতিতে শিল্পচর্চায় তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করে। একটা সময় পর পাশ্চাত্য রীতিতে শিল্পচর্চার উৎসাহ ক্রমশ কমে আসতে থাকে। নব্যবঙ্গীয় শিল্পী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে অজন্তা, মোগল, রাজপুত শৈলীর চর্চা করেন। প্রাচ্য শৈলীর ধারণা নিতে তিব্বতি ও চিনা শৈলীতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পুরাণ অনুসরণে বিচিত্র সব ছবি আঁকেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে। পরবর্তীকালে তাঁর অতৃপ্ত-মন এমন এক আঙ্গিকের ছবি আঁকায় স্থিরতা লাভ করল যার সঙ্গে নিজভূমির টান রয়েছে, আত্মার যোগ রয়েছে।[২০] আবহমানকাল ধরে চলে আসা বাংলার লোকশিল্পগুলিকে আশ্রয় করে ছবি আঁকতে শুরু করেন এবং এর মধ্যেই আধুনিক ইউরোপীয়

শিল্প আঙ্গিকগুলির গুণ খুঁজে পান। তিনি দেখেন বাস্তব অনুকৃতির বদলে বস্তুর ভাবধর্মী রূপায়ণ, সরল রেখাঙ্কন, সমতল রঙের প্রয়োগ বাংলার লোকশিল্পীরা অনেক আগেই করেছেন। ফলে লোকশিল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে এতদিনের শিক্ষা এবং নিজভূমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন উভয়ই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। লোকশিল্পীরা অবচেতনে যে আঙ্গিকচর্চা করে গেছেন যামিনী রায় তাঁর শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মনন দ্বারা এই আঙ্গিককে গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর ছবিকে বাংলার লোকশিল্পের অন্ধঅনুকরণ বা পশ্চাদগামীতা বলে ভাববার কারণ নেই। তাঁর যাত্রাকে পাশ্চাত্য চিত্ররীতি থেকে ভারতীয় চিত্ররীতির অভিমুখে যাত্রা বলা যেতে পারে। অপরদিকে নন্দলাল ভারতীয় চিত্ররীতিতে পথচলা শুরু করে ক্রমশ চিনা জাপানি বিদেশি চিত্ররীতির বিশেষ বিশেষ গুণকে অঙ্গীভূত করে নিয়ে আপন সৃষ্টিকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলেন। ভারতবর্ষের ভাবধর্মী চিত্ররীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেন বৈদেশিক সংস্কৃতিকে।[২১] সমগ্র প্রাচ্য-দেশের শিল্প ভাবপ্রধান হওয়ায় আত্তীকরণ পক্রিয়াটি অতিসহজেই সম্ভব হয়। ভারতীয় বিষয়কে উপস্থাপন করতে চৈনিক ক্যালিগ্রাফি রেখার ব্যবহার ছবিগুলিকে অন্য মাত্রা দান করে। জাপানি কালিতুলির একরাঙা কাজের প্রভাব তাঁর শেষের দিককার ছবিগুলিতে স্পষ্টত চোখে পড়ে। প্রকৃতির মধ্যেই দেবদর্শন করা যায় তা তিনি চিন-জাপানের শিল্পীদের থেকে শেখেন। ধ্রুপদী রীতিতে দেবদেবী ও পুরাণনির্ভর ঐতিহ্যাশ্রয়ী জগতের বদলে তাঁর তুলিতে চিত্রিত হতে থাকে লৌকিক জীবন, সংস্কৃতি। ওয়াশের পরিবর্তে তাঁর কাজে টেম্পেরার ব্যবহার বেড়ে যায়। তাঁর এই উত্তরণের সঙ্গে যামিনী রায়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যামিনীও প্রথম জীবনে ইউরোপীয় প্রথাগত ধারার চিত্র রচনা করেছেন, পরে বাংলার লোকশিল্পের ধারায় নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করেছেন। নন্দলালের ছবিতে জৈনপুঁথি, পটচিত্র ও গ্রামের খেলনার প্রভাব লক্ষ করা যায়।[২২] নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসার পর ইউরোপীয় শিল্পরীতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেননি। তিনি কেবলমাত্র ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের বর্ণলেপন পদ্ধতির দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হলেও সেক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য তেল রঙের বদলে টেম্পেরা ব্যবহার করেন। প্রাচ্যদেশীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন – 'অধিকাংশ বিলাতি শিল্পী আদর্শ ছাড়া মূর্তি বা ছবি করতেই পারে না'।[২৩] তাঁর এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য নয়। পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির শিল্পীদের কাজ করার ধরন দেখে তিনি এই মন্তব্য করে থাকতে পারেন। তবে তিনি সমকালীন আধুনিক মতবাদগুলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এমন নয়।

তার প্রমাণ মেলে পাশ্চাত্য শিল্প সম্পর্কে আরেকটি সমালোচনায়। তিনি পাশ্চাত্য শিল্পচর্চার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বলেন –

> এক সময় য়ুরোপ স্বভাবের হুবহু নকল করার দিকে ঝুঁকেছিল। সেটা আর্টের ঠিক রাস্তা নয়, তাতে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি দিতে পারে না। প্রতিক্রিয়ার বশে এখন স্বভাবকে একেবারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা দেবার চেষ্টা হচ্ছে; সেটাও অস্বাভাবিক; তাতে কোন রস নেই। সমস্ত অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে ভাবতেও পারে না, দেখতেও পারে না।[২৪]

কিউবিজম বা বিমূর্ত শিল্প আঙ্গিকগুলিকে তিনি সুনজরে দেখতে পারেননি। বিমূর্ততার নামে রূপের বিকৃতিতে তাঁর মন সায় দেয়নি। মডার্ন আর্টিস্টদের ছবিকে তাঁর মনে হয়েছে ফ্যাশানের জন্য বিদেশি আধুনিক শিল্পীদেরকে তাঁরা নকল করছেন। কেন তাঁরা এই ধরনের ছবি আঁকে তা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ভালোলাগে তাই। এই উত্তরে তাঁদের মনের কথা বোঝা যায় না। ভালোলাগার কারণ ব্যাখ্যা না করতে পারলে শিল্পীর ভালোলাগার সঙ্গে পাগলের ভালোলাগার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। শিল্পীকে সাধারণের সঙ্গে একটা যোগ রাখতে হয়, তবেই শিল্পীর শিল্প সকলের বোধগম্য হয়। তাঁর মতে পাগল আর জ্ঞানী দুজনের কথাই শক্ত। সাধারণের বোধগম্য হয় না কিন্তু জ্ঞানী তার কথার ব্যাখ্যা জানেন আর পাগল বোধ-জ্ঞানশূন্য হয়ে বলে। সাধারণভাবে আঁকতে পারেন না বলেই অনেক শিল্পী কিম্ভুতকিমাকার করে আঁকতে থাকেন দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তাদেঁর এই ধরনের কাজের পিছনে রয়েছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। প্রচারের আলোয় আসার জন্য, টাকার জন্য তাঁরা এমন করেন।[২৫] তাই তিনি যখন দেখেছেন তাঁর ছাত্ররা এইসব আধুনিক শিল্পচর্চার দিকে ঝুঁকেছেন, তখন বাধা দিয়েছেন। চেয়েছেন তাঁর ছাত্ররা নিজের সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে আগে ছবি আঁকার রীতি কৌশল, বস্তুর সাধারণধর্ম শিখুক। সাধারণধর্ম না জেনে রূপের বিকৃতি ঘটাতে গেলে তা পাগলের প্রলাপের মতই মনে হবে। পরে যখন দেখেছেন তাঁর ছাত্ররা পূর্ণজ্ঞানের অধিকার নিয়ে আধুনিক শিল্পচর্চার জগতে প্রবেশ করেছে, যখন ছাত্রদের কাজের মধ্যে স্বকীয়তা দেখতে পেয়েছেন তখন মনের ভিতরের বাধার প্রাচীর ভেঙে গেছে। তিনি নিজে অ্যানাটমির চর্চা করেছেন এবং ছাত্রদেরকেও এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন।[২৬] তবে একাডেমিক রীতি অনুসারী পাশ্চাত্য শিল্পীদের অ্যানাটমি জ্ঞান ও নন্দলালের অ্যানাটমি জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা। নান্দলাল প্রাণছন্দটিকে বুঝে নিয়ে তারপর দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মুদ্রার সংযোজন করেন। অর্থাৎ আগে ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে পরে বিজ্ঞানের দিকে যান, আর পাশ্চাত্য

শিল্পীরা আগে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে নিয়ে তাতে ভাবের সংযোগ করেন।[২৭] তাঁর মতে দেহহীন আত্মাকে যেমন আঁকা যায় না, আদর্শের শারীর-সংস্থান না থাকলে তেমনি মনের ভাবকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না।[২৮] তবে খেয়াল রাখতে হবে অ্যানাটমি যেন ভাবের ঊর্দ্ধে স্থান না পায়। যামিনী রায়ও লোকশিল্পধর্মী ছবি আঁকার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতি অনুসারী অ্যানাটমিকে মানেন না। 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছবির অ্যানাটমি জ্ঞান বিশ্লেষণে এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়। অ্যানাটমি সম্পর্কে তিনি বলেন –

> এ শাস্ত্র শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেবে, এর বেশি আর কি? শরীরের পক্ষে হাড়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেহটাকে নেতিয়ে পড়তে না দেওয়া, খাড়া রাখা, সতেজ আর মজবুত রাখা।[২৯]

যামিনী রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এসমস্ত গুণ দেখতে পান। তাঁর আঁকা ছবিগুলিতেও এই অ্যানাটমিবোধ দেখা যায়। আসলে ভারতবর্ষের ভাববাদী শিল্পরচনার দাবী অনুযায়ী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানধর্মী অ্যানাটমিকে মানা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। আধুনিক মতাদর্শে বিশ্বাসী শিল্পীরা ভাবধর্মী শিল্পচর্চা শুরু করার পর থেকে অ্যানাটমির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসেন। নন্দলাল মনে করেন শিল্পীর চিন্তা-ভাবনার ধরন অর্থাৎ শিল্পীর চারিত্রিক গুণ যেমন ছবিকে বিশিষ্ট করে তোলে তেমন পোর্ট্রেট আঁকার ক্ষেত্রেও এই গুণটিকে প্রয়োগ করতে হয়। তাঁর মতে – 'পোট্রেটে ব্যক্তি, ব্যক্তির চরিত্র ও শিল্পীর চরিত্র থাকবে'।[৩০] যামিনী একাডেমিক রীতিতে তেলরঙে প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন করার সময় রঙের বিন্যাস, রেখার সংহতি এবং মডেলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি ছবির পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছেন। তুলির ছোঁয়ায় মুখাবয়বের মধ্যে বিশেষ 'টাচ' ছবিটিকে অলংকৃত করেছে।[৩১]

যামিনী রায়ের অর্জিত পশ্চিমী শিল্পশিক্ষা বাংলার লোকশিল্পের অন্দর থেকে শুদ্ধ রূপের সন্ধান করে আনে। তিনি ইউরোপীয় আঙ্গিকের পূর্ণজ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে লোকশিল্পের পৌরাণিক জগতের সামনে এসে দাঁড়ান।[৩২] ইউরোপীয় এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মতো তিনিও প্রাগৈতিহাসিক শিল্পে অভিব্যক্তির ভাষা খোঁজেন। লোকশিল্পের সংহত পৌরাণিক জগতে আস্থা রেখে সীমিত সংখ্যক রঙে, অভিব্যক্তিময় রেখায়, মোটিফ ব্যবহারে তাঁর আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ-সরল রূপের অন্তরালে তাঁর সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান, হিসাব-নিকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুভব করা যায় তাঁর ছবি কোন মতেই বোধহীন পটুয়া চিত্রের অনুকৃতি মাত্র নয়, তুলির প্রতিটি আঁচড়ে রয়েছে আধুনিক পরিশীলিত

মনন। এই কারণে তাঁকে আধুনিক যুগের এক ভিন্ন ভাবধারার, ভিন্ন শিল্পআঙ্গিকের পথ প্রদর্শক রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। যামিনী রায়ের জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশের মাটি স্পর্শ করেছিল এবং তাঁকে আধুনিক শিল্পী বলে গণ্য করা যায় কারণ একটা সময় বিদেশের মতো ভারতবর্ষেও র‍্যাফেলের আদর্শের বদলে Signification form আর Abstract quality আর Contour-এর ব্যবহারে ছবিকে দেখার প্রচলন শুরু হয়। যামিনী রায়ের ছবি নন্দনশাস্ত্রের এই নতুন আদর্শের সমধর্মী। তাই তিনি আজ আমাদের অতি মার্জিত, অতি আধুনিক শহরবাসীর অতি প্রিয় চিত্রকর।[৩৩]

নন্দলাল বসুও বিংশ শতাব্দীর একজন আধুনিক শিল্পী হিসাবে পরিচিত। তাঁর আধুনিকত্বকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হয়। আধুনিকতা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ভাবতেন এমন একদল শিল্পীর কথা যাঁরা জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার গতানুগতিকতার পথে না হেঁটে নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে আপন পথ প্রস্তুত করতে পারবেন। তিনি জানতেন কালের গতিকে পিছনে ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই শিল্পীকে বর্তমানের দাবি মেনে নিজের পরম্পরার বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নন্দলালের আধুনিক চিন্তাভাবনা টের পাওয়া যায়। পশ্চিমি শিল্পের কোন একটি ধারার বা কোন একটি আঙ্গিকের চর্চা করে আধুনিক হওয়া যে যায় না, তা তিনি বুঝতে পারেন। তাঁর আত্মসচেতন আধুনিক শিল্পীমন অনুভব করে আধুনিক যুগের আহ্বানে আত্মমর্যাদা নিয়ে সারা দেওয়ার জন্য নিজেদেরই ঐতিহ্য থেকে পাওয়া উপাদান থেকে আধুনিক শিল্পভাষা গড়ে নিতে হবে।[৩৪] বিদেশি শিল্প-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও ভারতীয় ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সেই সমস্ত সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চাকে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ দর্শনে, অনুশীলনে জীবনের পর্ব পর্বান্তরে নিজ প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন তাতে তাঁর আধুনিক মননেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যামিনীও পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চা দিয়ে শিল্পী জীবনের শুরু করলেও স্থিতু হয়েছেন স্বদেশের মাটির শৈল্পিক বিশেষত্বে। বিদেশি শিল্পপ্রকরণের চর্চা করে তা থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত স্বদেশের মাটিতে স্থিতু হয়ে নিজস্ব শৈলী গঠনের জন্য যে চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন হয় এই দুই শিল্পীর তা ছিল। সুতরাং একথা স্বীকার করতে হয় নন্দলাল বসু এবং

যামিনী রায় দুজনই ভারতের আধুনিক শিল্পী। আপাতদৃষ্টিতে দুজনার আধুনিকতার প্রেক্ষিত ভিন্ন বলে মনে হলেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত এক বিন্দুতে এসে মিলে যান।

৫.৩ সাহিত্যের সংস্পর্শে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

নন্দলাল বসু তাঁর শিল্প চেতনা, বিভিন্ন দেশ ও ভারতবর্ষের শিল্প সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, ছবি আঁকার উপাদান উপকরণ সম্পর্কে হাতে কলমে শেখা ও অন্যান্য প্রচীন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বিদ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন *শিল্পকথা, শিল্পচর্চা* গ্রন্থে। *ফুলকারী* এবং *রূপাবলী*-র তিনটি খণ্ডে ছবি আঁকা ও সেলাই করার বিভিন্ন নমুনাচিত্র তিনি এঁকেছেন। এছাড়া আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও নানা পরিচিত জনকে লেখা অজস্র চিঠিতে ধরে রেখেছেন বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনা, স্নেহ, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধকে। নন্দলালের চিঠিপত্রগুলি ভ্রমণ ডাইরির মতো। তাঁর চিঠির অন্যতম বৈশিষ্ট্য লেখার সঙ্গে দৃষ্টিনন্দন ও মূল্যবান সব স্কেচের সহাবস্থান। এই জন্য তারঁ চিঠি সাহিত্যিক ও শৈল্পিক দুই দিক থেকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে যামিনী রায়ের শিল্পচেতনার সন্ধানও পাওয়া যায় তাঁর লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে। চিঠিপত্র ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর ভাবনার সংহত রূপ পাওয়া যায়। নন্দলাল এবং যামিনী দুজনেই প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন। নন্দলাল গ্রন্থচিত্রণেও বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণকে সাহিত্যের পাশাপাশি আরেকটি চিত্রভাষা নির্মাণ বলে বলা যেতে পারে। তাঁর গ্রন্থচিত্রণে সাহিত্যিক উপস্থাপনাটির ভাবোপলব্ধি প্রাধান্য পেয়েছে। এই শিক্ষা অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের থেকে পাওয়া। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদেরকে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নানা কাহিনি শুনিয়ে সেই কাহিনির ভাব অনুযায়ী ছবি আঁকার শিক্ষা দেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে *চয়নিকা* অলংকরণের জন্য প্রস্তাব দিলে তাই স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের বই পড়েননি, আর পড়লেও মানে কিছু বোঝেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চয়নিকার নির্বাচিত কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালে তাঁর মধ্যে থেকে সেই দুর্বোধ্যতার বেড়া জাল ছিঁড়ে যায়।[৩৫] এরপর *চয়নিকা*সহ একাধিক গ্রন্থ অলংকরণ করেছেন তিনি। প্রতিটি অলংকরণই হয়ে উঠেছে কবিতা বা গ্রন্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অর্থবোধক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ও নন্দলাল বসু চিত্রিত *সহজপাঠ* ছবি ও শব্দের যুগলবন্দীর এক অনন্য নিদর্শন। বর্ণমালার ছান্দিক রূপ যেমন শিশু মনকে আলোড়িত করে তেমনি শব্দের

সমান্তরালে সাদাকালো ছবিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার মনের মধ্যে স্থায়ী আসন লাভ করে। অক্ষরগুলির লিখন ভঙ্গির সঙ্গে ছবির ছন্দ মিলে যায়। 'ই' 'ঈ' অক্ষর দুটির সঙ্গে পাখির অবয়ব যেন মিলে যায়। আবার 'উ' 'ঊ' অক্ষর দুটির পরিচয় বহনকরে দুটি কুকুর। ছবিটিতে দেখা যায় একটি কুকুর মাথা নীচু করে এবং অপর কুকুটি মাথা উঁচু করে ডাকছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যখন একটি কুকুর মাথা নীচু করে, লেজ নামিয়ে ডাকে আর যখন সে মাথা উঁচু করে শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করে ডাকে, তখন দুটি ডাকের মধ্যে আওয়াজের তীক্ষ্নতা ও সময়ের পার্থক্য ঘটে যায়। নন্দলালের আঁকা ছবিতে কুকর দুটির শারীরিক ভঙ্গিমায় সেই স্বরভেদই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আবার কবি যখন লেখেন –

বলে মূর্ধন্য ণ

চুপ করো কথা শোনো।[৩৬]

এই লেখাটির সঙ্গে নন্দলাল আঁকেন জঙ্গলের মধ্যে সচকিত এক হরিণের ছবি। লেখাটির মধ্যে কোথাও 'ণ' অক্ষর নির্দেশক হরিণ শব্দটি নেই, কিন্তু শিল্পী এখানে হরিণের ছবি এঁকে ছবির মাধ্যমে 'ণ' নির্দেশক শব্দটির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আঁকা হরিণটির অঙ্গভঙ্গি এবং খাড়া কানদুটিতে দূরের কোন শব্দ শোনার মনোযোগ লক্ষ করা যাচ্ছে। সাহিত্যের বর্ণনাকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র এক প্রতিমাকল্পে স্তব্ধতার নিহিত সৌন্দর্যকে বোঝানো হয়েছে। এখানেই সাহিত্যের সচিত্রকরণ বর্ণনা নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র এক নান্দনিক ভিত্তি পেয়ে যায়।[৩৭] আবার রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন –

রেগে বলে দন্ত্য ন

যাব না তো কক্ষনো।[৩৮]

তখন তাঁর লেখার মধ্যে 'ন' অক্ষরটি মনুষ্য স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এর সমান্তরালে নন্দলাল আঁকেন একটি রাখাল ছেলে দড়িতে বেঁধে একটি ছাগলকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, অনিচ্ছুক ছাগলটি কিছুতেই যেতে চাইছে না। পশুটির স্বভাব বৈশিষ্ট্য ছবির মধ্যে ফুটে ওঠে। শব্দ ও ছবির এই যুগলমিলনের আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে –

শাল মুড়ি দিতে হ ক্ষ

কোণে বসে কাশে খ ক্ষ।[৩৯]

লেখাটির সঙ্গে আঁকা ছবিটিকে নিছক সচিত্রণ বলা যায় না। ছবিতে দেখা যায়, টাক মাথা এক বৃদ্ধ মানুষ কিতাব-দানে রাখা বই পড়ছে। বৃদ্ধ মানুষটির ন্যুব্জদেহটিকে দেখে বোঝা যায় হাঁপানিতে ভোগা লোকটি কাশছে। *সহজপাঠে-র* ছবি কেবলমাত্র ছড়ার বর্ণনা দেয় না, এইসব ছবিতে পরিস্থিতি ও ঘটনা জীবন্ত হয়ে ওঠে। বৌ রান্না করছে, খুকি কাঁদছে, কিংবা মাঝি গান গাইছে এই সব ব্যাপার সাদা কালোর বলিষ্ঠ সংকেতে দেখানো হয়।[৪০] সহজপাঠের জন্য নন্দলালের আঁকা ছবিগুলিকে রানী চন্দ 'ইলাস্ট্রেশন'-এর থেকে অধিক মর্যাদা দিতে চেয়েছেন।[৪১] নন্দলালের ছবি কাব্যের সমান্তরালে এক চিত্রিত জগত উন্মোচিত করে। নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণে ও প্রচ্ছদ অলংকরণে এই তালটিই বরাবর রক্ষিত হয়ে এসেছে।

যামিনী রায়ের গ্রন্থচিত্রণের তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন তিনি। তাঁর প্রচ্ছদ অলংকরণের সঙ্গে গ্রন্থমধ্যস্থ ভাবের বা সাহিত্যের কোন সংযোগ নেই বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁর প্রচ্ছদ অলংকরণকে নিছক নক্সা মনে করার কোন কারণ নেই। *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত* গ্রন্থটির প্রচ্ছদ রচনার জন্য বিষ্ণু দেকে লেখা তাঁর একটি চিঠি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য –

> স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত বই খানি প্রবন্ধ কিছু কবিতাও কিছু – না পুরা কবিতায় লেখা জনালে ভালো হয়। উপরের রূপটীর জন্য ভাবছি, শুধু হাল্কা ইণ্ডিয়ান রেড – কিম্বা দুটী রংএ করব – কিনা ভাবছি বেশী রং ব্যবহার করলে ব্লক করতেও খরচ বড্ড বেশী।[৪২]

এই চিঠিটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রচ্ছদ অলংকরণের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেছেন। কাব্য বা গদ্য ভেদে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ অলংকরণের কথা ভেবেছেন। শুধু তাই নয় ছাপার খরচের কথা ভেবেছেন প্রচ্ছদের রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রে। সাহিত্যপাঠের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে নেই একথা ভাববার কারণ নেই। আধুনিক সাহিত্যের পাঠের প্রমাণ তাঁর বহু চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। গ্রন্থ মধ্যস্থ প্রবন্ধ বা কবিতা পাঠ করে যে তিনি প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে তিনি যে শিরোনাম অনুসারে প্রচ্ছদ অলংকরণ করে থাকেন একথা বলা যেতেই পারে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো দক্ষিণারঞ্জন বসুর জন্য প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার সময় সংশয় প্রকাশ করেন পূর্বের মতো আঁকতে

পারবেন কিনা। তারপর গ্রন্থটির শিরোনাম জেনে নিয়ে এক সপ্তাহ সময় নেন সেটি আঁকার জন্য। গ্রন্থের শিরোনাম নির্বাচন করা হয় গ্রন্থটির মূলভাব অনুযায়ী, তাই তাঁর প্রচ্ছদ চিত্রণকে অর্থহীন রেখা বলে মনে করা ঠিক নয়। তাঁর আঁকা লোককলা আশ্রিত নক্সাধর্মী সাংকেতিক সহজ সরল প্রতীক ব্যবহার প্রচ্ছদগুলিকে অন্য মাত্রা দান করে।

নন্দলাল ও যামিনী নাট্যশিল্পে তাঁদের নিজ নিজ সাক্ষর রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেতনা ও মঞ্চ পরিকল্পনা দ্বারা চালিত হয়ে নন্দলাল অভিনব মঞ্চসজ্জার প্রচলন করেন। নূন্যতম উপকরণে রঙের সাংকেতিক বিন্যাসে সেজে ওঠে তাঁর পরিকল্পিত মঞ্চ। বাস্তবানুগ সিন অঙ্কন রবীন্দ্রনাট্যের চিন্তাধারায় সঙ্গে বেমানান হয়ে পড়লে নন্দলাল এই অভিনব পন্থাটি আবিষ্কার করেন। নন্দলালের পরিকল্পনায় সজ্জিত নাট্যমঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করেন তখন সেই নাট্যমঞ্চের সাজসজ্জা আলাদা করে নিজেকে জাহির করে না। ঠিক যেন ভারতীয় ছবির পশ্চাদপটের মতো।[৪৩] আলোকসজ্জাকেও যথাসম্ভব সরল করে তোলেন। ইউরোপীয় সভ্যতার চাপে হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় আদর্শটিকে পুনরুদ্ধার করে তার সঙ্গে নিজস্বতা মিশিয়ে নন্দলাল মঞ্চসজ্জার ইতিহাসে একটি যুগ প্রবর্তন করেন। নট-নটীদের অঙ্গসজ্জাতেও নন্দলাল চড়া মেকাপে তাদের স্বাভাবিক গড়নকে ঢেকে দেওয়ার বদলে সামান্য উপকরণে সাজান। শান্তিনিকেতনে অভিনীত নন্দলাল পরিকল্পিত রবীন্দ্রনাট্যের দৃশ্যপট এবং অঙ্গসজ্জা সুরুচির আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছে।[৪৪]

যামিনী রায় বহু বছর কলকাতার আধুনিক নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়মিত থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তৎকালীন সময়ে কলকাতায় ইউরোপীয় ঘরানার মঞ্চসাজ্জার প্রচলন ছিল। তাই তিনি নাটকের প্রয়োজনে রিয়েলিস্টিক ধরনের ‘সিন’ এঁকেছেন। তবে তাঁর মন পড়েছিল গ্রামীণ যাত্রাপালার দিকে। সেখানে পুরুষ অভিনেতারা চেহারা ও পেশাকের পরিপাট্য ছাড়াই সদর্পে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছে। আর দর্শকও তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছে।[৪৫] অর্থাৎ তিনিও মন থেকে রিয়েলিস্টিক ধরনের মঞ্চসজ্জা ও অঙ্গসজ্জাকে মেনে নিতে পারেননি। পাশ্চাত্য রীতির চিত্রচর্চার পথ ত্যাগ করে লোকশিল্পানুসারী চিত্রচর্চা শুরু করলে নাট্যজগতের সংস্পর্শ থেকে ক্রমে দূরে সরে এসেছেন।

৫.৪ পরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের প্রতি নন্দলালের ছিল সজাগ দৃষ্টি। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তিনি পরিচ্ছন্নতা বোধের শিক্ষা পান ওকাকুরার কাছ থেকে। তিনি সেই শিক্ষা তাঁর ছাত্রদেরকেও দিয়েছেন। আর নিজ আবাস, আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার চেতনা ছিল তাঁর সহজাত। তাঁর কাছে পরিচ্ছন্নতাবোধ অর্থ বা শিক্ষা থেকে আসে না, রুচিবোধ থেকে আসে। এই জন্যই গরীব সাঁওতালরা তাদের ছেঁড়া কাঁথা যত্নে গুছিয়ে রাখেন আর কলেজে পড়া অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম ছাত্রাবাসের ঘর দামি জিনিসপত্রে অপরিচ্ছন করে রাখে।[৪৬] কলাভবনের ছাত্রাবাসে ছাত্রদের শোবার ঘরে খাটের উপর বিছানা, মশারি, আলনায় কাপড়জামা, টেবিলে বই, খাতা, তুলি, কাগজ প্রভৃতি অগোছালোভাবে পড়ে থেকলে বিরক্ত হতেন, ছাত্রদের শিক্ষা দিতে অনেক সময় তিনি নিজে গুছিয়ে দিতেন। আর্টিস্ট হলেই অগোছালো হতে হবে, উশৃঙ্খল হতে হবে এমন ধারণা তিনি নিজ আদর্শ দিয়ে ভেঙে দেন।[৪৭] শিশুদের তিনি ভালোবাসতেন, তাদের ঘরগুলি প্রায়ই দেখতে যেতেন, বিশেষ করে শৌচাগারের দিকে নজর দিতেন।[৪৮] শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্য যাতে সৌন্দর্যবোধ এবং পরিচ্ছন্নতার বোধ জাগিয়ে তোলা যায় সেজন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে শিশুবিভাগের ছাত্রদের জন্য আলপনা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রতি আমাবস্যা ও পূর্ণিমায় আশ্রম সংস্কারের জন্য ছুটিতে, বিশেষ করে গান্ধি পুণ্যাহে এবং পৌষের আগে আশ্রম পরিষ্কার করার কাজে তিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে গ্রামের কাজে যাবার সময় বারবার তিনি তাঁদেরকে বলেছেন –

> গ্রামের সুন্দর করবে নিজের আদর্শ দেখিয়ে। কুঁড়ে ঘর নিকিয়ে-চুকিয়ে আলপনা দিয়ে রাখলে বা পিছনে একটু ফলফুলের বাগান করে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে গ্রামের লোককে দেখাবে কী করে নিখরচায় গ্রামের শোভা বাড়ানো যায়। শুধু স্বাধীনতা আনলেই হবে না, লক্ষ্মীছাড়া দেশে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনার ভার তোমাদের।[৪৯]

ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে শিল্পের ছোঁয়ায় কীভাবে সুন্দর করে তোলা যায় নন্দলাল সেই ব্যাপারে নমুনা সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর কাছে পরিত্যক্ত, অনাদৃত বলে কিছু নেই। নারকেলের মালা, বেলের খোল, লাউয়ের খোল, বাঁশ ইত্যাদি কেটে পুড়িয়ে খোদাই করে তাতে নানা রকম অলঙ্করণের

কাজ করে এমন সব মূল্যবান সামগ্রী তৈরি করেছেন যা ব্যবহার করা যায় আবার ঘর সাজাবার কাজেও লাগে। পুরনো তালের আঁটি সংগ্রহ করে নক্সা অনুযায়ী কেটে ঘষে মেজে সুন্দর কাজের জিনিসে পরিণত করেছেন।[৫০] এসব ফেলে দেওয়া সামগ্রীকে তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন তাঁর 'লাখ টাকার ঝুলিতে'[৫১]। খড়ের ছাউনি দেওয়া তাঁর মাটির বাড়িটি আসবাবপত্রের অভাব সত্ত্বেও শিল্পীর সুরুচি সৌন্দর্যবোধের স্পর্শে শ্রীমণ্ডিত ছিল।[৫২] ছবি আঁকার জন্য কলাভবনে ও নিজের কুটিরে নন্দলালের বসবার যে জায়গা ও আয়োজন ছিল, তা খুবই সাদাসিদে অথচ নিখুঁত ও পরিপাটি বা সাজানো গোছানো।[৫৩]

যামিনীর বাড়িতে যেসব শিল্পীরা গেছেন বা যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা যামিনীর মধ্যে পরিচ্ছন্নতার বোধ লক্ষ করেছেন। তাঁদের কথায় যামিনী রায়ের বাড়ি ও ছবি আঁকার ঘরগুলির পরিচ্ছন্ন ও দেশি সরঞ্জামে সাজানো। তাঁর বাড়িতে প্রথমেই চোখে পড়ে আসবাবের অভিনবত্ব। দেওয়াল ঘেঁষে রাখা থাকে লাল পাড়ওয়ালা মোটা কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া ছোট ছোট চৌকো কাঠের টুল। সেগুলি আরামদায়ক না হলেও ছবি দেখার পক্ষে উপযোগী, উঠতে বসতেও কষ্ট হয় না।[৫৪] লাল মসৃণ ঝাঁট দেওয়া মেঝে, দেওয়াল দেখলে মনে হয় যেন সদ্য চুনকাম করা, কোথাও ঝুল নেই, ময়লা নেই মলিনতা নেই। যে ঘরে ছবি আঁকেন সেখানে ছবি আঁকার সব সরঞ্জাম সাজানো। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র সাদামাটা কিন্তু পরিচ্ছন্ন।[৫৫] বাগবাজারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটির সজ্জাতেও পরিচ্ছন্নতা, শুচিতা ও সৌন্দর্যচেতনার ছোঁয়া পাওয়া যায়। মাটির পাত্র, চায়ের ভাঁড় সেজে ওঠে শিল্পীর যত্নে।

৫.৫ রাজনৈতিকে চেতনায় নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে যে নবজাগরণ 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে খ্যাতিলাভ করেছিল তার সঙ্গে নন্দলালের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন যোগ নানাভাবে ছিল।[৫৬] সামান্য বস্তুকে অসামান্য করার এই ক্ষমতা নন্দলালের মধ্যে গান্ধিজি দেখতে পান। তাই কংগ্রেস প্রদর্শনীগুলো সাজানোর ভার তাঁকে দেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের (১৯৩৬) ঘর শরকাঠি, সামান্য বাঁশ ও কাঠ দিয়ে সাজান। সামান্য উপকরণ দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির নমুনা দেখে দিয়ে নন্দলালের প্রতি গান্ধিজির আস্থা আরো বেড়ে যায়। ফৈজপুর-কংগ্রেস (১৯৩৭) মণ্ডপসজ্জার দায়িত্ব নন্দলালকে দিতে চান। নন্দলাল প্রথমে রাজি হননি, কারণ তিনি মনে

করতেন তিনি একজন চিত্রশিল্পী, স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষ কোন জ্ঞান নেই তাঁর। সেকথা শুনে গান্ধিজি নন্দলালকে একটি পত্রে লেখেন তিনি 'বড়ো ওস্তাদ Painter' না, 'হৃদয়বান প্রেমিক fiddler' চান।[৫৭] এই পত্র পাওয়ার পর নন্দলাল আর অসম্মত হতে পারেননি। গান্ধিজির পরিকল্পনা মাফিক নন্দলাল গ্রামের লোকজন, গ্রামের সামগ্রী দিয়ে প্রদর্শনী সাজান। এরপর তিনি হরিপুরা কংগ্রেসে দেশীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে মণ্ডপ সজ্জার পরম্পরা রক্ষা করেন। দেশি রঙ, কাগজ, তুলি ও ছবি আঁকার অন্যান্য দেশি সরঞ্জামের প্রতি তাঁর অনুরাগের পিছনে রয়েছে গান্ধিজির স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ। নন্দলালের শিল্প প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের গুণে গান্ধিজি যেমন মুগ্ধ হন তেমনি গান্ধিজির চারিত্রিক গুণাবলি এবং আদর্শ দ্বারা নন্দলালও প্রভাবিত হন। গান্ধিজির সান্নিধ্য, ব্যক্তিত্ব নন্দলালের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বোঝাতে গিয়ে তিনি লেখেন –

> মহাত্মাজির জীবনযাত্রা দেখে শিল্পীরা হৃদয়ে অনুপ্রেরণা ও চরিত্রগঠন করতে পারবেন। মহাত্মাজি একজন শিল্পী, তাঁর শিল্পসৃষ্টি নিজেকে সৃষ্টি করাতে, নিজেকে মানুষ হতে দেবতা গড়াতে এবং আপামর সাধারণকে ঐ পথে চালিত করাতে। ...ভারতীয় শিল্পীরা যদি [চান] শিল্পী নিজের সংস্কার চাইলে ঐরকম চরিত্রই অনুসরণীয়।[৫৮]

নন্দলাল গান্ধিজির আদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জাতীয়তাবোধের দ্বারা আজীবন চালিত হয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত ওরিয়েন্টাল সোসাইটি বা সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের কাজ তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না।[৫৯] সেখানে কাজ করায় দুর্ভোগের কথা কর্তৃপক্ষের ভয়ে সচিত্র পোস্টকার্ডে প্রতীক এঁকে অসিত কুমার হালদারকে জানান।[৬০] স্বদেশি পরিবেশে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি কলাভবনে যোগদান করেন। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) সময় নন্দলাল কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে কংগ্রেসের দফতরে প্রাচীরপত্র আঁকেন বলে শোনা যায়।[৬১] তাঁর আঁকা ওই সময়ের স্বদেশি ব্যঙ্গচিত্রগুলি সমকালের রাষ্ট্রপতির বিশেষ করে ভারতে ইংরেজ শাসনের অমানবিক দিকগুলি তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির ডাণ্ডি অভিযান সংঘটিত হলে, কলেজ স্কোয়ারের কংগ্রেস অফিসের বেআইনি নুন তৈরি করবার স্বেচ্ছাসেবকদের ঘাঁটিতে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এই সময়ে তাঁর আঁকা একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র গান্ধিজির 'ডান্ডিমার্চ'।[৬২] বাংলার বিপ্লবীদের কারো কারো সঙ্গে নন্দলালের যোগাযোগ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন গান্ধিজির আদর্শে অহিংসার পথে দেশ স্বাধীন হতে পারে। মহিসাবাথানে রাজবিদ্রোহ

প্রচারের কাজে সাহায্যের জন্য ‘মড়ার মাথায় গাথা বেদীর উপর স্ত্রী-পুরুষ-শিশু মিলে জাতীয় পতাকা তুলেছে’ এমন কয়েকটি চিত্র এঁকে দেন।[৬৩] নন্দলাল তাঁর ছাত্রছাত্রীদের স্বাজাত্যবোধ ও দেশসেবার ব্রতে উদ্দীপিত করেছেন।[৬৪] তাঁর ছাত্ররা কেউ রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুসুধা ঘোষ প্রমুখ ছাত্রছাত্রীরা কারাবরণ করলে তিনি তাঁদেরকে মানসিক শক্তি যুগিয়েছেন। জেলে বসে যাতে চিত্রচর্চা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছেন। চরকা কেটেছেন। জাতীয়তাবোধ, স্বাজাত্যবোধের প্রভাব তাঁর ছবি ও কর্মজীবন জুড়ে রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন ছবি তিনি আঁকেননি বলে তাঁর বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। একথা সত্য পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া শিল্পীর মনে সাড়া জাগায় এবং তাঁর শিল্পকর্মে তার প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু বড়ো শিল্পসৃষ্টি সাময়িক প্রভাবকে জয় করে চিরন্তন সত্যের জগতে পৌঁছে যায়। নন্দলালের সৃষ্টি এই চিরন্তন সত্যের জগতকে ছুঁয়ে থাকে। সৌন্দর্যবোধহীন দেশবাসীর চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা দেশসেবারই সমকক্ষ।[৬৫]

যামিনী রায়ের চিত্র সম্পর্কেও সেই একই অভিযোগ আনা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, মন্বন্তর এতগুলো বিষয়ের সাক্ষী থাকলেও সেই যুগের উত্তাপ, যন্ত্রণা, অস্থির ছিন্ন-ভিন্ন সমাজের প্রতিফলন তাঁর ছবিতে আসেনি। যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে সময়কে অস্বীকার করা অনেকেই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। শিল্প সমালোচক শোভন সোম বিষয়ের দিক থেকে তাঁর ছবিতে কোন নতুনত্ব দেখতে পাননি। সমাজ বা সমকালের চিহ্ন তাতে অনুপস্থিত। অবনীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের মতো তাঁর ছবিতেও কৃষ্ণরতি প্রাধান্য পেয়েছে। কৃষ্ণের বিকল্প হিসাবে তিনি খ্রিস্ট কাহিনিকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু খ্রিস্ট চরিত্রটিও সমকালের তাৎপর্যে গুণান্বিত হয়নি। অবনীন্দ্রগোষ্ঠীর শিষ্যদের মতো তিনিও পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেন এবং গতানুগতিক খ্রিস্ট, কৃষ্ণকাহিনিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। যে অর্থে অবনীন্দ্রনাথ তথা বেঙ্গল স্কুলকে পুনরুজ্জীবক বলা হয়ে থাকে, সেই অর্থে যামিনী রায় ও একই গোত্রের।[৬৬] সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেখলে বিষয়ভাবনা ও ছবি আঁকায় স্বদেশী উপকরণ ব্যবহারে তিনি সমকালীন দাবিকে মেনে চলেছেন। বিলাতি রঙ ক্যানভাস বর্জন করে দেশি রঙ, ক্যানভাসে দেশের অতি প্রাচীন শিল্প আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ছবি দেওয়া কিংবা চরকাকাটা মহিলার ছবি তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবধারার

প্রতি বিশ্বাসকেই পরিস্ফুট করে। সময় যত এগিয়েছে, সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যত জটিল হয়েছে তাঁর আধুনিক মননে সংগতিহীন স্বদেশের রুচিবিভ্রাট তীব্র সংকটের সৃষ্টি করেছে। সেই সংকট থেকে মুক্তি পেতেই তিনি লোকশিল্পের সংহত জগতকে বেছে নিয়েছেন।[৬৭] রূপের সন্ধানে ব্যাকুল যামিনী অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ব্যাকুলতার কথা প্রকাশ করলে অবনীন্দ্রনাথ উপদেশ দেন – 'নন্দর কাছে শেখ।'[৬৮] শুদ্ধরূপের সন্ধানী যামিনী তাঁর সেই উপদেশকে মান্যতা দিতে পারেননি। তিনি কোন খণ্ডিত সময়কে না ধরে সর্বকালীন পটভূমিতে ছবি এঁকেছেন। যা চিরন্তন সত্য, যা সুন্দর, যাকে আশ্রয় করে শুদ্ধ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৬৯] লোকশিল্পের সহজ সরল নিরাভরণ আঙ্গিককে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক বিষয়গুলিকে নিয়ে ছবি এঁকেছেন। সেইসময় কলকাতায় মার্কসবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী একদল শিল্পী গোষ্ঠী তাঁর সংস্পর্শে আসেন। মতাদর্শগতভাবে মিল থাকায় এঁদের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে তিনি আবদ্ধ হন। তিনি সরাসরিভাবে কখনো সমসাময়িক রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়কে চিত্রে প্রতিফলিত না করলেও তৎকালীন শিল্প-সংস্কৃতিচর্চায় Peoples Art-এর যে ধারণা উঠে আসছিল, লোকশিল্প অনুসারী চিত্রগুলি যেন সেই ধারণা দ্বারা অনুমোদিত। বাটালি হাতে কর্মকার, লাঙল কাঁধে কৃষক, লাঙল চালানো কৃষকের রেখাচিত্র, মাঝিমল্লা প্রভৃতি চিত্রগুলি Peoples Art-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ছবিগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমের স্বীকৃতি।[৭০] যদিও ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত ছবিগুলি মার্কবাদী ধারণার বিপক্ষে, তবু একথা স্মরণে রাখতে হবে তিনি পুরাণকে নয় পৌরাণিক জগতকে কেন্দ্র করে মিথ গড়ে উঠেছিল তাকে প্রাধান্য দিতে চান। সমাজ বিভাজনের কথা মাথায় রেখে সবার ছবির দাম এমনভাবেই নির্ধারন করেছিলেন যাতে ধনী নির্ধন সকলেই কিনতে পারে। এজন্য তিনি বিরামহীনভাবে অসংখ্য ছবি ও তার কপি করে গেছেন। তাঁর ছবির দাম বাঁধা এবং পুনরুৎপাদন নীতি গ্রহণ ছিল, ঔপনিবেশিক সমাজে শিল্পী ও শিল্পীর সৃষ্টিকে উচ্চাসনে রেখে সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বঞ্চিত করার মনোভাবের বিরুদ্ধের স্বঘোষিত বিদ্রোহ। তিনি চাইছিলেন শিল্পকে মূল্য এবং উপলব্ধি দু-দিক থেকেই সাধারণের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে আসতে।[৭১] লোকশিল্পকে লোকসমাজের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে সার্বজনীন করে তোলার পিছনেও ছিল তাঁর গণচেতনা। ফ্যাসিবাদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা এবং এই পরিস্থিতিতে লেখক, শিল্পীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিশাল জনসভা আয়োজিত হয়। এই সভায় বিশিষ্ট মার্কবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে থেকে কোন এক নেতৃস্থনীয় বুদ্ধিজীবী যামিনী রায় সম্পর্কে বলেন যে, তাঁর চেয়ে সৃষ্টিশীল শিল্পী ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে নেই। এই সময় গঠিত 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংগঠন'-এর অন্যতম সদস্য হন যামিনী।[৭২] যামিনী সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেননি, সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলিও তাঁর ছবির বিষয় হয়ে ওঠেনি, তবু তাঁর ছবির মধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের সন্ধান পেয়ে আধুনিক শিল্পী গোষ্ঠী বিশেষ করে 'পরিচয় গোষ্ঠী'র[৭৩] শিল্পীরা তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে যামিনী রায়ের বাগবাজারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে এঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পার্থ মিত্তর দাবি করেন এই প্রদর্শনীটি একটি রাজনৈতিক ইস্তাহারের থেকে কোন অংশে কম নয়।[৭৪] যামিনী যেহেতু গান্ধিবাদে বিশ্বাসী একটি পরিবারে বড় হয়ে উঠেছিলেন তাই গান্ধিজিকে গান্ধিজির আদর্শকে তিনি সম্মান করতেন। অনেকের মতে যামিনী 'কমিউনিস্টদের কাছে People Artist এবং কংগ্রেসদের কাছে National Artist ছিলেন।'[৭৫]

৫.৬ শ্লীলতার ভাবনায় নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

ছাত্রাবস্থায় নন্দলাল লাজুক প্রকৃতির ছিলেন, যৌনতা বিষয়ে ছবি আঁকায় সংকোচ কাজ করত। তাই কুমারস্বামী যখন তাঁর সংগৃহীত মোগল যৌনতা-প্রদর্শক ছবির অনুলিপি করতে বলেন, তখন তাঁর মন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাঁর অনুরোধ রাখতে অবশ্য সেই কাজ করতে রাজি হন।[৭৬] যৌনতা সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব যে তিনি কাটিয়ে ওঠেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুরীর মন্দিরের ভাস্কর্য রক্ষায় তাঁর ভূমিকা গ্রহণের ঘটনায়। পুরীর মন্দিরের অশ্লীল ভাস্কর্য দেখে বিদেশি পর্যটকরা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে হীন ধারণা নিয়ে যান সেই যুক্তিতে যমুনালাল বাজাজ গান্ধিজির কাছ থকে অনুমতি চান নিজ খরচে সেইগুলি ভেঙে ফেলা কিংবা প্ল্যাস্টার করে ঢেকে দেওয়ার। এই নিয়ে সেই সময়ে দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হলে মূর্তিগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে নন্দলাল দ্বিধাগ্রস্থ গান্ধিজিকে বলেন –

> জীবনে কাম মোক্ষেরই ধাপ মাত্র। ...দোষটা যখন শিল্পে উৎরোয় তখন শিল্পসৃষ্টিতে অমৃতত্ব সে পায়। শিল্পীর জগতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দোষগুণ কিছুই বাদ পড়বে না। মানুষে এবং সমাজে যা ঘটছে সবই হল শিল্পীর বিষয়বস্তু।[৭৭]

সুতরাং নন্দলালের কাছে শিল্পে অশ্লীল বিষয় বলে কিছু নেই। শ্লীল অশ্লীলের বিচার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের কাছে যা অশ্লীল শিল্পীর কাছে তা একটি স্বাভাবিক সত্যের উন্মোচন ছাড়া আর কিছুই না। এজন্য তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিগুলিকে ঢাকতে দেননি। সেগুলোর শৈল্পিক মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে এই কাজ থেকে বিরত করেছেন। তাঁর মতে, নবরসের মধ্যে একটি বিশেষ রস আদিরস। যেহেতু শিল্পীদের কারবার রস নিয়ে তাই শিল্পীরা একে বাদ দিতে পারে না। শিল্পীর কাছে উচ্চ-নীচ, ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। শিল্পী বাদবিচার করে আঁকতে পারেন না, কারণ শিল্প নীতি বা আদর্শের উপর নির্ভর করে হয় না। শিল্পী তথাকথিত হীন বা নিম্ন বিষয়ের ছবি যাই আঁকুক না কেন তার মধ্যে উচ্চ বা দেবভাব প্রকাশ পাবে। শিল্পবস্তুতে রসের প্রকাশ ঘটলে তা শিল্পের পর্যায়ে পড়ে যায়, বিষয়বস্তুর ভালোমন্দের বিচার সেখানে আসেনা। শিল্পীর সৃষ্টি তখন অমরত্ব লাভ করে।[৭৮]

যামিনী রায়ের ছবিতেও মান্দির ভাস্কর্যের প্রভাব পড়েছে, কিন্তু ভাস্কর্যের তথাকথিত অশ্লীল বিষয়গুলিকে এড়িয়ে গেছেন। যৌন অঙ্গ ব্যতিরেখে নারী চরিত্রগুলিকে এঁকেছেন। গোপিনীদের দেহের উপরিভাগ বস্ত্রের আবরণে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না থাকলেও যৌন অঙ্গসূচক অনুপুঙ্খ বর্জনের মাধ্যমে কামোদ্দীপনাকে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। এই পর্যায়ের মানব মূর্তিগুলি লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে মধ্যবর্তী যৌন চেতনায় অবস্থান করে।[৭৯] একবার এক আধুনিক কবি যামিনী রায়কে তাঁর ছবির নারীদের স্তন নেই কেন জিজ্ঞাসা করলে শিল্পী বলেন – 'অত হতাশ হচ্ছ কেন? খুঁজলে পেতেও পারো...'।[৮০] তাঁর ছবিগুলির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যৌন অঙ্গ নির্দেশক অনুপুঙ্খ বর্জনের মাধ্যমেও নারী পুরুষকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এখানেও সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। যৌন অঙ্গহীন নারীর চিত্র কারো কাছে বিসদৃশ ঠেকে আবার কেউ কেউ যৌন অঙ্গনির্দেশক চিহ্ন ব্যতিরেখেও শিল্পরস আস্বাদন করতে পারে। লিঙ্গচেতনার বদলে তাঁর কাছে মনুষ্যগুণই প্রাধান্য পায়। একই ভঙ্গিতে কৃষ্ণ ও তাঁর গোপীনিদের দেখা যায়, চুলের বাঁধন, পোশাকের সামান্য ভিন্নতা ছাড়া খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না। 'বস্ত্র হরণ' চিত্রটিতে তিনি মানব শরীরের সূক্ষ্মবিভাজন পরিত্যাগ করে যৌন আবেদনকে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন।[৮১] ছবিটি 'শ্লীলতা অশ্লীলতার' প্রশ্ন তোলার অবকাশ দেয় না।[৮২]

৫.৭ নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও শিল্পভাবনা

যামিনী রায় ও নন্দলালকে পরস্পরের বিপক্ষে দাঁড় করানো হলেও তাঁদের মধ্যে কখনো কোন ব্যক্তিগত বিরোধের সৃষ্টি হয়নি। যামিনী রায়ের 'নন্দলাল বসু' (১৮ এপ্রিল, ১৯৬৬) শীর্ষক লেখাটিতে বিপরীত পথে চলা দুটি মানুষের কোন একটি বিন্দুতে এসে একাত্ম হয়ে যাওয়ার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। যামিনী বলেছেন নন্দলাল আর তিনি একসঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন পদ্ধতি ও মতাদর্শে শিক্ষাগ্রহণ করলেও 'অন্তরঙ্গ' থেকেছেন। ইউরোপীয় রীতিকে পরিত্যাগ করে নতুন কিছু করার কথা দুজনেই ভেবেছেন। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন আর যামিনী পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারফৎ নতুন পদ্ধতিতে এসে পৌঁছেছেন। শিল্পাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি নন্দলালের কাজকে শ্রদ্ধা করেছেন আর ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করেছেন।[৮৩] কোন ঘনিষ্ট সাহিত্যিক শান্তিনিকেতনে গেলে যামিনী তাঁর মারফৎ নন্দলালের খোঁজ নিয়েছেন।[৮৪] আবার পাশ্চাত্য শিল্পচর্চা ছেড়ে নতুন আঙ্গিকের সন্ধানে যামিনী যখন আর্থিক অনটনে ভুগছেন নন্দলাল তখন প্রকৃত বন্ধুর মতো তাঁকে ছবি আঁকবার অর্ডার জোগার করে দিয়েছেন।[৮৫] শিল্পবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ মুকুল দের ফ্ল্যাটে যামিনী, মুকুল, নন্দলাল এবং রাণী চন্দ একত্রে শিল্পচর্চা করেছেন। শিল্পবিদ্যালয়েরই দোতলায় পুরনো আমলের এই ফ্ল্যাটটির বিরাট ঘরের মেঝেতে চারটি খোপ করা ছিল। তার মধ্যে একটি খোপে বসে যামিনী পটের পর পট এঁকে যেতেন। নন্দলাল কলকাতায় এলে সেই ঘরে একত্রে শিল্পচর্চা করতেন। সেই সময়ে নন্দলাল, যামিনী ও মুকুল তিনজনে নানা সময় নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। কোন প্রয়োজনে যামিনী বাইরে গেলে নন্দলাল মশকরা করে তাঁর আঁকার কাগজে পটের স্টাইলে ছবি এঁকে রাখতেন। যামিনী প্রথমে অবাক হলেও এই কাজ কার তা বুঝতে পেরে হেসে ছবিখানা যত্ন করে পাশে তুলে রাখতেন।[৮৬] পটের স্টাইলে ছবি আঁকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও যামিনীর প্রতিভাকে নন্দলাল বরাবরই সম্মান জানিয়েছেন। গান্ধিজি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতশিল্পের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরার ভার নন্দলালের উপর দিলে তিনি ভারতসংস্কৃতির অন্যতম বাহক যামিনীর আঁকা বড় বড় কয়েকটি পট দিয়ে প্রদর্শনীর বাইরের দেওয়াল ঢেকে দেন।[৮৭] এইসব ছবি আঁকার জন্য সামান্য পারিশ্রমিক পেলেও নন্দলালের কথা

রাখতে যামিনী এই বিষয়ে সম্মত হন। নন্দলালের ছাত্রদের তৎপরতায় প্রদর্শনীর পরে ছবিগুলি অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাওয়ায় তাঁর ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা কম হয়। নন্দলাল ও যামিনী ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও কিছু বিষয়ে তাঁদের মতের মিল হতে দেখা যায়। যামিনীর 'পটুয়াশিল্প' প্রবন্ধ এবং নন্দলালের *শিল্পকথা* গ্রন্থের 'শিল্পদৃষ্টি' প্রবন্ধের নির্বাচিত কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। প্রাগৈতিহাসিক ছবি বা পটুয়া শিল্পে শুদ্ধ সত্যের প্রকাশ ঘটে থাকলেও তার মূল্য কেন কমে যায় সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যামিনী এসব ছবিকে শিশুদের অসচেতন মনে আঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন –

> সত্যি কথা, জ্ঞানের কথা অনেক সময় শিশুও বলে থাকে; তবু যতক্ষণ দেখা যায় এ কথা অজ্ঞানে বলা হয়েছে ততক্ষণ তার মূল্য দিতে আমরা নারাজ। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের কথাকে আসল বলতে আমরা রাজি সে-কথা যখন সচেতন। ছবির বেলাতেও তাই।[৮৮]

যামিনী রায়ের শিল্পচর্চাকে এই উপলব্ধির সম্যক পরচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর শিশুপুত্র পটলের আঁকা দেখে অনুপ্রাণিত হন, সরলতাময় পট শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণের ফলে তাঁর ছবিতে আসে শিশু ও পটুয়াদের মতো সরল রেখাঙ্কন, বর্ণলেপন, অবয়ব কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি। উজ্জ্বল রঙ ও রেখার টানে তাঁর ছবির ছবির মধ্যে মিশে থাকে শৈশবের স্নিগ্ধতা, গ্রাম জীবনের অতীতচারিতা এবং একই সঙ্গে মিশে জেগে থাকে মুক্ত দৃঢ় কোনো ভবিষ্যত।[৮৯] পটের আঙ্গিকে শুরু হয় তাঁর পথচলা। শিশুর হাতে যা সহজে এসেছিল, অসচেতন সরলতায় পটুয়া শিল্পীরা যা প্রকাশ করেছিল আশ্চর্য রকম ঘরোয়া ভাষায় তা তিনি আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করে তবে গ্রহণ করেন। পটুয়াদের মোটিফ ও আঙ্গিকের ব্যবহার করেন সচেতন মন নিয়ে। তৃতীয় পথে বিচরণ করার সিদ্ধান্ত তাঁর সচেতন মনের প্রকাশ। নন্দলাল তাঁর লেখার মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে যামিনী রায়ের শিল্প প্রতিভাকে কুর্নিশ জানান। শিশুদের আঁকা ছবি শিল্পী গ্রহণ করলে কখন দোষের হয় না তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন –

> ছোটো ছেলের আঁকা ছবিও সুন্দর হয়; আশ্চর্য ছন্দ, আশ্চর্য রঙ তাতে থাকে। তবুও ছোটো ছেলের কাজের নকল করে আর্টিস্ট্ হওয়া যায় না। ছোটো ছেলের কাজের গুণ বড়ো আর্টিস্টের কাজে আসে, যখন তিনি 'জ্ঞানে'র চরমে পৌঁছোন। কারণ, বড়ো মানুষ ছোটো ছেলের অনুকরণ করলে হয় ন্যাকামি, অথচ বড়ো মানুষও ছোট ছেলে হয়ে থাকে জানি – তাঁকেই আমরা বলি প্রতিভাবান্ বা পরমহংস।[৯০]

এই বিশ্লেষণে যামিনীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। নন্দলালের মতে – যে কারণেই হোক, ‘নিজের Style বা অন্য শিল্পীর Style অনুকরণ করা দোষের’।[৯১] ‘আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমাবন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না।’[৯২] অন্যদিকে যামিনী রায় অসংখ্য ছবির পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। তিনি এই পুনরাবৃত্তি নিয়েছিলেন জড়ানো পট বিশেষত কালীঘাটের পটুয়াদের কাছ থেকে, যাঁরা একই ছবি বহুবার আঁকতেন। জীবনের শেষ পর্বে যিশুখ্রিস্ট বিষয় চিত্রাবলি অঙ্কনের মাধ্যমে তাঁর স্বকীয় চক্র থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।[৯৩] তাঁর কপি করা ছবিগুলি লক্ষ করলে বোঝা যাবে সেগুলি মূল ছবির হবহু নকল নয়। সচেতনভাবেই সেগুলিতে রঙ ও দুএকটি বিষয়ের পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া প্রথম অঙ্কনে ছবিগুলির ‘তাজা ভাব’ পুনরাবৃত্তির বেলায় হ্রাস পায়।[৯৪] পৃথ্বীশ নিয়োগীর মতে পুনরাবৃত্তি যামিনীর বৈষ্ণব মনের পরিচয় বহন করে। বৈষ্ণব বীজমন্ত্র অসংখ্যবার জপ করলে যেমন তার মূল্য বিন্দুমাত্র কমে না বারংবার পুনরাবৃত্তিতে যামিনীর চিত্রের ফর্ম, ডিজাইন ও প্রতিমার ক্ষতি তো হয়ই না বরং মূল্য বেড়ে গিয়ে সমাজজীবনে এক তরঙ্গের সৃষ্টি করে।[৯৫]

আলংকারিক চিত্রপদ্ধতিতে বর্ণ ব্যবহার প্রসঙ্গে নন্দলাল বলেন – এই ধরনের চিত্রও রচনার ক্ষেত্রে শিল্পী ধান খেতের সবুজ আকাশে, মেঘে, পাহাড়েও দিতে পারে; তাতে কোন দোষ হয় না। কারণ প্রকৃতির কাছে শিল্পী শিখে নেয় রঙের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সঙ্গতি বা গভীর আত্মীয়তা।[৯৬] যামিনী রায়ের চিত্রে আলংকারিক চিত্রের এই গুণ লক্ষ করা যায়। ভারতীয় চিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের মর্মোপলব্ধি করেই তিনি স্বচ্ছন্দে নীল রঙের হাতি, বিচিত্র রঙের পাখি, সবজেটে ধূসর বা সাদাটে সবুজ রঙের মানুষ ইত্যাদি বিসদৃশ রঙের প্রয়োগ করতে পারেন।

ধার্মিক নন্দলাল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত না থাকতে পারায় দ্বিধাগ্রস্থ মনে মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মরণাপন্ন হলে মহেন্দ্রনাথ তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে জপধ্যাপ করতে নিষেধ করে আশ্বস্ত করতে বলেন – অনুভব করতে না পারলেও নন্দলাল মহাশক্তির ভিতরেই রয়েছেন। তাই অযাচিতভাবে যা পেয়েছেন, তা অযাচিতভাবেই দান করে শক্তির সম্প্রসারণ করা উচিত।[৯৭] মালা অথবা তুলি নিয়ে জপধ্যান করা দুটিই এক।[৯৮] এই কথার মর্মপোলব্ধি করে পরবর্তীকালে নন্দলাল বলেন – অদ্বৈত-সাধক ও শিল্প-সাধক দুজনারই সাধনার লক্ষ এক। অদ্বৈতবাদীরা জাগতিক বস্তুকে

মায়া জ্ঞানে ত্যাগ করেন, আর শিল্পীরা মায়াকে আশ্রয় করেই শিল্পসৃষ্টি করলেও মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না।[৯৯] যামিনী রায়ও নিত্য পূজা থেকে বিরত ছিলেন। ছবি আঁকাই ছিল তাঁর কাছে পূজা। তাঁর জীবনের মূল সুর ছিল শান্তি, সমাহিত সংযম।[১০০]

৫.৮ উপসংহার

নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় বিংশ শতাব্দীর এই দুই প্রথিতযশা শিল্পী স্বতন্ত্র পরিচয়ে আপন শৈলী সৃষ্টি করেন। তাঁদেরকে বিশেষ কোন শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচয়ে বেঁধে ফেলা যায় না। নন্দলাল স্বদেশ বলতে সমগ্র ভারতবর্ষকে এবং যামিনী বেলিয়াতোড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই প্রাধান্য দেন। বিদেশিরা যামিনী রায়ের চিত্রে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়ায় তাঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে যায়। তবে একথা স্বীকার করতে হয় লোকশিল্পানুসারী তৃতীয় ধারার জন্ম দিতে গিয়ে যামিনীকে অনেক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অসিতকুমার হালদার, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শোভন সোম প্রমুখ শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের দ্বারাই তিনি সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছেন। তবে শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় পস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। নন্দলালের মতে শিল্প শিক্ষা হল 'প্রাণ দিয়ে প্রাণ জাগানো'[১০১] তাই তিনি নির্দিষ্ট পাঠক্রম কিংবা নিয়ম শৃঙ্খলায় শিক্ষাদানের বদলে অবিরাম চিত্ররচনা করে ছাত্রদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে নন্দলালের সংযোগও সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শান্তিনিকেতনের সাহিত্যিক বন্ধুদের সংস্পর্শে। গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির আশ্রয়ে যামিনীর শিল্পচর্চা নবরূপলাভ করলেও সাধনক্ষেত্র হিসাবে তিনি কলকাতাকেই বেছে নেন। কলকাতার আধুনিক শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁকে আমৃত্যু ঘিরে থেকেছে। অসংখ্য চিঠিপত্রে তাঁদের সঙ্গে যামিনী রায়ের আত্মিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। আত্মপ্রচার বিমুখ যামিনীর লেখার প্রতি তাঁর অনীহা লক্ষ করে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরাই তাঁর মূল্যবান শিল্প চেতনাকে পাঠক সমাজে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেন। এইভাবেই আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দুই শিল্পী তাঁদের মতাদর্শ ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ভারতশিল্পে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

উৎস ও অনুষঙ্গ

১। ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯১)। *কলকাতার চিত্রকলা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পৃ. ৭৩

২। ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত (১৯৮৭)। সেন, পরিতোষ। ‘যামিনী রায়ের চিত্রকলা’। *দেশ*। পৃ. ২৪–২৭

৩। ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত (১৯৮৭)। রায়, প্রণবরঞ্জন। ‘যামিনী রায়ের ছবির ঠিকানা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০

৪। ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত (১৯৮৭)। গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ। ‘যামিনী রায়ের শিল্পের উৎস সন্ধানে’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৪

৫। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। ‘গুরুস্মরণ’। *মাস্টারমশাই নন্দলাল*। কলকাতা: লালমাটি। পৃ. ১৭৯

৬। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। চক্রবর্তী, কাঞ্চন (সম্পাদিত)। *চিত্রকথা*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী। পৃ. ১৭৮

৭। ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত (১৯৮৭)। গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ। ‘যামিনী রায়ের শিল্পের উৎস সন্ধানে’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৪

৮। ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত (১৯৮৭)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। ‘নন্দলাল: কারুসংঘ ও জাতীয় আন্দোলন’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৭

৯। চৌধুরী, সত্যজিৎ (১৪১৮)। *নন্দলাল*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং। পৃ. ৬৬

১০। ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত (১৯৮৭)। সেন, পরিতোষ। ‘যামিনী রায়ের চিত্রকলা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬

১১। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। চৌধুরী, বিজন। ‘উত্তরসূরীর চোখে নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৮

১২। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। আনন্দ, মুলকরাজ। ‘শিল্পীর সমস্যা সংগ্রাম ও সাফল্য’। *রূপতাপস যামিনী রায়*। কলকাতা: প্রতিভাস। পৃ. ১০২

১৩। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। চৌধুরী, বিজন। ‘উত্তরসূরীর চোখে নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৮

১৪। মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। *ভারতের চিত্রকলা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ১২৫

১৫। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। ভট্টাচার্য, বিকাশ। ‘যামিনী রায় ও তাঁর বরণীয় চিত্রকল্প’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫৬

১৬। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ। ‘শিল্পী যামিনী রায়ের ছবি’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩২

১৭। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। সুরাবর্দী, শাহীদ। ‘যামিনী রায়ের শিল্প’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৮

১৮। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। *যামিনী রায়: তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক।* কলকাতা: আশা প্রকাশনী। পৃ. ২১–২২

১৯। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। *সাধক শিল্পী যামিনী রায়*। কলকাতা: আভাষ। পৃ. ১৮

২০। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮১

২১। সামন্ত, কানাই (১৯৬২)। *শ্রী নন্দলাল বসু*। কলকাতা: কথাশিল্প-প্রকাশ। পৃ. ৪৬

২২। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। চৌধুরী, বিজন। 'উত্তরসূরীর চোখে নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৮

২৩। বসু, নন্দলাল(১৪০৫)। *শিল্পকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ২৩

২৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৬

২৫। নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। *শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্প দীপঙ্কর নন্দলাল*। কলকাতা: ভারতবাণী প্রকাশনী। পৃ. ৬৪

২৬। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (২০১৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৮

২৭। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫-৩৫

২৮। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। 'গুরুস্মরণ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬৭

২৯। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮২

৩০। নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৬

৩১। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। রায়চৌধুরি, দেবীপ্রসাদ। 'যামিনীদা প্রসঙ্গে'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭২-৭৩

৩২। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। রায়, প্রণবরঞ্জন। 'যামিনী রায়ের ছবির ঠিকানা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪

৩৩। ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত (১৯৮৭)। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী। 'শিল্পী যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০

৩৪। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০-৩৩

৩৫। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। প্রথম খণ্ড। বীরভূম: রাঢ় গবেষণা পর্ষদ। পৃ. ৩৭৭

৩৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০০)। *সহজ পাঠ*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃ. ১২

৩৭। ঘোষ, মৃণাল (২০১২)। *ছবির রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স। পৃ. ১৪৯

৩৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৪

৩৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮

৪০। কৌশিক, দিনকর (১৯৯৫)। সোম, শোভন (অনুদিত)। *নন্দলাল বসু ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*। নয়া দিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া। পৃ. ৭০

৪১। চন্দ, রানী (১৯৮০-৮১)।*সপ্তপর্ণী*। সহজপাঠ বিশেষ সংখ্যা। বিশ্বভারতী ছাত্রসম্মিলনী। পৃ. ১১

৪২। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫১

৪৩। ঘোষ, শান্তিদেব (১৪১০)। *বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা। পৃ. ৩১-৩২

৪৪। রায়, সুশীল (সম্পাদিত, ১৩৭৩)। সেন, অমিয়কুমার। 'শিক্ষাগুরু নন্দলাল'। বিশ্বভারতী পত্রিকা। পৃ. ৪৯

৪৫। গুহ, নরেশ (২০১৫)। *যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর*। কলকাতা: লালমাটি। পৃ. ৪২

৪৬। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০

৪৭। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। 'গুরু স্মরণ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৭

৪৮। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। কৃপালনী, কৃষ্ণ। 'শিল্প ও সামাজিক মূল্যবোধ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৮

৪৯। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। 'গুরুস্মরণ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৪

৫০। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। দেববর্মা, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। 'শিল্পাচার্য'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৫

৫১। লাখ টাকার ঝুলি – নন্দলাল যখন যা দেখতেন, যদি মনে হতো সেগুলিকে শিল্প সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা যাবে তাহলে সংগ্রহ করে রাখতেন। এভাবেই তাঁর ঝুলি ভরে উঠত বেল, লাউ, নারকেলের খোলা; পাকা তালের আঁটি, নানা আকৃতির গাছের ডাল, পাথর, ফলের বিচি ইত্যাদি নানা রকম পরিত্যক্ত উপাদানে। দ্রষ্টব্য: অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ভঞ্জ, গৌরী। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০০

৫২। রায়, সুশীল (সম্পাদিত, ১৩৭৩)। দেববর্মা, ধীরেনকৃষ্ণ। 'রূপরসজ্ঞ শিল্পাচার্য নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৮

৫৩। অধিকারী, সুশোভন (২০১৬)। ভঞ্জ, গৌরী। 'আমার পিতা ও গুরু নন্দলাল'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৭

৫৪। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। বসু, বুদ্ধদেব। 'ধন্য যামিনী রায়'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১৪

৫৫। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। মিত্র, অশোক। 'চিন্তায় মহাজ্ঞানী, কথোপকথনে সরল কৃষক'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৪

৫৬। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। দেববর্মা, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। 'শিল্পাচার্য'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৪

৫৭। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। *নন্দলালের বাপুজি*। কলকাতা: সূত্রধর। পৃ. ১৯

৫৮। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪

৫৯। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। প্রতিমা দেবী। 'শ্রদ্ধেয় মাস্টারমহাশয়ের স্মরণে'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬২

৬০। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। হালদার, অসিতকুমার। 'তরুণ নন্দলাল ও তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শন'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬২

৬১। কৌশিক, দীনকর (১৯৯৫)। সোম, শোভন (অনুদিত)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৮

৬২। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। দ্বিতীয় খণ্ড। বীরভূম: রাঢ় গবেষণা পর্ষদ। পৃ. ৬১৪-৬১৫

৬৩। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন। 'গুরু স্মরণ'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৯

৬৪। অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। ঘোষ, ইন্দুসুধা। 'পুণ্যস্মৃতি'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫২

৬৫। ঘোষ, শান্তিদেব (১৪১০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫

৬৬। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ২০১৭)। *যামিনী রায় পত্রাবলী ও প্রবন্ধ*। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ১০৯– ১১৩

৬৭। চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৯

৬৮। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। নন্দী, সুধীর। ' শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রসাধনা'। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৫

৬৯। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। সুরাবর্দী, শাহীদ। 'যামিনী রায়ের শিল্প'। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯৬

৭০। মল্লিক, সঞ্জয় (২০১৪)। *যামিনী রায়*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ। পৃ. ১২ ও ৯০

৭১। Ghosh, Anuradha (2022). *Jamini Roy*. New Delhi: Niyogi Books. P. 121

৭২। Chatterjee, Jamini. 'The Original Jamini Roy: A Study in the Consumerism of Art. https://about.jstor.org/terms. Last accessed – 25. 03.2023

৭৩। পরিচয় গোষ্ঠী – পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর সমমনস্ক শিল্পীদের গড়ে তোলা আড্ডা গোষ্ঠী পরিচয় গোষ্ঠী নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবু সয়ীদআইয়ুব, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। দ্রষ্টব্য: জানা, শ্রীমন্তকুমার (২০০৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পরিচয়*। কলকাতা: অরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩০০

৭৪। Mitter, Partha (2007). "Jamini Roy and Art for the Community", in *The Triumph of Modernism:` India's Artists and the Avant-Garde, 1922–1947*. London:` Reaktion Books. P. 105

৭৫। ফকির, মানিক (২০১৩)। নাগ, পত্রলেখা। 'যামিনী রায়ের প্রিয় ইংরেজি শব্দ Discipline'। *বসন্ত-যামিনী*। কলকাতা: কলকাতা প্রকাশন। পৃ. ১৯৭

৭৬। মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১৫

৭৭। ভট্টাচার্য, চপলাকান্ত (সম্পাদিত, ১৯৫৩)। বসু, নন্দলাল। *আনন্দবাজার পত্রিকা*। ডিসেম্বর।

৭৮। নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬০–৬১

৭৯। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩

৮০। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮৩

৮১। মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫২

৮২। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। *শিল্পী মানুষ যামিনী রায়*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। পৃ. ৭১

৮৩। দাঁ, প্রশান্ত(সম্পাদিত, ২০০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯৯

৮৪। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৪

৮৫। দেববর্মা, ধীরেনকৃষ্ণ (১৯১১)। *স্মৃতিপটে*। বিশ্বভারতী: শান্তিনিকেতন গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ। পৃ. ১৭৮

৮৬। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। চন্দ, রাণী। মানুষ নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৬

৮৭। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। গুহ, নন্দলাল। ‘গান্ধিজি ও নন্দলাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৪

৮৮। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯১

৮৯। মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (সম্পাদিত, ১৩৯৪)। ঘোষ, শঙ্খ। ‘শিশুর সারল্য বয়স্ক মননে’। *বাঁকুড়া হিতৈষী*। পৃ. ৬৪

৯০। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৪–৫৫

৯১। নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৪

৯২। রায়, সুশীল (সম্পাদিত, ১৩৭৩)। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘নন্দলাল বসু’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬

৯৩। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ। ‘যামিনী রায়ের শিল্পের উৎস সন্ধানে’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৪

৯৪। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। সেন, পরিতোষ। ‘যামিনী রায়ের চিত্রকলা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৭

৯৫। মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩৪

৯৬। বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫০

৯৭। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪২৪)। *নিবেদিতা লোকমাতা*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ২০৬

৯৮। নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০

৯৯। ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ। ‘নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৭

১০০। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায় সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৯

১০১। চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত, ১৩৪৭)। মুখোপাধ্যায়, কাননবিহারী। ‘নন্দলাল বসুর শিক্ষাপদ্ধতি’। *প্রবাসী*। পৃ. ৭৫৭

চিত্র ১: আলপনা, যামিনী রায়

চিত্র ২: ছাত্রদের খাতায় আঁকা নন্দলাল বসুর আঁকা আলপনার নমুনা

চিত্র ৩: *সহজপাঠ*-এর লিনোকাট, নন্দলাল বসু

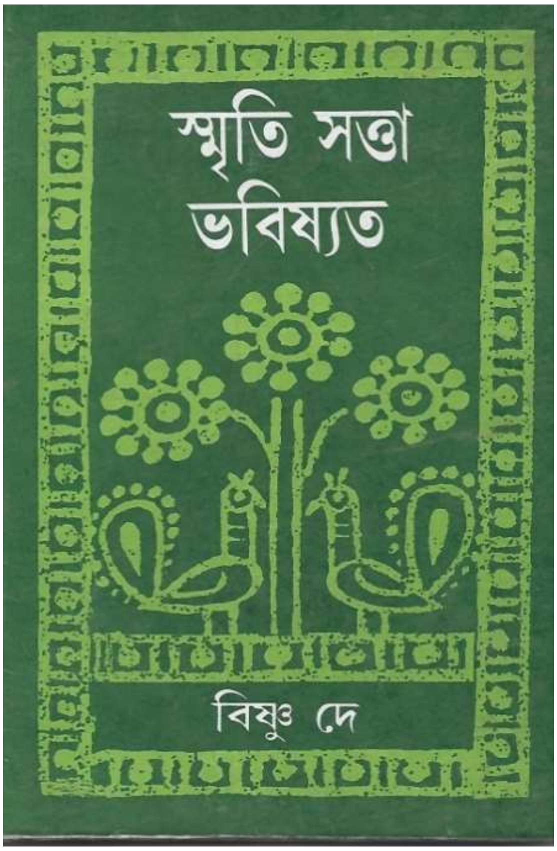

চিত্র ৪: *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত*-এর প্রচ্ছদ, যামিনী রায়

চিত্র ৫: ডান্ডি মার্চ, নন্দলাল বসু

চিত্র ৬: কর্মকার, যামিনী রায়

চিত্র ৭: বস্ত্রহরণ, যামিনী রায়

উপসংহার

ভারতভূমিতে সভ্যতা পত্তনের সময় থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত আত্তীকরণ-সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে ভারতশিল্পের যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবাসী সেই আদর্শ বিস্মৃত হয়ে পাশ্চাত্যরীতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চায় যখন ভারতবাসী আপন ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে তাকে তুচ্ছ মনে করেছে, তখন প্রকৃত স্বদেশকে খুঁজে পেতে বিংশ শতাব্দীতে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় চিত্রচর্চা শুরু করেন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চার উত্তরাধিকারী নন্দলাল ভারতবর্ষের ধ্রুপদীশিল্প ধারার অনুকরণ না করে উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বদেশকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। তিনি দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত ঘুরে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, জীবনাচরণ, ঘরবাড়ি, মন্দির, তৈজসপত্রাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, সেখানকার লোকশিল্প ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় শিল্পসম্ভার প্রত্যক্ষ করতে চান। পরবর্তী প্রজন্ম নন্দলালের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশকে খোঁজার এই তাগিদ অনুভব করেন। দিশাহীন, ক্ষতবিক্ষত, বিধ্বস্ত সমাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেকে জানা, চেনা ও প্রতিষ্ঠা করবার জন্য স্বদেশকে খুঁজতে যামিনী রায় যে শ্রমস্বীকার করেন, সমাজের মূলস্রোতের বিপক্ষে চলতে গিয়ে যে আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন, অভিজ্ঞতার স্তরে স্তরে নিজেকে বারবার ভেঙে গড়ে নতুন শিল্পরূপ প্রতিষ্ঠা করেন সেই বিবেচনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তিনি আধুনিক রুচির সঙ্গে আবহমান লৌকিক ঐতিহ্যের, দেশের শিল্পের শিকড়ের সংযোগ ঘটান। পটুয়া বা গ্রামীণ লোকশিল্পীদের বোধহীন প্রথানুসরণের বদলে লোকশিল্পাঙ্গিকের সঙ্গে নানা রীতির আধুনিক পাশ্চাত্যশৈলীর সংমিশ্রণে স্বতন্ত্র শৈলী গড়ে তোলাতেই তাঁর কৃতিত্ব। তাঁর রচিত ভাস্কর্যগুলি স্বল্প সংখ্যক হলেও ভারতীয় ভাস্কর্যের নররূপায়ণে সেইগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আদিম শিল্পরূপের অভিমুখে যাত্রায় তাঁর মৌলিক ভাবনা আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের নতুন পথের দিশা দেখায়। সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর নিজভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃঢ় সংকল্প, কৃচ্ছসাধনা, অখণ্ড ব্যক্তিত্ব বহু মানুষকে মানসিক শক্তি জোগায়। যামিনী তাঁর শৈল্পিক চাতুর্যের দ্বারা সভ্যসমাজের রুচি বদল করে লোকশিল্পকে গ্রহণযোগ্য করে তুললে পরবর্তীকালে বহু শিল্পী তাঁর আঙ্গিককে অনুসরণ করেন। যাঁরা

তাঁর ছবির বহিঃপ্রকরণকে নকল করতে যান তাঁরা প্রতারিত হন, আর যাঁরা তাঁর ছবির আত্মাকে উপলব্ধি করেন তাঁরা স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হন। নন্দলালও পট, আলপনা, সূচিশিল্প ইত্যাদি লোকশিল্পাঙ্গিকের চর্চা করেন। তাঁদের এই চর্চায় লোকশিল্প লোকসমাজের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর পরিসরে পরিচিতি পায়।

নন্দলাল এবং যামিনী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয়েও জনমানসে রাজনৈতিক চেতনাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেন। গান্ধিজির আদর্শে বিশ্বাসী নন্দলাল সর্বপ্রথম লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর বিশেষত হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের সাজসজ্জার মাধ্যমে রাজনৈতিক সভাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা সম্ভব তা দেখান। হরিপুরা পট ছাড়াও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতে তাঁর আঁকা বেশকিছু চিত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদেরকে দেশসেবার ব্রতে উদ্দীপিত করেন। সমকালীন মার্কসবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সদস্যরা যামিনীর ছবিগুলিকে রাজনৈতিক ইস্তেহার হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁর ছবিগুলি People Art-এর তকমা পায়। মার্কসবাদী সাম্যের ভাবনা থেকে ছবির অর্থমূল্যকে সাধারণের আয়ত্বের মধ্যে রাখা তাঁর অন্যান্য কৃতিত্বের থেকে কম কিছু নয়। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য তৎকালীন সময়ে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল তা অন্য গবেষণা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করলেও একথা স্বীকার করতে হয় আজও মধ্যবিত্ত বাঙালি অন্যান্য শিল্পীদের উচ্চমূল্যের ছবির বদলে ঘরের দেওয়ালে যামিনীর আঁকা ছবি রাখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। শুধুমাত্র স্বল্প মূল্য ও সহজলভ্যতার কারণে যামিনীর ছবি জনপ্রিয়তা পেয়েছে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা জাগে। বাঙালি তাঁর ছবির মধ্যে আপন ভূমির সহজসরল প্রতিচ্ছবি, ঘরোয়া আমেজ, প্রশান্তি, সর্বজনীন চিরন্তন রূপকল্পের সন্ধান পান।

নন্দলাল ও যামিনীর ছবি লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। প্রচ্ছদের মাধ্যমে গ্রন্থ সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত দিয়ে গ্রন্থ পাঠের আগেই গ্রন্থ সম্পর্কে পাঠকের কল্পনার বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করেন। নন্দলাল অলংকৃত গ্রন্থগুলিতে একদিকে যেমন লেখকের লেখা পাঠ দেয়, অন্যদিকে তাঁর আঁকা ছবিগুলিতে মিশে থাকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যা পাঠককে অন্য একটি পাঠের সম্মুখে দাঁড় করায়। এই দুই পাঠের সংশ্লেষে পাঠক একটি স্বতন্ত্র পাঠের সৃষ্টি করতে পারে। ফলত লেখার পাশে ছবির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থ অলংকরণে এঁদের শিল্পচেতনা পরবর্তীতে অনুসৃত হয়েছে। নন্দলালের শিল্পচেতনা, জীবনদর্শন, শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর

লেখা-আঁকা গ্রন্থ ও পত্রাবলিতে ফুটে উঠেছে। তাঁর গ্রন্থগুলি শিল্পশিক্ষার্থীদের কাছে আজও প্রাসঙ্গিক। প্রতিষ্ঠানের বাইরে লোকায়ত শিক্ষণ থেকে যে শিক্ষালাভ করা যেতে পারে তা তাঁর শিল্পের আলোচনায় উঠে আসে। তাঁর লেখাগুলিতে মিশে থাকে ঐতিহ্য, প্রকৃতি, দৈনন্দিন জীবন ও তাঁর অভিজ্ঞতা। ধ্রুপদী শিল্পের জৌলুসের থেকে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোকশিল্পের স্নিগ্ধতার ভাবনায় বিশ্বাস যামিনী রায়ের লেখাতে এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। ভারতশিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্যশিল্পকে মিলিয়ে দেওয়া ও পৃথক করার যে প্রবণতা যামিনীর চিত্রে লক্ষ করা গিয়েছিল 'পটুয়া শিল্প' ও 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' প্রবন্ধ দুটিতে সেই চেতনা ফুটে ওঠে। 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' প্রবন্ধে তিনিই প্রথম রবীন্দ্রচিত্রের প্রকৃত অর্থ উন্মোচন করেন। তাঁর বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ছবির অর্থ অনুধাবনে এবং বিশ্লেষণে প্রভূত সাহায্য করে। তাঁর আঁকা পটে ধরা দেয় লোকায়ত সমাজ, গোষ্ঠীর ভাবনা, মৌখিক সাহিত্য। তাঁর ইতস্তত কথার গভীরে থাকা তত্ত্বগুলি কোন দার্শনিক মতবাদের থেকে কম কিছু নয়। তাঁর রচনা ও পত্রাবলীগুলিতে শিল্পতত্ত্বসহ তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় সংক্রান্ত নানা তথ্য ফুটে ওঠে। সমকালীন আধুনিক সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সাহিত্যদর্শনের প্রভাব এবং যামিনীর চিত্রে পাশ্চাত্য শিল্পদর্শনগুলির বৌদ্ধিক প্রয়োগে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

যামিনী রায় সম্পর্কে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ করি তাঁর ছবিগুলিকে আপাতভাবে অপটু, সরল, শিশুর আঁকা মনে হলেও এর ভিতরে একটি ব্যাকরণগত দিক রয়েছে। ছবিগুলিতে লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য বিভিন্ন শিল্পআঙ্গিকের বিপুল প্রভাব পাই। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিশেল তাঁর লেখাগুলিতেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের আধুনিকতার ব্যাখ্যাতা হিসাবে যামিনী রায়কে পাই।

নন্দলাল বসু পাশ্চাত্যশিল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকলেও তিনি সচেতনভাবে প্রাচ্যশিল্পকেই গ্রহণ করেছিলেন সেটি গবেষণার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেছি। এশিয়ার ঐক্য তাঁর শিল্পচর্চায় প্রতিফলিত হয়। তাঁর গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সেখানে তিনি শিক্ষক হিসাবে উত্তর প্রজন্মকে শিল্প সম্পর্কে নির্দেশ দিতে চেয়েছেন। শিল্পকে কেবলমাত্র শৌখিনতার বিষয় নয় জীবনযাপনের মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান গবেষণাপত্রে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় সম্পর্কিত আলোচনাগুলিকে তাঁদের শিল্পরচনার প্রেক্ষাপট, লোকশিল্পানুষঙ্গ, বিদেশি অনুষঙ্গ, চিত্র-সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। এইগুলি ছাড়াও তাঁদেরকে কেন্দ্র করে রচিত বিপুল সৃষ্টির সিংহভাগই আনালোচিত রয়ে গেছে। লেখায় সর্বত্র তাঁদের চিত্ররাজির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যামিনী রায় ছবি কপির পর কপি করে গেছেন, কোনটি মূল কপি এবং কোনগুলি পরবর্তীতে আঁকা হয়েছে, সেগুলিতে কী কী পার্থক্য ঘটে গেছে তা পৃথক গবেষণার দাবি জানায়। এইরূপ নন্দলালের কার্টুন ছবি, হেলাফেলার কাজগুলি নিয়েও গবেষণাধর্মী কাজ করা চলে। নন্দলাল ও যামিনীর প্রকাশিত পত্রগুলি থেকে অনুমান করা যায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে লেখা এঁদের অপ্রকাশিত পত্রগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সেই সমস্ত পত্রগুলি নানা সূত্র থেকে অনুসন্ধান এবং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে। নন্দলাল ও যামিনীসহ অন্যান্য শিল্পীর নিজের লেখা বা তাঁদেরকে নিয়ে লেখাগুলি খ্যাত অখ্যাত নানা পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। সেইগুলিকে অনুসন্ধান করে সংকলন ও সম্পাদনা করলে চিত্র-সাহিত্যক্ষেত্রটি আরো সমৃদ্ধ হতে পারে। বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে একদিকে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের শিল্পচর্চা অন্যদিকে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের অবদান আলোচিত হয়েছে। এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা গবেষণাটি শিল্প, শিল্পী, শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টি এবং তাঁদেরকে কেন্দ্রকরা রচিত সাহিত্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখার সূচনামুখ মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

বাংলা

অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)। *নন্দলালের বাপুজি*। কলকাতা: সূত্রধর।

গুহ, নরেশ (২০১৫)। *যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর*। কলকাতা: লালমাটি।

চক্রবর্তী, শ্যামল (২০২৩)।*চিত্রকর ধীরেনকৃষ্ণ*। আগরতলা: অক্ষর পাবলিকেশন।

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১৭)। *যামিনী রায় পত্রাবলী ও প্রবন্ধ*। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। *রূপতাপস যামিনী রায়*। কলকাতা: প্রতিভাস।

দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। *যামিনী রায় : তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক*। কলকাতা: আশা প্রকাশনী।

দেববর্মা, ধীরেনকৃষ্ণ (১৯১১)। *স্মৃতিপটে*। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন: গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ।

নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ (১৩৬৮)। *শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প দীপঙ্কর নন্দলাল*। কলকাতা: ভারতবাণী প্রকাশনী।

বসু, নন্দলাল (১৩৫৬)।*রূপাবলী*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

বসু, নন্দলাল (১৩৫৬)।*রূপাবলী*। দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

বসু, নন্দলাল (১৩৯২)।*রূপাবলী*। তৃতীয় ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

বসু, নন্দলাল (১৪০৫)। *শিল্পকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

বসু, নন্দলাল (১৪১৪)। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

বসু, নন্দলাল (১৪২৪)। দত্ত, অম্লান ও সুব্রহ্মণ্যন্, কল্পাতি গণপতি (সম্পাদিত)। *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। বসু, নন্দলাল। 'ফুলকারী'। *দেশ*। নন্দলাল বসু সংখ্যা।

বসু, শঙ্খ (২০২২)। *নন্দলাল বসুর কার্ড চিত্র*। কলকাতা: মিউজয়াম ও আর্ট গ্যালারী দ্যা রামকৃষ্ণ মিশনইনস্টিটিউট অব কালচার।

মানিক ফকির (২০১৩)। *বসন্ত-যামিনী*। কলকাতা: কলকাতা প্রকাশন।

মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ (সম্পাদিত, ১৯৭২)। *যুগান্তর সাময়িকী*। ১৫ ফেব্রুয়ারি।

মুখোপাধ্যায়, লীলাময় (সম্পাদিত, ২০১৪)। *সাধক-শিল্পী যামিনী রায়*। কলকাতা: আভাষ।

সেন, অরুণ (২০২০)। *যামিনী রায় বিষ্ণু দে: বিনিময়*। কলকাতা: প্রতিক্ষণ।

ইংরাজি

Appaswamy, J (1968). *Jamini Roy.* New delhi: Lalit Kala Academy.

Gupta, Debdutta (Edited, 2023). Nandalal Bose. Kolkata: Akar Prakar.

http://www.ngmaindia.gov.in/virtual-tour-of-modern-art-1.asp

http://www.ngmaindia.gov.in/virtual-tour-of-nandalal-bose.asp

Nandalal Basu Archive. The Centre for Studies in Social Sciences. Kolkata.

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

অধিকারী, শচীন্দ্রনাথ (১৩৫২)। *পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: শ্রীহট্ট প্রকাশন।

অধিকারী, শচীন্দ্রনাথ। *সহজমানুষ রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড।

অধিকারী, সুশোভন (২০২৩)। *প্রসঙ্গ নন্দলাল*। কলকাতা: বিচিত্রা।

অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৬)।*মাস্টারমশাই নন্দলাল*। কলকাতা: লালমাটি।

অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৯)। *আচার্য নন্দলালের শিল্পসুধামৃত*। কলকাতা: লালমাটি।

অধিকারী, সুশোভন (সম্পাদিত, ২০১৯)। *কেন্দ্রবিন্দুতে রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: পত্রলেখা।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯৭৩)। *ঘরোয়া*। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা : প্রকাশ ভবন।

আলম, রফিকুল (২০০৩)। *উপমহাদেশের শিল্পকলা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

আশ, নির্মল (২০০৬)। *চিত্র প্রকরণ*। কলকাতা: রক্তকরবী।

আহমদ, ওয়াকিল (১৯৬৫)।*বাংলার লোক-সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

আহমদ, ওয়াকিল (২০০১)। *লোককলা প্রবন্ধাবলি*। ঢাকা: গতিধারা।

আহসান, সৈয়দ আলী (২০০২)। *শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ*। ঢাকা: বইপত্র।

কর, চিন্তামণি (১৯৯৬)। *শিল্পী ও রূপকলা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী।

কালিদাস (-)। বসু, অনিলচন্দ্র (সম্পাদিত, অনুবাদিত)। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো। পৃ. ৪৭২-৪৮১

কৌশিক, দিনকর (১৯৯৫)। সোম, শোভন (অনুবাদিত)। *নন্দলাল বসু ভারতশিল্পের পথিকৃৎ*। নিউ দিল্লি: ন্যাশানাল বুকট্রাস্ট।

কৌশিক, দিনকর (২০০৯)। *শান্তিনিকেতনের দিনগুলি*। কলকাতা: পত্রলেখা।

খাঁ, চন্দন (২০১২)। *লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির নানা দিক*। কলকাতা: সাহিত্যসঙ্গী।

খালেদ, মইনুদ্দীন (২০০১)। *গঁগ্যা ও ভ্যান গখ*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।

খালেদ, মইনুদ্দীন (২০০১)। *দশ বাঙালি শিল্পী*। ঢাকা: প্যাপিরাস।

গঙ্গোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার (১৩৪৬)। *শিল্প-পরিচয়*। কলকাতা: ভিনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস।

গঙ্গোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার (১৯৬৯)। *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*। কলকাতা: এ মুখার্জী এণ্ড কোংপ্রাঃ লিঃ।

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার (১৯৮৬)। *বাংলার ভাস্কর্য*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা।

গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল (১৩৮০)। *গগনেন্দ্রনাথ*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল (১৩৮৮)। *দক্ষিণের বারান্দা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ (২০১৬)। *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*। কলকাতা: আনন্দ।

গুপ্ত, মনীন্দ্র (২০১৬)। *রং কাঁকর রামকিঙ্কর*। কলকাতা: অবভাস।

গুহ, প্রদ্যোত (১৯৭৮)। কোম্পানি আমলে বিদেশি চিত্রকর। কলকাতা: আয়ান।

গোপ, রবীন্দ্র (সম্পাদিত, ২০১৪)। *বাংলাদেশের কারুশিল্প ও শিল্পকর্ম*। ঢাকা: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।

ঘোষ, ইন্দুসুধা (১৯৩০)। *সীবনী*। কলকাতা: বুক কোম্পানী।

ঘোষ, তপন কুমার (২০১০)। *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন

ঘোষ, দেবপ্রসাদ (১৯৮৬)। *ভারতীয় শিল্প ধারা প্রাচ্যভারত ও বৃহত্তর ভারত*। কলকাতা: সাহিত্যলোক

ঘোষ, নির্ম্মলকুমার (১৯৮৩)। *ভারতশিল্প*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড

ঘোষ, বিনয় (১৩৮৫)। *বাংলার লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*। কলকাতা: সিগনেট।

ঘোষ, বিনয় (২০০৩)। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন।

ঘোষ, বিনয় (২০১০)। *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন।

ঘোষ, মৃণাল (১৯৪৪)। *শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব*। কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড।

ঘোষ, মৃণাল (১৯৯৫)। *সমকালীন ভাস্কর্য*। কলকাতা: প্রতিক্ষণ।

ঘোষ, মৃণাল (২০০১)। *এই সময়ের ছবি*। কলকাতা: প্রতিক্ষণ।

ঘোষ, মৃণাল (২০১২)। *ছবির রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: অভিযান।

ঘোষ, শান্তিদেব (১৩৮৬)। *রবীন্দ্রসংগীত*। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঘোষ, শান্তিদেব (১৪১০)। *বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা।

ঘোষ, শান্তিদেব (২০১৭)। *রূপকার নন্দলাল*। কলকাতা: যাপনচিত্র।

ঘোষ, শুভেন্দু (১৯৪২)। *শিল্প-দর্শনের ভূমিকা*। কলকাতা: সমবায় পাবলিশার্স।

ঘোষ, শ্যামলকৃষ্ণ (১৯৯০)। *পরিচয়ের আড্ডা*। কলকাতা: কে পি বাগচি অ্যাণ্ড কোম্পানি।

ঘোষ, সঞ্জয় (২০১৮)। *কলকাতা যামিনী সংলাপ*। কলকাতা: অভিযান।

ঘোষ, সিদ্বার্থ (২০১৮)। *কলের শহর কলকাতা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

ঘোষ, স্বাতী (২০১৫)। *রবীন্দ্রভাবনায় শান্তিনিকেতনের আলপনা*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

চক্রবর্তী, অধীর ও অন্যান্যরা (১৩৮৮)। *আলোর ফুলকি*। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

চক্রবর্তী, কাঞ্চন (সম্পাদিত, ২০১৬)। মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী। *চিত্রকথা*। কলকাতা: অরুণা।

চক্রবর্তী, বরুণ (সম্পাদিত, ২০১১)। *লোকজশিল্প*।কলকাতা: পারুল।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০১৬)।*বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির কোষ*। কলকাতা: দে বুক স্টোর।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার ও মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পাদিত,১৯৯৬)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: অপর্ণা।

চক্রবর্তী, বিমলেন্দু (২০১৯)। *গুহাচিত্র থেকে লোকচিত্র এবং শিল্পশাস্ত্র*। কলকাতা: অমর ভারতী।

চক্রবর্তী, বিমলেন্দু (২০২০)। *অজন্তা ও বাঘগুহার কথা*। কলকাতা: অমর ভারতী।

চক্রবর্তী, রতনলাল (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের মন্দির*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ (১৯৯২)। *ভারত-শিল্পের পথিকৃৎ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

চক্রবর্তী, স্বপন (সম্পাদিত, ২০০৭)। *মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই*। কলকাতা: অবভাস।

চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (২০০০)। *ইতিহাস অনুসন্ধান*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড।

চট্টোপাধ্যায়, জীবানন্দ (২০০৭)। *বটতলার ভোরবেলা*। কলকাতা: পারুল প্রকাশনী।

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (১৯৮১)। *রূপ, রস ও সুন্দর*। কলকাতা: ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া।

চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ (১৯৯১)। *রবীন্দ্র পরিকর*। কলকাতা: আনন্দ।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি (১৯৯৭)।বসু, দেবতোষ (সম্পাদিত)। *এই কাব্যে এই হাতছানি*। কলকাতা: দেজ।

চট্টোপাধ্যায়, সৌগত (২০০৪)। *বাংলার ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (১৪১৩)। *সাহিত্য-প্রকরণ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

চন্দ, রানী (১৩৪৯)। *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

চন্দ, রানী (১৩৭৯)। *শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

চন্দ, রানী (১৯৮৪)। *সব হতে আপন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

চন্দ, রানী (২০১২)। *মানুষ নন্দলাল*। কলকাতা: দৃশী পাবলিশার্স।

চৌধুরী, কবীর (২০০২)। *পল সেজান ও আঁরি মাতিস*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

চৌধুরী, কমল (সংকলিত ও সম্পাদিত)। *বাংলার ব্রত ও আলপনা*। কলকাতা: দেজ।

চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত, ২০১৩)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৪)। *অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: কপোতাক্ষ।

চৌধুরী, সত্যজিৎ (২০০৮)। *নন্দলাল*। কলকাতা: দেজ।

জানা, শ্রীমন্তকুমার (২০০৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পরিচয়*। কলকাতা: অরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৩৫১)। *টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ (১৩৫৪)। *পরিশেষ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৫০)। *বাংলার ব্রত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৫৪)। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৮৬)। *আলোর ফুলকি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর ।(১৩৯৮)অবনীন্দ্রনাথ ,*ঘরোয়া*। কলকাতাবিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। :

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯১৯)। *রাজকাহিনী*। কলকাতা: হিতবাদী লাইব্রেরী।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯৭৫)।*অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশভবন।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯৮৯)। *শিল্পায়ন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯৯৭)। *অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলী*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: প্রকাশ ভবন

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (২০১৮)।*অবনীন্দ্রনাথরচনাবলী*। নবমখণ্ড। কলকাতা: প্রকাশভবন।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ও চন্দ, রানী (১৯০৬)। *জোড়াসাঁকোর ধারে*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, প্রতিমা (১৩৫৯)। *স্মৃতিচিত্র*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস।

ঠাকুর, প্রবোধেন্দুনাথ (১৩৪৬)। *কুমারসম্ভব*। কলকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩০৮)।*নৈবেদ্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৬)। *তপতী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪০)। *বিচিত্রিতা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৪)।*ছড়ার ছবি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৮)। *চয়নিকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৮)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দশম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৫৩)। *রাজা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৩)। *বুদ্ধদেব*। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৩)। *মহুয়া*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৩)।*গীতাঞ্জলি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৯)।*বীরপুরুষ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৭৫)। *বনবাণী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮১)। *চিঠিপত্র*। একাদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮৫)।*রাখী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮৭)। *সহজ পাঠ*। চতুর্থ ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮৭)। *সহজ পাঠ*। তৃতীয় ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮৭)।*বিথীকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯২)। *সহজপাঠ*। দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯২)।*জাভা-যাত্রীর পত্র*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০০)। *সহজ পাঠ*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০০)।*গীতবিতান*। অখণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০৭)।*চিঠিপত্র*। চতুর্দশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৮৭৯)। *বিচিত্র প্রবন্ধ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯১৬)।*বলাকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০)।*পল্লীপ্রকৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৫৯)। *খৃষ্ট*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০২২)। দত্ত, সৌমকান্তি (সংকলিত)। *বৈশাখ হে*। কলকাতা: বিচিত্রা।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (১৩৩৪)। *কাম-সূত্রম্*। কলকাতা

দত্ত, বিমলকুমার (১৩৭৩)। *ভারত-শিল্প*। কলকাতা: বিদ্যাভারতী।

দত্ত, গুরুসদয় (২০০৮)। *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য*। কলকাতা: ছাতিম।

দত্ত, গুরুসদয় ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ২০১০)। *পূর্ব ভারতের পটচিত্র*। পশ্চিমবঙ্গ সরকার: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

দত্ত, জয়িতা (১৯৯৮)। *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী।

দত্ত, পুলক (১৪০৮)। *কারুসঙ্ঘ শান্তিনিকেতন শিল্পীসমবায়*। শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্রভবন বিশ্বভারতী।

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (১৩৪৫)।*স্বগত*। কলকাতা: ভারতী ভবন।

দত্ত, হর্ষ ও বসু, স্বপন (সম্পাদিত, ২০১০)। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৬)। *শিল্প প্রবন্ধাবলী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ (১৩৫৮)। *শিল্প-লিপি*। কলকাতা: এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড।

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ (২০০৬)। *ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।

দাশমুন্সী, শুভেন্দু (২০১১)। *টইপাড়ায় টহলদারি*। হুগলি: সপ্তর্ষি প্রকাশন।

দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮২)। *শিল্প ও শিল্পী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক।

দাস, কৃষ্ণলাল (১৯৮৩)। *শিল্প ও শিল্পী*। তৃতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক।

দাস, গৌতম (২০০০)। *বাংলার শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার*। কলকাতা: পুনশ্চ।

দাস, সুধীরঞ্জন (১৯৫৯)।*আমাদের শান্তিনিকেতন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

দাসগুপ্ত, ঋদ্ধি (১৯৯২)। *অবনীন্দ্রসাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপাদানের ব্যবহার*। কলকাতা: দে বুক স্টোর।

দে, অভীককুমার (১৯৯২)।*রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

দে, বিষ্ণু (১৪০৩)। *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

দে, বিষ্ণু (১৪০৫)। *কবিতা সমগ্র*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

দে, বিষ্ণু (১৪০৫)। *কবিতা সমগ্র*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

দে, বিষ্ণু (১৪১৭)। *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

দে, বিষ্ণু (১৯৪১)।*পূর্বলেখ*। কলকাতা: কবিতা ভবন।

দে, বিষ্ণু (১৯৫৫)। *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: নাভানা।

দে, বিষ্ণু (২০০৪)। *কবিতাসমগ্র*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

দে, বিষ্ণু (২০১৩)। *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

দেব, বিমল (১৯৮৮)। *চিত্রকলায় পূর্ব ও পশ্চিম*। কলকাতা: স্টার পাবলিকেশনস।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত, ২০১১)। *বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ*। প্রথম খন্ড। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত, ২০১৮)। *বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ*। দ্বিতীয় খন্ড। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

নন্দী, সুধীর কুমার (১৯৮৪)। *নন্দনতত্ত্ব*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

নাগ, নির্মাল্য (২০০০)। *শিল্পচেতনা*। কলকাতা: দীপায়ন।

নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল (১৩৬৮)। *সাহিত্য ও শিল্পলোক*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

পত্রী, পুর্ণেন্দু (১৯৮৫)। *এক যে ছিল কলকাতা*। কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৫৯)। *ভগিনী নিবেদিতা*। সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল।

বড়পণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯)।*পটুয়াসংস্কৃতিপরম্পরাওপরিবর্তন*।কলকাতা: পুস্তকবিপণি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ (১৯৯২)। *চিত্রভূষণ ও চিত্রবিশারদ প্রশ্নোত্তরের সম্ভার*। কলকাতা: নাথ ব্রাদার্স।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (১৯৮১)। *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর (২০১৫)। *আমার সাহিত্য-জীবন*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন (সংকলন ও সম্পাদনা, ২০১০)। *সঙ্গিনী ঐ চিত্রকলা নিজের আঁকা ছবির প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনা সংকলন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ (২০১২)। *চিত্রকরের রোজনামচা*। কলকাতা: লালমাটি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (২০১৪)। *শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগ*। কলকাতা: অ্যাহেড ইনসিয়েটিভ্‌স্।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিলকুমার (১৯৮৩)। *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: নবজাতক।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত, ২০১৪)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। পৃ. ১৩৯-১৪০

বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ (১৯৮২)। *রবীন্দ্র-চিত্রকলা রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ (২০১৯)। *শিল্পী রামকিঙ্কর: আলাপচারি*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

বসাক, শীলা (১৯৯৮)। বাংলার ব্রতপার্বণ। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

বসাক, শীলা (২০০০)। *বাংলার ব্রত পার্বণ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

বসাক, শীলা (২০০২)। *বাংলার নকশিকাঁথা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

বসু, অতুল (১৯৯৩)। *বাংলার চিত্রকলা ও রাজনীতির একশ বছর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলিত ও প্রকাশিত, ১২৯৯)। *বিশ্বকোষ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি।

বসু, ফণীন্দ্রনাথ (১৯২৫)। *বিক্রমশীলা*। কলকাতা: আর্য্য পাবলিশিং হাউস।

বসু, বুদ্ধদেব (১৯৫৩)। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: নাভানা।

বসু, বুদ্ধদেব (১৯৫৯)। *কালের পুতুল*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বসু, বুদ্ধদেব (২০০১)। *আমাদের কবিতাভবন*। কলকাতা: বিকল্প।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪২৪)। *লোকমাতা নিবেদিতা* (চতুর্থ খণ্ড)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৩)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বসু, শেখর (২০০৫)। *শ্রেষ্ঠ শিল্পী বারোজন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

বসু, শ্রীলা (২০১৬)। *বাংলার টেরাকোটা মন্দির*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

বসু, সুধা (২০১৩)। *শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ*। কলকাতা : বোনা।

বসু, স্বপন (সম্পাদিত, ১৪১৭)। *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*। কলকাতা: বাংলা সাহিত্য পরিষৎ।

বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পাদিত, ২০০৩)। *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (২০০৭)। লোক সংস্কৃতিবিদ্যা। কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স।

বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত, ২০০০)। *বটতলার বই*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: গাঙচিল।

বিশ্বাস, অদ্রীশ ও আচার্য, অনিল (সম্পাদিত, ২০১৩)। *বাঙালির বটতলা।* কলকাতা: অনুষ্টুপ।

বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাদিত, ২০১১)। *যামিনী রায় শ্রদ্ধার্ঘ্য*। কলকাতা: সুতানুটি বইমেলা।

বেদান্ততীর্থ, গিরীশ্চন্দ্র (১৩৭৯)। *প্রাচীন শিল্প পরিচয়*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা।

ভট্টাচার্য, অরুণ (১৯৮১)। *নন্দনতত্ত্বের সুত্র*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯১)। *কলকাতার চিত্রকলা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

ভট্টাচার্য, অশোক (১৯৯৪)। *বাংলার চিত্রকলা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পাদিত, ২০০১)। *পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র*। পশ্চিমবঙ্গ সরকার: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (১৯৭০)। *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এম আর পাবলিশার্স।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০৪)। *বাংলার লোকসাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, তপন (২০০৭)। *শিল্প ও শিল্পী*। কলকাতা: উর্বী।

ভট্টাচার্য, তপোধীর (২০০৯)। *চিত্রকলার দুই কিংবদন্তী গখ ও পিকাসো*। কলকাতা: অক্ষর পাবলিকেশনস্।

ভট্টাচার্য, তরুণদেব (১৯৮২)। *বাঁকুড়া*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, ভোলানাথ (১৩৮২)। *শিল্পভাবনা*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন্স্।

ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাদিত, ২০০৪)। *বঙ্গীয় শিল্পও পরিচয়*। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

ভট্টাচার্য, সাধনকুমার (১৯৬৭)। *শিল্পতত্ত্ব-পরিচয়*। কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

ভট্টাচার্য, সন্দীপন (সংকলিত, ২০০৮)। *ভিনসেন্ট ভান গখ: এ ভাবেই চলে যেতে চাই*। কলকাতা: মনফকিরা।

ভদ্র, গৌতম (২০১১)। *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার*। কলকাতা: ছাতিম।

ভৌমিক, দেবাশিস (২০১৩)। *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর*। কলকাতা: গ্রন্থতীর্থ।

মজুমদার, মানস (২০১০)। লোকঐতিহ্য-চর্চা। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

মজুমদার, হেমেন্দ্রনাথ (১৯৯১)। *ছবির চশমা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

মণ্ডল, অজয় (সম্পাদিত, ২০১৩)। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সমীক্ষা। কলকাতা: সাহিত্যসঙ্গী।

মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮২)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। প্রথম খণ্ড। বীরভূম : রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ।

মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৮৪)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*। দ্বিতীয় খণ্ড। বোলপুর: রাঢ়-গবেষণা পর্ষদ।

মণ্ডল, পঞ্চানন(১৯৯৭)। *গোর্খ-বিজয়*। বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন।

মণ্ডল, রবীন (২০১৮)। *শিল্পভাবনা*। কলকাতা: বাণীশিল্প।

মণ্ডল, সত্যানন্দ (১৯৮৪)। *চব্বিশ পরগণার লোকশিল্প*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

মণ্ডল, সুজিত কুমার (২০১১)। *দুখুশ্যাম চিত্রকর পটুয়া সঙ্গীত*। কলকাতা: গাঙচিল।

মনসুর, আবুল (২০১৬)। *নন্দলাল বসু*। চট্টগ্রাম: বাতিঘর।

মল্লিক, ঋত্বিক (২০১৪)।*বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির ডার্করুম থেকে আলোয়*। ভারত সরকার: কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক।

মল্লিক, শ্রীহর্ষ (১৯৮৫)। *প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

মল্লিক, সঞ্জয় কুমার (২০১৪)। *যামিনী রায়*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ।

মাইতি,চিত্তরঞ্জন (২০০১)। *প্রসঙ্গ: পট, পটুয়া ও পটুয়া সঙ্গীত।* কলকাতা: সাহিত্যলোক।

মাখার্জী, অর্ঘ্য (২০২১)। *ধর্ম ও উপাসনা: নিবিড় পাঠ*। উঃ চব্বিশ পরগণা: মাথামোটার দপ্তর।

মান্না, অনির্বাণ (২০০৭)। *নান্দনিকতার আলোকে লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

মান্না, সুব্রত কুমার (২০১২)। *বাংলার পটচিত্র, পটুয়াসংগীত, পটুয়াসমাজ ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম।

মিত্র, অশোক (১৯৮৪)। *ছবি কাকে বলে*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

মিত্র, অশোক (১৯৮৮)। *পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

মিত্র, অশোক (১৯৯২)। *ইউরোপের ভাস্কর্য*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

মিত্র, অশোক (১৯৯৬)। *ভারতের চিত্রকলা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্য (সম্পাদিত, ১৩৫৭)। *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত, ১৯৯৫)। *লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালা:৬*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

মিত্র, হিরণ (২০০৭)। *আঁকা আঁকি ও অন্যান্য*। কলকাতা: বাণীশিল্প।

মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ (১৪১৪)। *বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ।

মিদ্যা, বিকাশকান্তি (২০১৯)। *সহজাত সহজপাঠ* । কলকাতা: ধানসিড়ি।

মুখোপাধ্যায়, আদিত্য (২০০৫)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: অমর ভারতী।

মুখোপাধ্যায়, আদিত্য (২০১৭)। *বাংলার পট ও পটুয়া*। কলকাতা: বলা।

মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার (১৯৮৪)। *সাহিত্য বিবেক*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত (১৯৭০)। *বাঘ ও অজন্তা*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার (সম্পাদিত, ১৯৯৭)। *বিষ্ণু দে, প্রবন্ধ সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার (সম্পাদিত, ১৯৯৮)। *বিষ্ণু দে, প্রবন্ধ সংগ্রহ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : দেজ পাবলিশিং।

মুখোপাধ্যায়, প্রণতি (সম্পাদিত, ১৯৮৪)। *রবীন্দ্রভাবনা:* নন্দলাল সংখ্যা। কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার (১৯৬১)। *রবীন্দ্রজীবনী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী (১৩৭৯)। *আধুনিক শিল্পশিক্ষা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ (১৯৯০)। *পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী*। কলকাতা: এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি।

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ (১৯৯৯)। *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্ত বঙ্গের প্রেক্ষাপটে*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

মুজতবা আলী, সৈয়দ (১৩৫৯)। *ময়ূরকণ্ঠী*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার (১৩৮৯)। *ভারতশিল্পের কথা*। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

রহমান, মহঃ মতিয়র (২০০৬)। *পটুয়া গীত: সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারা।* পশ্চিমবঙ্গ সরকার: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

রায়, অন্নদাশঙ্কর (১৯৬৮)। *আর্ট*। কলকাতা: সুচয়নী।

রায়, আলোক ও নিয়োগী, গৌতম (সম্পাদিত, ২০১২)। *উনিশ শতকের বাংলা*। কলকাতা: পারুল।

রায়, কামিনিকুমার (১৯৬০)। *লৌকিক শব্দকোষ*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্।

রায়, গোপালচন্দ্র (২০০১)। *চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: সাহিত্যভবন।

রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ (১৯৯৬)। মিত্র, মৈত্রেয়ী (অনুবাদিত)। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা ও চিত্রশিল্প*। নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।

রায়, জগদানন্দ (১৩৩১)। *পাখী*। এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড।

রায়, জগদানন্দ (১৩৩১)। *বাঙলার পাখী*। এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড।

রায়, ত্রিদিবনাথ (সম্পাদিত, ১৯৮০)। *বাৎসায়নের কামসূত্র*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। পৃ. ৬০-৬১

রায়, নীরোদ (১৯৭৮)। *ফটোগ্রাফি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৮০)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম. মুখোপাধ্যায়। পৃ. ৮১২

রায়, মীরা (১৯৯৫)।*নন্দলাল : জীবন ও শিল্প*। বার্ণপুর: উদয়াচল সাহিত্য পরিষদ।

রায়, সত্যেন্দ্রনাথ (১৯৮১)। শিল্পসাহিত্য দেশকাল। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রায়, সিতাংশু (১৩৯৪)। *সৌন্দর্যদর্শন: প্রাথমিক পরিচয়*। কলকাতা: এস্. পি. বুক সেলার্স।

লাহিড়ী, চণ্ডী (১৯৯৫)। *কার্টুনের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: গণমাধ্যম তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

লাহিড়ী, চণ্ডী (২০০৪)। *গগনেন্দ্রনাথ কার্টুন ও স্কেচ*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি।

শাস্ত্রী, শিবনাথ (১৯৮৩)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স লি.।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (১৯৯১)। *প্রাচীন বাংলার গৌরব*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

শ্রীপান্থ (১৯৭৭)। *যখন ছাপাখানা এল*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

শ্রীপান্থ (১৯৯৭)। *বটতলা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

শ্রীপান্থ (১৯৯৯)। *কলকাতা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

শ্রীপান্থ (২০০২)। *ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

সরকার, প্রভাতচন্দ্র (সম্পাদিত, ২০২১)। *বহমান লোকসংস্কৃতি চর্চা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

সাত্তার, আব্দুর (২০০৩)। *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

সান্যাল, নারায়ণ (১৩৮৩)। *অজন্তা অপরূপা*। কলকাতা: ভারতী বুকস্টল।

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন (২০১২)। বাংলার মন্দির। কলকাতা: কারিগর।

সামন্ত, কানাই (১৮৮১ শক)। *চিত্রদর্শন*। কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী।

সামন্ত, কানাই (১৯৬২)।*নন্দলাল বসু*। কলকাতা: কথাশিল্প প্রকাশন।

সামন্ত, কানাই (১৯৬২)। *শ্রী নন্দলাল বসু*। কলকাতা: কথাশিল্প-প্রকাশ।

সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ (১৯৮১)। *বাঁকুড়ার সংস্কৃতি পরিক্রমা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, ১৯৮০)। *শিল্পী মানুষ যামিনী রায়*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

সামন্ত,কানাই (১৯৬২)। *শ্রীনন্দলাল বসু*। কলকাতা: কথাশিল্প প্রকাশন।

সাহা, টিটু (২০২০)। *বাংলাদেশের মাটির পুতুল ও খেলনা*। ঢাকা: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।

সিনহা, সুবিমলেন্দু বিকাশ (১৪১২)। *নন্দনতত্ত্বের আলোকে আধুনিক চিত্রকলা*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর আর্ট অ্যান্ড ইস্থেটিকস।

সুর, অতুল (২০১৬)। *কলকাতা*। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

সেন, ক্ষিতিমোহন (১৯৫৮)।*চিন্ময় বঙ্গ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

সেন, দীনেশচন্দ্র (১৯১১)। *বৃহৎ বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেন, দীনেশ্চন্দ্র (১৯৩৫)। *বৃহৎ বঙ্গ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, যমুনা (১৯৮৪)। *সেলাইয়ের নকশা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

সেন, যামিনীকান্ত (১৩৫৯)। গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার (সম্পাদিত)। *আর্ট ও আহিতাগ্নি*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্।

সেন, যামিনীকান্ত (১৩৬৭)। *বাংলার রূপরস সাধনা*। কলকাতা : মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন যামিনীকান্ত (১৯৩১)। *আন্তর্জাতিক রূপতন্ত্র*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: আন্তর্জাতিক আর্ট রূপারণ্যক।

সেন, সুকুমার (১৩৬২)। *চণ্ডীমঙ্গল*। নয়া দিল্লি : সাহিত্য একাডেমি।

সেন, সুকুমার (২০০৮)। *বটতলার ছাপা ও ছবি*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

সেন, সুকুমার ও মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত, ১৩৫১)। *রূপরামের ধর্মমঙ্গল*। প্রথম খণ্ড। বর্দ্ধমান: সাহিত্য-সভা।

সেনগুপ্ত, শঙ্কর (১৯৭২)। *বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন।

সেনগুপ্ত, সমীর (২০০৮)। *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

সোম, তপনকুমার (সম্পাদিত, ২০১০)। *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন।

সোম, শোভন (১৯৮৫)। *তিন শিল্পী: নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর*। কলকাতা: বাণীশিল্প।

সোম, শোভন ও আচার্য, অনিল (সম্পাদিত, ১৯৮৬)। *বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

সোম, শোভন (১৯৯৯)। *চিত্রভাবন*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত, ১৩৮৬)। *উপনিষৎ গ্রন্থবলী*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৩৬৩)।*সঙ্গীত ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

হক, সৈয়দ মাহমুদুল (সম্পাদিত, ১৯৮৩)। *বাংলাদেশের লোকশিল্প*। ঢাকা: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।

হাজরা, অক্ষয় কুমার (১৯৫৯)। *শিক্ষায় শিল্পের স্থান*। কলকাতা: অ্যাকাডেমিক এন্টারপ্রাইজ।

হাফিজ, আবদুল (১৯৭৫)। *বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হালদার, অসিতকুমার (১৩২০)। *অজন্তা*। কলকাতা: ভট্টাচার্য এণ্ড সন্।

হালদার, অসিতকুমার (১৩৫৪)। *রূপরুচি*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লি.।

হালদার, অসিতকুমার (১৩৬৫)। *রবিতীর্থে*। কলকাতা: পাইওনিয়র বুক কোং।

হালদার, অসিতকুমার (১৯৪০)। *উরোপের শিল্প-কথা*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

হালদার, অসিতকুমার (১৯৬৩)। *রূপদর্শিকা*। কলকাতা: বুকল্যান্ড প্রাইভেট লি.।

হালদার, অসিতকুমার (১৯৯৩)। *ভারতের শিল্প-কথা*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

হালদার, অসিতকুমার (২০১৫)। *শিল্পকথা*। কলকাতা: পত্রলেখা।

ইংরাজি

Appaswamy, J (1968). *Abanindranath Tagore and the Art of his Times*. New delhi: Lalit Kala Academy.

Appaswamy, J (1973). *Jamini Roy*. New delhi: Lalit Kala Academy.

Beniyon, Lawrence (1913). *Painting in the Far East*. London.

Bhattacharya, Jyotirmoy (2019). *Jamini Roy Candid Sketches*. Kolkata: Tulsyan Family Beneficiary Trust.

Brown, Percy (1960). *Indian Painting*. Calcutta: Y.M.C.A. Publishing House.

Brown, Rebecca M (2009). *Art for a Modern India, 1947–1980*. Durham & London: Duke University Press.

Chandra, Subodh and Mode, Heinz (1985).*Indian Folkart*. London: Alpine Fine Arts Collections, Ltd.

Chatterjee, Ramananda (Edited, 1931).*The Golden Book of Tagore*. Kolkata: Golden BookCommittee.

Chatterjee, Ratnabali (1990). *From the Karkhana to the Studio: A Study in the Changing Social Role of Patron and Artists in Bengal*. New Delhi: Books and Books.

Coomerswami, Ananda K. (1912). *Art and Swadeshi*.Madras : Ganesh and Co.

Coomerswami, Ananda K. (1916). *Rajput Painting*. London: Oxford Univerity Press.

Coomerswami, Ananda K. (1959). *History of Indian and Indonesian*. New York: Dover Publication Inc.

Corni, Caterina and Kejariwal, Prakash (2019).*Jamini Roy: Retracing the Lines*. Kolkata: Chitrakoot Art Gallery.

Daw, Prasanta (Edited, 2019). *Line and Artists: An Assessment of Jamini Roy*. Kolkata: M C Sarkar and Sons Private Limited.

Datta, Sudhindranath (1970). *The World of Twilight*. Kolkata: Oxford University Press.

Dev, chittoranjan (1980).*Influence of Folk art on some Modern Artist*. Folk lore vol.

Dey, Bishnu and Irwin, John (1944).*Jamini Roy*. Indian Society of Oriental Art.

Dey, Mukul (1932).*Drawing and painting of kalighat*. Kolkata: Advance.

Dutta, Sona (2010). *Urban Patua: The Art of Jamini Roy*. Kolkata: Marg.

Dutta, Surajit (1993). *Folk painting of Bengal*. New Delhi: Khama Publishers.

Fergusson, James. *History of Indian and Eastern Architecture*. London: John Murray.

Ghosh, Anuradha (2022). *Jamini Roy*. Kolkata: Niyogi Books.

Ghosh, Prodyot (1373). Kalighat Pats: *Annals and Appaisal*. Kolkata: Shilpayan Artists Society.

Guha Thakurata, Tapati (1992). *The Making of a New 'Indian' Art.* Cambridge: Cambridge University Press.

Gupta, Mahendranath (1944). SwamiNikhilananda (Tranclate). *Gospel of Sri Ramkrishna*.Kolkata: Ramkrishna-Vivekananda Center.

Harrison, Charles, Wood, Paul and Gaiger, Jason (2000).*Art in Theory*. UK: Blackwell Publishers.

Havell, E. B (1908).*Indian Sculpture and Painting*. London: John Murray.

J. Mc Cutchion, Devid/ Bhowmik, Suhrid Kumar (1999).*Patuaand Patua Art in Bengal*. Kolkata: Firma KLM Private Ltd.

Jain, Champat Rai (1929). Risabha Deva – The Founder of Jainism. Allahabad: The Indian Press Limited.

Kapur, Geeta and Howard Hodgkin (1982).*Six Indian Painters*. London: The Tate Gallery.

Kastaria Manuja, Goldie and Kasturia, Shivani (2018).*Artist of India Modern and Contemporary Art*.24 by 7 Publishing.com.

Lady, Harringham (1915). Ajanta Frescoes. New Delhi:Aryan Books International.

Mahta, N. C (1926).Studies in Indian Painting. Bombay: Taraporevala.

Mitter, P (2001).*Indian Art*. UK: Oxford University press.

Mitter, Partha (2007).*The Triumph of Modernism: India's Artists and the Avant-Garde, 1922–1947*. London: Reaktion Books.

Nair, Uma (2016). *Jamini Roy*. Delhi: Dhoomimal.

Okakura, Kakuzo (1920). *The Ideals of the East*. New York: E. P. Dutton and Company.

Quintanilla, Sonya Rhe (Edited, 2008). *Rhythms of India: The Art of Nandalal Bose*. San Diego Museum of Art.

Sarkar, Sandip (2013). *Jamini Roy*. Kolkata: Golden Circle Publications.

Sinha, Suhashini and Pand. C (Edited, 2011). *Kalighat Painting*. London: V&A Publishing.

Sinha, Suhashini and Panda, C (2011).*Kalighat Paintings*. London: V &A Publishing.

Sister, Nivedita (1915).*Footfalls of Indian History*.London: Longmans, Green and Co.

Sister, Nivedita and Coomaraswamy, Ananda K. (1914).*Mythes of The Hindus and Buddhists*. London : George G. Harrap and Company.

Suharawardy, Sahid (1938). *Prefaces: Lectures on Art Subjects*. Calcutta University.

Sunderason, Sanjukta (2020). *Partisan Aesthetics: Modern Art and India's Long Decolonization*. Stanford: Stanford University Press.

Tagore, Abanindranath (1914). *Some Notes Of Indian Artistic Anatomy*. Culcutta : Indian Society of Oriental Art.

Tagore, Rabindranath (1913). *The Crescent Moon*. New york: The macmillam Company.

Tagore, Rabindranath (1918). *Gatanjali and Fruit-Gathering*. New-York: The Macmilan Company.

পত্র-পত্রিকা

বাংলা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত, ২০০৭)। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। প্রসঙ্গ শিল্প ও সংগীত সংখ্যা। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত, ১৩৮৭)।*অনুষ্টুপ*। চতুর্দশ বর্ষ। শীত-গ্রীষ্ম যুগ্ম সংখ্যা।

গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত, ১৩৩৪)। বিচিত্রা। কার্তিক।

ঘোষ, পান্নালাল (সম্পাদিত,২০১৯)। *শিলাদিত্য*। জানুয়ারি।

ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত,১৩৯৩)।*দেশ*। চৈত্র।

ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৩৮৯)। *দেশ*। নন্দলাল বসু সংখ্যা।

ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদিত, ১৯৮২)। *দেশ*। ফেব্রুয়ারি।

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত, ১৩৪৮)। *প্রবাসী*। আষাঢ়।

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত, ১৩৪৭)। *প্রবাসী*। বৈশাখ-আশ্বিন।

চট্টোপাধ্যায়, সুমন (সম্পাদিত, ১৪১৭)। *নবপত্রিকা*। শারদীয় সংখ্যা।

চট্টোপাধ্যায়, সুমন (সম্পাদিত, ১৪১৮)। *নবপত্রিকা*। শারদীয় সংখ্যা।

চট্টোপাধ্যায়, সুমন (সম্পাদিত, ১৪১৯)। *নবপত্রিকা*। শারদীয় সংখ্যা।

চৌধুরী, বিকাশ গণ (সম্পাদিত, ২০১৭)।*চমৎকার৯ঋ কাল,* প্রথম সংখ্যা।

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত, ১৩৫০)। *প্রবাসী*। পৌষ।

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত, ১৩২০)। প্রবাসী। মাঘ।

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত, ১৩৩৪)। প্রবাসী। মাঘ।

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (সম্পাদিত, ১৩৪৫)। *পরিচয়*। প্রথম সংখ্যা।

দাঁ, প্রশান্ত ও রায়, জয়ন্ত (সম্পাদিত, ১৩৭৮)। *ক্ষণিকা*। যামিনী রায় সংখ্যা।

দাস, মন্টু, বন্দ্যোপাধ্যায়, দুঃখভঞ্জন ও মিদ্যা, দেবদাস (সম্পাদিত, ১৩৯৪)। *সুচেতনা*। যামিনী রায় সংখ্যা।

সরকার, অশোক কুমার (সম্পাদিত,১৯৭২)। *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৫ এপ্রিল।

নন্দলাল বসু জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণিকা (১৮৮২-১৯৮২)। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বসু, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত, ১৯৮৩)।*জ্ঞান ও বিজ্ঞান*।

প্রধান, সুধী ও অন্যান্য (সম্পাদিত, ১৯১১)। *লোকশ্রুতি*। মার্চ।

প্রধান, সুধী ও অন্যান্য (সম্পাদিত, ১৯৯৩)। *লোকশ্রুতি*। জানুয়ারী।

প্রধান, সুধী ও অন্যান্য (সম্পাদিত, ১৯৯৬)। *লোকশ্রুতি*। ফেব্রুয়ারি।

ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পাদিত)। *লোকশ্রুতি*। ডিসেম্বর, ২০০০।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত, ১৪১৮)। *চিত্রকল্প কথা*। একাদশ বর্ষ। ১৪ সংখ্যা। কার্তিক।

ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পাদিত, ১৪০৭)। *চারুকলা* ২। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ভট্টাচার্য, অশোক (সম্পাদিত, ১৪১১)। *চারুকলা* ৩। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পাদিত, ২০০০)।*লোকশ্রুতি*। সপ্তদশ সংখ্যা।

ভট্টাচার্য, মিহির (সম্পাদিত,২০১৮)।*লোকশ্রুতি*। সৌজন্য সংখ্যা, জানুয়ারি।

মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত, ১৪১০)। *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা*।

মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৬)।*দশদিশি*। শিল্পকলাসিরিজ (প্রথমভাগ)।

মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত, ২০১৭)। *দশদিশি*। শিল্পকলা সিরিজ (দ্বিতীয় ভাগ)।

মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ (সম্পাদিত, ১৯৮৫)।যুগান্তর সাময়িকী। ২৪মার্চ।

রায়, সুশীল (সম্পাদিত, ১৩৭৩)। *বিশ্বভারতী* পত্রিকা। নন্দলাল বসু সংখ্যা।

লীলাময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত, ১৩৯৪)। *বাঁকুড়া হিতৈষী*।শারদ সংখ্যা। যামিনী রায়: শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সপ্তপর্ণী। সহজপাঠ বিশেষ সংখ্যা (১৯৮০-৮১)। বিশ্বভারতী ছাত্রসম্মিলনী।

সরকার, অভীক কুমার (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। *রবিবাসরী আনন্দবাজার*। ২৪ মার্চ।

সাধু, সুমন (সম্পাদিত, ২০২২)। *বঙ্গদর্শন*। দ্বিতীয় পর্ব, সংখ্যা ৬১। শনিবারের কড়চা : নন্দলাল বসু বিশেষ সংখ্যা।

সাধুখাঁ, সুদীপ্ত (সম্পাদিত, ২০১২)। *শহর*। প্রথমবর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি।

সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, সুমনা (সম্পাদিত, সংকলিত, রচিত, অনুদিত, ১৩৮৭)। *অবান্তর পত্রিকা*। বৈশাখ। যামিনী রায় সংখ্যা।

সেন, অপর্ণা (সম্পাদিত, ১৯৮৭)। *সানন্দা*। ২৩ এপ্রিল।

সেন, বঙ্কিমচন্দ্র (সম্পাদিত, ১৩৫৭)। *দেশ*। চৈত্র।

সেনগুপ্ত, আনন্দগোপাল (সম্পাদিত, ১৩৮০)। *সমকালীন*।

ইংরাজি

Chatterjee, Ramananda (Edited, January to June 1908). *The Modern Review*, vol. III.

Chatterjee, Ramananda (Edited, January to June 1914). *The Modern Review.*

Jamini Roy: A Profile, Oxygen News. Quaterly House Journal of Indian Oxygen Ltd. Vol. 5 No 1, January-March, 1965.

Jamini Roy: New Medico Quaterly, Winter No. 1945-55.

Prasad, Sujata (Edited, May 2022). *The NGMA Art Journal*. New Delhi: National Gallery of Modern Art.

অভিধান

বাংলা

আইচ, কমল (২০০০)। *শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পাদিত, ২০১১)। *আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি।

ওদুদ, কাজী আবদুল (সংকলিত)। ঘোষ, অনিলচন্দ্র (পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত)। *ব্যবহারিক শব্দকোষ*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।

খান, কালিম ও চক্রবর্তী, রবি (১৮১৭)। *বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ* ২য় খণ্ড। কলকাতা: ভাষাবিন্যাস।

চন্দ, অরূপ (২০২২)। *শিল্পের ব্যাকরণ*। মুর্শিদাবাদ: বাসভূমি প্রকাশন।

চৌধুরী, জামিল (২০০৯)। *শব্দসংকেত আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে উচ্চারণ সহ শব্দার্থ অভিধান*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদিত, ২০১৩)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

দাশ, শিশিরকুমার (সম্পাদিত, ২০০৩)। *সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পাদিত, ১৯৩৭)। *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* প্রথম ভাগ। কলকাতা: দি ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (১৪০৮)। *সংস্কৃত বাংলা অভিধান*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (১৯৯৯)। *সাহিত্যের শব্দার্থকোশ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (২০০৪)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। প্রথম খণ্ড। নিউ দিল্লী: সাহিত্য আকাদেমী।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (১৯৬৭)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। দ্বিতীয় খণ্ড। নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী।

বসু, রাজশেখর (১৪১০)। *চলন্তিকা*। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, সুভাষ (সম্পাদিত, ২০১৩)। *সংসদ বাংলা অভিধান*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড।

মিত্র, সুবলচন্দ্র (১৯৯৫)। *সরল বাঙ্গালা অভিধান*। কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি.।

মুরশিদ, গোলাম (সম্পাদিত, ২০১৪)। *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রায় কর্মকার, কেশবচন্দ্র ও পাল, নিমাইচন্দ্র (সম্পাদিত, ২০০৪)। *শব্দার্থ প্রকাশিকা*। কলকাতা: তুলিকলম।

সরকার, সুবোধচন্দ্র (সম্পাদিত, ১৪১১)। *পৌরাণিক অভিধান*। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ও বসু, অঞ্জলি (সম্পাদিত, ২০১০)। *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

ইংরাজি

Adeline's, M. Jules (1905). *Adeline's Art Dictionary*. New York: D. Appleton and Company.

বৈদ্যুতিন মাধ্যম

বাংলা

চক্রবর্তী, রঞ্জন। বাংলার পুতুল: ঐতিহ্যময় জীবনশৈলীর অঙ্গ। https://kulayefera.comLast accessed 07.02.2023

প্রাচ্যের আদর্শ : উৎসের খোঁজে। গাজী তানজিয়া। deshrupantor.com

সাধু, সুমন (সম্পাদিত, ২০২২)। গুপ্ত, দেবদত্ত। 'নন্দলাল বসুর পোস্টকার্ড'। https://www.Bangodarshoon.com. Last accessed on 07.07.2023

www.bongodorshon.com. Last accessed on 6.08.2023

সেন, অরুণ। 'বিষ্ণু দে ও তাঁর তিনি বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যামিনী রায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র'। http://www.Srishtisandhan.com. Last accessedon – 07/07/23

ইংরাজি

Chatterjee, Ratnabali (1987). 'The Original Jamini Roy: A Study in the Consumerism of Art'. *Social Scientist*, Vol 15, No 1. https://www.jstor.org/stable/3517398. last accessed on 5.04.2023

Datta, Meenakshi (1990–1991). 'The Popular Art of Jamini Roy: Reminiscences'. India International Centre Quarterly, Vol 17, No3/4, The Calcutta Psyche, Winter 1990/1991. 281-290. https://www.jstor.org/stable/23002469? seq=1. Last accessed 5.04.2023

Ezekiel, Nissim. 'Jamini Roy'. Journal of South Asian Literature, Vol. 11, No. 3/4, NISSIM EZELIEL ISSUE (Spring, Summer 1976), p. 69. http://www.jstor.org/stable/40873417. Last accessed: 11/06/2014 08:26)

Ghosh, Chilika (2013). 'Realism and the Issue of Taste: Marxist Cultural Debates in the 1940s'. *Social Scientist*, March–April 2013,Vol 41 No 3/ 4. 49–64.https://www.jstor.org/stable/23610471. Last accessed on 20.04.2023

https://disco.teak.fi/asis/zat-pwe-the-burmese-dance-drama/.

https://www.britannica.com/biography/Georges-Seurat

http://www. Srishtisandhan.com. Last accessed – 07/07/23

https://www.oldholland.com/academy/how-to-use-the-glaze-technique-effectively/?. Last accessed: 10.06.2023

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/modeling. Last accessed: 23.10.2023.

Iguchi, Toshino and Suga, Yasuko (Edited, 2017). *The Second Asian Conference of Design History and Theory: Design Education beyond Boundaries*. Japan: Tsuda University. https://acdth.com/download/2017/all_corol.pdf. Last accessed: 20.10.2023.

Murphy, Richard (1999). Theories of the Avant-Garde: Modernism, Expressionism, and the Problem of Postmodernity. P. 9. http://assets.cambridge.org/97805216/48691/excerpt/978052164891_excerpt.pdf

Pooja, Singh, Vivek and Arya, Nisha 2019. Devolopment of Contemporary Kathiawar Embroidery Design for Jacket. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.8(02): 2073–2080. Doi: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.802.240 Last accessed 08.12.2022

Ukil, Satyasri (2000). *Jamini Roy: The first but Forgotten Exhibition*. Mukul Dey Archives, reprinted from Art Deal, May–June 2000. https://www.chitralekha.org/articles/jamini-roy/jamini-roy-first-forgotten-exhibition. Last acced on 24. 05. 2023